আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯—৯১১ হি. ১৪৪৫—১৫০৫ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫তম পারা

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আহমদ মায়মূন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
লেখক ও সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা

মূল ❖ আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.)

অনুবাদক ❖ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন

প্রকাশক ❖ আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম.

প্রকাশকাল ❖ ১৫ রমযান, ১৪৩১ হিজরি
১লা এপ্রিল, ২০১১ ইংরেজি
১১ ভাদ্র, ১৪১৭ বাংলা

শব্দ বিন্যাস ❖ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৬২০.০০ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ -

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সমধিক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে এগারো হতে পনেরোতম পারার [তৃতীয় খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তৃতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)], তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতু সাবী, তাফসীরে উসমানি, তাফসীরে মাযহারীসহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
লেখক ও সম্পাদক
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الحادى عشر : এগারোতম পারা

الجزء الثانى عشر : বারোতম পারা

الجزء الثالث عشر : তেরোতম পারা

বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الرابع عشر : চৌদ্দতম পারা

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء الخامس عشر : পনেরোতম পারা

اَلْجُزْءُ الْحَادِيْ عَشَرَ : একাদশ পারা

٩٤. يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِى التَّخَلُّفِ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ قُلْ لَهُمْ لَا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ نُصَدِّقُكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ط اَىْ اَخْبَرَنَا بِاَحْوَالِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ بِالْبَعْثِ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَىِ اللّٰهِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ.

٩٥. سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ مِنْ تَبُوْكَ اَنَّهُمْ مَعْذُوْرُوْنَ فِى التَّخَلُّفِ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط بِتَرْكِ الْمُعَاتَبَةِ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ رِجْسٌ قَذَرٌ لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

٩٦. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ اَىْ عَنْهُمْ وَلَا يَنْفَعُ رِضَاكُمْ مَعَ سَخَطِ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

৯৪. তোমরা তাদের নিকট যুদ্ধ হতে ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট পশ্চাতে থাকার ব্যাপারে অজুহাত পেশ করবে তাদেরকে বল, তোমরা আর অজুহাত দাড় করো না। আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না। অর্থ– কখনোই তোমাদেরকে আমরা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। অতঃপর যিনি অদৃশ ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ অতঃপর তোমাদেরকে তিনি তার প্রতিফল দিবেন।

৯৫. তোমরা তাবুক হতে তাদের নিকট ফিরে আসলে অর্থ– তোমরা ফিরে গেলে। পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার অজুহাত বর্ণনা করতে গিয়ে তারা আল্লাহর শপথ করবে যেন তোমরা শাস্তি প্রদান না করে তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেহেতু তাদের অন্তর আবিলতাপূর্ণ সেহেতু তারা ঘৃণ্য অপবিত্র। আর তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম হলো তাদের আবাসস্থল।

৯৬. তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ তাদের প্রতি তুষ্ট হবেন না। আর আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিতে তোমাদের সন্তুষ্টি কোনো উপকারে আসবে না।

٩٧. اَلْاَعْرَابُ اَهْلُ الْبَدْوِ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا مِنْ اَهْلِ الْمُدُنِ لِجَفَائِهِمْ وَغِلْظِ طِبَاعِهِمْ وَبُعْدِهِمْ عَنْ سِمَاعِ الْقُرْاٰنِ وَّاَجْدَرُ اَوْلٰى اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنَ الْاَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ حَكِيْمٌ. فِىْ صُنْعِهٖ بِهِمْ.

৯৭. মরুবাসীরা অর্থাৎ গ্রামবাসী বেদুঈনরা কুফরি ও মুনাফিকীতে রুক্ষতা, কর্কশতা এবং কুরআন শ্রবণ হতে দূরে থাকার দরুন নগরবাসীদের তুলনায় কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ও শরিয়তের বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার জ্ঞান লাভ না করারই অধিক উপযুক্ত। اَجْدَرُ অর্থ– অধিক উপযুক্ত। اَنْ এ স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে খুব অবহিত তাদের সাথে তাঁর কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়।

٩٨. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَغْرَمًا غَرَامَةً وَّخُسْرَانًا لِاَنَّهٗ لَا يَرْجُوْ ثَوَابَهٗ بَلْ يُنْفِقُهٗ خَوْفًا وَهُمْ بَنُوْ اَسَدٍ وَغِطْفَانُ وَّيَتَرَبَّصُ يَنْتَظِرُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ دَوَائِرَ الزَّمَانِ اَنْ يَّنْقَلِبَ عَلَيْكُمْ فَيَتَخَلَّصَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ اَىْ يَدُوْرُ الْعَذَابُ وَالْهَلَاكُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِ عِبَادِهٖ عَلِيْمٌ بِاَفْعَالِهِمْ.

৯৮. মরুবাসীদের কেউ কেউ এমন যে আল্লাহ তা'আলার পথে যা ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক করে অর্থাৎ দায় ও ক্ষতি বলে মনে করে। কেননা তারা তার ছওয়াবের আশা রাখে না। কেবলমাত্র ভয়ে ও আশঙ্কায় তারা তা ব্যয় করে। আর তারা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়েরই অপেক্ষা করে। অর্থাৎ তারা এ প্রতিক্ষায় আছে যে, কালের আবর্তনে তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসবে আর তারা রেহাই পাবে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই اَلسَّوْءُ -এর س -এ পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর নয় বরং তাদের উপরই ধ্বংস এবং আজাব নেমে আসুক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কথাবার্তা শুনেন, তাদের ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে জানেন। এ আরবরা হলো আসাদ এবং গাতফান গোত্র।

٩٩. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ كَجُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ فِىْ سَبِيْلِهٖ قُرُبٰتٍ تُقَرِّبُهٗ عِنْدَ اللّٰهِ وَ وَسِيْلَةً اِلٰى صَلَوٰتِ دَعَوَاتِ الرَّسُوْلِ ط لَهُمْ اَلَآ اِنَّهَا اَىْ نَفَقَتُهُمْ قُرْبَةٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِهَا ط لَّهُمْ عِنْدَهٗ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط جَنَّتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِاَهْلِ طَاعَتِهٖ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

৯৯. মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে যেমন জুহাইনা এবং মুযাইনা গোত্র। তারা তাঁর [আল্লাহর] পথে যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এবং তাদের স্বপক্ষে রাসূলের সালাওয়াত অর্থাৎ দোয়া পাওয়ার অসিলা হিসেবে মনে করে। শুনে রাখ! বাস্তবিকই তা অর্থাৎ তাদের এ ব্যয় তাদের জন্য তাঁর সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন। আল্লাহ তাদেরকে অচিরেই তাঁর রহমত জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর অনুগতদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু। قُرُبٰتٍ অর্থ– সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন। قُرْبَةٌ এর ر অক্ষরটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ : এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের আগামী অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যখন মুনাফিকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের ওজর পেশ করবে। এখানে قُلْ -এর মুখাতাব যদি রাসূল ﷺ হন যেমনটি সুস্পষ্ট; তবে كُمْ বহুবচনের যমীর আনা হয়েছে সম্মানার্থে আর যদি كُمْ যমীর দ্বারা রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণ উদ্দেশ্য হন তবে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সর্বাধিনায়ক বা মহাপরিচালক হিসেবে।

قَوْلُهُ نُصَدِّقُكُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَكُمْ -এর মধ্যে لَامْ টি অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ وَرَسُوْلُهُ : এর আতফ হলো اَللّٰهُ শব্দের উপর। আর মাঝখানে رُؤْيَتْ -এর মাফউলকে এটা প্রকাশ করার জন্য নিয়েছেন যে, প্রতিদান ও ছওয়াব এবং ধমক ও শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার رُؤْيَتْ -এর সাথে।

قَوْلُهُ الْأَعْرَابُ : এটা اِسْم جَمْع যা বহুবচনের সুরতে হয়েছে। এটা عَرَبٌ -এর বহুবচন নয়। কেননা عَرَبٌ আরবি ভাষীকে বলে চাই সে গ্রাম্য হোক বা শহুরে হোক। আর أَعْرَابٌ টা أَعْرَابِيٌّ -এর বহুবচন। যার অর্থ গ্রাম্য ব্যক্তি।

قَوْلُهُ جَفَاءٌ : এর অর্থ হলো- হৃদয়ের কাঠিন্য, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন।

قَوْلُهُ الدَّوَائِرَ : এটা دائرة -এর বহুবচন। অর্থ হলো- বালামসিবত। دَوَائِرُ الزَّمَانِ অর্থ- কালের দুর্যোগ, মসিবত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফিকদের আলোচনা ছিল যারা গাযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জিহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদিনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদিনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওজর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুত ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

১. যখন এরা আপনার কাছে ওজর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, অযথা মিথ্যা ওজর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দৌরাত্ম্য এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোনো রকম ওজর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে- وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ এতে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, এখনো যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোনো উপকারই সাধন করবে না।

২. দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং এবং সেজন্য যেন কোনো ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এ

বাসনা পূরণ করে দিন। فَاعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ ভর্ৎসনা করে কোনো ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। অযথা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

৩. তৃতীয় আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাজি করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাজি হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাজি হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেওয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজি নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরি ও মুনাফিকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ তা'আলা কেমন করে রাজি হবেন!

قَوْلُهُ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا الخ : বিগত আয়াতগুলোতে মদিনার মুনাফিকদের আলোচনা ছিল। আর বর্তমান আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সমস্ত মুনাফিকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মদিনার উপকণ্ঠে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত।

اَعْرَابٌ শব্দটি عَرَبٌ শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদবিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে اَعْرَابِىٌّ বলা হয়। যেমন– اَنْصَارٌ-এর একবচন اَنْصَارِىٌّ হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরি ও মুনাফিকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশি কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা ইলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। اَجْدَرُ اَنْ لَا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ না কুরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা জাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে একপ্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরিকে লুকাবার জন্য নামাজও পড়ে নেয় এবং ফরজ জাকাত দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোনো রকমে মুসলমানদের উপর কোনো বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। اَلدَّوَائِرُ শব্দটি دَائِرٌ-এর বহুবচন। আরবি অভিধান অনুযায়ী دَائِرَةٌ [দায়েরাহ] এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভালো অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কুরআন কারীম তাদের উত্তরে বলেছে– عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনার কুরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সঙ্গত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে, তাঁদের অবস্থা হলো এই যে, তাঁরা যে সদকা-জাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া প্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে। সদকা যে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কুরআন কারীমে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুসলমানদের কাছ থেকে জাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সদকা উসুল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صَلٰوةٌ শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দোয়াকে صَلٰوةٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٠٠. وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا اَوْ جَمِيْعُ الصَّحَابَةِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ بِاِحْسَانٍ فِى الْعَمَلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوْا عَنْهُ بِثَوَابِهِ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِزِيَادَةِ مِنْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

১০০. মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রবর্তী অর্থাৎ যারা বদর যুদ্ধে শরিক ছিলেন তারা বা সকল সাহাবীই তার অন্তর্ভুক্ত এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত কাজেকর্মে উত্তমতা ও একনিষ্ঠতাসহ তাদেরকে অনুগমন করে আল্লাহ তাঁর প্রতি আনুগত্যের কারণে তাদের প্রতি প্রসন্ন ও তারাও তৎপ্রদত্ত ছওয়াব ও পুণ্যফল দর্শনে তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। অপর এক কেরাতে تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ-এর পূর্বে একটি مِنْ সহ পঠিত রয়েছে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা সাফল্য।

١٠١. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ط كَاَسْلَمَ وَاَشْجَعَ وَغِفَارٍ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قف مُنٰفِقُوْنَ اَيْضًا مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَجُّوْا فِيْهِ وَاسْتَمَرُّوْا لَا تَعْلَمُهُمْ ط خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ط سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِالْفَضِيْحَةِ اَوِ الْقَتْلِ فِى الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ هُوَ النَّارُ.

১০১. হে মদিনাবাসীগণ, মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে রয়েছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক যেমন আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্র এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক। তারা মুনাফিকীতে সিদ্ধ; তাতেই তারা মত্ত এবং তাতেই তারা কালাতিপাত করে। তুমি তাদেরকে জান না لَا تَعْلَمُ এ শব্দটিতে তুমি বলে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত বা নিহত করে আর কবরে আজাব দিয়ে দু-বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা পরকালে প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তি অর্থাৎ মহাগ্নির দিকে।

١٠٢. وَ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ مُبْتَدَاٌ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ مِنَ التَّخَلُّفِ نَعْتُهُ وَالْخَبَرُ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَهُوَ جِهَادُهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ اَوِ اعْتِرَافُهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ وَّاٰخَرَ سَيِّئًا وَهُوَ تَخَلُّفُهُمْ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১০২. এবং অপর কতক সম্প্রদায় اٰخَرُوْنَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। নিজেদের পশ্চাতে থাকার অপরাধ স্বীকার করেছে। اِعْتَرَفُوْا এটা উক্ত مُبْتَدَأٌ-এর نَعْت বা বিশেষণ আর خَلَطُوْا টি خَبَرٌ বা বিধেয়। তারা সৎকর্মের সাথে অর্থাৎ পূর্বের জিহাদসমূহে অংশগ্রহণ করা বা এ অপরাধের স্বীকার করে নেওয়া বা ইত্যাদি অন্যান্য যে সৎ আমলসমূহ রয়েছে তার সাথে অপকর্মের অর্থাৎ এ জিহাদ হতে পশ্চাতে থাকার মিশ্রণ করে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

نَزَلَتْ فِى اَبُوْ لُبَابَةَ وَجَمَاعَةٍ اَوْثَقُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا نُزِّلَ فِى الْمُتَخَلِّفِيْنَ وَحَلَفُوْا اَنْ لَا يَحُلُّهُمْ اِلَّا النَّبِىُّ ﷺ فَحَلَّهُمْ لَمَّا نَزَلَتْ.

যারা এ জিহাদ হতে পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে যে হুমকিপূর্ণ আয়াত নাজিল হয়েছে তা জানতে পেরে হযরত আবূ লুবাবা এবং তাঁর মতো আরো কতিপয় সাহাবী [যাঁরা এ যুদ্ধে শরিক হননি।] নিজেদেরকে মসজিদের স্তম্ভে বেঁধে রাখেন এবং শপথ করেন, রাসূলে কারীম ﷺ নিজের হস্তে খুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এ বন্ধন খুলব না। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তা নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাঁদের বন্ধন খুলে দেন.

١٠٣. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا مِنْ ذُنُوْبِهِمْ فَاَخَذَ ثُلُثَ اَمْوَالِهِمْ وَتَصَدَّقَ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اُدْعُ لَهُمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ رَحْمَةٌ لَّهُمْ وَقِيْلَ طَمَانِيْنَةٌ بِقَبُوْلِ تَوْبَتِهِمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

১০৩. তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করবে। তার মাধ্যমে তুমি তাদরকে পাপ হতে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। এটা নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাদের সম্পদ হতে এক তৃতীয়াংশ নিয়ে সদকা করে দিয়েছিলেন। তুমি তাদের উপর সালাত বর্ষণ করবে অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া করবে। তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিকর, অর্থাৎ রহমতস্বরূপ। কেউ কেউ বলেন, তার [سَكَنٌ -এর] অর্থ হলো, তাদের তওবা কবুল করার মাধ্যমে তা তাদের চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٠٤. اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ يَقْبَلُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ عَلٰى عِبَادِهٖ بِقَبُوْلِ تَوْبَتِهِمْ الرَّحِيْمُ بِهِمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْقَصْدُ بِهٖ تَهْيِيْجُهُمْ اِلَى التَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ.

১০৪. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন, তা কবুল করেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করত তাদের প্রতি অতি ক্ষমা পরবশ, তাদের সম্পর্কে পরম দয়ালু। اَلَمْ এ প্রশ্নবোধকটি এ স্থানে تَقْرِيْر বা বিষয়টিকে সুসাব্যস্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হলো, তওবা ও সদকার প্রতি মানুষকে আরো উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

١٠٥. وَقُلِ لَهُمْ اَوْ لِلنَّاسِ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ بِالْبَعْثِ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَىِ اللّٰهِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

১০৫. তাদেরকে বা সকল মানুষকে বল, যা ইচ্ছা তোমরা কর; আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও করবে। পুনরুত্থানের মাধ্যমে অচিরেই তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল কিছুর পরিজ্ঞাতার নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন

١٠٦. وَاٰخَرُوْنَ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ مُرْجَوْنَ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهِ مُؤَخَّرُوْنَ عَنِ التَّوْبَةِ لِاَمْرِ اللّٰهِ فِيْهِمْ بِمَا يَشَاءُ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ بِاَنْ يُمِيْتَهُمْ بِلَا تَوْبَةٍ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ بِهِمْ وَهُمُ الثَّلَاثَةُ الْاٰتُوْنَ بَعْدُ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ تَخَلَّفُوْا كَسَلًا وَمَيْلًا اِلَى الدَّعَةِ لَا نِفَاقًا وَلَمْ يَعْتَذِرُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَغَيْرِهِمْ فَوُقِفَ اَمْرُهُمْ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَهَجَرَهُمُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ بَعْدُ.

১০৬. আর পশ্চাতে যারা রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অপর কতক এমন যাদের বিষয়টি আল্লাহর যদৃচ্ছা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় স্থগিত রইল। مُرْجَوْنَ শব্দটির ج -এর পরে হামযাসহ ও তা ব্যতিরেকে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তাদের তওবা কবুল করা বিলম্বিত করা হলো। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তওবাহীন অবস্থায় তাদের মৃত্যুদান করত তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর নয়তো ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের বিষয়ে তাঁর কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়। তারা হলেন ঐ তিনজন যাদের কথা পরে আসছে। অর্থাৎ হযরত মুরারা ইবনুর রবী, হযরত কা'ব ইবনে মালেক এবং হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া। তাঁরা মুনাফিকীতে নয়; বরং অলসতা এবং আরামের খেয়ালে পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ -এর প্রত্যাবর্তনের পর অন্যান্য [মুনাফিকদের মতো মিথ্যা] অজুহাতও তাঁরা প্রদর্শন করেননি। তাদের তওবার বিষয়টি পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত স্থগিত ছিল। লোকেরা তাদের সাথে বয়কট করেছিল। শেষ পর্যন্ত পরে তাদের তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাজিল হয়।

١٠٧. وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا وَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ ضِرَارًا مُضَارَّةً لِاَهْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَّكُفْرًا لِاَنَّهُمْ بَنَوْهُ بِاَمْرِ اَبِيْ عَامِرِ الرَّاهِبِ لِيَكُوْنَ مَعْقِلًا لَهُ يَقْدَمُ فِيْهِ مَنْ يَّاتِيْ مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ ذَهَبَ لِيَاْتِيَ بِجُنُوْدٍ مِنْ قَيْصَرَ لِقِتَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ بِقُبَاءٍ بِصَلٰوةِ بَعْضِهِمْ فِيْ مَسْجِدِهِمْ وَاِرْصَادًا تَرَقُّبًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ط اَيْ قَبْلَ بِنَائِهِ .

১০৭. এবং তাদের মধ্যে একদল এমন যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে তারা ছিল বারোজন মুনাফিকের একটি দল। ক্ষতিসাধন অর্থাৎ কুবাবাসীদের ক্ষতি করা, কুফরি মু'মিনদের মধ্যে অর্থাৎ যারা কুবা মসজিদে নামাজ পড়তেন তাদের কিছু সংখ্যাককে এ তথাকথিত মসজিদে নিয়ে এসে পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ তথাকথিত মসজিদটি আবূ আমির নামক ইসলামের দুশমন জনৈক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর নির্দেশে নির্মাণ করেছিল। এটা ছিল তার চক্রান্তের ঘাঁটি। যারা তাঁর নিকট হতে গোপন সংবাদ নিয়ে আসত তারা এখানে অবস্থান করত। সে নিজে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য রোম সম্রাট কায়সারের নিকট সৈন্য সাহায্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। এবং ইতঃপূর্বে অর্থাৎ তা নির্মাণের পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে অর্থাৎ তাদের নেতা আবূ আমীরের গোপন ঘাঁটিস্বরূপ মুসলিমদের গতিবিধি ও তৎপরতা লক্ষ্য রাখার ঘাঁটিস্বরূপ। তারা

وَهُوَ أَبُو عَامِرٍ الْمَذْكُوْرُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ مَا أَرَدْنَا بِبِنَائِهِ إِلَّا الْفِعْلَةَ الْحُسْنٰى مِنَ الرِّفْقِ بِالْمِسْكِيْنِ فِى الْمَطَرِ وَالْحَرِّ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ ـ

অবশ্যই শপথ করে বলবে, এর নির্মাণে ভালো ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। إِنْ টি এই স্থানে না-বাচক শব্দ مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْحُسْنٰى -এর পূর্বে اَلْفِعْلَةُ [কাজ] শব্দটি উহ্য। তা [اَلْحُسْنٰى-ভালো] এর বিশেষণ। অর্থাৎ তারা বলবে, গরম ও বৃষ্টির সময় দরিদ্র লোকদের জন্য কিছু সুবিধা এবং মুসলিমদের স্থান সংকুলানের কিছুটা ব্যবস্থা করা ভিন্ন তাতে আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা এ কথায় বাস্তবিকই মিথ্যাবাদী।

١٠٨. وَكَانَ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ فَنَزَلَ لَا تَقُمْ تُصَلِّ فِيْهِ أَبَدًا ۚ فَأَرْسَلَ جَمَاعَةً هَدَمُوْهُ وَحَرَّقُوْهُ وَجَعَلُوْا مَكَانَهُ كُنَاسَةً تُلْقٰى فِيْهَا الْجِيَفُ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ بُنِيَتْ قَوَاعِدُهُ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ يَوْمَ حَلَلْتَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ كَمَا فِى الْبُخَارِىِّ أَحَقُّ مِنْهُ أَنْ أَىْ بِأَنْ تَقُوْمَ تُصَلِّيَ فِيْهِ ۚ فِيْهِ رِجَالٌ هُمُ الْأَنْصَارُ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ أَىْ يُثِيْبُهُمْ وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْأَصْلِ فِى الطَّاءِ ـ رَوٰى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّهُ ﷺ أَتَاهُمْ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ ـ

১০৮. তারা রাসূল ﷺ-কে এ তথাকথিত মসজিদটিতে নামাজ পড়তে অনুরোধ জানিয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তুমি তাতে কখনো দাঁড়াইও না অর্থাৎ সালাত পড়ো না। অনন্তর রাসূল ﷺ একদল সাহাবী প্রেরণ করেন। তাঁরা এ তথাকথিত মসজিদটি বিধ্বস্ত করে দেন এবং জ্বালিয়ে দেন। পরে ঐ স্থানটিকে আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মরা পশু ইত্যাদি সেই স্থানে ফেলা হতো। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে أُسِّسَ অর্থ– ভিত স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়ার উপর তাতেই তোমার দাঁড়ানো أَنْ এ স্থানে بِأَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সালাত আদায় করা এ ক্ষতিকর মসজিদটির তুলনায় অধিক সমুচিত। যেদিন রাসূল ﷺ প্রথম হিজরত করে আসেন তখন এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ মসজিদটিই হলো কুবার মসজিদ। তাতে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা ভালোবাসে। তারা হলেন আনসার সাহাবীগণ। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে তার বিনিময় দান করবেন। اَلْمُطَّهِّرُوْنَ তাতে মূলত ت -এ ط অক্ষরের إِدْغَامٌ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে। ইবনে খুযাইমা তৎসংকলিত সহীহ উআইমার ইবনে সায়িদা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ﷺ মসজিদে কুবায় তশরিফ নিয়ে আসলেন।

فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِى الطُّهُوْرِ فِىْ قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ فَمَا هٰذَا الطُّهُوْرُ الَّذِىْ تَطَهَّرُوْنَ بِهٖ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَعْلَمُهٗ شَيْئًا اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَكَانُوْا يَغْسِلُوْنَ اَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوْا وَفِىْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فَقَالُوْا كُنَّا نَتَّبِعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ فَقَالَ هُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ.

এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তোমাদের পবিত্রতা সম্পর্কেও খুব সুন্দর প্রশংসা করেছেন। বল তো, তোমরা কি ধরনের পবিত্রতা অর্জন করে থাক? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর শপথ! বিশেষ কিছু তো আমাদের জানা নেই, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমাদের কতিপয় ইহুদি প্রতিবেশী ছিল। তারা শৌচকার্যে পানি ব্যবহার করত। তাদের মতো আমরাও তা করে থাকি। বায্যার বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, তারা বলেছিলেন, আমরা শৌচকার্যে ঢিলা ব্যবহার করার সাথে সাথে পানিও ব্যবহার করে থাকি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আসলে তাই ঐ প্রশংসার কারণ। তোমরা এ আমল দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক।

١٠٩. اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مَخَافَةً مِنَ اللّٰهِ وَرَجَاءٍ رِضْوَانٍ مِنْهُ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا طَرَفٍ جُرُفٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِهَا جَانِبٍ هَارٍ مُشْرِفٍ عَلَى السُّقُوْطِ فَانْهَارَ بِهٖ سَقَطَ مَعَ بَانِيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ط خَيْرُ تَمْثِيْلٍ لِلْبِنَاءِ عَلٰى ضِدِّ التَّقْوٰى بِمَا يُؤَوَّلُ اِلَيْهِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَىِ الْاَوَّلُ خَيْرٌ وَهُوَ مِثَالُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالثَّانِىْ مِثَالُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

১০৯. যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া তাঁর ভয় [ও] তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশার উপর স্থাপন করে সে উত্তম না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাতের ধসনুখ কিনারায়। شَفَا অর্থ- কিনারা। جُرُفٍ তার ر অক্ষরটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপে পাঠ করা যায়। অর্থ এক কিনারা। هَارٍ অর্থ- ধসনুখ। ফলে যা তাকে তার নির্মাতাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? খসে পড়ে। তা তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির বিপরীত বস্তুর উপর ভিত্তি করত গৃহ নির্মাণের মারাত্মক পরিমাণের একটি উদাহরণ। تَقْرِيْر বা বিষয়টির সুসাব্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠা অর্থে, এ স্থানে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার করা হয়েছে, তার মর্ম হলো যে প্রথম ধরনের গৃহই উত্তম। প্রথমটি হলো মসজিদে কুবার উদাহরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো মসজিদে জিরার বা ঐ ক্ষতিকর মসজিদটির উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

١١٠. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ تَنْفَصِلَ قُلُوبُهُمْ بِأَنْ يَمُوتُوا وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيمٌ . فِي صُنْعِهِ بِهِمْ

১১০. তাদের গৃহ যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে رِيْبَةً অর্থ– সন্দেহ। যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ মরে আলাদা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাঁর কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : এ বাক্যের সর্বোৎকৃষ্ট তারকীব হলো এই যে, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ হলো صِفَتْ হলো اَلْاَوَّلُوْنَ আর مَوْصُوْف হলো اَلسَّابِقُوْنَ; সিফত ও মওসূফ মিলে মুবতাদা। আর بِإِحْسَانٍ টা উভয়ের সাথে হয়ে حَالْ হয়েছে। আর اَلَّذِيْنَ হলো إِتَّبَعُوْهُمْ -এর সেলাহ। আর وَالَّذِيْنَ হলো মা'তূফ اَلسَّابِقُوْنَ -এর উপর। আর حَالٌ হয়ে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এটা জুমলা হয়ে اَلسَّابِقُوْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। এই তারকীব ছাড়াও কেউ কেউ আরো দুটি তারকীব করেছেন। কিন্তু إِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ প্রণেতা সেগুলো দুর্বল বরং ভুল বলেছেন। প্রথম তারকীব হলো اَلسَّابِقُوْنَ মুবতাদা আর اَلْاَوَّلُوْنَ হলো তার খবর। দ্বিতীয় তারকীব হবে اَلسَّابِقُوْنَ হলো মুবতাদা আর مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَجَمِيْعُ الصَّحَابَةِ : এ ইবারতের মধ্যে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ -এর মধ্যকার দুটি উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِزِيَادَةِ مِنْ : অর্থাৎ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

قَوْلُهُ مَرَدُوْا : এ শব্দটি جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর- مَاضِى -এর সীগাহ। অর্থাৎ تَمَرَّنُوْا عَلَيْهِ দক্ষ ও নিপুণ হয়ে গেল। প্রত্যেক কল্যাণ শূন্য হয়ে পড়ল। এর থেকেই اَلشَّيْطَانُ الْمَارِدُ মন্দের উপর জমে বসে গেছে।

قَوْلُهُ قَوْمٌ : قَوْمٌ শব্দটি উহ্য মেনে এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন যে, মুবদাতার জন্য ذَاتْ হওয়া জরুরি। অথচ اٰخَرُوْنَ টা ذَاتْ নয়; বরং তা وَصْف তাই قَوْمٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَلْاٰخَرُوْنَ হলো সিফত আর তার মওসূফ যা মুবতাদা তা হলো উহ্য قَوْمٌ কাজেই কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ نَعْتُهُ : এটা সেই সংশয়ের জবাব যে, قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ হলো نَكِرَة আর نَكِرَة মুবতাদা হতে পারে না। এর জবাব দিয়েছেন যে, اِعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ এটা قَوْم -এর সিফত যার কারণে قَوْمٌ টি نَكِرَة থাকেনি। কাজেই قَوْمٌ টা মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْمٌ سَوَارِىْ : এটা سَارِيَةٌ -এর বহুবচন, স্তম্ভকে বলা হয়।

قَوْلُهُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ : এখানে تُطَهِّرُ টা صَدَقَةً -এর সিফত تُطَهِّرُ -এর যমীরের দিকে ফিরেছে। تُطَهِّرُ টা مُضَارِعْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। আর যদি تُطَهِّرُ টা حَاضِرْ -এর সীগাহ হয় আর مُخَاطَبْ হন রাসূল ﷺ-তবে بِهَا -এর تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -এর সম্পর্ক تُطَهِّرُ এবং تُزَكِّيْهِمْ উভয়ের সাথে হবে। অর্থাৎ

قَوْلُهُ مُرْجَؤُوْنَ : এখানে হামযা ব্যতীতও একটি কেরাত রয়েছে অর্থাৎ مُرْجَوْنَ তথা مُؤَخَّرُوْنَ এবং مَوْقُوْفُوْنَ। مُرْجَوْنَ এটা اِرْجَاءٌ হতে اِسْم مَفْعُوْل -এর- جَمْع مُذَكَّر -এর সীগাহ। অর্থ সে সকল লোক যাদের লেনদেন পরিহার করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَبِىْ عَامِرٍ : সে ছিল গাসীলুল মালাইকা হযরত হানযালা (রা.)-এর পিতা। সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যখন রাসূল ﷺ মদিনায় আগমন করলেন তখন সে মহানবী ﷺ-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

قَوْلُهُ مَعْقَلًا : অর্থ– ঠিকানা, আশ্রয়স্থল।

قَوْلُهُ الْفَعْلَةَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْحُسْنٰى হলো সিফত আর তার মওসূফ হলো اَلْفَعْلَةَ বা اَلْخَصْلَةَ ইত্যাদি যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْمَسَاكِيْنِ : কোনো কোনো নুসখায় بِالْمَسَاكِيْنِ-এর স্থলে بِالْمُسْلِمِيْنَ রয়েছে, যা অধিক সমীচীন।

قَوْلُهُ شَفَا : অর্থ– কূপের কাঁচা কিনারা, নদী, পুকুর ইত্যাদির পানি মুক্ত কিনারা বা পার্শ্ব, সমুদ্র সৈকত।

قَوْلُهُ هَارٍ : এটা اِسْمُ فَاعِلٌ-এর সীগাহ। অর্থ– পড়ে যাওয়ার নিকটবর্তী। মূলবর্ণ (ه و ر) هَار শব্দটি মূলত هَاوِر অথবা هَائِرٌ ছিল। رَاءْ-এর পরে هَمْزَةٌ-এর- هَائِرٌ-কে অথবা وَاوْ-এর- هَاوِرٌ-কে قَلْبُ مَكَانِىْ তথা স্থানভিত্তিক পরিবর্তন করে দিয়েছে ফলে هَارِوٌ বা هَارِءٌ হয়ে গেছে। এরপর هَمْزَةٌ বা وَاوْ-কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে هَارِىٌ হয়ে গেছে। এরপর كَسْرَةٌ-এরপর يَاءْ-এর উপর পেশ কঠিন হওয়ার কারণে يَاءْ-কে সাকিন করে দিয়েছে। এরপর يَاءْ সাকিন ও তানবীনের মাঝে দু সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে يَاءْ-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে هَارٍ হয়ে গেছে।

অথবা কেউ কেউ বলেন যে, هَاوِرٌ-এর وَاوْ-কে বা هَائِرٌ-এর يَاءْ-কে قَلْبُ مَكَانِىْ ব্যতীত تَخْفِيْفًا ফেলে দেওয়ার ফলে هَارٍ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَعَ بَانِيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِهِ-এর মধ্যে بَاءْ টি مَعَ অর্থে হয়েছে, سَبَبِيَّة হয়নি।

قَوْلُهُ تَمْثِيْلٌ لِلْبِنَاءِ بِمَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ : اِلَيْهِ-এর مَرْجِعْ হলো سُقُوْط এটা সেই بِنَاءْ-এর تَمْثِيْل যা তাকওয়ার বিপরীতে বিনির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ مُشَبَّهٌ بِهِ সেই অট্টালিকা যা এমন জায়গায় বানানো হয়েছে যা ধসে যাওয়া ও দেবে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। আর مُشَبَّهٌ হলো ধর্মীয় বিধান ও আমল সমূহকে কুফর ও নেফাকের উপর مُرَتَّبٌ করা।

قَوْلُهُ رِيْبَةً : অর্থাৎ سَبَبَ رِيْبَةٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ : এর পরবর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবান বেদুইন মু'মিনদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে সাধারণ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের আলোচনা হচ্ছে, যাতে তাদের মর্যাদা ও ফজিলতেরও বিবরণ রয়েছে।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয়কে অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ تَبْعِيْض-এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজিরীন ও আনসারদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ১. ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং ২. অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম। এমন করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা [অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ]-এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ গণ্য করেছেন। এমনটি হলো সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব ও হযরত কাতাদা (র.)-এর। হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আউওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (র.)-এর মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বায়'আতে রেজওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আউওয়ালীন'। বস্তুত প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবা মুহাজির হোক বা আনসার 'সাবেকীনে আউওয়ালীনের' পর দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। –[কুরতুবী, মাযহারী]

তাফসীরে মাযহারীতে আরো একটি অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিককে বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি; বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আউওয়ালীন। আর سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ হলো তার বিবরণ। বয়ানুল কুরআন থেকে তাফসীরের যে সারসংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তাফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দুটি শ্রেণি সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হলো সাবেকীনে আউওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি হলো কেবলা পরিবর্তন কিংবা গজওয়ায়ে বদর অথবা বাই'আতে রেজওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাদের। আর দ্বিতীয় তাফসীরের মর্ম হলো এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আউওয়ালীন। কারণ ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তাফসীর অনুযায়ী তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে সেসমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গজওয়ায়ে বদর অথবা বায়'আতে হুদাবিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কিয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تَابِعِيْ [তাবেয়ী] বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতি ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত : মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রা.)-কে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন, যদি দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলেছেন [এর প্রমাণ কি?] তিনি বললেন, কুরআন কারীমের আয়াত পড়ে দেখ– اَلسَّابِقُوْنَ اَلْاَوَّلُوْنَ এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবী সম্পর্কেই বলা হয়েছে– رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اِتِّبَاعٌ بِاِحْسَانٍ-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোনো রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তাফসীরে মাজহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো– لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى . আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের আল্লাহ তা'আলার তাদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

জ্ঞাতব্য : যেসব লোক সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং তাঁদের মাঝে সংঘটিত ঘটনাবলির ভিত্তিতে কোনো কোনো সাহাবী সম্পর্কে এমন সমালোচনা করে, যার ফলে মানুষের মন তাদের উপর কুধারণায় লিপ্ত হতে পারে, তারা নিজেদেরকে এক আশঙ্কাজনক পথে নিয়ে ফেলছে। আল্লাহ রক্ষা করুন।

قَوْلُهُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ الخ : বিগত অনেক আয়াতে সেসব মুনাফিকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের নেফাক তথা মুনাফিকী তাদের কথা ও কাজে প্রকাশ পেয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও জানতেন যে, এরা মুনাফিক। এ আয়াতে এমন সব মুনাফিকের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মুনাফিকী অত্যন্ত চরম পর্যায়ের হওয়ার দরুন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গোপনই রয়ে গেছে। এ আয়াত এহেন কঠিন মুনাফিকদের উপর আখেরাতের পূর্বেই দু-রকম আজাব দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মুনাফিকী গোপন রাখার চিন্তা এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে পতিত থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আর তাদের অনুসরণে বাধ্য থাকাটাও কোনো অংশে কম আজাব নয়। দ্বিতীয়ত কবর ও বরজখ এর আজাব যা কিয়ামত ও আখেরাতের পূর্বে তারা ভোগ করবে।

قَوْلُهُ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ الخ : গাযওয়ায়ে তাবুকের জন্য যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা প্রচার করা হলো এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। গন্তব্যও ছিল দূরদূরান্তের, আর মোকাবিলা ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে, যা ছিল ইসলামি ইতিহাসের প্রথম ঘটনা। এসব কারণেই এ নির্দেশ সম্পর্কে জনগণের অবস্থায় বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং তাদের লোকগুলো কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এক শ্রেণি ছিল নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ লোকদের যারা প্রথম নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় জিহাদের জন্য তৈরি হয়ে যান। দ্বিতীয় শ্রেণির ছিলেন সেসব লোক যারা প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই সঙ্গী হয়ে যান আয়াতে- الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ বলে এসব লোকেরই উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণি সেসব লোকের যারা প্রকৃত মাজুর বা অক্ষম ছিলেন বলে যুদ্ধে যেতে পারেননি। তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ অংশে। চতুর্থ শ্রেণি সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনের যারা কোনো রকম ওজর না থাকা সত্ত্বেও আলস্যের দরুন জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। এঁদের আলোচনা উল্লিখিত وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ ও وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا অংশে এসেছে। আর পঞ্চম শ্রেণিটি ছিল মুনাফিকদের যারা কুটিলতা ও মুনাফেকীর কারণে জিহাদে শরিক হয়নি। এদের আলোচনা কুরআনের বহু আয়াতে এসেছে। সারকথা, বিগত আয়াতসমূহে বেশিরভাগই পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে চতুর্থ শেণির লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও শুধু আলস্যের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল ও কাজকর্ম সংমিশ্রিত– কিছু ভালো, কিছু মন্দ। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম দশ ব্যক্তি ছিল যারা কোনো রকম যথার্থ ওজর-আপত্তি ছাড়াই গাযওয়ায়ে তাবুকে যাননি। তারপর তাদের সাতজন নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তওবা কবুল করে নিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে না খুলবেন, আমরা এভাবেই আবদ্ধ কয়েদি হয়ে থাকব। এঁদের মধ্যে আবূ লুবাবাহর নামের ব্যাপারে হাদীসের সমস্ত রেওয়ায়েতকারী একমত। অন্যান্য নামের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদেরকে এভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাদেরকে না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তিনি বললেন, আমিও আল্লাহর কসম খাচ্ছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এঁদেরকে খুলব না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাকে এদের বাধন খোলার নির্দেশ দান করেন। এদের অপরাধ বড়ই মারাত্মক। এরই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এঁদের বাধন খুলে দেবার নির্দেশ দান করেন। অতঃপর তাঁদের খুলে দেওয়া হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ লুবাবাহকে বাঁধনমুক্ত করার যখন সংকল্প প্রকাশ করা হয়, তখন তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন, যতক্ষণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হয়ে নিজের হাতে না খুলবেন, আমি বাঁধাই থাকব। সুতরাং ভোরে যখন তিনি নামাজ পড়তে আসেন, তখন পবিত্র হস্তে তাঁকে খুলে দেন।

সদাসৎ মিশ্রিত আমল কি? আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের কিছু আমল ছিল নেক, কিছু ছিল মন্দ। তাদের নেক আমল তো ছিল তাদের ঈমান, নামাজ, রোজার অনুবর্তিতা এবং উক্ত জিহাদের পূর্ববর্তী গাযওয়াসমূহে মহানবী ﷺ -এর সাথে অংশগ্রহণ, স্বয়ং এই তাবুকের ঘটনায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া এবং এ কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা প্রভৃতি। আর মন্দ আমল হলো গাযওয়ায়ে তাবুকে অংশগ্রহণ না করা এবং নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা মুনাফিকের সামঞ্জস্য বিধান করা।

যেসব মুসলমানদের আমল মিশ্রিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত তারাও এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত : তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ জামাত তথা দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক। যে সমস্ত মুসলমানদের আমল ভালো ও মন্দে মিশ্রিত হবে, তারা যদি নিজেদের পাপের জন্য তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্যও মাগফেরাত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায়।

আবূ ওসমান (র.) বলেছেন, কুরআন কারীমের এ আয়াতটি উম্মতের জন্য বড়ই আশাব্যঞ্জক। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী শরীফে মি'রাজ সম্পর্কিত এক বিস্তারিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে যখন মহানবী ﷺ -এর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তার কাছে এমন কিছু লোককে দেখতে পান

যাদের চেহারা ছিল সাদা। আর কিছু লোক যাদের চেহারা ছিল কিছু দাগ-যুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির এ লোকগুলো একটি নহরে প্রবেশ করল এবং তাতে গোসল করে বেরিয়ে এলো। আর তাতে করে তাদের চেহারায় দাগগুলোও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে সাদা হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে জানালেন যে, স্বচ্ছ চেহারার এ লোকগুলো হলো যারা ঈমান এনেছে এবং পাপতাপ থেকেও মুক্ত থেকেছে- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আর দ্বিতীয় শ্রেণির লোকগুলো হলো যারা ভালোমন্দ সবরকম কাজই মিশিয়ে করেছে এবং পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং তাদের পাপ মোচন হয়ে গেছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً : আয়াতের ঘটনা হলো এই যে, উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যারা কোনো রকম ওজর- আপত্তি ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে আবদ্ধ করে নেন। অতঃপর উল্লিখিত আয়াত তাদের তওবা কবুল হওয়ার বিষয় নাজিল হয় এবং বন্ধনমুক্তির পর তাঁরা শুকরিয়া স্বরূপ নিজেদের সমস্ত ধনসম্পদ সদকা করে দেওয়ার জন্য পেশ করেন। তাতে রাসূলে কারীম ﷺ এই বলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, এসব মালামাল গ্রহণের নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় যে, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ এদের মাল থেকে গ্রহণ করুন। ফলে তিনি সমগ্র মালামালের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ মালের সদকা গ্রহণ করতে সম্মত হন। কারণ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন সমগ্র মাল নেওয়া না হয়; বরং তার অংশবিশেষ যেন নেওয়া হয়। مِنْ অব্যয়টিই এর প্রমাণ।

মুসলমানদের সদকা-জাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব : এ আয়াতের শানে নুযূল অনুযায়ী যদিও বিশেষ একটি শ্রেণি বা দলের সদকা বা দান গ্রহণ করার নির্দেশ হয়েছে, কিন্তু তা নিজ মর্ম অনুযায়ী ব্যাপক।

তাফসীরে কুরতুবী, আহকামুল কুরআন জাস্সাস, মাজহারী প্রভৃতি গ্রন্থে একেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরতুবী ও জাস্সাস একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এ আয়াতের শানে নুযূল অনুযায়ী যদি সেই বিশেষ ঘটনাকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তবুও কুরআনি মূলনীতির ভিত্তিতে এ হুকুমটি ব্যাপক ও সাধারণই থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য বলবৎ থাকবে। কারণ কুরআনের অধিকাংশ বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহকাম বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাজিল হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা পরিধি কারো মতেই সেই বিশেষ ঘটনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যে পর্যন্ত নির্দিষ্টতার কোনো দলিল না থাকবে, এই হুকুম সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক বলেই গণ্য হবে এবং সবাইকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এমনকি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে যদিও নির্দিষ্টভাবে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ হুকুমটি না তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং না তাঁর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; বরং এমন প্রতিটি লোক যিনি হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নায়েব হিসেবে মুসলমানদের নেতা হবেন, তিনিই এ হুকুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেন। মুসলমানদের জাকাত-সদকাসমূহ আদায় করা এবং তা যথাযথ খাত অনুযায়ী ব্যয় করার ব্যবস্থা করা তার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খেলাফতের প্রাথমিক আমলে জাকাত দানে বিরত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, তাতে জাকাত দানে বিরত লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিদ্রোহী ও মুরতাদ। আর কিছু লোক এমনও ছিল যারা নিজেদের মুসলমান বলত সত্য, কিন্তু জাকাত না দেওয়ার জন্য এমন ছলছুতা অবলম্বন করত যে, "এ আয়াতে মহানবী ﷺ -এর প্রতি আমাদের কাছ থেকে সদকা-জাকাত উসুল করার নির্দেশ ছিল, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই। বস্তুত আমরা তা মান্যও করেছি। তার ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এমন কি অধিকার থাকতে পারে যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে জাকাত দাবি করতে পারেন!" তাছাড়া প্রথম দিকে এ বিষয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর মনেও এ কারণেই দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল যে, যতই হোক, এরা মুসলমান এবং একটি আয়াতের আশ্রয় নিয়ে জাকাত থেকে বিরত থাকতে চাইছে। কাজেই এদের সাথে এমন আচরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে না, যা সাধারণ মুরতাদদের সাথে করা যায়। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) পূর্ণ দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বললেন, যে ব্যক্তি নামাজ ও জাকাতের ব্যাপারে ব্যতিক্রম করবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই।

এতে এ ইঙ্গিতই ছিল যে, যারা জাকাতের হুকুমকে শুধুমাত্র মহানবী ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট করত এবং তাঁর অবর্তমানে তা রহিত হয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল, তারা অদূর ভবিষ্যতে এমনও বলতে পারে যে, নামাজও মহানবী ﷺ -এর সাথেই নির্দিষ্ট ছিল। কারণ কুরআনে কারীমে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ আয়াতও এসেছে, যাতে নামাজ কায়েমের জন্য নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নামাজ সংক্রান্ত আয়াতের হুকুম যেভাবে গোটা উম্মতের জন্য ব্যাপক এবং একে মহানবী ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার মতো ভ্রান্ত ও অপব্যাখ্যাদানকারীদেরকে কুফরি থেকে বাঁচানো যায় না, তেমনিভাবে خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ আয়াতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যাদান করাও তাদেরকে কুফরি ও ইসলামদ্রোহিতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এ কথার পর হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ঘুচে যায় এবং সমগ্র উম্মতের ঐকমত্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়।

জাকাত সরকারি কর নয়; বরং ইবাদত : কুরআন মাজীদের আয়াত خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ-এর পর صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাকাত ও সদকা রাষ্ট্রীয় কোনো কর নয়, যা সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, গুনাহ থেকে ধনী লোকদের পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা।

এখানে উল্লেখ্য, জাকাত-সদকা উসুলে দু-ধরনের উপকার পাওয়া যায়। প্রথমত এক উপকার স্বয়ং ধনী লোকদের জন্য। কারণ এর দ্বারা ধনী লোকেরা গুনাহ ও অর্থসম্পদের মোহজাত স্বভাব রোগের বিষাক্ত জীবাণু থেকে পাকসাফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা সমাজের সেই দুর্বল শ্রেণির লালনপালনের ব্যবস্থা হয়, যারা নিজেদের জীবিকা আহরণে অসমর্থ ও অপারগ। যেমন– এতিম, বিধবা, বিকলাঙ্গ, ছিন্নমূল, মিসকিন ও গরিব প্রভৃতি।

কিন্তু কুরআনের এ আয়াতে শুধু প্রথমোক্ত উপকারিতার উল্লেখ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেটিই হলো জাকাত ও সদকা উসুলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকারিতাগুলো হলো আনুষঙ্গিক। সুতরাং কোথাও এতিম, বিধবা ও গরিব-মিসকিন না থাকলেও ধনী লোকদের পক্ষে জাকাতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের দান-খয়রাতের রীতিনীতি থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সেকালে দান-খয়রাত ভোগ করা কারো পক্ষে জায়েজ ছিল না; বরং নিয়ম ছিল যে, কোনো পৃথক স্থানে সেগুলো রেখে দেওয়া হতো এবং আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে যেত। এ ছিল কবুল হওয়ার আলামত। কিন্তু যেখানে আগুন দ্বারা ভস্ম হতো না, সেখানে তা অগ্রাহ্য হওয়ার আলামত মনে করা হতো। অতঃপর এই অপয়া মালামল কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করত না। এ থেকে পরিষ্কার হলো যে, জাকাত ও সদকার আয়াতের হুকুম মূলত কারো অভাব মোচনের জন্য নয়; বরং তা মালের হক ও ইবাদত। যেমন– নামাজ রোজা হলো শারীরিক ইবাদত। তবে উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, যে মালামাল আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তার ভোগ-ব্যবহার সে উম্মতের ফকির-মিসকিনদের জন্য জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে।

একটি প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে যে, উপরিউক্ত ঘটনায় তাদের তওবা যখন কবুল হয়েছে বলে আয়াতে বলা হলো, তখন বোঝা গেল যে, তওবার ফলেই গুনাহের মার্জনা ও পরিশুদ্ধি হয়ে গেল। এরপরও সদকা উসুলকে পরিশুদ্ধির মাধ্যম বলা হলো কেন? জবাব এই যে, তওবা দ্বারা যদিও গুনাহ মাফ হলো, কিন্তু তার পরও গুনাহের কিছু কালিমা, মলিনতা থাকা সম্ভব যা পরবর্তীকালে গুনাহের কারণ হতে পারে। সদকা আদায়ে সে মলিনতা দূর হয়ে পূর্ণতর বিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ বাক্যে صَلٰوة অর্থ তাদের জন্য রহমতের দোয়া করা। রাসূলে কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কারো কারোর জন্য صَلٰوة [সালাত] শব্দ দ্বারা দোয়া করেছিলেন। যেমন, হাদীস শরীফে আছে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى কিন্তু পরবর্তীকালে صَلٰوة শব্দটি নবীগণের বিশেষ আলামতে পরিণত হয়। সে জন্য অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে অন্য কারো জন্য صَلٰوة শব্দ দ্বারা দোয়া করা যাবে না; বরং শব্দটি নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, যাতে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। –[বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি]

এ আয়াতে মহানবী ﷺ -এর প্রতি সদকা আদায়কারীদের জন্য দোয়া করার আদেশ হয়। এ কারণে কতিপয় কিফহবিদ বলেন, ইমাম ও আমীরদের পক্ষে সদকাদাতাগণের জন্য দোয়া করা ওয়াজিব। আর কেউ কেউ এ নির্দেশকে মোস্তাহাবও মনে করেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ : যে দশজন মু'মিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাতজন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকি তিনজনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেওয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং ইখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا الخ : মুনাফিকদের অবস্থা ও তাদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার কথা উপরের অনেক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে রয়েছে তাদের এক ষড়যন্ত্রের বর্ণনা। তা হলো, মদিনায় আবূ আমের নামের এক ব্যক্তি জাহিলি যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আবূ আমের 'পাদ্রি' নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রা.) যার মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহি ও খ্রিস্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় উপস্থিত হলে আবূ আমের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী ﷺ তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসল না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দুজনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে।" সে একথা বলল যে, আপনার যে কোনো প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাব। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযিনের মতো সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় গেল। কারণ তখন এটি ছিল খ্রিস্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল তা ভোগ করল। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোমান সম্রাটকে মদিনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের দেশান্তরিত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল। এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনায় পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোমান সম্রাট কর্তৃক মদিনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময়ে সম্রাটের সাহায্য হয় মতো কোনো সম্মিলিত শক্তি তোমার থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদিনার মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যাতে মুসলমানদের অন্তরে কোনো সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।" তার এ পত্রের ভিত্তিতে বারোজন মুনাফিক মদিনার কোবা মহল্লায়, যেখানে রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, ভথায় অপর একটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখ ঐতিহাসিক এ বারোজানের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যা হোক, অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামাজ সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মতো এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রাসূলে কারীম ﷺ তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামাজ আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পরে যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন উপরিউক্ত আয়াতগুলো নাজিল হলো, এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হলো।

আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর তিনি কতিপয় সাহাবীকে যাদের মধ্যে আমের ইবনে সাকন এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হন্তা 'ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন। এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বং করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

তাফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ ইবনে সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মদিনায় পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম ইবনে আদীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে জায়গা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগ-দখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখিকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

ঘটনার বিবরণ জানার পর এবার আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়- وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا অর্থাৎ উপরে অপরাপর মুনাফিকের আজাব ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য মুনাফিকরাও ওদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত ضِرَارًا অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضِرَارٌ ও ضَرَرٌ শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে কতিপয় অভিধান প্রণেতা এ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। তারা বলেন, ضَرَرٌ সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক। আর ضِرَارٌ হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। সেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে একই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضِرَارٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করা। একটি দল সে মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কুরআন মাজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী ﷺ -এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলত মসজিদই ছিল না, নামাজ আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কুরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোনো মসজিদের মুকাবিলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লি হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার ছওয়াব তো হবেই না, বরং বিচ্ছেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরিয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েজ হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলত গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামাজ আদায় করবে, তাদের নামাজকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব সে পাবে না; বরং গুনাহগার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার' -এর মতো বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত ওমর ফারুক (রা.) এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। -[কাশশাফ]

উপরিউক্ত মসজিদে যিরার সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত মহানবী ﷺ -কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ আপনি এ তথাকথিত মসজিদ কখনো নামাজ আদায় করবেন না।

মাসআলা : এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানকালেও যদি কেউ পূর্বতন মসজিদের নিকটে নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা জিদের বশে কোনো মসজিদ নির্মাণ করে, তবে সেখানে নামাজ শুদ্ধ হলেও নামাজ পড়া ভালো নয়।

এ আয়াতে মহানবী ﷺ -কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনার নামাজ সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথম দিন থেকে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামাজ আদায় করে, যারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদ্গ্রীব। বস্তুত আল্লাহ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী ﷺ তখন নামাজ আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَهْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ –[তাফসীরে মাযহারী]

অপর কতিপয় রেওয়ায়েত মতে এর অর্থ যে মসজিদে নববী নেওয়া হয়েছে, তা আয়াতের মর্মের পরিপন্থিও নয়। কেননা মসজিদে নববীর ভিত্তি যে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলাই বাহুল্য। কেননা তাঁর চেয়ে অধিক পবিত্র আর কে হতে পারে? অতএব এ মসজিদটিও আয়াতের উদ্দেশ্য। –[তিরমিযী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا : এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী ﷺ -এর নামাজের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লিগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ নাপাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বুঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লিগণ সাধারণত এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

ফায়দা : উক্ত আয়াত থেকে একথাও বুঝা গেল যে, কোনো মসজিদের মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তা ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে নির্মিত হওয়া এবং তাতে কোনো লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্যের সামান্যতম দখলও না থাকা। আর একথাও জানা গেল যে, নেককার, পরহেজগার এবং আলেম ও আবেদ মুসল্লির গুণেও মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই যে মসজিদের মুসল্লিগণ আলেম, আবেদ ও পরহেজগার হবে, সে মসজিদে নামাজ আদায়ে অধিক ফজিলত লাভ করা যাবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সেই মকবুল মসজিদের মোকাবিলায় মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদে যিরারের নিন্দা করে বলা হয়েছে, তার তুলনা নদীর তীরবর্তী এমন মাটির সাথেই করা যায়, যাকে পানির ঢেউ নিচের দিকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু উপর থেকে মনে হয় যেন সমতল ভূমি। এর উপর কোনো গৃহ নির্মাণ করলে যেমন অচিরেই তা' ধসে যাবে, মসজিদে যিরার-এর ভিত্তিও ছিল তেমনি নড়বড়ে। সুতরাং অচিরেই সেটি ধসে গেল এবং জাহান্নামে পতিত হলো। জাহান্নামে পতিত হওয়ার কথাটি রূপক অর্থেও নেওয়া যায় এ হিসেবে যে, এর নির্মাতারা যেন জাহান্নামে পৌঁছার পথ পরিষ্কার করল। তবে কতিপয় মুফাসসির এর আক্ষরিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ মসজিদটিকে ধ্বংস করার পর তা প্রকৃত প্রস্তাবেই জাহান্নামে চলে গেল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের এই নির্মাণ কর্ম সর্বদা তাদের সন্দেহ ও মুনাফেকীকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলবে, যতক্ষণ না তাদের অন্তরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের জীবন শেষ না হওয়া অবধি তাদের সন্দেহ, কপটতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

অনুবাদ :

١١١. إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ يَبْذُلُوْهَا فِىْ طَاعَتِهٖ كَالْجِهَادِ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ جُمْلَةُ اِسْتِيْنَافٍ بَيَانٌ لِلشِّرَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيْمِ الْمَبْنِىِّ لِلْمَفْعُوْلِ اَىْ فَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ وَيُقَاتِلُ الْبَاقِىْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا مَصْدَرَ انِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمَحْذُوْفِ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ اَىْ لَا اَحَدَ اَوْفٰى مِنْهُ فَاسْتَبْشِرُوْا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ الْبَيْعُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ الْمُنِيْلُ غَايَةَ الْمَطْلُوْبِ.

১১১. জান্নাত প্রদানের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ জিহাদ ও এই ধরনের ফরমাবরদারীর কাজে নিজেদের জানমাল ব্যয় করে। তারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে; নিধন করে ও নিহত হয়। অর্থাৎ তাদের কতকজন যুদ্ধে নিহত হয়ে যায় আর বাকিরা যুদ্ধে রত থাকে। এ বাক্যটিতে ক্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। বস্তুত; তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠতর কে আছে? না তাঁর অপেক্ষা আর কেউ অধিক ওয়াদা পালনকারী নেই। তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য সুসংবাদ লাভ কর এবং তাই এই বিক্রয় কার্যই মহাসাফল্য কামনার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। يُقَاتِلُوْنَ তা اِسْتِيْنَافٌ বা নববাক্য। তাতে ক্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। فَيُقْتَلُوْنَ অপর এক কেরাতে مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচকরূপে প্রদত্ত صِيْغَة বা রূপটি [يَقْتُلُوْنَ-কে] অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। وَعْدًا - حَقًّا এ দুটিই مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার মূল। এ স্থানে তা একটি সামর্থবোধক ক্রিয়ার মাধ্যমে এ দুটি مَنْصُوْب [যবরযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْتَبْشِرُوْا তাতে غَيْب অর্থাৎ নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

١١٢. اَلتَّائِبُوْنَ رَفْعٌ عَلَى الْمَدْحِ بِتَقْدِيْرِ مُبْتَدَأٍ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ اَلْعٰبِدُوْنَ الْمُخْلِصُوْنَ الْعِبَادَةَ لِلّٰهِ اَلْحٰمِدُوْنَ لَهٗ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَلسَّائِحُوْنَ الصَّائِمُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ اَىِ الْمُصَلُّوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط لِاَحْكَامِهٖ بِالْعَمَلِ بِهَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَنَّةِ.

১১২. তারা শিরক ও মুনাফেকী হতে তওবাকারী, ইবাদতকারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে একনিষ্ঠ, সর্বাবস্থায়ই তাঁর প্রশংসাকারী, রোজা পালনকারী, রুকু-সিজদাকারী অর্থাৎ সালাত আদায়কারী সৎকাজের নির্দেশদানকারী, অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদানকারী এবং আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখার অর্থাৎ তাঁর বিধিবিধানের সংরক্ষক। আর মু'মিনদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও। اَلتَّائِبُوْنَ তার পূর্বে مُبْتَدَأ বা তার উদ্দেশ্য থাকায় তা رَفْعٌ عَلَى الْمَدْحِ অর্থাৎ প্রশংসাব্যঞ্জকভাবে مَرْفُوْع [পেশযুক্ত] ব্যবহৃত হয়েছে। اَلسَّائِحُوْنَ অর্থ- রোজা পালনকারী।

١١٣. وَنَزَلَ فِيْ اِسْتِغْفَارِهِ ﷺ لِعَمِّهِ اَبِيْ طَالِبٍ وَاسْتِغْفَارِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِاَبَوَيْهِ الْمُشْرِكِيْنَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِيْ قُرْبٰى ذَوِيْ قَرَابَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ النَّارُ بِاَنْ مَاتُوْا عَلَى الْكُفْرِ ـ

১১৩. রাসূল ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের জন্য ইস্তেগফার করেছেন। তখন কতিপয় সাহাবীও তাঁদের মুশরিক পিতামাতার জন্য ইস্তেগফার করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– আত্মীয় হলেও আত্মীয়তার অধিকারী হলেও মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা নবী এবং মু'মিনগণের পক্ষে সঙ্গত নয়, এরা কুফরি অবস্থায় মারা যাওয়ায় তাদের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামি অগ্নিবাসী। اَلْجَهَنَّمُ অর্থ– অগ্নি, দোজখ।

١١٤. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ج بِقَوْلِهِ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ رَجَاءً اَنْ يُسْلِمَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ بِمَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ط وَتَرَكَ الْاِسْتِغْفَارَ لَهُ اَنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ كَثِيْرُ التَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ حَلِيْمٌ صَبُوْرٌ عَلَى الْاَذٰى ـ

১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তা ছিল একটি প্রতিশ্রুতি যা সে তাকে দিয়েছিল। তার ঈমানের আশায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমার জন্য আমার প্রভুর নিকট সত্বর ক্ষমা প্রার্থনা করব।' কিন্তু কুফরি অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করায় যখন তা তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার শত্রু তখন ইবরাহীম তা হতে আলাদা হয়ে গেল। এবং তার জন্য ইস্তেগফার করা ছেড়ে দিল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয়, আল্লাহর দরবারে খুবই ক্রন্দনকারী ও দোয়াকারী, সহনশীল দুঃখকষ্টে ধৈর্যশীল।

١١٥. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ لِلْاِسْلَامِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ مِنَ الْعَمَلِ فَلَا يَتَّقُوْهُ فَيَسْتَحِقُّوا الْاِضْلَالَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ مُسْتَحِقُّ الْاِضْلَالِ وَالْهِدَايَةِ ـ

১১৫. ইসলামের হেদায়েত করার পর কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে দেন যে, কি কার্যে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। কিন্তু তা সুস্পষ্ট করার পরও কেউ কেউ তাকওয়া অবলম্বন করে না ফলে তারা পথভ্রষ্টতার যোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। কে হেদায়েতের আর কে গুমরাহির যোগ্য তাও তার অন্তর্ভুক্ত।

١١٦. اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُحْيٖى وَيُمِيْتُ ط وَمَا لَكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُكُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُ عَنْكُمْ ضَرَرَهٗ .

১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই, তিনি জীবনযাপন করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। হে মানুষ সকল! আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যে তোমাদেরকে তাঁর আজাব হতে রক্ষা করবে. এবং কোনো সাহায্যকারী নেই যে তোমাদের হতে তাঁর ক্ষতিসাধন বাধা দিয়ে রাখতে পারবে। دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ– আল্লাহ ব্যতীত।

١١٧. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ اَىْ اَدَامَ تَوْبَتَهٗ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اَىْ وَقْتِهَا وَهِىَ حَالُهُمْ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ كَانَ الرَّجُلَانِ يَقْتَسِمَانِ تَمْرَةً وَالْعَشَرَةُ يَعْتَقِبُوْنَ الْبَعِيْرَ الْوَاحِدَ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ حَتّٰى شَرِبُوا الْفَرْثَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَمِيْلُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ عَنْ اِتِّبَاعِهٖ اِلَى التَّخَلُّفِ لِمَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الشِّدَّةِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط بِالثَّبَاتِ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

১১৭. আল্লাহ অনুগ্রহ পরবশ হলেন সর্বদাই তিনি তাঁর অনুগ্রহদৃষ্টি রাখেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যারা তার অনুগমন করেছিল সংকট মুহূর্তে কঠিন সময়ে; তাবুক যুদ্ধকালে তাদের এ ধরনের কঠিন অবস্থা ছিল। এমনকি দুজনে আহারের জন্য একটি খেজুর পেতেন। পরপর দশজনকে একটি উটে আরোহণ করতে হতো। এতো প্রচণ্ড গরম ছিল যে উটের নাড়িভুঁড়ি চুষে তাদেরকে পিপাসা নিবারণ করতে হয়েছিল। এমনকি তখন এই নিদারুণ কষ্টের কারণে তাদের একদলের মন বক্র হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা অনুসরণ করা হতে বিরত হয়ে পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দৃঢ়তা দান করত ক্ষমা করলেন। তিনি তাদের বিষয়ে দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। يَزِيْغُ তা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই গঠিত রয়েছে।

١١٨. وَ تَابَ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا عَنِ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ بِقَرِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ قُلُوْبُهُمْ لِلْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ بِتَاخِيْرِ تَوْبَتِهِمْ فَلَا يَسَعُهَا سُرُوْرٌ وَّلَا اُنْسٌ وَّظَنُّوْا اَيْقَنُوْا اَنْ مُخَفَّفَةٌ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَفَّقَهُمْ لِلتَّوْبَةِ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

১১৮. এবং তিনি ক্ষমা পরবশ হলেন অপর তিনজনের প্রতিও যাদের তওবা কবুলের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ তার বিস্তৃতি সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। এমন কোনো স্থান তারা পাচ্ছিল না যেখানে তারা স্বস্তি পেতে পারে। তওবা কবুল হতে বিলম্ব দেখে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় তাদের হৃদয় কুঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানে কোনো আনন্দ ও প্রীতির অবকাশ ছিল না। তারা ধারণা করেছিল তাদের প্রতীতি জন্মিল যে আল্লাহ তা'আলার [শাস্তি] হতে [বাঁচার] তিনি ব্যতীত আর কোনো আশ্রয় নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরববশ হলেন। তাদেরকে তওবা করার তাওফীক দান করলেন যেন তারা তওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। اَلَّذِيْنَ خُلِّفُوْا অর্থাৎ যাদের তওবার বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। তার প্রমাণ ও আলামত হলো তৎপরবর্তী বাক্য - حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ مَا رَحُبَتْ তার مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থ ব্যঞ্জক। অর্থ তার [পৃথিবীর] বিস্তৃতি সত্ত্বেও। اَنْفُسُهُمْ অর্থ– তাদের হৃদয়। اَنْ তা এ স্থানে مُثَقَّلَةٌ হতে পরিবর্তিত হয়ে مُخَفَّفَةٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ بِاَنْ يَبْذُلُهَا فِيْ طَاعَتِهِ : এটা একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ মুজাহিদগণকে স্বীয় জানমাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার বিনিময়ে জান্নাত দেওয়াকে شِرَاءٌ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কাজেই বাস্তবিক ক্রয়বিক্রয় হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهُ جُمْلَةُ اِسْتِيْنَافٌ : এটা مَا سَبَقَ হতে عَدَمُ وَصْلٍ-এর ইল্লত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ وَيُقَاتِلُ الْبَاقِيْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, مَجْهُوْلٌ মুকাদ্দম হওয়ার সুরতে যখন সে নিহত হয়ে যায়, তখন সে যুদ্ধ কিভাবে করে?

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো এই যে, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ হলো সকল মু'মিন অর্থাৎ যখন তাদের মধ্যে কতেক নিহত হতেন তখন বাকিরা হতবিহ্বল হয়ে পলায়ন করতেন না; বরং বীর বিক্রমে যুদ্ধি চালিয়ে যেতেন।

قَوْلُهُ مَصْدَرَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمَحْذُوْفِ : অর্থাৎ وَعْدًا এবং حَقًّا উভয়টি স্বীয় উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَعَدَهُمْ وَعْدًا وَحَقَّ الْوَعْدِ حَقًّا-এর করীনা হলো شِرَاءٌ টা وَعْد অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ رُفِعَ عَلَى الْمَدْحِ : এটা মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়নি। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন, কেননা এ সুরতে অহেতুক খবরকে উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ছে। مَرْفُوْعٌ بِالْمَدْحِ-এর সুরতে যদিও حَذْفٌ আবশ্যক হচ্ছে; কিন্তু তা ফায়দামুক্ত নয়। যেমনটি সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ بِتَقْدِيْرِ الْمُبْتَدَأِ : আর তা হলো هُمْ

قَوْلُهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ : এ উভয়টাই اَلتَّائِبُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلصَّائِمُوْنَ : এটা اَلسَّائِحُوْنَ-এর অর্থের বিবরণ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– سَيَاحَةُ اُمَّتِيْ الصَّوْمُ

قَوْلُهُ وَنَزَلَ فِيْ اِسْتِغْفَارِهِ ﷺ لِعَمِّهِ اَبِيْ طَالِبٍ : খাজা আবূ তালিব যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন রাসূল ﷺ খাজা আবূ তালেবকে বললেন, চাচা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করুন। আমি এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে প্রমাণ উপস্থাপন করব। কিন্তু খাজা আবূ তালিব অস্বীকার করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন– لَا اَزَالُ اَسْتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْهُ –[বুখারী ও মুসলিম]

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আমি এক ব্যক্তিকে তার পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনেছি। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছ অথচ তারা কাফের ছিল। তখন সে বলল, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, অথচ তাঁর পিতা মুশরিক ছিল। এই ঘটনা রাসূল ﷺ -এর সম্মুখে উল্লেখ করা হলো এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[তিরমিযী]

قَوْلُهُ اَوَّاهٌ : এটা فَعَّالٌ-এর ওজনে মুবালাগার সীগাহ। অর্থ বেশি বেশি আফসোসকারী / আহকারী। নরম দিল।

قَوْلُهُ اَدَامَ تَوْبَتَهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো, তওবা কবুল হওয়ার জন্য প্রথমে গোনাহে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা তওবা গ্রহণ হওয়া গুনাহে লিপ্ত হওয়ার শাখা। অথচ রাসূল ﷺ হলেন নিষ্পাপ/মাসূম। আর সাহাবায়ে কেরামও এ ঘটনায় কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হননি। এরপরও তওবা গ্রহণীয় হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : دَوَامٌ এবং اِثْبَاتٌ عَلَى التَّوْبَةِ তথা তওবার উপর সুদৃঢ় থাকা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিনা ওজরে জিহাদ থেকে বিরত থাকার নিন্দা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রয়েছে মুজাহিদগণের ফজিলতের বর্ণনা।

শানে নুযূল : অধিকাংশ মুফাসসিরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়'আত নেওয়া হয়েছিল মক্কায় মদিনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মাদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মাক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বুঝায় 'মিনা'র জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মদিনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফে বায়'আত নেওয়া হয়। প্রথম দফে নেওয়া হয় নবুয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদিনায় ফিরে যান। এতে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম ﷺ -এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে বারোজন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচজন ছিলেন পূর্বের এবং সাতজন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী ﷺ -এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদিনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চল্লিশজনেরও বেশি। তারা নবী করীম ﷺ -এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কুরআনের তালিম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কুরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদিনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তরজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণত বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকিদা ও আমল, বিশেষত কাফেরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদিনা গেলে তাঁর হেফাজত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেওয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এখন অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে, আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্তারোপ থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক। হুজুর ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো, তোমরা আমার হেফাজত করবে যেমন নিজের জানমাল ও সন্তানের হেফাজত কর। তাঁরা আরজ করলেন, এ শর্ত দুটি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাজি এমন রাজি যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনোদিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

বায়'আতে আকাবার ব্যাপারটি দৃশ্যত লেনদেনের মতো বিধায় এ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ আয়াত শুনে সর্বপ্রথম হযরত বারা ইবনে মা'রুর, আবুল হায়সম ও আসআদ (রা.) নিজেদের হাত মহানবী ﷺ -এর হস্ত মোবারকের উপর রেখে বললেন, এ অঙ্গীকার পালনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনার হেফাজত করব নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মতো। আর আপনার বিরুদ্ধে সমগ্র দুনিয়ার সাদা কালো সবাই সমবেত হলেও আমরা সবার সাথে যুদ্ধ করে যাব।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত : মহানবী ﷺ মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত কোনো হুকুম নাজিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়- اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ [সূরা হজ : আয়াত ৩৯] মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় আর তখনই মহানবী ﷺ মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম ﷺ নিজে আল্লাহ তা'আলার অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মতো নিবৃত্ত রাখেন। -[মাযহারী]

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাজিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে [বাইবেলে] জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবত এজন্য যে, পরবর্তী খ্রিস্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো বারিজ হয়ে যায়- আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

قَوْلُهُ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمْ : বায়'আতে আকাবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যত ক্রয়বিক্রয়ের মতো। তাই আয়াতের শুরুতে 'ক্রয়' শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরিউক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা এর দ্বারা অস্থায়ী জানমালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকি থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে অর্থসম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেওয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর ফারূক (রা.) বলেন, "এ এক অভিনব বেচাকেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ তা'আলা।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, "লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মু'মিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।"

قَوْلُهُ التَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ : এ গুণাবলি হলো সেসব মু'মিনের, যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে- "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন।" আয়াতটি নাজিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّائِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তারূপে নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলি উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত তারা এ সকল গুণেরও অধিকারী হয়। বিশেষত বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে اَلسَّائِحُوْنَ -এর অর্থ- صَائِمُوْنَ অর্থাৎ রোজা পালনকারী। শব্দটি سِيَاحَتْ [দেশ ভ্রমণ] থেকে উদ্ভূত। ইসলামপূর্ব যুগে খ্রিস্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোজা পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ। অথচ রোজা এমন এক ইবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জিহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, سِيَاحَةُ اُمَّتِى الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত سَائِحِيْنَ শব্দের অর্থ রোজাদার। হযরত ইকরিমা (রা.) سَائِحِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, যারা ইলম হাসিলের জন্য ঘরঘবাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ, যথা- تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، حَامِدُوْنَ، سَائِحُوْنَ، رَاكِعُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، اٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে الحافظون لحدود الله এতে রয়েছে উপরিউক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরিয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাজতকারী। আয়াতের শেষে বলা হয় وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যে সকল মু'মিনের উপরিউক্ত গুণাবলি রয়েছে, তাদের এমন নিয়ামতের সুসংবাদ দান করুন, যা ধারণার অতীত, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না এবং যা এ পর্যন্ত কেউ শুনেওনি অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত।

قَوْلُهُ مَاكَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : গোটা সূরা তওবাই কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম-আহকাম সংবলিত। সূরাটি শুরু হয় بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ বাক্য দিয়ে। এজন্য এটি সূরা 'বারাআত' নামেও খ্যাত। এ পর্যন্ত যতগুলো হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা ছিল পার্থিব জীবনে কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদ সম্পর্কিত। কিন্তু আলোচ্য

আয়াতে বর্ণিত সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম হলো পরজীবন সংক্রান্ত। তা হলো এই যে, মৃত্যুর পর কাফের ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনাও জায়েজ নেই। যেমন, পূর্ববর্তী এক আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে মুনাফিকদের জানাজার নামাজ পড়তে বারণ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত অবতরণের পটভূমি হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর চাচা আবূ তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তথাপি তিনি আজীবন ভ্রাতুষ্পুত্রের হেফাজত ও সাহায্যকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্বগোত্রের কারো এতটুকু তোয়াক্কা করেননি। এজন্য মহানবী ﷺ তার দ্বারা অন্তত কালেমাটি পাঠ করিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিলেন। কারণ ঈমান আনলে রোজ হাশরে সুপারিশ করার একটা সুযোগ হবে এবং দোজখের আজাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। অতঃপর চাচা যখন মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন তাঁর চেষ্টা ছিল যদি শেষ মুহূর্তেও কোনো উপায়ে কালেমাটি পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়, তবে একটা সদগতি হয়। তাই তিনি চাচার শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেখলেন, আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত। তবুও তিনি বললেন, চাচাজান, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন! আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য চেষ্টা করব। তখন আবূ জাহল বলে উঠল, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথাটি আরো কয়েকবার বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই আবূ জাহল নিজের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ তালেব একথা বলেই মৃত্যুবরণ করেন যে, "আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।" পরে রাসূলে কারীম ﷺ শপথ করে বলেন, কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য নিয়মিত মাগফিরাত কামনা করব। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ ও সকল মুসলমানকে কাফের ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে বারণ করা হয়েছে যদিও তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়।

এতে কোনো কোনো মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের কাফের পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তররূপে পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হয়– مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য যে দোয়া করেছিলেন, তা ছিল এ কারণে যে, পিতা শেষ পর্যন্ত কুফরের উপর যে অটল থাকবে এবং কুফরি অবস্থায়ই যে মৃত্যুবরণ করবে, সেকথা তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনিও সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন এবং মাগফিরাতের দোয়াও ত্যাগ করলেন।

কুরআনে যে সকল আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য দোয়া করার উল্লেখ রয়েছে তা সবই ছিল উপরিউক্ত কারণের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ তাঁর দোয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে পিতা ঈমান ও ইসলামের তাওফীক লাভ করে এবং তাতে তাঁর মাগফিরাত হতে পারে।

ওহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা মহানবী ﷺ -এর চেহারা মুবারকে আঘাত করে তখন তিনি নিজ হাতে গণ্ডদেশের রক্ত মুছতে মুছতে দোয়া করেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা অবুঝ। কাফেরদের জন্য মহানবী ﷺ -এর উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদের যেন ঈমান ও ইসলামের তাওফীক লাভ হয় এবং তার ফলে যেন তারা মাগফিরাতের যোগ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, জীবিত কাফেরের জন্য ঈমানের তাওফীক লাভের নিয়তে দোয়া করা জায়েজ রয়েছে, যাতে সে মাগফিরাতের যোগ্য হতে পারে। اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - اَوَّاهٌ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা কুরতুবী (র.) এর ১৫টি অর্থ উল্লেখ করেছেন, তবে সবই সমার্থবোধক। প্রকৃতপক্ষে তাতে তেমন ব্যবধান নেই। তন্মধ্যে কয়েকটি অর্থ এই অতিশয় হা-হুতাশকারী, অত্যধিক প্রার্থনাকারী, মানুষের প্রতি দয়াশীল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে শেষোক্ত অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াত وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, তাবুক যুদ্ধে আদেশ ঘোষিত হলে মদিনাবাসীরা পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু-দল ছিল মুনাফিকের যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে এসেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে রয়েছে নিষ্ঠাবান মু'মিনের তিনটি দলের বর্ণনা। প্রথম দল ছিল তাদের যারা যুদ্ধের আদেশ হওয়া মাত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাদের আলোচনা রয়েছে প্রথম আয়াতের اِتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ বাক্যে। দ্বিতীয় দল যারা প্রথম দিকে রয়েছে অত্র আয়াতের مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ বাক্যে।

তৃতীয় দল হলো তাদের, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু পরে অনুতাপ ও অনুশোচনা সাথে তওবা করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তওবা কবুলও হয়। কিন্তু পরে তারা আবার দুদলে বিভক্ত হয়ে যায় সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা ছিল দশজন। তাদের সাতজন জিহাদ থেকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তনের প নিজেদের মনস্তাপ ও তওবাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নেন এ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবেন। তখনই তাদের তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কিত আয় নাজিল হয়, যার বিবরণ ইতঃপূর্বে এসেছে। তাঁদের বাকি তিনজন নিজেদের মনস্তাপ সেভাবে প্রকাশ করেননি। রাসূ কারীম ﷺ তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও সালামের আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেন। ফলে তাঁ ভীষণভাবে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের শুরুতে وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا বাক্যে তাঁদের বিষ উল্লেখ করা হয়েছে এবং অবশেষে তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের সমাজচ্যু করার হুকুম রহিত হয়ে যায়। বলা হয়– لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেছেন নবীর এবং সেসব মুহাজির ও আনসারগণের যারা একা সংকটকালে নবীর অনুগমন করেছেন।

প্রশ্ন আসে, তওবা করতে হয় পাপাচার ও নাফরমানির কারণে। অথচ রাসূলে কারীম ﷺ হলেন নিষ্পাপ, তাঁর তও কবুলের অর্থ কি? এছাড়া মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা শুরুতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের তো কো দোষ ছিল না। এ সত্ত্বেও তাঁদের তওবা কোন অপরাধে ছিল, যা কবুল হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা গোনাহ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন, যাকে তাওবা নামে অভিহিত ক হয়েছে। কিংবা এর অর্থ এও হতে পারে যে,, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তওবাকারীতে পরিণত করেছেন। এতে ইঙ্গি রয়েছে যে, কোনো মানুষ তওবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না, তা স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা ত বিশিষ্ট সাহাবী যেই হোক না কেন? যেমন, অপর আয়াতে আছে– تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ "তোমরা সবাই আল্ল তা'আলার কাছে তওবা কর।" এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যে যেখানে পৌছাক না কেন, তারপরেও অন্য স্তর থেকে যায়। তাই বর্তমান স্তরে স্থির থাকা অলসতার নামান্তর। মাওলানা রুমী (র বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

اے برادر بے نہایت در گہی ست
ہرچہ بروئے می رسی بروئے مایست

অর্থাৎ "হে আমার ভাই, আল্লাহ তা'আলার দরবার বহু উচ্চে, তাই যেখানে পৌছাবে সেখানেই স্থির হয়ে থেকো না অতএব আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত বর্তমান স্তরে থেকে যাওয়া হতে তওবার আবশ্যক আছে, যাতে পরবর্তী স্তরে পৌঁ যায়। سَاعَةِ الْعُسْرَةِ কুরআন মাজীদ জিহাদের এ মুহূর্তকে সংকটময় মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছে। কারণ সেস মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে স দশজনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালাবদল করে তারা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছি নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

قَوْلُهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ : আয়াতের এ বাক্যে যে কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতি কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়; বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের অল্পতা হেতু সাহস হারি ফেলা এবং জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাদের অপর যেজন্য তারা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়।

قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا : এখানে خُلِّفُوْا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হ যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। এঁরা তিনজন হলেন হযরত কা'আব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবি এ হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.), তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতঃপূর্বে বায়'আতে আকাবা

মহানবী ﷺ -এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরিক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুলল। অতঃপর যখন রাসূলে কারীম ﷺ জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল। আর মহানবী ﷺ ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন। ফলে তারা নির্বিঘ্ন আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে ঐ তিন বুজুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুজুর ﷺ -কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, যে অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মাজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ...... عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিনজন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাজিল হয় তাদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তাঁরা আবার আনন্দিত মনে রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

সহীহ্ হাদীসের আলোকে ঘটনার বিবরণ : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-এর এ ঘটনার এক দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, যা বহু ফায়দা ও মাসায়েল সংবলিত এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে জন্য পুরা হাদীসের তরজমা এখানে পেশ করা সমীচীন মনে করছি। সে বিদগ্ধ তিন শ্রদ্ধেয়জনের একজন ছিলেন কা'আব ইবনে মালেক (রা.)। তিনি ঘটনার নিম্ন বিবরণ পেশ করেন–

"রাসূলে কারীম ﷺ যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া বাকি সবগুলোতেই আমি তাঁর সাথে যোগদান করি। তবে বদর যুদ্ধ যেহেতু আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় এবং এতে যোগ না দেওয়ায় কেউ হযরত ﷺ -এর বিরাগভাজন হয়নি তাই এ যুদ্ধেও আমি শরিক হতে পারিনি। অবশ্য আমি বায়'আতে আকাবার রাতে সেখানেও উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা ইসলামের সাহায্য হেফাজতের অঙ্গীকার করেছিলাম। বদর যুদ্ধের খ্যাতি যদিও সর্বত্র, তথাপি বায়'আতে আকাবার মর্যাদা আমার কাছে অধিক। তবে তাবুক যুদ্ধে শরিক না হওয়ার কারণ হলো এই যে, তখনকার মতো এত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা পরবর্তী কোনো কালেই আমার ছিল না। আল্লাহর কসম করে বলছি, বর্তমানের মতো দুটি বাহন ইতঃপূর্বে কখনো একত্রে আমার ছিল না। "যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর অভ্যাস ছিল এই যে, মদিনা থেকে বের হবার সময় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি রণাঙ্গনে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করতেন, যাতে মুনাফিক গুপ্তচরেরা সঠিক গন্তব্য সম্পর্কে শত্রু পক্ষকে হুঁশিয়ার করতে না পারে। আর প্রায়ই তিনি বলতেন, যুদ্ধে [এ ধরনের] ধোঁকা জায়েজ আছে।

"এমতাবস্থায় তাবুক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। [এ যুদ্ধটি কয়েকটি কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত] মহানবী ﷺ প্রকট গ্রীষ্ম ও দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে এ যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করেন। সফরও ছিল বহু দূরের। শত্রু সেনার সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। তাই তিনি যুদ্ধের ব্যাপক ও সাধারণ ঘোষণা দিলেন যাতে মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে।"

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত মতে এ জিহাদে যোগদানকারী মুসলমানের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। আর হাকেম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে হযরত মু'আয (রা.) বলেন, 'নবী করীম ﷺ -এর সাথে এ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় আমাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের বেশি।'

"এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কোনো তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে জিহাদে যেতে যারা অনিচ্ছুক তাদের এ সুযোগ হলো যে, তাদের অনুপস্থিতির কথা কেউ জানবে না। যখন রাসূলে কারীম ﷺ জিহাদে রওয়ানা হলেন, তখন ছিল খেজুর পাকার মৌসুম। তাই খেজুর বাগানের মালিকেরা এ নিয়ে মহাব্যস্ত ছিল। ঠিক এ সময় নবী করীম ﷺ ও সাধারণ মুসলমানগণ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন। যে কোনো দিকের সফরে তা যুদ্ধের হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটিকেই মহানবী ﷺ পছন্দ করতেন।

"এদিকে আমার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিন সকালে জিহাদের প্রস্তুতির ইচ্ছা পোষণ করতাম, কিন্তু কোনোরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই ঘরে ফিরে আসতাম। মনে মনে বলতাম জিহাদের সামর্থ্য আমার আছে, বের হয়ে পড়াই আবশ্যক কিন্তু 'আজ'না কালে'র চক্করে পড়ে থাকলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ ও অপরাপর মুসলমানগণ জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবুও মনে আসত, এক্ষুণি রওয়ানা হয়ে যাই, পরে কোনোখানে তাঁদের সাথে মিলিত হব। হায়! যদি তাই করতাম, কতইনা ভালো হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হলো না।

"রাসূলে কারীম ﷺ -এর জিহাদে চলে যাওয়ার পর মদিনায় যে কোনো পথে চলতে গিয়ে একটি কথা আমাকে পীড়া দিত। আমি দেখতাম, মদিনায় রয়েছে মুনাফিক, সফরের অযোগ্য অসুস্থ কিংবা মাজুর লোকেরা। অপরদিকে চলার পথে মহানবী ﷺ কখনো আমাকে স্মরণ করেননি, অবশেষে তাবুক পৌঁছে তিনি বললেন, কা'আব ইবনে মালেকের কি হলো? [সে কোথায়?] "উত্তরে বনূ সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি জানালেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! উত্তম পোশাক ও তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দরুন জিহাদ থেকে নিবৃত রয়েছে।' হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি মন্দ কথা বললে। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তার মাঝে ভালো ব্যতীত আমি আর কিছুই পাইনি।' একথা শুনে নবী করীম ﷺ নীরব হয়ে গেলেন।"

হযরত কা'আব (রা.) বলেন, "যখন শুনতে পেলাম যে, রাসূলে কারীম ﷺ জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন বড়ই চিন্তিত হয়ে পরলাম এবং তাঁর বিরাগভবাজন না হওয়ার জন্য যুদ্ধে না যাওয়ার কোনো একটি বাহানা দাঁড় করবার ইচ্ছাও করছিলাম এবং প্রয়োজনবোধ বন্ধুদের সাহায্যও নিতাম। কিন্তু [এ জল্পনা-কল্পনায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর] যখন শুনলাম, নবী করীম ﷺ মদিনায় ফিরে এসেছেন, তখন মনের জল্পনা-কল্পনা সব তিরোহিত হয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, কোনো মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নিয়েই হযরত ﷺ -এর রোষাণল থেকে বাঁচা যাবে না। তাই সত্য বলার সংকল্প গ্রহণ করি। কারণ সত্য তখন আমাকে বাঁচাতে পারে।

"সূর্য কিছু উপরে উঠলে রাসূলে কারীম ﷺ মদিনায় প্রবেশ করেন। ঠিক এমনি সময় যে কোনো সফর থেকে ফিরে আসা ছিল তাঁর অভ্যাস। আরেকটি অভ্যাস ছিল এই যে, কোনোস্থান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু-রাকাত নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন। তারপর স্ত্রীগণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

"এ অভ্যাস মতে তিনি প্রথমে মসজিদে গমন করেন এবং দু-রাকাত নামাজ আদায় করেন, অতঃপর মসজিদেই বসে পড়েন। তখন যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক মুনাফিকের দল, যাদের সংখ্যা ছিল আশিজনের কিছু অধিক হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে মিথ্যা বাহানা গড়ে, মিথ্যা শপথ করতে থাকে। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এ বাহ্যিক অজুহাত ও মৌখিক শপথকে কবুল করে নিয়ে তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের গোপন বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করেন।

"ঠিক এ সময় আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হই এবং তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়ি। আমি যখন তাঁকে সালাম দেই, তখন তিনি এমন ভঙ্গিতে একটু হাসলেন যেমন অসন্তুষ্ট লোকেরা হাসে।" কতিপয় রেওয়ায়েত মতে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি মুনাফেকী করিনি। আমার মনে দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং দীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তনও আনিনি। এবার তিনি বললেন, তাহলে জিহাদে গেলে না কেন? তুমি কি সওয়ারি খরিদ করনি?

"আরজ করলাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দুনিয়ার আর কোনো মানুষের সামনে যদি বসতাম তবে নিশ্চয়ই কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে বিরাগভাজন হওয়া থেকে বাঁচতাম। কেননা বাহানা গড়ার ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার বুঝতে বাকি নেই যে, কোনো মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হয়তো আপনার সাময়িক সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব, কিন্তু বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ আমার প্রকৃত অবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তবে আপনি সাময়িকভাবে অসন্তুষ্ট হলেও আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং সত্য কথা হলো এই যে, জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার যথার্থ কোনো ওজর আমার ছিল না এবং এমনকি সে সময় যে আর্থিক ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আমার ছিল, তা অন্য কোনো সময় ছিল না।

"রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, এ সত্য কথা বলেছে। অতঃপর বললেন, এখন যাও, দেখি আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি চলে আসলাম। চলার পথে বনূ সালামার কিছু লোক আমাকে বলল, 'আমাদের জানামতে ইতঃপূর্বে তুমি কোনো অপরাধ করনি। এ কেমন নির্বুদ্ধিতা? অন্যান্য লোকের মতো তুমিও তো কোনো একটি বাহানা গড়ে নিলে পারতে এবং তোমার অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগফিরাত কামনা করলে যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম, তারা আমার এই সত্যবাদিতার বারংবার নিন্দা করেছে। এমনকি আমারও মনে হয়েছে, আবার গিয়ে নবী করীম ﷺ-কে বলে আসি যে, আমার পূর্ব বক্তব্য মিথ্যা, আমরা যথার্থ ওজর রয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে বলেছি, অপরাধের উপর অপরাধ কেন করব? এক অপরাধ করেছি জিহাদে না গিয়ে। দ্বিতীয় অপরাধ হবে মিথ্যা কথা বলে। কাজেই আমি তাদের বললাম, আমার মতো আর কি কেউ আছে, যারা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ দুজন আরো আছে; একজন মুরারা ইবনে রবিয়া আল আমেরী অপরজন হলেন হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী (রা.)।

ইবনে আবী হাতেম (রা.)-এর রেওয়ায়েত মতে হযরত মুরারা (রা.)-এর জিহাদ থেকে বিরত থাকার কারণ ছিল এই যে, তাঁর বাগানের ফল তখন পাকছিল। মনে মনে ভাবলেন, ইতিপূর্বে অনেক জিহাদেই তো শরিক হয়েছি। এ বছর বিরত থাকলে কি আর হবে? কিন্তু পরে যখন নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে বললেন, এই বাগান আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম।

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.)-এর ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁর পরিবারবর্গ ছিল দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। এ সময় তাঁরা পরস্পর মিলিত হন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, এ বছর জিহাদ থেকে বিরত থেকে পরিবার-পরিজনের সাথে কাটিয়ে নিই। কিন্তু পরে যখন অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব।

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, "লোকেরা এমন দুজন সম্মানী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল, যাঁরা বদর যুদ্ধের মুজাহিদ। তাই আমি একথা বলে তাদের ত্যাগ করলাম যে, এ দুজন শ্রদ্ধেয়জনের আমলই আমার অনুসরণীয়। "এদিকে রাসূল কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে আমাদের তিনজনের সাথে সালাম-কালাম বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অথচ পূর্বের মতোই আমাদের অন্তরে মুসলমানদের ভালোবাসা ছিল। কিন্তু তারা সবাই আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"ইবনে আবি শায়বার রেওয়ায়েতে আছে, এখন আমাদের অবস্থা এমন হলো যে, আমরা লোকদের কাছে যেতাম কিন্তু কেউ আমাদের সাথে না কথা বলত, না সালাম দিত, আর না সালামের জবাব দিত।"

মুসনাদে আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত আছে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, তখন দুনিয়াই যেন আমাদের জন্য বদলে গেল। মনে হচ্ছিল যেন এক অচেনা জগতে বাস করছি। নিজের ঘরবাড়ি, উদ্যান, পরিচিত লোকজন বলতে কিছুই যেন আমাদের নেই। সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হলো যে, এ অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করি তবে নবী করীম ﷺ আমার জানাজার নামাজ আদায় করবেন না। কিংবা আল্লাহ না করুন যদি ইতোমধ্যে হযরত ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়, তবে সারা জীবন এ লাঞ্ছনার মধ্যেই ঘুরে ফিরতে হবে। এ চিন্তায় আমি বড় কাহিল হয়ে পড়লাম। এমনি অবস্থায় আমাদের পঞ্চাশ রাত কেটে গেল। আমার অপর দু-সঙ্গী [মুরারা ও হেলাল] এ অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে ঘরে বসে দিবারাত্র কান্নাকাটিতে মত্ত থাকে। তবে আমি ছিলাম যুবক, বাইরে ঘুরাফেরা করতাম, নামাজের জামাতে শরিক হতাম এবং বাজারেও যেতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না, সালামের জবাব দিত না। নামাজের পর হুজুর ﷺ-এর মজলিসে বসতাম এবং সালাম দিয়ে দেখতাম জবাবে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে কিনা। অতঃপর তাঁর পাশেই নামাজ আদায় করতাম এবং আড় চোখে তাঁকে দেখতাম, যখন আমি নামাজে মশগুল তখন তিনি আমার প্রতি সময় সময় দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতেন।

"মুসলমানদের এই বয়কট দীর্ঘতর হয়ে উঠলে একদিন চাচাতো ভাই কাতাদাহ (রা.)-এর কাছে যাই, তিনি ছিলেন আমার বড় আপনজন। আমি তাঁর বাগানের দেওয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি এবং তাঁকে সালাম দেই। আল্লাহর কসম! তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। বললাম, কাতাদাহ তোমার কি জানা নেই, আমি নবী করীম ﷺ-কে কত ভালোবাসি? কাতাদাহ তখন নিশ্চুপ। কথাটি আরো কয়েকবার বললাম, অবশেষে তৃতীয় কি চতুর্থবার তিনি শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম আর দেয়াল টপকে বাইরে চলে এলাম। একদিন

মদিনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ সিরিয়া থেকে আগত জনৈক ব্যবসায়ীর প্রতি আমার নজর পড়ল। সে লোকদের জিজ্ঞেস করছিল, কা'আব ইবনে মালেকের ঠিকানা কেউ দিতে পার? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করলে সে আমার কাছে এসে গাসসানের রাজার একটি পত্র আমার হাতে দেয়। পত্রটি রেশম বস্ত্রের উপর লিখিত ছিল। বিষয়বস্তু ছিল এই- "অতঃপর জানতে পারলাম যে, আপনার নবী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং আপনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ আপনাদের এহের লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের স্থানে রাখেননি। আমার এখানে আসা যদি ভালো মনে করেন চলে আসুন। আমরা আপনাদের সাহায্যে থাকব।"

"পত্রটি পাঠ করে বললাম, হায়! এতো আরেক পরীক্ষা। কাফেররা আমার প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠেছে [যাতে তাদের সাথে একাত্ম হই]। পত্রটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলি। কিছুদূর গিয়ে রুটির এক চুলায় তা নিক্ষেপ করলাম।"

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, "পঞ্চাশ রাতের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হলো তখন হঠাৎ নবী করীম ﷺ-এর জনৈক দূত খোযাইমা ইবনে সাবিত (রা.) আমার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ, নিজ স্ত্রী থেকেও দূরে সরে থাক। আমি বললাম, তাকে তালাক দিয়ে দেব, না অন্য কিছু? তিনি বলেন, না। তবে কার্যত তার থেকে দূরে থাকবে। নিকটে যাবে না; এ ধরনের আদেশ অপর সঙ্গীদ্বয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে। আমি স্ত্রীকে বললাম, পিতৃগৃহে চলে যাও, সেখানে থাক এবং আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা কর। ওদিকে হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী খাওলা বিনতে আসেম এ আদেশ শুনে সোজা রাসূল ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল তার সেবা করার কেউ নেই। ইবনে আবি শায়বার রেওয়ায়েত মতে তিনি চোখেও কম দেখতেন। খাওলা বিনতে আসেম আরো বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁর খিদমত করা কি আপনার পছন্দ নয়? তিনি বলেন, খিদমতে আপত্তি নেই, তবে সে যেন তোমার কাছে না যায়। আমি আরজ করি, সে তো বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, নড়চড়ার শক্তি নেই। আল্লাহর কসম! সে তো দিনরাত শুধু কেঁদে চলেছে।

কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, 'বন্ধুজনেরা আমাকেও পরামর্শ দিয়েছিল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে স্বপরিবারে থাকার অনুমতি চেয়ে নেই, যেমন তিনি হেলালকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, আমি তা পারব না। জানি না নবী করীম ﷺ কি জবাব দেবেন। তাছাড়া আমি তো যুবক [স্ত্রী সাথে রাখা সতর্কতার পরিচায়ক নয়]। এমনিভাবে আরো দশটি রাত কাটিয়ে দিলাম। এতে মোট পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো। [মুসনাদে আব্দুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে,] সে সময়ই রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের তওবা কবুল হওয়ার আয়াতটি নাজিল হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, অনুমতি থাকলে এ সময় কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-কে সংবাদটি দেওয়ার ব্যবস্থা করি? হুজুর ﷺ বললেন, না। লোকেরা ভিড় জমাবে, ঘুমানো দুষ্কর হবে।' কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, পঞ্চাশতম রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফজরের নামাজ আদায় করার পর ঘরের ছাদে বসেছিলাম আর কুরআনের ভাষায় অবস্থা ছিল এই- "পৃথিবী এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য আমার জন্য সংকুচিত হয়ে গেল।" হঠাৎ সিলা (سَلْعٍ) পর্বতের চূড়া থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম- কে যেন বলছে, 'কা'আব ইবনে মালেকের জন্য সুসংবাদ।'

মুহাম্মদ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-ই সেই পর্বতের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে বলছিলেন, আল্লাহ কা'আবের তওবা কবুল করেছেন, তার জন্য সুসংবাদ। হযরত ওকবার রেওয়ায়েত মতে কা'আবকে এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দুজন সাহাবী দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের একজন আগে চলে গেলেন। কিন্তু পেছনে যিনি ছিলেন তিনি 'সিলা' পর্বতের চূড়ায় উঠে সজোরে চিৎকার করে সংবাদটি প্রচার করে দিলেন। কথিত আছে, তাঁরা দুজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক (রা.)। হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, 'আমি এ চিৎকার শুনে সিজদায় চলে গেলাম। অনন্দাশ্রু দু-গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, সংকট কেটে গেছে। রাসূলে কারীম ﷺ ফজরের নামাজের পর আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদটি সাহাবীদেরকেও দিলেন। তখন সবাই মোবারকবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে ত্রস্তপদে আমাদের তিনজনের দিকে ছুটে আসেন। কেউ ঘোড়া নিয়ে আমার দিকে ছুটলেন। তবে পাহাড়ে চিৎকারকারী ব্যক্তির আওয়াজই সবার আগে আমার কানে পৌঁছেছিল।"

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য বাইরে এসে দেখি, লোকেরা দলে দলে মোবারকবাদ জানাতে আসছেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখি মহানবী ﷺ সেখানেই অবস্থান করছেন আর তাঁর চারদিকে সাহাবায়ে কেরামের ভিড়। আমাকে দেখে সবার আগে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ আমার কাছে এসে করমর্দন করলেন এবং তওবা কবুল হওয়ার জন্য মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। আমি তালহার এই দয়া কখনো ভুলব না। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম জানাই, তখন তার পবিত্র চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি বললেন, কা'আব তোমার সুসংবাদ আজকের এই মোবারক দিনের জন্য, যা তোমার গোটা জীবনের দিনগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এ সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? ইরশাদ হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তুমি সত্য কথা বলেছ বলে আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্যতা প্রকাশ করে দিলেন।

'আমি তাঁর সামনে বসে নিবেদন করলাম, আমার তওবা হলো, অর্থসম্পদ যা আছে সমুদয় ত্যাগ করব, সবই আল্লাহ তা'আলার রাহে করে দান দেব। তিনি বলেন, না, নিজের জন্যও কিছু রেখো, এটিই উত্তম। আরজ করলাম, অর্ধেক সম্পদ দান করে দেব? তিনি এতেও বারণ করলেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ সদকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাতে সম্মত হলেন। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সত্য বলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে নাজাত দিয়েছেন, তাই আমার প্রতিজ্ঞা হলো এই যে, আমি জীবনে সত্য ছাড়া টু শব্দটি করব না। হযরত কা'আব (রা.) বলেন, 'আল্লাহর একান্ত শুকরিয়া যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও মিথ্যা বলিনি।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর এর চাইতে বড় নিয়ামত আর একটিও লাভ করিনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে সত্য কথা বলেছি, মিথ্যাকে ত্যাগ করেছি। কারণ যদি মিথ্যা বলতাম, তবে সেই মিথ্যা শপথকারী লোকদের মতোই আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যাদের সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ .... فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদের বয়কট অব্যাহত থাকার মাঝে এ রহস্য রয়েছে যে, তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল।

١١٩. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ مَعَاصِيْهِ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ فِي الْاِيْمَانِ وَالْعُهُوْدِ بِاَنْ تَلْزَمُوا الصِّدْقَ.

١٢٠. مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِذَا غَزَا وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ بِاَنْ يَّصُوْنُوْهَا عَمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهٖ مِنَ الشَّدَائِدِ وَهُوَ نَهْيٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ ذٰلِكَ اَيِ النَّهْيُ عَنِ التَّخَلُّفِ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ عَطَشٌ وَّلَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ جُوْعٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى وَطْأً يَّغِيْظُ يُغْضِبُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ لِلّٰهِ نَّيْلًا قَتْلًا اَوْ اَسْرًا اَوْ نَهْبًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ لِيُجَازَوْا عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ اَيْ اَجْرَهُمْ بَلْ يُثِيْبُهُمْ.

অনুবাদ :

১১৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা পাপাচার বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং ঈমান ও চুক্তির বিষয়ে যারা সত্যবাদী তাদের অন্তর্ভুক্ত হও। অর্থাৎ তোমরা সর্বদা সততাকে আঁকড়ে থাক।

১২০. আল্লাহর রাসূলের যখন তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন তাঁর সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া এবং তিনি নিজে আল্লাহর পথে যে কষ্ট স্বীকার করেন তা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদিনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়। তা অর্থাৎ যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ থাকার এই নিষেধাজ্ঞা এ জন্য যে আল্লাহ তা'আলার পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা এবং আল্লাহর শত্রুদের নিকট হতে কিছু লাভ করা অর্থাৎ তাদেরকে বধ করা বা বন্দী করা বা দেশান্তর করা সবকিছুর প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যে তাদের সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল অর্থাৎ উল্লিখিত জনপদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না। বরং তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দিয়ে থাকেন। مَا كَانَ বাক্যটি خَبَرٌ বা বিবরণমূলক ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হলেও এ স্থানে نَهْي বা নিষেধাজ্ঞামূলক অর্থে ব্যবহৃত। بِاَنَّهُمْ তার ب টি سَبَبِيَّة বা হেতু বোধক। ظَمَأٌ অর্থ তৃষ্ণা। نَصَبٌ অর্থ ক্লান্তি مَخْمَصَةٌ অর্থ ক্ষুধা। مَوْطِئًا তা مَصْدَرٌ ক্রিয়ামূল وَطْئًا [পদক্ষেপ করা] অর্থে ব্যবহৃত يَغِيْظُ অর্থ ক্রোধ সঞ্চার করা।

١٢١. وَلَا يُنْفِقُوْنَ فِيْهِ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَوْ تَمْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا بِالسَّيْرِ اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ذٰلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَيْ جَزَاءَهُ .

১২১. এবং তাতে তাদের ক্ষুদ্র যেমন একটি খর্জুর বা বৃহৎ ব্যয় এবং যাত্রার মাধ্যমে তাদের প্রান্তর অতিক্রম এসব কিছুই তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করা হয়– এ উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ তা'আলা তারা যা করে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দেবেন।

١٢٢. وَلَمَّا وُبِّخُوْا عَلَى التَّخَلُّفِ وَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً نَفَرُوْا جَمِيْعًا فَنَزَلَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا اِلَى الْغَزْوِ كَافَّةً ط فَلَوْلَا فَهَلَّا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ قَبِيْلَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ جَمَاعَةٌ وَمَكَثَ الْبَاقُوْنَ لِيَتَفَقَّهُوْا اَيِ الْمَاكِثُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ بِتَعْلِيْمِ مَا تَعَلَّمُوْهُ مِنَ الْاَحْكَامِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ عِقَابَ اللّٰهِ بِامْتِثَالِ اَمْرِهِ وَنَهْيِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) فَهٰذِهِ مَخْصُوْصَةٌ بِالسَّرَايَا وَالَّتِيْ قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنْ تَخَلُّفِ اَحَدٍ فِيْمَا اِذَا اَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ .

১২২. যুদ্ধ হতে পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার বিষয়ে তারা তিরস্কৃত হওয়ার পর রাসূল ﷺ অপর একটি দল জিহাদের জন্য প্রেরণ করার উদ্যোগ নিলে তখন একেবারে সকলেই তাতে যাত্রা করতে উদ্যত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– মু'মিনদের সকলে একসাথে যুদ্ধ অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের প্রত্যেক কবিলার এক অংশ এক জামাত কেন বের হয় না আর অবশিষ্টরা কেন বাড়িতে থেকে যায় না। যাতে তারা বাড়িতে অবস্থানরত অবশিষ্টরা দীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তারা যে সমস্ত আহকাম ও বিধিবিধান শিক্ষা করেছে তৎমাধ্যমে সতর্ক করতে পারে যখন তারা যুদ্ধ হতে তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহ বাস্তবায়ন করত আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতোক্ত বিধানটি সারিয়্যা অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিজে যে যুদ্ধে শরিক হননি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যুদ্ধে শরিক না হয়ে পশ্চাতে থাকা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত বিধানটি হলো যে যুদ্ধে রাসূল ﷺ নিজে বের হয়েছেন সে ক্ষেত্রের জন্য। لَوْلَا তা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِي الْاِيْمَانِ وَالْعُهُوْدِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَعَ الصَّادِقِيْنَ-এর মধ্যে مَعِيَّتْ দ্বারা مَعِيَّتْ فِي الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য مَعِيَّتْ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْمَكَانِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা এই مَعِيَّتْ এ কোনো কল্যাণ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না হয়।

قَوْلُهُ تَلْزَمُوا الصِّدْقَ : এটা مَعِيَّتْ-এর পদ্ধতির বর্ণনা

قَوْلُهُ بِاَنْ يَصُوْمُوْا الخ : এটা حَاصِل مَعْنٰى-এর বর্ণনা بِاَنْفُسِهِمْ-এর মধ্যে بَاء টা تَعْدِيَة-এর জন্য হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যে কঠিন তা ও মসিবতে নিজেকে ফেলেছেন, যেই ক্লেশ আপনার সম্মুখে আসছে। তোমরা তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো না।

قَوْلُهُ وَهُوَ نَهْيٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ : এটা মুবালাগার ভিত্তিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىِ النَّهْىُ : এটা ذَالِكَ -এর مَرْجِعْ -এর বর্ণনা। আর نَهْىٌ দ্বারা সেই نَهْىٌ উদ্দেশ্য যা مَا كَانَ لِاَهْلِ مَدِيْنَةٍ الخ থেকে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى وَطْئًا : অর্থাৎ مَوْطِئًا অর্থে এর টা হলো مِيْم এটা مَصْدَر مِيْمِىْ -এর ظَرْف -এর মীম নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَنَالُوْنَ : অর্থাৎ لَا يُصِيْبُوْنَ সম্মুখন হওয়া পেশ আসা, অর্থাৎ সময় ও পেরেশানির সম্মুখীন হওয়া।

قَوْلُهُ نَيْلًا : অর্থাৎ يُصِيْبُوْنَ اِصَابَةً তথা اِصَابَةً এটা প্রত্যেক কষ্ট ও মসিবতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

قَوْلُهُ اَىْ اَجْرُهُمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, اَلْمُحْسِنِيْنَ টা هُمْ যমীরের স্থানে তার সিফত বলা যথেষ্ট হতো। কিন্তু তাতে دَلَالَةٌ عَلَى الْاِحْسَانِ হতো না।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كُتِبَ -এর যমীর اِنْفَاقٌ এবং قَطْعِ وَادِىْ উভয়ের দিকেই উল্লিখিত تَاوِيْل -এর ভিত্তিতে ফিরতেছে। কাজেই عَدَمِ مُطَابَقَتْ -এর সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

قَوْلُهُ لَمَّا وُبِخُوْا عَلَى التَّخَلُّفِ : এতে আগত আয়াত (وَمَا كَانَ) -এর শানে নুযূল এর দিকে ইঙ্গিত করেছে।

قَوْلُهُ قَبِيْلَةٍ : فِرْقَةٍ -এর তাফসীর قَبِيْلَةٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِرْقَةٍ দ্বারা বড় জামাত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَكَثَ الْبَاقُوْنَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে لِيَتَفَقَّهُوْا -এর যমীর উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে نَفَرْ -এর সাথে নয়। কাজেই এ সন্দেহ শেষ হয়ে গেল যে, যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে কিভাবে ফিকহ অর্জন করবে?

قَوْلُهُ وَالَّتِىْ قَبْلَهَا بِالنَّهْىِ عَنِ التَّخَلُّفِ الخ : এই বৃদ্ধি করা দ্বারা উভয় ইবারতের দ্বন্দ্ব নিরসন করা উদ্দেশ্য। مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ -এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির জন্যই জিহাদ থেকে বসে থাকা জায়েজ নয়। আর وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا الخ আয়াতে সকলকে জিহাদে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। উভয় আয়াতের مَفْهُوْمْ -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা تَعَارُضْ রয়েছে।

اَلَّتِىْ قَبْلَهَا الخ দ্বারা এই সন্দেহেরই নিরসন করা হয়েছে। এই জবাবের সারকথা হলো এই যে, পূর্বে যেই نَهْىٌ রয়েছে তা এই সুরতে রয়েছে যে, বের হওয়াটা ব্যাপকভাবে হয় এবং স্বয়ং রাসূল ﷺ ও জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়েন। আর ছোট জামাত বের হওয়া আর বড় জামাত মদিনায় অবস্থান করার বিধান হলো সারিয়ার। যখন ব্যাপক ঘোষণা না হয় এবং রাসূল ﷺ নিজে তাতে অংশগ্রহণ না করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) এবং তাঁর দুজন সঙ্গীকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সত্যবাদীতার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর। এই আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে দুটি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একটি তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করা আর দ্বিতীয় হলো সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং মুনাফিকদের সঙ্গ পরিহার করা।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরই তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করা একান্ত জরুরি। এরপর সত্যবাদী এবং নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করা পক্ষান্তরে মুনাফিকদের তথা কাফের ও সকল মন্দ লোকের সঙ্গ পরিহার করা কর্তব্য।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً : অর্থাৎ এমন নয় যে, মুসলমানগণ সকলেই একসাথে অভিযানে যাবে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তাতে কোনো কোনো মুসলমানের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রত্যেক জিহাদেই মুসলমান মাত্রই অংশগ্রহণ একান্ত কর্তব্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিহাদে সকল মুসলমানেরই শরিক হওয়া একান্ত কর্তব্য নয়।

শানে নযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাবুকের জিহাদে গমন করেন তখন মদিনাতে শুধু মুনাফেকরাই থেকে যায়। আর দু চারজন যারা খাঁটি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও যেতে

পারেননি তাদের তওবা সম্পর্কীয় আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়েছে ঐ অবস্থায় মু'মিনগণ বললেন, আমরা আর কোনো সময় কোনো জিহাদ থেকে বিরত থাকব না স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদে গমন করেন অথবা তিনি সাহাবায়ে কেরামের কোনো দল জিহাদে প্রেরণ করেন কোনো অবস্থাতেই আমরা জিহাদ থেকে বিরত থাকব না।

মহানবী ﷺ যখন তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন দিকের কাফেরদের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করলেন তারা সকলেই ঐ জিহাদে শরিক হলেন, মদিনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একা রেখে গেলেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

সূরা তাওবায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাবুক যুদ্ধের ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। এ যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়। বিনা ওজরে এ আদেশের বিরুদ্ধাচারণ জায়েজ ছিল না। যারা আদেশ লঙ্ঘন করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। এ সূরার অনেক আয়াতে তাদের আলোচনা এসেছে। আর কিছু নিষ্ঠাবান মু'মিনও ছিলেন, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত ছিলেন। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে বাহ্যত বুঝা যেতে পারে যে, প্রত্যেক জিহাদে গমন করাই প্রত্যেকটি মুসলমানদের জন্য ফরজ এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম অথচ শরিয়তের হুকুম তা নয়। বরং শরিয়ত মতে সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ নিলেই অবশিষ্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এ ফরজ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু জিহাদকারী যদি যথেষ্ট সংখ্যক না হয় এবং যদি তাদের পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে আশপাশের মুসলমানদের জিহাদে যোগ দেওয়া এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করা ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ এমনকি প্রয়োজনবোধ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পক্ষে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরজে আইন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। তেমনিভাবে মুসলমানদের আমির যদি প্রয়োজন বোধে সকল মুসলমানকেই জিহাদে যোগ দেওয়ার সাধারণ আদেশ জারি করেন, তবুও জিহাদ সবার উপরে ফরজ হয়ে যায়। তখনও জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। যেমন তাবুক যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আদেশ জারি হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধের ঘোষণা ছিল এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে, অথচ সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন নয় এবং এতে সকলের সমবেতভাবে যোগ দেওয়াও ফরজ নয়। কেননা জিহাদের মতো ইসলাম ও মুসলমানদের আরো অনেক সমষ্টিগত সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান জিহাদের মতোই ফরজে কিফায়া। আর তা হবে দায়িত্ব বণ্টনের নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তাই সকল মুসলমানদের পক্ষে একই সময়ে জিহাদে যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এ আলোচনা থেকে 'ফরজে কিফায়া'র পরিচয় জানা গেল। অর্থাৎ যে কাজ ব্যক্তিগত নয়, বরং সমষ্টিগত এবং সকল মুসলমানদের পক্ষে তা সমাধা করা কর্তব্য, শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকেই ফরজে কিফায়া বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে দায়িত্ব বণ্টনের নীতি অনুসারে যাবতীয় কার্য স্ব-স্ব গতিতে চলতে পারে এবং সমষ্টিগত দায়িত্বগুলোও আদায় হয়ে যায়। মুসলমান পুরুষের পক্ষে জানাজার নামাজ, কাফন-দাফন, মসজিদ নির্মাণ, তার হেফাজত ও সীমান্ত রক্ষা প্রভৃতি হলো ফরজে কিফায়া। সাধারণত বিশ্বের সকল মুসলমানের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু যদি কিছু সংখ্যক লোক তা আদায় করে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

ফরজে কিফায়ার মধ্যে দীনের তালিম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তা'লিমে-দীনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে, জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালেও যেন দীনের তা'লিম স্থগিত না হয়। সে জন্য প্রত্যেক বড় দল থেকে একেকটি ছোট দল জিহাদে বের হবে এবং অবশিষ্ট লোকেরা দীনি ইলম হাসিলে নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর তারা ইলম হাসিল করে মুজাহিদ ও অপরাপর লোককে দীনি তালিম দেবে।

দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি দীনের ইলম হাসিলের মৌলিক দলিল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দীনি ইলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি এবং ইলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দীনি ইলমের ফজিলত : দীনি ইলমের অগণিত ফজিলত ও ছওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট্ট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) রেওয়ায়েত

করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ তা'আলা এই চলার ছওয়াব হিসেবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ দীনি জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল ইবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফজিলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেম সমাজ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ সোনা রূপার মিরাস রেখে যান না। তবে ইলমের মিরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি ইলমের মিরাস পায়, সে যেন মহাসম্পদ লাভ করল। -[কুরতুবী]

ইমাম দারেমী (র.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, বনী ইসরাঈলের দুজন লোক ছিলেন যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামাজ ও লোকদের দীনি তালিম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দুজনের মধ্যে কার ফজিলত বেশি? রাসূল ﷺ বলেন, সেই আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফজিলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর। -[কুরতুবী]

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবিলায় একজন ফিকহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারি। -[তিরমিযী, মাযহারী]

তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া, যেমন- মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। দুই. ইলম, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। যেমন- শাগরিদ রেখে গিয়ে ইলমে দীনের চর্চা জারি রাখা বা কোনো কিতাব লিখে যাওয়া। তিন. নেককার সন্তান, যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং ছওয়াব পাঠাতে থাকে। -[কুরতুবী]

দীনি ইলম ফরজে আইন অথবা ফরজে কিফায়া হওয়ার বিবরণ : ইবনে আদী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ। বলা বাহুল্য এ হাদীস ও উপরিউক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লিখিত ইলম শব্দের অর্থ দীনের ইলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো দুনিয়াবি জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরি। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফজিলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দীনি ইলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বুঝায় না; বরং তা বহু বিষয়ের উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপরই যে ইলম তলব ফরজ করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দীনি ইলমের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরজ করা হয়েছে যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরি এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরজসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয়সমূহ থেকে বাঁচতে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়, কুরআন হাদীসের মাসআলা মাসায়েল, কুরআন হাদীস থেকে আহরিত হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরজে আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরজে কেফায়া। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরিয়তের উপরিউক্ত ইলম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত লাভ করতে পারে। কিন্তু যে শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোনো আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরজ, যাতে করে যে কোনো প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমতে আমল করা যায়। দীনি ইলম সম্পর্কে ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়ার তাফসীর নিম্নরূপ-

ফরজে আইন : ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামাজ রোজা ও অন্যান্য ইবাদত বা শরিয়ত যেসব বিষয় ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মাকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক তার জন্য জাকাতের মাসআলা মাসায়েল জানা, যে হজ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার

আহকাম ও মাসায়েল জেনে নেওয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা বা শিল্প কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরজ। এক কথায় শরিয়ত মানুষের যেসব কাজ ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ।

ইলমে তাসাউফও ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত : শরিয়তের জাহিরী হুকুম তথা নামাজ রোজা প্রভৃতি যে ফরজে আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর ইলম রাখাও ফরজে আইন। হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরজে আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর ইলম যাকে পরিভাষায় ইলমে তাসাউফ বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরজে আইন। অধুনা বিভিন্ন ইলম তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরজে আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বুঝায় যা ফরজ ওয়াজিবের তাফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকিদা, যার সম্পর্কে বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরজ কিংবা গর্ব, অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কুরআন হাদীসের মতে হারাম। এগুলোর গতি প্রকৃতি অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। এ সকল বিষয়ের উপরই হলো ইলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরজে আইন।

ফরজে কিফায়া : পূর্ণ কুরআন মাজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বুঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, কুরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া। বস্তুত এটি এত বড় কাজ যে, গোটা জীবন এতে নিয়োজিত থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরিয়ত একে ফরজে কিফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমতো এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দীনি ইলমের সিলেবাস : কুরআন মাজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দীনি ইলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে- لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ অথচ يَتَعَلَّمُوْنَ الدِّيْنَ [যেন দীনের জ্ঞান হাসিল করে] -ও বলা যেত। কিন্তু কুরআন এখানে تَعَلُّمٌ -এর স্থলে تَفَقُّهٌ শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দীনের ইলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের সাথে। বরং ইলমে দীনের উদ্দেশ্য হলো দীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تَفَقُّهٌ শব্দের অর্থও তাই। এটি فِقْه থেকে উদ্ভূত। فِقْه অর্থ- বুঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদ এ আয়াতে صِيْغَةُ مُجَرَّدٌ ব্যবহার করে لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ [যেন তারা দীনকে বুঝে নেয়।] বলেনি; বরং একে بَابُ تَفَعُّلٌ এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধানাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে, "তারা যেন দীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলা বাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামাজ-রোজা, হজ-জাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জ্ঞানকেই দীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না; বরং দীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বুঝে, তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে, দুনিয়ার এজীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে, মূলত এ চিন্তাই হলো দীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'ফিকহ' -এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকহ সেই শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয়, যা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরি।" অধুনা মাসআলা- মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে ইলমে ফিকহ বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহের তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় দীনের ইলম হাসিল করার অর্থ হলো, দীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোনো উপায়েই হোক সব একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব : দীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ [যেন তারা জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ভয় প্রদর্শন করে] বাক্যটিতে। উল্লেখ্য, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে اِنْذَارٌ বা ভয় প্রদর্শন। এটি اِنْذَارٌ-এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুত ভয় প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতি প্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত শত্রু, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয় প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয় প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয় প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবিতে একেই বলা হয় اِنْذَارٌ এজন্য নবী-রাসূলগণ نَذِيْر উপাধিতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয় প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে তা মূলত নবীগণের আংশিক মিরাস বা হাদীস মতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য, নবীগণ بَشِيْر ও نَذِيْر উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نَذِيْر-এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بَشِيْر অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলিলের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া। তবে এখানে শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দুটি। ১. দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং ২. অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেম ও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় একে جَلْب مَنْفَعَتْ [উপকার লাভ] دَفَع مُضَرَّتْ [লোকসান পরিহার] নামে অভিহিত করে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসান পরিহারের ও উপকার লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কেননা যে কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বাঞ্ছনীয় তা ত্যাগ করা বড়ই ক্ষতিকর। সুতরাং ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে যে বাঁচতে চায় সে করণীয় কর্মে অলসতা থেকেও দূরে থাকবে।

এ আলোচনা থেকে আরো একটি কথা জানা যায়। বর্তমান যুগে ওয়াজ ও নসিহতের কার্যকারিতা যে খুব কম পরিলক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ হলো, ভয় প্রদর্শনের নিয়ম পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যে ওয়ায়েজের কথা ও ভাবভঙ্গি থেকে দয়া-প্রীতি ও কল্যাণ কামনা পরিস্ফুট হবে, শ্রোতার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে যে, এ ওয়াজের উদ্দেশ্য তাকে নিন্দা ও খাটো করাও নয় এবং মনের রোষ মেটানোও নয়; বরং তার পক্ষে যা কল্যাণকর ও আবশ্যকীয় তাই বলা হচ্ছে পরম স্নেহভরে। শরিয়তের প্রতি অমনোযোগী লোকদের সংশোধন এবং দীন প্রচারে যদি উপরিউক্ত নীতি অবলম্বিত হয় তবে কখনো শ্রোতাবৃন্দ জেদের বশবর্তী হবে না। তারা তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের আমলের বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিণাম চিন্তায় নিয়োজিত হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে একদিন ওয়াজ-নসিহত কবুল করে বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত আর কিছু না হলেও অন্তত পরস্পরের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না যার অভিশাপে আজ গোটা জাতি ক্ষতিকর। আয়াতের শেষে لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আলেম সমাজের দায়িত্ব শুধু ভয় প্রদর্শন করাই নয়; বরং ওয়াজ-নসিহতের ক্রিয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। একবার ক্রিয়া না হলে বারংবার তাকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেন يَحْذَرُوْنَ-এর সুফল লাভ হয়। আর তা হলো পাপ ও নাফরমানি থেকে জাতির বেঁচে থাকা।

অনুবাদ :

١٢٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ اَيِ الْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ مِنْهُمْ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً شِدَّةً اَيْ اَغْلِظُوْا عَلَيْهِمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ .

১২৩. হে মু'মিনগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী ক্রমান্বয়ে যারা নিকট হতে নিকটতর তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়। অর্থাৎ তোমরা তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন কর। জেনে রাখ! আল্লাহ তাঁর সাহায্য-সহযোগিতাসহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা।

١٢٤. وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَمِنْهُمْ اَيِ الْمُنَافِقِيْنَ مَنْ يَّقُوْلُ لِاَصْحَابِهِ اِسْتِهْزَاءً اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ تَصْدِيْقًا قَالَ تَعَالٰى فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا لِتَصْدِيْقِهِمْ بِهَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ يَفْرَحُوْنَ بِهَا .

১২৪. যখনই কুরআনের কোনো সূরা নাজিল হয় তখন তাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের কেউ কেউ সাহাবীগণকে উপহাস করে বলে তা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান প্রত্যয় বৃদ্ধি করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা মু'মিন যেহেতু তারা তার প্রত্যয় রাখে সেহেতু তা তো তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা এতদ্বিষয়ে আনন্দিত সুখী।

١٢٥. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ كُفْرًا اِلٰى كُفْرِهِمْ لِكُفْرِهِمْ بِهَا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ .

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি অর্থাৎ প্রত্যয়ের দুর্বলতা বিদ্যমান যেহেতু তারা তা অস্বীকার করে সেহেতু তা তোমাদের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে। কুফরির উপর আরো কুফরির বৃদ্ধি ঘটায় এবং কুফরি অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করে।

١٢٦. اَوَلَا يَرَوْنَ بِالْيَاءِ اَيِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالتَّاءِ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ يُبْتَلَوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ بِالْقَحْطِ وَالْاَمْرَاضِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ مِنْ نِفَاقِهِمْ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ .

১২৬. তারা কি দেখে না لَا يَرَوْنَ তা ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে গঠিত হলে মুনাফিকদেরকে বুঝাবে। আর ت সহ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে হে মু'মিনগণ! তোমরা কি দেখ না? যে, তারা প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ, মহামারী দ্বারা দু একবার বিপর্যস্ত হয়? বিপদাপন্ন হয়? তারপরও তারা মুনাফেকী হতে তওবা করে না এবং তারা শিক্ষা গ্রহণও করে না। তা হতে উপদেশও নেয় না।

١٢٧. وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فِيْهَا ذِكْرُهُمْ وَقَرَأَهَا النَّبِيُّ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ط يُرِيْدُوْنَ الْهَرَبَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ يَرٰكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِذَا قُمْتُمْ فَاِنْ لَّمْ يَرَهُمْ اَحَدٌ قَامُوْا وَاِلَّا ثَبَتُوْا ثُمَّ انْصَرَفُوْا ط عَلٰى كُفْرِهِمْ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ عَنِ الْهُدٰى بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ الْحَقَّ لِعَدَمِ تَدَبُّرِهِمْ.

১২৭. এবং যখনই তাদের উল্লেখ সংবলিত কোনো সূরা নাজিল হয় আর রাসূল ﷺ তা পাঠ করেন তখন তারা ভেগে যাওয়ার ইচ্ছায় একে অপরের দিকে তাকায়। বলে, দাঁড়ালে তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করবে কি? কেউ যদি লক্ষ্য না করে তবে তারা চলিয়া যায়। আর তা না হলে বসে থাকে। অতঃপর তারা কুফরির উপরই ফিরে চলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় সত্যপথ হতে বিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা চিন্তা না করার কারণে সত্যকে বুঝে না।

١٢٨. لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَىْ مِنْكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ عَزِيْزٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اَىْ عَنَتُكُمْ اَىْ مَشَقَّتُكُمْ وَلِقَاؤُكُمُ الْمَكْرُوْهَ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ اَنْ تَهْتَدُوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ شَدِيْدُ الرَّحْمَةِ رَّحِيْمٌ يُرِيْدُ لَهُمُ الْخَيْرَ.

১২৮. তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এসেছেন। তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয় অর্থাৎ তোমাদের কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া তাঁর জন্য পীড়াদায়ক ক্লেশকর। তোমরা পথপ্রাপ্ত হও তার প্রতি তিনি অতি আগ্রহী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমতাশীল। অর্থাৎ তিনি তাদের মঙ্গলকামী। مَا عَنِتُّمْ তার مَا টি مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থ ব্যঞ্জক। এদিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে তাফসীরে عَنَتُكُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। رَءُوْفٌ অর্থ– অতিশয় মমতা যার।

١٢٩. فَاِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِكَ فَقُلْ حَسْبِىَ كَافِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بِهٖ وَثِقْتُ لَا بِغَيْرِهٖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُرْسِىِّ الْعَظِيْمِ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ اَعْظَمُ الْمَخْلُوْقَاتِ رَوَى الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ.

১২৯. অতঃপর তারা যদি তোমার উপর ঈমান আনয়ন করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল, আমার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আমি অন্য কারো উপর নয় তাঁর উপরই নির্ভর করি আস্থা পোষণ করি। তিনি মহাআরশের আসনের অধিপতি। সৃষ্টির মধ্যে আকাশে আরশ সর্ববৃহৎ বলে এ স্থানে বিশেষভাবে কেবল তারই উল্লেখ করা হয়েছে। حَسْبِىَ অর্থ আমার জন্য যথেষ্ট। হাকেম তৎপ্রণীত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে হযরত উবাই ইবনে কা'ব প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, لَقَدْ جَآءَكُمْ হতে শেষ পর্যন্ত এ সূরার আয়াতসমূহই সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَلُوْنَكُمْ : এটা وَلِيٌّ মাসদার থেকে جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থ– তারা যারা তোমাদের নিকটবর্তী।

قَوْلُهُ اغْلُظُوْا عَلَيْهِمْ : এ ইবারত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, وَلْيَجِدُوْا এটা কাফেরদেরকে নির্দেশ করা যে, তারা মুসলমানদের মধ্যে غِلْظَتً এবং কঠোরতা পাবে। অথচ কাফেরদের উপর غِلْظَتً পাওয়া ওয়াজিব নয়।

উত্তর. উত্তর এই যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্দেশ কাফেরদের প্রতি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নির্দেশ মু'মিনদেরকেই করা হয়েছে। আয়াতে সবব বলে مُسَبَّبْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ الخ : প্রশ্ন. يَقُوْلُوْنَ উহ্য মানার প্রয়োজন কি ছিল?

উত্তর. যেহেতু هَلْ يَرَاكُمْ-এর পূর্বে অর্থাৎ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ-এর মধ্যে বাহ্যত কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা هَلْ يَرَاكُمْ হলো حَاضِرٌ আর نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ হলো غَائِبٌ-এর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য يَقُوْلُوْنَ উহ্য মানার প্রয়োজন হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : অর্থাৎ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

قَوْلُهُ صَرَفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : এটা মূলত মুনাফিকদের জন্য বদদোয়া। কেননা এটা স্থানের হিসেবে যথোপযুক্ত খবর নয়।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ : এটা اِنْصَرَفُوْا-এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে صَرَفَ اللّٰهُ-এর নয়। কেননা এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ دُعَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ مِنْكُمْ اَيْ مِنْ جِنْسِكُمْ : অর্থাৎ عَرَبِيٌّ قُرَيْشِيٌّ مِثْلُكُمْ

قَوْلُهُ اَيْ عَنَتُّكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا عَنِتُّمْ-এর মধ্যে مَا টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ মওসূলাহ নয়। এতে عَائِدٌ-এর প্রয়োজন নেই। কাজেই عَائِدٌ না থাকার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদের বিধান পেশ করা হয়েছে এবং জিহাদের ফজিলতও বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে জিহাদ কিভাবে শুরু হবে এবং কার সঙ্গে সর্বপ্রথম জিহাদ করতে হবে এ বিধান বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا-এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। নিকটবর্তী দুরকমের হতে পারে। এক. অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। **দুই.** গোত্র আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটবর্তী অন্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কুরআনে রাসূলে কারীম ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ হে রাসূল নিজের নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করুন। তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ তিনি স্থান হিসেবে প্রথমে মদিনার আশপাশের কাফের তথা বনূ কুরায়জা, বনূ নাজীর ও খায়বারবাসীদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

قَوْلُهُ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً : غِلْظَةٌ অর্থ– কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোনো দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফরমাবরদারী সহজ হয়ে উঠে। ইবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রা.) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্রেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরির তীব্রতার সাথে সে কালো দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কালো হয়ে যায়। –[মাযহারী]

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন, আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতি বছরই তারা কখনো একবার, কখনো দুবার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোনো বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদের এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করেন না?

قَوْلُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الخ : এ দুটি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ সকল সৃষ্টির উপর বিশেষ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জিহাদের বর্ণনা, যা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থারূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তাবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষের ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করা এবং তারই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর মতে এ দুটি আয়াত হলো কুরআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আরো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ মতই পোষণ করেন। –[কুরতুবী]

হাদীস শরীফে আয়াত দুটির অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাত বার করে আয়াত দুটি পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কাজ সহজ করে দেবেন। আল্লাহ মহান, পবিত্র, সর্বজ্ঞ।

–[কুরতুবী]
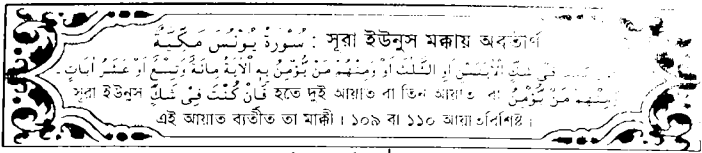
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. الٓرٰ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ اَيْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنَ الْحَكِيْمِ الْمُحْكَمِ .

২. اَكَانَ لِلنَّاسِ اَيْ اَهْلِ مَكَّةَ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ حَالٌ مِنْ قَوْلِهٖ عَجَبًا بِالنَّصْبِ خَبَرُ كَانَ وَبِالرَّفْعِ اِسْمُهَا وَالْخَبَرُ وَهُوَ اِسْمُهَا عَلَى الْاُوْلٰى اَنْ اَوْحَيْنَا اَيْ اِيْحَاؤُنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنْ مُفَسِّرَةٌ اَنْذِرْ خَوِّفْ النَّاسَ الْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ اَيْ بِاَنَّ لَهُمْ قَدَمَ سَلَفَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَيْ اَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ الْمُشْتَمِلَ عَلٰى ذٰلِكَ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ لَسَاحِرٌ وَالْمُشَارُ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম রা তার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবহিত। তা অর্থাৎ এ আয়াতসমূহ জ্ঞানগর্ভ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত একটি গ্রন্থের অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত। اٰيٰتُ الْكِتٰبِ এই اَلْكِتٰبُ শব্দটির প্রতি اٰيٰتُ শব্দটির اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ مِنْ অর্থব্যঞ্জক।

২. মানুষের জন্য মক্কাবাসীদের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজন মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে তুমি মানুষকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে সতর্ক কর ভয় প্রদর্শন কর এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে সত্যিকার অগ্রদূত। অর্থাৎ পূর্বে তারা যে সমস্ত সৎকার্য করেছে তার উত্তম প্রতিদান রয়েছে। কাফেররা বলে, এটা তো অর্থাৎ উক্ত বক্তব্য সংবলিত এই কুরআন তো প্রকাশ্য সুস্পষ্ট এক জাদু। এস্থানে اِنْكَارْ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে اَكَانَ اِسْتِفْهَامْ বা প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। عَجَبًا তা نَصَبْ সহ [যবর সহ] পঠিত হলে উল্লিখিত كَانَ -এর خَبَرْ বা বিধেয়রূপে বিবেচ্য হবে। আর رَفَعْ সহ [পেশসহ পঠিত হলে তার [كَانَ -এর] اِسْمْ বলে বিবেচ্য হবে। এমতাবস্থায় পরবর্তী শব্দ اَنْ اَوْحَيْنَا তার خَبَرْ বলে গণ্য হবে। اَنْ তার مَصْدَرِيَّةْ টি اَنْ اَوْحَيْنَا অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থব্যঞ্জক এদিকে করণার্থে তাফসীরে اِيْحَاؤُنَا [আমার ওহী প্রেরণ করা] উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রথম কেরাত অনুসারে [অর্থাৎ عَجَبًا যদি نَصَبْ সহ পঠিত হয় তবে] كَانَ -এর اِسْمْ বলে গণ্য হবে। اَنْ اَنْذِرْ তার اَنْ টি مُفَسِّرَةْ বা ভাষ্যমূলক। اَنَّ لَهُمْ এ স্থানে اَنَّ টির পূর্বে একটি بْ উহ্য রয়েছে। قَدَمَ এ স্থানে তার অর্থ যা অগ্রে হয়েছে। لَسِحْرٌ এটা অপর এক কেরাতে سَاحِرٌ [অর্থ জাদুকর] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা দ্বারা রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বুঝাবে।

٣. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَىْ فِىْ قَدْرِهَا لِاَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَوْ شَاۤءَ لَخَلَقَهُنَّ فِىْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ـ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ـ بَيْنَ الْخَلَائِقِ مَا مِنْ زَائِدَةٌ شَفِيْعٍ يَشْفَعُ لِاَحَدٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ـ رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اَنَّ الْاَصْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ ذٰلِكُمُ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ وَحِّدُوْهُ اَفَلَا تَذَّكَّرُوْنَ بِادْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ ـ

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, যিনি দুনিয়ার দিন হিসেবে ছয়দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ছয় দিনে অর্থ পৃথিবীর দিন হিসেবে ততটুকু পরিমাণ সময়ে। তৎসময়ে তো আর চন্দ্র বা সূর্য কিছুই ছিল না। যদ্দারা সময়ের পরিমাপ করা হয়। ইচ্ছা করলে তিনি মুহূর্তের মধ্যেই তা তৈরী করে ফেলতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টি জগতকে ধীরতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি তা না করে এই বিলম্ব করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যেমন তাঁর শানের পক্ষে উপযুক্ত তেমনি সমাসীন হন। সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁর অনুমতি লাভ ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ করবার কেউ নেই। ইনিই অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক সৃষ্টিকর্তাই হলেন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর। তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না? مِنْ شَفِيْعٍ এ স্থানে مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। تَذَّكَّرُوْنَ তাতে ذ -এ ت -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে।

٤. اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ـ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا مَصْدَرَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ اِنَّهٗ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا وَالْفَتْحِ عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ اَىْ بَدَأَهٗ بِالْاِنْشَاءِ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ بِالْبَعْثِ لِيَجْزِىَ لِيُثِيْبَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ـ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْمٍ مَاءٍ بَالِغٍ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ اَىْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ ـ

৪. তারই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে ন্যায়ভিত্তিক কর্মফল দেওয়ার জন্য। প্রতিফল দেওয়ার জন্য। এবং যারা কাফের কুফরির দরুন তাদের জন্য রয়েছে হামীম অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি। অর্থ আমি পুনরাবর্তন ঘটাই তাদের কুফরির দরুন তাদের বদলা দিত। وَعْدًا حَقًّا এ দুটি শব্দ مَصْدَرْ ক্রিয়ার মূল। [এ স্থানে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ সমধাতুজ কর্ম।] এস্থানে উহ্য সমধাতুজ ক্রিয়ার মাধ্যমে তারা مَنْصُوْبٌ [যবরযুক্ত,] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اِنَّهٗ তার হামযাটি اِسْتِئْنَافٌ অর্থাৎ নতুন বাক্যরূপে কাসরাসহ পাঠ করা যায়। আর তার পূর্বে একটি ل তা ধরা হলে তা ফাতাহসহ পঠিত হবে।

৫. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ذَاتَ ضِيَاءٍ اَىْ نُوْرٍ وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَقَدَّرَهٗ مِنْ حَيْثُ سَيْرِهٖ مَنَازِلَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ مَنْزِلاً فِىْ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسْتَتِرُ لَيْلَتَيْنِ اِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا اَوْ لَيْلَةً اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا لِتَعْلَمُوْا بِذٰلِكَ عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ج لاَ عَبَثًا تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ يُفَصِّلُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ يُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ ـ

৫. তিনিই সূর্যকে দীপ্ত অর্থাৎ আলো বিশিষ্ট ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং চলার গতি হিসেবে তার মনজিল নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তা দ্বারা তোমরা বৎসর গণনা ও হিসাবের জ্ঞান লাভ করতে পার। প্রতি মাসে ২৮ রাত্র হিসেবে চন্দ্রের ২৮টি মানজিল বা তিথি নির্ধারিত রয়েছে; মাস যদি ৩০শা হয় তবে দুই রাত্র আর ২৯শা হলে এক রাত্র তা লুক্কায়িত থাকে। আল্লাহ তা অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুসমূহ তাৎপর্য ভিন্ন সৃষ্টি করেননি। এই সবকিছু নিরর্থক নয়। নিরর্থক কাজ হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল লোকদের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। يُفَصِّلُ তা ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ একবচন পুংলিঙ্গরূপে ও ن সহ অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচনরূপে পঠিত রয়েছে।

৬. اِنَّ فِىْ اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالذَّهَابِ وَالْمَجِيْءِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ مِنْ مَلاَئِكَةٍ وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ وَنُجُوْمٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَ فِى الْاَرْضِ مِنْ حَيَوَانٍ وَجِبَالٍ وَبِحَارٍ وَاَنْهَارٍ وَاَشْجَارٍ وَغَيْرِهَا لَاٰيٰتٍ دَلاَلاَتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

৬. দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে তার আগমন নির্গমন ও হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে এবং আকাশমণ্ডলীতে ফেরেশতা, সূর্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি এবং পৃথিবীতে অর্থাৎ তার মধ্যে জীব জন্তু, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, গাছপালা ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তাতে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তাঁর কুদরতের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ফলে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। মুত্তাকী ও সাবধানরাই যেহেতু তা দ্বারা উপকৃত হয় সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا بِالْبَعْثِ وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بَدَلَ الْاٰخِرَةِ لِاِنْكَارِهِمْ لَهَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا سَكَنُوْا اِلَيْهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا دَلاَئِلِ وَحْدَانِيَّتِنَا غٰفِلُوْنَ تَارِكُوْنَ النَّظْرَ فِيْهَا ـ

৭. যারা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না এবং পরকাল অস্বীকার করত তার পরিবর্তে যারা পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং তাতেই যারা নিশ্চিন্ত তাতেই যারা প্রশান্তি লয় এবং যারা আমার নিদর্শনাবলি সম্বন্ধে আমার একত্বের প্রমাণাদি সম্পর্কে উদাসীন তাতে লক্ষ্য প্রদান যারা পরিত্যাগ করেছে।

٨. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي .

৮. তাদেরই আবাস জাহান্নাম তাদের শিরক, পাপাচার অবাধ্যতা ইত্যাদি কৃতকর্মের জন্য।

٩. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ يُرْشِدُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ بِهِ بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نُورًا يَهْتَدُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .

৯. যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাস হেতু তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে এমন এক নূর ও জ্যোতি প্রদান করবেন যদ্দারা তারা কিয়ামতের দিন পথ চলবে। তারা থাকবে সুখকর উদ্যানে, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত থাকবে নদীসমূহ।

١٠. دَعْوَاهُمْ فِيهَا طَلَبُهُمْ لِمَا يَشْتَهُونَهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَيْ يَا اللَّهُ فَإِذَا طَلَبُوهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ج وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ مُفَسِّرَةٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১০. সেখানে তাদের যখন কোনো বস্তুর বাসনা হবে তখন তাদের ধ্বনি হবে এই কথা বলা সুবহানাকাল্লাহুম্মা হে আল্লাহ তুমি মহান, পবিত্র। তারা যা চাইবে তৎক্ষণাৎ তাদের সামনে উপস্থিত পাবে। এবং সেখানে পরস্পরে তাদের অভিবাদন হবে সালাম এবং তাদের শেষধ্বনি হবে প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ عَجَبًا : মূলত لِلنَّاسِ টা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে عَجَبًا -এর সিফত হয়েছে। আর সিফত যখন মওসূফের উপর مُقَدَّمٌ হয় তখন তাকে حَالٌ বলা হয়। কেননা সিফতের মওসূফের উপর مُقَدَّمٌ হওয়া ঠিক নয় এবং لِلنَّاسِ এটা عَجَبًا -এর مُتَعَلِّقٌ নয়। কেননা মাসদারটা দুর্বল আমেল হয়ে থাকে এবং তার مَا قَبْلَ -এ আমল করে না, عَجَبًا টা كَانَ -এর খবরে মুকাদ্দাম হয়েছে। আর أَنْ أَوْحَيْنَا হলো كَانَ -এর إِسْمٌ مُؤَخَّرٌ ; উহ্য ইবারত হলো أَكَانَ أَنْ أَوْحَيْنَا إِيحَاؤُنَا عَجَبًا لِلنَّاسِ আর عَجَبٌ রফা' সহও পড়া হয়েছে। এ সুরতে عَجَبٌ টা كَانَ -এর إِسْمٌ হবে। আর أَنْ أَوْحَيْنَا যা -এর সুরতে إِسْمٌ ছিল তা خَبَرٌ হবে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) كَانَ -কে تَامَّةٌ মেনে عَجَبٌ -কে نَصَبٌ রফা' সহকারে পাঠ করেছেন। আর أَنْ أَوْحَيْنَا -কে عَجَبٌ থেকে بَدَلٌ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ قَدَمَ صِدْقٍ : এটা إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ -এর অন্তর্গত। যেমন– مَسْجِدُ الْجَامِعِ -এর মধ্যে হয়েছে। قَدَمٌ অর্থ হলো মর্যাদা, ইজ্জত, অতীত নেক আমলের শুভ প্রতিদান। মুফাসসির (র.) قَدَمٌ -এর তাফসীর سَلَفَ দ্বারা করে এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) أَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوا مِنَ الْأَعْمَالِ বলে এই অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ফায়দা : যেহেতু قَدَمٌ [পা] -এর মাধ্যমে অগ্রগামীতা হয়ে থাকে এজন্য سَابِقَةٌ -কে قَدَمٌ বলে দেওয়া হয়। যেমন নিয়ামতকে يَدٌ বলা হয়। قَدَمٌ -এর صِدْقٌ -এর দিকে ইজাফত করা হয়েছে زِيَادَتِي فَضْلٍ -এর জন্য। অথবা এজন্য যে صِدْقُ قَوْلٍ -এর স্থান صَادِقٌ দ্বারাই অর্জিত হয়।

قَوْلُهُ مَذْكُورٌ : ذٰلِكَ -এর তাফসীর مَذْكُورٌ দ্বারা করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো পূর্বে চন্দ্র ও সূর্যের আলোচনা রয়েছে। কাজেই اِسْمُ اِشَارَةٍ দ্বিবচন নেওয়া উচিত ছিল অথচ ذٰلِكَ কে একবচন নেওয়া হয়েছে।

উত্তর. জবাবের সারকথা হলো এই যে, مَذْكُورٌ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে ذٰلِكَ -কে একবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : يَهْدِيْهِمْ হলো اَنَّ -এর প্রথম খবর। আর تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ হলো দ্বিতীয় খবর আর فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ হলো তৃতীয় খবর।

قَوْلُهُ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ : অর্থাৎ যখনই কোনো পছন্দনীয় বস্তুর আশা করবে তখন প্রার্থনার পদ্ধতি এটা হবে যে, اَللّٰهُمَّ বলবে। তাহলে তৎক্ষণাৎ কামনীয় বস্তু বিদ্যমান হয়ে যাবে। اَللّٰهُمَّ টা যেহেতু كَلِمَةُ نِدَاءٍ কাজেই دُعَاءٌ টা طَلَبٌ অর্থে হবে।

قَوْلُهُ اِذَا مَا طَلَبُوْهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ : এখানে اِذَا টা হলো مُفَاجَاتِيَةٌ অর্থাৎ জান্নাতিগণ যখন কোনো জিনিসের কামনা করবেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবেই সেই বস্তু উপস্থিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ ذَاتَ ضِيَاءٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلشَّمْسُ ضِيَاءٌ -এর حَمْل -কে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া। কেননা ضِيَاءٌ হলো মাসদার আর এর ذَات -এর উপর حَمْل করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সূরাটি 'সূরায়ে ইউনুস' নামে খ্যাতি লাভ করে। অনেক সূরার নাম তার বিশেষ অংশের কারণে রাখা হয়েছে, এ সূরাটি তন্মধ্যে অন্যতম। এই সূরা হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। এই সূরার তিনটি আয়াত মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে।

এ সূরার মধ্যেও কুরআনে কারীম এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয় বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার এসব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসত্ত্বেও অংশীবাদের খণ্ডন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ সূরার সার বিষয়বস্তু তাই। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলি [তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি] হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জিহাদ করা এবং কুফর ও শিরকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জিহাদের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলিকে মক্কী জিন্দেগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। الٓرٰ এগুলোকে হরুফে মুকাত্তাআহ বলা হয়, যা কুরআন মাজীদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– الٓرٰ . عٓسٓقٓ . قٓ . حٰمٓ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে মুকাত্তাআহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুজুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুজুর ﷺ -কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন যা তারা সহ্য করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হরুফে মুকাত্তাআহর গূঢ় তত্ত্ব এমন কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোনো ক্ষতি হতে পারে। এজন্যই হুজুর ﷺ ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করে যাননি। অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ এটা তো সত্যকথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোনো রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে আলম ﷺ অন্তত এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোনো রকম কার্পণ্য করতেন না।

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ : বাক্যে تِلْكَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ সূরার সে সমস্ত আয়াতের প্রতি, যা একটু পরেই পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। আর কিতাব অর্থ এখানে কুরআন। এর প্রশংসা এখানে اَلْحَكِيْم শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যার অর্থ হলো হিকমতপূর্ণ কিতাব।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না; বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কুরআনে কারীম বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا অর্থাৎ জমিনের উপর যদি ফেরেশতা বাস করত, তাহলে আমি তাদের জন্য কোনো ফেরেশতাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম। যার মূলকথা হলো এই যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুত ফেরেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোনো মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রাসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ তা'আলার ফরমাবরদার তাদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ মানুষের কাছে মানুষকে রাসূল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ শব্দের দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে قَدَمٌ অর্থ পা। যেহেতু পা'ই মানুষের চেষ্টা তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবিতে 'কদম' [পদমর্যাদা] বলে দেওয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয় যে, কোনো কাজের বিনিময়ে প্রথমত সে সম্মান পাবার কোনো নিশ্চয়তাই থাকে না, আর যদিও বা পাওয়া যায় তবুও তা চিরকাল থাকার নিশ্চয়তা নেই। বরং সেই সম্মান বা পদমর্যাদা শেষ হয়ে গিয়ে ধুলোয় মিশে যাওয়াটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, তার জীবিত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সময় তো পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদা এবং ধনসম্পদ থেকে মানুষ খালি হাত হয়ে যায়ই। মোটকথা صِدْقٌ শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য, সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়াল এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দেন যে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না [অর্থাৎ চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে।] কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এক্ষেত্রে صِدْقٌ শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণেই পেয়ে থাকবে, শুধু মুখের জমাখরচ এবং মুখে কালেমায়ে ঈমান পড়ে নিলেই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টি দিয়েই নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে, যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তাওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক-অংশীদার নেই, তখন ইবাদত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরিক হতে পারে? বরং এতে [ইবাদতে] অন্য কাউকে শরিক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে [আল্লাহ তা'আলা] মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান জমিন ও তারকা নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে? কাজেই [দিন বলতে] এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً الخ : এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হিকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন জারি করবেন। আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা।

এভাবে এ তিনটি আয়াত ঐ সংক্ষেপের বিশ্লেষণ, যা পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে আসমান-জমিনকে ছয় দিনে তৈরি করা অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর يُدَبِّرُ الْاَمْرَ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয় যে, তিনি শুধু এ বিশ্বকে তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক জিনিসের পরিচালনা এবং শাসনব্যবস্থাও তার হাতেই রয়েছে। এ ব্যবস্থা ও পরিচালনার একটি অংশ হলো هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا এখানে ضِيَاءٌ এবং نُوْر উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য। সেজন্যই অভিধানের অনেক ইমাম এ দুটি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যামাখশারী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نُوْرٌ শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল-সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ণ যে কোনো জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضَوْءٌ এবং ضِيَاءٌ যে আলোতে তীক্ষ্ণতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশি পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকত, তাহলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ণ আলো থাকত, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ তা'আলা দু-ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضَوْءٌ [যাও] এবং ضِيَاءٌ [যিয়া] -এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হালকা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কুরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূরা নূহে বলা হয়েছে- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا সূরা ফুরকানে বলেছেন- وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا 'সিরাজ' শব্দের অর্থ চেরাগ [অথাৎ প্রদীপ]। যেহেতু প্রদীপের আলো তার নিজস্ব আলো, অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা নয়, সেহেতু কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, কোনো বস্তুর নিজস্ব আলোকে ضِيَاءٌ বলা হয়। আর نُوْر বলা হয় সে সমস্ত আলোকে যা অন্য কারো থেকে অর্জন করে আলোকিত হয়। কিন্তু এ মতের পেছনে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান। অন্যথায় এর কোনো আভিধানিক ভিত্তি নেই। আর স্বয়ং কুরআন কারীমও এর কোনো শেষ সমাধান দেয়নি।

মুফাসসির যুজাজ ضِيَاءٌ শব্দকে ضَوْء শব্দের বহুবচন বলেছেন। এ প্রেক্ষিতে হয়তো এখানে একথা বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, আলোর সাতটি প্রসিদ্ধ রং এবং অন্যান্য রং পৃথিবীতে পাওয়া যায় সূর্যই হলো সেগুলোর উৎস, যা বৃষ্টির পর রংধনুর মধ্যে প্রকাশ পায়। -[মানার]

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে- وَقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ - قَدَّرَ শব্দটি تَقْدِيْر শব্দ থেকে গঠিত تَقْدِيْرٌ অর্থ হলো কোনো বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলি অনুযায়ী একথা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা। রাত এবং দিনের সময়কে একটা বিশেষ পরিমাণের উপর রাখার জন্য কুরআন কারীমে বলা হয়েছে- وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ আর সাধারণ পরিমাণ সম্পর্কে বলেছে-

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

مَنَازِلُ শব্দটি مَنْزِلٌ -এর বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ নাজিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটিকেই একেক مَنْزِل বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনজিল হলো ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে একদিন লুক্কায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণ চাঁদের মনজিল আটাশটি বলা হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার

মনজিল হলো তিনশ ষাট অথবা পঁয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মঞ্জিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে, যেগুলো সেসব মনজিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন কারীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুত কুরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দূরত্ব বুঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ একবচনের ضَمِيْر [সর্বনাম] ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মনজিল কিন্তু চন্দ্র সূর্য উভয়েরই। কাজেই কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, যদিও এখানে একবচনের সর্বনাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একক হিসেবে উভয়টি বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার দৃষ্টান্ত কুরআন এবং আরবি পরিভাষায় অনেক অনেক পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, যদিও আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্য উভয়ের জন্য মনজিলসমূহ কায়েম রেখেছেন, কিন্তু এখানে চাঁদের মনজিল বুঝানোই উদ্দেশ্য। অতএব قَدَّرَهٗ শব্দের সর্বনাম চাঁদের সাথেই সম্পৃক্ত। একটির সঙ্গে খাস করার কারণ হলো এই যে, সূর্যের মনজিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং হিসাব ছাড়া জানা যায় না। সূর্যের উদয়াস্ত বছরের প্রতিদিন একই অবস্থানে হয়ে থাকে। শুধু চোখে দেখে একথা বুঝা যাবে না যে, আজ সূর্য কোনো মনজিলে অবস্থিত। কিন্তু চাঁদের অবস্থা অন্য রকম। তার অবস্থা প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মাসের শেষের দিকে তো চাঁদ মোটেই দেখা যায় না। এ ধরনের পরিবর্তন দেখে একজন বিদ্যাহীন লোকও চাঁদের তারিখগুলো বলে দিতে থাকে। উদাহরণত যদি ধরা যায়, আজ মার্চ মাসের আট তারিখ, তবে কোনো মানুষই সূর্য দেখে একথা বুঝতে পারবে না যে, আজ আট তারিখ কি একুশ তারিখ। কিন্তু চাঁদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা- চাঁদকে দেখেও তার তারিখটা বলে দেওয়া যেতে পারে।

قَوْلُهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ক্ষেত্র আসমান-জমিন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তাওহীদ ও আখেরাতের আকিদা ও বিশ্বাসকে এক 'সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক. সে শ্রেণি যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশি চেতনাভূতি ও জ্ঞানবুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তো বা আমাদের প্রতিও কিছু দায়দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সেসবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন, কুরআনের পরিভাষায় যাকে কিয়ামত ও হাশর-নাশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণির লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোনো ধারণা কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত-অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না, চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেওয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কারো কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য ছিল।"

তৃতীয়ত "এসব লোক আমার নির্দেশাবলি ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান জমিন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হতো না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফলতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।"

এ সমস্ত লোক যাদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হলো এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি। পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনে কারীম কাফের ও মুনাফিকদের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের জীবন ও আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যকলাপ ও চিন্তা-কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের

মাঝেও এ দুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এতদসত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে সত্য ও পাকা মুসলমান প্রতিপন্ন করে চলেছি। পক্ষান্তরে সত্য ও পাকা মুসলমান ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ, তাদের চেহারা দেখার সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং মনে হতো, এর মনে অবশ্যই কোনো মহান সত্তার ভয় এবং কোনো হিসাব-কিতাবের চিন্তা বিদ্যমান। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা থেকে মাসুম হওয়া সত্ত্বেও এমনি অবস্থা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় বিষণ্ন ও চিন্তান্বিত থাকতেন।

দুই. এ আয়াতে সেসব ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত তথা মহাশক্তির নিদর্শনাবলি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত রয়েছে। কুরআনে কারীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে- أُولَٰئِكَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ অর্থাৎ তাঁদের পরওয়ারদিগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রশ্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। এতে 'হেদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হলো পথ প্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণির লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মু'মিন শ্রেণির প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

চতুর্থ আয়াতে জান্নাতে পৌঁছার পর জান্নাতবাসীদের কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা ও আচরণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ এখানে دَعْوَىٰ শব্দটি তার নির্ধারিত দাবি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোনো বাদী তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে دَعْوَىٰ অর্থ হলো দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হলো এই যে, জান্নাতে পৌঁছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলা জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো দোয়া বলা হয় কোনো বিষয়ের আবেদন এবং কোনো উদ্দেশ্য যাজ্ঞা করাকে, কিন্তু سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [সুবহানাকাল্লাহুম্মা]-তে কোনো আবেদন কিংবা কোনো কিছুর প্রার্থনা নেই। একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন। কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আরো হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মতো অবশ্যকরণীয় কোনো ইবাদত হিসেবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তাঁর থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব। এ হিসেবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিতে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে যখনই কোনো কষ্ট কিংবা পেরেশানি উপস্থিত হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

আর ইমাম তাবারী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোনো বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানির সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া প্রার্থনা করতেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযিরে প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোনো জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের কাম্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। বস্তুত সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী] সুতরাং এ হিসেবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে, যার মাধ্যমে কোনো আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন- সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা 'আহলান ওয়া সাহলান' প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سَلَامٌ -এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, তোমরা যে কোনো রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনের রয়েছে- سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দুটি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্য নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। 'সালাম' শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌঁছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে। -[রূহুল মা'আনী]

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলার মা'রিফত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে [বিপুল] উন্নতি লাভ করবে। যেমন হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র.) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌঁছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রিফতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবন ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ যে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী-রাসূলগণের হতো। আর নবী রাসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমূদ' যার জন্য আজানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

অনুবাদ :

١١. وَنَزَلَ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْمُشْرِكُوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ اَىْ كَاسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ـ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاَنْ يُهْلِكَهُمْ لٰكِنْ يُمْهِلُهُمْ فَنَذَرُ نَتْرُكُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ مُتَحَيِّرِيْنَ ـ

১১. মুশরিকদের শীঘ্র আজাবের দাবি জানাবার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতেন যেভাবে তারা কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায় তবে তিনি তাদের নির্ধারিত সময় শেষ করে দিতেন। অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। অনন্তর যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেই। اِسْتِعْجَالَهُمْ তার পূর্বে একটি كَاف উহ্য থেকে তাকে نَصَب [যবর,] দান করছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে তার উল্লেখ করা হয়েছে। قُضِىَ তা مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য ও مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اَجَلُهُمْ এটা مَرْفُوْع ও مَنْصُوْب [পেশ ও যবর] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। فَنَذَرُ অর্থ– অনন্তর আমরা ছেড়ে রাখি। يَعْمَهُوْنَ অর্থ– তারা উদভ্রান্ত ও অস্থির হয়ে ঘুরে.

١٢. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ الضُّرُّ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَىْ مُضْطَجِعًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۤئِمًا ـ اَىْ فِىْ كُلِّ حَالٍ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ عَلٰى كُفْرِهٖ كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ كَاَنَّهٗ لَمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لَهُ الدُّعَاۤءُ عِنْدَ الضُّرِّ وَالْاِعْرَاضُ عِنْدَ الرَّخَاءِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১২. যখন মানুষকে কাফেরদের দুঃখ রোগ, স্পর্শ করে তখন সে পার্শ্বস্থিত হয়ে, অর্থাৎ শুয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে অর্থাৎ সকল অবস্থায় আমাকে ডেকে থাকে। অনন্তর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তখন তার পূর্ব কুফরির পথই অবলম্বন করে যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেনি। যারা সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ যারা মুশরিক এভাবে অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলে দোয়া করা ও সুখের সময় তাঁর হতে বিমুখ হওয়ার এ কাজটি যেভাবে তাদের নিকট শোভন করে ধরা হয়েছে সেভাবে তাদের কর্ম তাদের নিকট শোভন করে ধরা হয়েছে। كَاَنْ তা مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত। তার اِسْم এস্থানে তা। উহ্য মূলত ছিল كَاَنَّهٗ।

١٣. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا ظَلَمُوْا بِالشِّرْكِ وَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى صِدْقِهِمْ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ـ عَطْفٌ عَلٰى ظَلَمُوْا كَذٰلِكَ كَمَا اَهْلَكْنَا اُولٰۤئِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

১৩. হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা শিরক অবলম্বন করত সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শন সহ অর্থাৎ তাদের সত্যতার প্রমাণসহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি সেভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ কাফেরদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। جَاۤءَتْهُمْ তার পূর্বে قَدْ শব্দটি উহ্য রয়েছে। وَمَا كَانُوْا পূর্বোল্লিখিত ظَلَمُوْا ক্রিয়ার সাথে তার عَطْف বা অন্বয় হয়েছে।

١٤. ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ خَلٰٓئِفَ جَمْعُ خَلِيْفَةٍ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فِيْهَا وَهَلْ تَعْتَبِرُوْنَ بِهِمْ فَتُصَدِّقُوْا رُسُلَنَا .

١٥. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَا يَخَافُوْنَ الْبَعْثَ ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا لَيْسَ فِيْهِ عَيْبُ اٰلِهَتِنَا اَوْ بَدِّلْهُ ط مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ قُلْ مَا يَكُوْنُ يَنْبَغِيْ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ قِبَلِ نَفْسِيْ ط اِنْ مَا اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ج اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ بِتَبْدِيْلِهٖ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ .

١٦. قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ اَعْلَمَكُمْ بِهٖ ز وَلَا نَافِيَةٌ عَطْفٌ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَامٍ جَوَابُ لَوْ اَيْ لَاَعْلَمَكُمْ بِهٖ عَلٰى لِسَانِ غَيْرِيْ فَقَدْ لَبِثْتُ مَكَثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا سِنِيْنًا اَرْبَعِيْنَ مِّنْ قَبْلِهٖ لَا اُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اَنَّهٗ لَيْسَ مِنْ قِبَلِيْ .

অনুবাদ :

১৪. অনন্তর আমি তাদের পর হে মক্কাবাসীগণ! দুনিয়ায় তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি। যেন আমি দেখতে পারি সেখানে তোমরা কি প্রকার আচরণ কর। তাদের অবস্থা হতে তোমরা কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ কর কিনা? ফলে আমাদের রাসূলগণকে স্বীকার কর কিনা। خَلَائِفَ তা خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- প্রতিনিধি।

১৫. যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না অর্থাৎ পুনরুত্থানের ভয় করে না; তারা বলে, এটা ব্যতীত অন্য এক কুরআন নিয়ে আস। যাতে আমাদের দেবদেবীদের কোনো দোষ উল্লেখ করা হয়নি। অথবা একে তোমার তরফ হতে বদলিয়ে নিয়ে আস। বল, নিজ পক্ষ হতে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার জন্য উচিতও নয়। আমার প্রতি যে ওহী হয় আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি। তাতে পরিবর্তন করে আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা যদি করি তবে আমার মহা দিবসের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির আশঙ্কা হয়। بَيِّنَاتٍ তা এ স্থানে حَالٌ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- সুস্পষ্ট। مِنْ تِلْقَاءِ অর্থ পক্ষ হতে, তরফ হতে। اِنْ اَتَّبِعُ এ স্থানে اِنْ শব্দটি না-বোধক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. বল, আল্লাহ তা'আলার সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমি তোমাদের নিকট তা পাঠ করতাম না এবং তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। তা তোমাদেরকে জানাতেন না। আমি তো তার পূর্বে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল চল্লিশ বৎসরকাল বসবাস করেছি। অবস্থান করেছি। অথচ এ বিষয়ে আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? যে, তা আমার পক্ষ হতে রচিত নয়। وَلَا اَدْرٰىكُمْ তার لَا টি না-বোধক। পূর্ববর্তী ক্রিয়া مَا تَلَوْتُهٗ -এর সাথে তার عَطْف হয়েছে। অপর এক কেরাতে তা ل সহ لَاَدْرٰىكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে এমতাবস্থায় তা لَوْ -এর جَوَابٌ বলে বিবেচ্য হবে অর্থ- দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হলে অন্য কারো বাচনিক আমি তা তোমাদেরকে অবহিত করতাম।

١٧. فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدٌ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ اِلَيْهِ اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهِ ط الْقُرْاٰنِ اِنَّهٗ اَىِ الشَّاْنُ لَا يُفْلِحُ يُسْعِدُ الْمُجْرِمُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ .

١٨. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مَا لَا يَضُرُّهُمْ اِنْ لَمْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اِنْ عَبَدُوْهُ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَيَقُوْلُوْنَ عَنْهَا هٰۤؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ لَهُمْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ تُخْبِرُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَىْ لَوْ كَانَ لَهٗ شَرِيْكٌ لَعَلِمَهٗ اِذْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ مَعَهٗ .

١٩. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً عَلٰى دِيْنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْاِسْلَامُ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ اِلٰى نُوْحٍ وَقِيْلَ مِنْ عَهْدِ اِبْرٰهِيْمَ اِلٰى عَمْرِو بْنِ لُحَىٍّ فَاخْتَلَفُوْا ط بِاَنْ ثَبَتَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاْخِيْرِ الْجَزَاۤءِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ اَىِ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ . مِنَ الدِّيْنِ بِتَعْذِيْبِ الْكَافِرِيْنَ .

অনুবাদ :

১৭. যে ব্যক্তি শিরক আরোপ করত আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নির্দশনকে আল কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? না, আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থা এই যে অপরাধীদের অর্থাৎ মুশরিকগণ সফলকাম সৌভাগ্যশালী হয় না। اِنَّهٗ তার শেষের ة টি شَانِيَه বা অবস্থা নির্দেশক।

১৮. তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যার ইবাদত করে তা অর্থাৎ এ প্রতিমাসমূহ এমন যে তাদের ইবাদত না করলেও তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর ইবাদত করলেও কোনো উপকার করে না। এগুলো সম্পর্কে তাঁরা বলে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের পক্ষে সুপারিশকারী। তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছো এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করেছ যা তিনি জানেন না? সত্যই তাঁর যদি কোনো শরিক থাকত তবে নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। কেননা কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নয়। তিনি মহান সকল দোষ হতে পবিত্রতা তাঁরই। তার সাথে যে সমস্ত বস্তু তারা শরিক করে সেসব কিছু হতে তিনি উর্ধ্বে। دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ– আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত। اَتُنَبِّئُوْنَ তার প্রশ্নবোধকটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থবাচক।

১৯. মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। হযরত আদম হতে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত একই ধর্ম ইসলামের অনুসারী। কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম হতে আমর ইবনে লুহাই পর্যন্ত একই ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। কিছু সংখ্যক তো মূল আদর্শে সুদৃঢ় রইল আর কিছু সংখ্যক কুফরি অবলম্বন করল। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কর্মফল দানের বিষয়টি বিলম্বিত করা সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কে যে মতভেদ ঘটায় কাফেরদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এই দুনিয়াতেই মানুষের মাঝে নিশ্চয়ই তার মীমাংসা হয়ে যেত।

২০. وَيَقُولُونَ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ج كَمَا كَانَ لِلْاَنْبِيَاءِ مِنَ النَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ فَقُلْ لَّهُمْ اِنَّمَا الْغَيْبُ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ اَىْ اَمْرُهٗ لِلّٰهِ وَمِنْهُ الْاٰيَاتُ فَلَا يَاْتِىْ بِهَا اِلَّا هُوَ وَاِنَّمَا عَلَىَّ التَّبْلِيْغُ فَانْتَظِرُوْا ج الْعَذَابَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.

২০. তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বলে, তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার নিকট মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? যেমন অন্যান্য নবীদের মধ্যে উষ্ট্র, লাঠি, হাত ইত্যাদি নিদর্শন ছিল। তাদেরকে বল, অদৃশ্য যা বান্দাদের অগোচরে তা অর্থাৎ এতদসম্পর্কিত বিষয়াদি তো আল্লাহরই ক্ষমতায়। নিদর্শনাদিও এরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা আনতে পারে না। আমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া। সুতরাং তোমরা যদি ঈমান আনয়ন না কর তবে আজাবের অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। هَلَّا তা لَوْلَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَاسْتِعْجَالِهِمْ : প্রশ্ন. اِسْتِعْجَالَهُمْ-এর তাফসীর كَاسْتِعْجَالِهِمْ তথা كَاف বৃদ্ধি করার দ্বারা কি ফায়দা? উত্তর. اِسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِ টা হুবহু اِسْتِعْجَالٌ بِالشَّرِّ নয়। যদি হরফে তাশবীহ كَاف বৃদ্ধি করা না হয়, তবে উভয়টি এক হওয়া আবশ্যক হয়। আর এ পার্থক্যটাকে সুস্পষ্ট করার জন্যই اِسْتِعْجَالَهُمْ-এর তাফসীর كَاسْتِعْجَالِهِمْ দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, اِسْتِعْجَالَهُمْ টা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ : قُضِىَ -এর নায়েবে ফায়েল হওয়ার কারণে رَفْع হয়েছে। আর قَضٰى মা'রূফ হওয়ার সুরতে মাফউল হওয়ার কারণে نَصْب হবে। এ সুরতে اَللّٰهُ ফায়েল হবে।

قَوْلُهٗ يُمْهِلُهُمْ : প্রশ্ন. يُمْهِلُهُمْ-কে উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. نَذَرُ -এর মধ্যে فَاء টি হলো আতেফা। তার জন্য مَعْطُوْف عَلَيْه-এর প্রয়োজন। অথচ পূর্বে তার مَعْطُوْف عَلَيْه-এর উল্লেখ নেই। আর قُضِىَ -এর উপর مَعْنًى ও لَفْظًا কোনোভাবেই তার আতফ সহীহ নয়। কেননা, لَقُضِىَ-এর জবাব হওয়ার কারণে তা جَزْم যুক্ত হয়েছে। যদি نَذَرُ -এর আতফ لَقُضِىَ -এর উপর হতো তবে তো نَذَرُ لَوْ জযমযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। অথচ তা مَجْزُوْم নয়। অর্থের হিসেবে অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে عَطْف বৈধ নয় যা সুস্পষ্ট। কাজেই نَذَرُ -এর আতফ সেই نَفِىْ -এর উপর হবে যা لَوْ شَرْطِيَّة থেকে বুঝা যায়। কেননা لَوْ يُعَجِّلُ টা نَفِىْ تَعْجِيْل-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর এই نَفِىْ تَعْجِيْل -এর مَفْهُوْم বর্ণনা করার জন্য মুফাসসির (র.) وَلٰكِنْ يُمْهِلُهُمْ বৃদ্ধি করেছেন। মোটকথা হলো نَذَرُ -এর আতফ উহ্য يُمْهِلُهُمْ -এর উপর হয়েছে نَقْضِىَ -এর উপর নয়।

قَوْلُهٗ وَقَدْ جَائَتْهُمْ : প্রশ্ন. وَجَائَتْهُمْ টা ظَلَمُوْا থেকে حَال হয়েছে অথচ مَاضِىْ টা قَدْ বিহীন حَال হয় না। উত্তর. এ প্রশ্নের নিরসনের জন্যই মুফাসসির (র.) قَدْ উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهٗ حَال : অর্থাৎ بَيِّنٰتٍ টা اٰيٰتُنَا থেকে حَال হয়েছে; صِفَتْ হয়নি। কেননা, اٰيٰتُنَا টা ইজাফতের কারণে مَعْرِفَة হয়েছে। আর بَيِّنٰتٍ হলো نَكِرَة অথচ مَوْصُوْف এবং صِفَتْ-এর মধ্যে مُطَابَقَتْ থাকা জরুরি হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَامٍ : অর্থাৎ لَا اَدْرٰكُمْ-এর স্থলে لَاَدْرٰكُمْ রয়েছে। অর্থাৎ لَام تَاكِيْد -এর সাথে।

قَوْلُهٗ جَوَابُ لَوْ : অর্থাৎ مَا تَلَوْتُهٗ-এর উপর আতফ হয়েছে, যা جَوَاب لَوْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে, যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সেজন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আজাব ডেকে আন। অথবা বলে এ আজাব শীঘ্র কেন আসে না; যেমন, নজর ইবনে হারেস বলেছিল, "হে আল্লাহ একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোনো কঠিন আজাব পাঠিয়ে দেন।" প্রথম আয়াতে এরই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আজাব এক্ষণেই নাজিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হিকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদদোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাজিল করেন না। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের বদদোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভালো দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে দেন। অবশ্য কখনো কোনো হিকমত ও কল্যাণের কারণে কবুল না হওয়া এর পরিপন্থি নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখকষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আজাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ দেন যাতে অস্বীকৃতরাও বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোনো সাময়িক দুঃখকষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয় করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ লক্ষ্য করে, তাঁর পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জারীর তাবারী (র.) কাতাদাহ (র.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে এবং বুখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোনো কোনো সময় কেউ কেউ রাগত নিজের সন্তানসন্ততি কিংবা অর্থসম্পদের ধ্বংস প্রাপ্তির জন্য বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু সামগ্রীর প্রতি অতিসম্পাত করতে আরম্ভ করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশত সহসাই এসব দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোনো বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবুল না করেন।" আর শাহর ইবনে হাওশাব (র.) বলেছেন, আমি কোনো কোনো কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বান্দা দুঃখকষ্টের দরুন কিংবা রাগবশত কোনো কথা বলে ফেললে তা লিখবে না। -[কুরতুবী]

তারপরেও কোনো কোনো সময় এমন কবুলিয়াত বা প্রার্থনা মঞ্জুরির সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোনো কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেজন্য রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, নিজের সন্তানসন্ততি ও অর্থসম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরির সময় এবং এ দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে গজওয়ায়ে 'বাওয়াত' -এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ সমুদয় রেওয়ায়েতের সারমর্ম হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য যদিও আখেরাতে অস্বীকৃতি ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের দাবি তাৎক্ষণিক আজাবের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু সাধারণভাবে এত সেসব মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত, যারা কোনো দুঃখকষ্ট ও রাগের দরুন নিজেদের সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদের জন্য বদদোয়া করে বসে। আল্লাহ তা'আলার রীতি স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণাবশত উভয়ের সাথে একই রকম যে, তিনি এ ধরনের বদদোয়া সাথে সাথে কার্যকর করেন না, যাতে করে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখেরাত অস্বীকৃত লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়, অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক সাব্যস্ত করে এবং তাঁদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোনো

বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হলো এই যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোনো বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা অপর কাউকে শরিক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা উপলব্ধি করে, কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আজাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আজাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোনো সাধারণ ব্যাপক আজাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবি করতে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোনো অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আজাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আজাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

চতুর্থ আয়াতে বলেছেন- ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়ের ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খিলাফত [শুধু] তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে; বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন করো, বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের আশায় উন্মুক্ত হয়ে পড়। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়। বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়দায়িত্ব।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এ চার আয়াতে আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃত লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে। এসব লোক না জানত আল্লাহ তা'আলার মারিফত, না ওহী ও রিসালাত সম্পর্কিত কোনো পরিচয়। নবী-রাসূলগণকে সাধারণ মানুষের মতো মনে করত। যে কুরআন কারীম রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কালাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী ﷺ -এর কাছে দাবি জানায়, এই যে কুরআন, এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী। যে মূর্তিবিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সতত সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসেবে মান্য করে এসেছে, কুরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কুরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাজি নই। সুতরাং হয় আপনি এ কুরআনের পরিবর্তনে অন্য কুরআন তৈরি করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্তত এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কুরআন কারীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী ﷺ -কে হিদায়াত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন, এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামতো আমি এতে কোনো পরিবর্তনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওহীর তাঁবেদার। আমি আমার ইচ্ছামতো এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গুনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আজাব নির্ধারিত রয়েছে আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

তারপর বললেন, আমি যাই কিছু করি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করি। তোমাদেরকে এ কালাম শুনানো না হোক এটাই যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তাহলে না আমি শুনাতাম, না আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করতেন। সুতরাং তোমাদেরকে এ কালাম শুনানো হোক এটাই যখন আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়, তখন কার এমন সাধ্য আছে যে, এতে কোনো রকম কমবেশি করতে পারে?

অতঃপর কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত ঐশী কালাম তা এক প্রকৃষ্ট দলিলের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে; ইরশাদ হয়েছে- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়টিও তো একটু চিন্তা কর যে, কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কখনো আমার কাছ থেকে কাব্য কবিতা বলতে কিংবা কোনো কথিকা প্রবন্ধ রচনা করতে শোননি। যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে এমন কালাম বলতে পারতাম, তবে এ চল্লিশ বছরের মধ্যে কিছু না কিছু তো বলতাম। তাছাড়া চল্লিশ বছরের এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমরা আমার চাল-চলনের বিশ্বস্ততাও প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ। সারা জীবনেই যখন কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তখন আজ চল্লিশ বছর পর মিথ্যা বলার কি এমন হেতু থাকতে পারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ সত্য ও বিশ্বস্ত। কুরআনে যা কিছু রয়েছে সেসব আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত তাঁরই কালাম।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কুরআন কারীমের এ দলিল-যুক্তি শুধু কুরআনের ঐশি বাণী হওয়ারই পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ নয়, বরং সাধারণ আচার অনুষ্ঠানে ভালোমন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়েরও একটি নীতি বাতলে দিয়েছে। কাউকে কোনো পদ বা নিয়োগ দান করতে হলে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাই করার উত্তম পদ্ধতি হলো তার বিগত জীবনের পর্যালোচনা। যদি তাতে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকে, তবে ভবিষ্যতেও তা আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিগত জীবনে যদি সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আগামীতে শুধু তার বলা-কওয়ায় তার উপর ভরসা করা কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। ইদানীং নিয়োগ ও পদ বণ্টনে এবং দায়িত্ব সমর্পণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে এবং সে কারণে যেসব হাঙ্গামা-উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে, সেসবের কারণেও এই প্রকৃতিগত পদ্ধতি পরিহার করে প্রথাগত বিষয়াদির পেছনে পড়া।

অষ্টম আয়াতে এই একই বিষয়ের অতিরিক্ত তাকিদ এসেছে যাতে কোনো বাণী বা কালামকে ভ্রান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য কঠিন আজাবের কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً الخ : কাফের ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি-বর্ণ ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার কতদিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আ.)-কে এর মোকাবিলা করতে হয়। -[তাফসীরে মাজহারী]

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ কাল। এ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুরআন কারীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং উম্মতে ওয়াহেদাহ তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অতঃপর যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে। فَاخْتَلَفُوا কুরআন কারীমের هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্রবর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া নিদর্শন যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখাপড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে রয়েছে। أَعَاذَ اللّٰهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ

অনুবাদ :

٢١. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ أَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ رَحْمَةً مَطَرًا وَخَصْبًا مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ بُؤْسٍ وَجَدْبٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْ آيَاتِنَا ط بِالْاِسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيْبِ قُلِ لَهُمُ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ط مُجَازَاةً إِنَّ رُسُلَنَا الْحَفَظَةَ يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ.

২১. এবং আমি মানুষকে মক্কার কাফেরদেরকে তাদের দুঃখ অভাব ও দুর্ভিক্ষ স্পর্শ করবার পর বৃষ্টি ও প্রচুর ফলনের মাধ্যমে অনুগ্রহের আশ্বাস দিলে তারা তক্ষুণি আমার নিদর্শন সম্পর্কে বিদ্রূপ ও অস্বীকার করে চক্রান্তে লিপ্ত হয় তাদেরকে বল, আল্লাহ কৌশলে প্রতিফল দানে আরো তৎপর। তোমরা যে চক্রান্ত কর আমার রাসূলগণ অর্থাৎ সংরক্ষক ফেরেশতাগণ নিশ্চয়ই তা লিখে রাখেন। تَمْكُرُوْنَ এটা ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

٢٢. هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَنْشُرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ج السُّفُنِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ لَيِّنَةٍ وَفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ شَدِيْدَةُ الْهُبُوْبِ تُكَسِّرُ كُلَّ شَيْءٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ أَيْ أُهْلِكُوْا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج الدُّعَاءَ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَهْوَالِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ.

২২. তিনিই তাদেরকে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করান يُسَيِّرُكُمْ অপর এক পাঠে রয়েছে يَنْشُرُكُمْ অর্থ তোমাদেরকে ছড়িয়ে দেন। এবং তোমরা যখন নৌকায় اَلْفُلْكُ অর্থ নৌকাসমূহ। আরোহণ কর আর এগুলো তাদের [আরোহীদের] নিয়ে সুখকর নরম বাতাসে বয়ে যায় جَرَيْنَ তাতে দ্বিতীয় পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর হয়েছে। এবং তাতে তারা আনন্দিত হয় আর হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস এসে পড়ে عَاصِفٌ প্রচণ্ড বেগে ধাবিত বায়ু ঝাঞ্ঝা বায়ু। যা সবকিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলে আর সকল দিক হতে তরঙ্গ আছড়ে পড়ে তাতে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে তাদের ধারণা হয় তারা ধ্বংসের আশঙ্কা করতে থাকে তখন দীন অর্থাৎ দোয়াকে কেবল আল্লাহ তা'আলারই জন্য বিশুদ্ধ করত তাকে ডাকে যে এই বিভীষিকা হতে আমাদেরকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের একত্ববাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। لَئِنْ এর ل টি قَسَمِيَّةٌ অর্থাৎ শপথব্যঞ্জক।

٢٣. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط بِالشِّرْكِ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ ظُلْمُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ إِثْمَهُ عَلَيْهَا هُوَ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تَتَمَتَّعُوْنَ فِيْهَا قَلِيْلًا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَنُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ مَتَاعِ أَيْ تَتَمَتَّعُوْنَ.

২৩. অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা শিরক অবলম্বন করত পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে। হে লোক সকল! তোমাদের সীমালঙ্ঘন এ জুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের উপরই বর্তায় কেননা এর পাপ তার নিজের উপরই বর্তায়। এটা পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ। সামন্য কয়েকদিনই কেবল তাকে তোমরা তা ভোগ করবে। অতঃপর মৃত্যুর পর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। অর্থাৎ তাদেরকে তার প্রতিফল দেব। مَتَاعَ এটা অপর এক কেরাতে نَصَب সহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা পূর্বে تَتَمَتَّعُوْنَ [অর্থাৎ তারা ভোগ করবে] ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে।

٢٤. إِنَّمَا مَثَلُ صِفَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ مَطَرٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ بِسَبَبِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَاشْتَبَكَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ وَغَيْرِهِمَا وَالْاَنْعَامُ ط مِنَ الْكَلَأِ حَتّٰى إِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا بُهْجَتَهَا مِنَ النَّبَاتِ وَازَّيَّنَتْ بِالزَّهْرِ وَاَصْلُهُ تَزَيَّنَتْ اُبْدِلَتِ التَّاءُ زَايًا وَاُدْغِمَتْ فِي الزَّايِ ثُمَّ اُجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا مُتَمَكِّنُوْنَ مِنْ تَحْصِيْلِ ثِمَارِهَا اَتٰهَا اَمْرُنَا قَضَاؤُنَا وَعَذَابُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا اَيْ زَرْعَهَا حَصِيْدًا كَالْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ كَاَنَّهَا لَمْ تَغْنَ تَكُنْ بِالْاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উদাহরণ হলো: পানি বৃষ্টি। আমি তা আকাশ হতে বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা بِهِ এ بِ টি سَبَبِيَّة বা হেতু বোধক। তার কারণে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন হয়। একটি অপরটির সন্নিবিষ্ট হয় মানুষ তার গম, যব ইত্যাদি এবং জন্তুগুলি ঘাস ইত্যাদি আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে উদ্ভিদ উদগমের মাধ্যমে চকচক করতে থাকে এবং ফুলে ফুলে নয়নাভিরাম হয় اِزَّيَّنَتْ তা মূলত ছিল تَزَيَّنَتْ; এর ت টিকে ز -এ পরিবর্তিত করত তাকে ز -এ اِدْغَامٌ বা সন্ধি করে দেওয়া হয়। অতঃপর শুরুতে একটি هَمْزَة وَصْل বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। আর তার মালিকগণ মনে করে এটা তাদের আয়ত্তাধীন অর্থাৎ তারা তার ফসল নিজেরাই নিতে পারবে তখন রাত্রে বা দিনে আমার নির্দেশ আমার ফয়সালা বা আমার আজাব এসে পড়ে। অনন্তর আমি তা তার ফসল এমনভাবে নির্মূল করে দেই, حَصِيْد অর্থ কাস্তে দ্বারা কর্তিত শস্য। যেন ইঃতপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশাবলি বিশদভাবে বিবৃত করি বর্ণনা করে দেই। كَاَنْ এটা مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত। মূলত ছিল كَاَنَّهُ । لَمْ تَغْنَ এ স্থানে অর্থ অস্তিত্ব ছিল না।

٢٥. وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ ع اَيِ السَّلَامَةِ وَهِيَ الْجَنَّةُ بِالدُّعَاءِ اِلَى الْاِيْمَانِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ هِدَايَتَهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ .

২৫. ঈমানের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শান্তির আবাসের প্রতি ধর্মের প্রতি পরিচালিত করেন। سَلَام অর্থ এ স্থানে سَلَامَةٌ বা শান্তি। অর্থাৎ জান্নাতের প্রতি আহ্বান করেন এবং যাকে তিনি হেদায়েতের ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথে ইসলাম ধর্মের প্রতি পরিচালিত করেন।

٢٦. لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْاِيْمَانِ الْحُسْنٰى الْجَنَّةَ وَزِيَادَةٌ ط هِيَ النَّظْرُ اِلَيْهِ تَعَالٰى كَمَا فِيْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ وَلَا يَرْهَقُ يَغْشٰى وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ سَوَادٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط كَاٰبَةٌ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২৬. যারা ঈমান আনয়ন করত মঙ্গলকর কার্য করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল অর্থাৎ জান্নাত এবং আরো কিছু। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ। কালিমা قَتَرٌ অর্থ কালিমা। ও হীনতা কষ্ট ও দুঃখ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে না, ঢেকে ফেলবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٢٧. وَالَّذِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا اَيْ وَلِلَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ عَمِلُوا الشِّرْكَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ عَاصِمٍ ج مَانِعٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ اُلْبِسَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قِطْعَةٍ وَاِسْكَانِهَا اَيْ جُزْءًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ط اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২৭. যারা পূর্বোল্লিখিত وَالَّذِيْنَ -لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا -এর সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। মন্দ কাজ করে শিরক অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মন্দের অনুরূপ প্রতিফল এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা আচ্ছন্ন করে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা হতে তাদেরকে রক্ষা করবার কেউ নেই। কেউ তাঁর আর প্রতিহতকারী নেই। তাদের মুখমণ্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা এমন হবে যে, রাত্রিরূপে আচ্ছাদনের একটা টুকরা এনে যেন তাদের মুখে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা অগ্নিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে। مِنْ عَاصِمٍ এ স্থানে مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। قِطَعًا এটা ط -এ ফাতাহসহ পঠিত রয়েছে। তা قِطْعَةٌ -এর বহুবচন। অপর এক কেরাতে ط -এ সাকিনসহও পঠিত রয়েছে।

٢٨. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اَيِ الْخَلْقَ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ نُصِبَ بِالْزَمُوْا مُقَدَّرًا اَنْتُمْ تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ وَشُرَكَاؤُكُمْ ج اَيِ الْاَصْنَامُ فَزَيَّلْنَا مَيَّزْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا فِيْ اٰيَةٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ وَقَالَ لَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ. مَا نَافِيَةٌ وَقُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلْفَاصِلَةِ.

২৮. স্মরণ কর যেদিন আমি তাদের সকলকে অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করব অতঃপর যারা অংশীবাদী তাদেরকে বলব 'তোমরা اَنْتُمْ এটা এ স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়াস্থিত সর্বননামের تَاكِيْد রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী শব্দ شُرَكَاؤُكُمْ -কে তার সাথে عَطْف বা অন্বয় সাধন। এবং তোমরা যাদেরকে শরিক করেছিলে তারা অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ স্বস্থানে অবস্থান কর। مَكَانَكُمْ -এর পূর্বে اِلْزَمُوْا উহ্য থাকায় তা مَنْصُوْب ব্যবহৃত হয়েছে। অনন্তর আমি তাদের মধ্যে ও মু'মিনদের মধ্যে পার্থক্য করে দেব। পরস্পরকে আলাদা করে দেব। যেমন অপর একটি আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন— وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ 'হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।, এবং তাদেরকে ঐ শরিকগণ বলবে 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। مَا كُنْتُمْ এ مَا টি এ স্থানে না বোধক। اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ এ স্থানে فَاصِلَة বা আয়াতের অন্ত্যমিল রক্ষার উদ্দেশ্যে مَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মপদ (اِيَّانَا) -কে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯. فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ .

২৯. আল্লাহ তা'আলাই আমরা ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে এ বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম। اِنْ এটা مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত। মূলত ছিল اِنَّا।

৩০. هُنَالِكَ اَىْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ تَبْلُوْا مِنَ الْبَلْوٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَائَيْنِ مِنَ التِّلَاوَةِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ قَدَّمَتْ مِنَ الْعَمَلِ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الشُّرَكَاءِ .

৩০. সেস্থানে অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেক পূর্বকৃত কর্মের বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের প্রকৃত অভিভাবক যিনি সবসময় হতে আছেন ও সর্বদা থাকবেন সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে নিশ্চিতভাবে ফিরিয়ে আনা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার শরিক আছে বলে যে মিথ্যা রচনা তারা করিত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। গায়েব হয়ে যাবে। تَبْلُوْا এটা بَلْوٰى হতে উদ্গত ক্রিয়া। অপর এক কেরাতে تِلَاوَةٌ হতে গঠিত ক্রিয়ারূপে প্রথমে দুটি ت সহ تَتْلُوْا রূপে পঠিত রয়েছে। مَا اَسْلَفَتْ অর্থ পূর্বে যা করেছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ .... اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِىْ اٰيٰتِنَا : এখানে وَاوْ টি اِسْتِيْنَافِيَّة আর اِذَا হলো ظَرْفِيَّة যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর اِذَاهُمْ হলো شَرْط-এর جَزَاء আর اِذَا হলো مُفَاجَاتِيَّة।

قَوْلُهُ مُجَازَاةً : প্রশ্ন. مَكْرٌ-এর তাফসীর مُجَازَاةً দ্বারা করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. যেহেতু مَكْرٌ-এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা অনুচিত তাই مَكْرٌ-এর তাফসীর جَزَاءُ مَكْرٍ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ السُّفُنِ : فُلْكِ শব্দটি যেহেতু একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে মুশতারিক। তাই فُلْكِ-এর তাফসীর سُفُنِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে বহুবচন উদ্দেশ্য– একবচন নয়।

قَوْلُهُ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ : পূর্বে خِطَابٌ-এর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর جَرَيْنَ بِهِمْ-এর মধ্যে غَائِبٌ-এর যমীর নেওয়া হয়েছে এরকম বৃদ্ধিকরণ تَقْبِيْح তথা মন্দত্বকে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। আর جَرَيْنَ হলো فِعْل مَاضِىْ-এর جَمْع مُؤَنَّث غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থ– তারা চলেছে। তারা প্রবাহিত হয়েছে। এটা بَاء দ্বারা مُتَعَدِّىْ হওয়ার কারণে তার অর্থ হয়েছে যে, সেই নৌযানগুলো তাদেরকে নিয়ে চলাচল করেছে।

قَوْلُهُ الرِّيْحُ : اَلْهَوَاءُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ তথা শূন্যে ঝুলন্ত বায়ুকে رِيْح বলা হয়। (اَلْمِصْبَاحُ) رِيْح শব্দটি মূলত رُوْحٌ ছিল। وَاو-এর পূর্ব বর্ণে যের হওয়ার কারণে وَاوْ-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করায় رِيْح হয়েছে। বহুবচনে اَرْوَاحٌ এবং رِيَاحٌ আসে। رِيْح শব্দটি مُؤَنَّث سَمَاعِىْ।

قَوْلُهُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ : এর আতফ হয়েছে جَائَتْهُمْ-এর উপর। এবং اَنَّ ও তার অধীনে যা রয়েছে তা ظَنُّوْا-এর দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। আর اُحِيْطَ بِهِمْ হলো اَنَّ-এর খবর। আর دَعَوُا اللّٰهَ الخ টা ظَنُّوْا থেকে بَدَلْ হয়েছে এজন্য যে, তাদের দোয়া তাদের ধ্বংসের ধারণার لَوَازِمْ-এর অন্তর্গত। আর উহ্য প্রশ্নের জবাব হওয়ার সুরতে جُمْلَة مُسْتَانِفَة ও হতে পারে অর্থাৎ مَاذَا صَنَعُوْا؟ - قِيْلَ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ الْاِشْتِمَالِ

قَوْلُهُ اَصْلُهُ تَزَيَّنَتْ : এটা বাবে تَفَعُّلْ হতে।

قَوْلُهُ زَرْعَهَا : প্রশ্ন. এখানে مُضَافْ উহ্য রাখার মধ্যে কি ফায়দা রয়েছে।

উত্তর. যদি زَرْع মুযাফকে উহ্য মানা না হয় তবে نَفْس اَرْض কর্তন করা আবশ্যক হবে। অথচ জমিন কর্তন করার কোনো অর্থই হতে পারে না। এ কারণেই زَرْع মুযাফকে উহ্য মেনেছেন এবং مُبَالَغَة-কে প্রকাশ করার জন্য মুযাফকে উহ্য করে দিয়েছে। অর্থাৎ ফসল কেটে এমন পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মনে হয় যেন জমিনকে কেটেই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا : এটা সে সকল লোকদের উক্তি অনুযায়ী যারা فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو-এর তারকীবকে জায়েজ মনে করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً الخ : **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার মক্কাবাসী দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হয়। অবশেষে প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে তারা আরজি পেশ করল আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের জন্য দোয়া করুন। যদি দুর্ভিক্ষের বিপদ কেটে যায় তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরগুজার থাকব। প্রিয়নবী ﷺ তাদের জন্য দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করে দিলেন। বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পরই তারা পুনরায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হলো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا : আরবি অভিধান অনুসারে مَكْر বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালো হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু [কিংবা বাংলা] পরিভাষার দরুন ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু [কিংবা বাংলায়] مَكْر বলা হয় ধোঁকা, প্রতারণা, ফেরেববাজি প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

قَوْلُهُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয় বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। [আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে] অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। [দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।] অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার ওবাল [অশুভ পরিণতি] তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হলো জুলুম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা। -[আবুশ শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ কর্তৃক তাঁর তাফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ الخ : বিগত আয়াতে পার্থিব জীবন এবং তার ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ এমন আবাদির দ্বারা দেওয়া হয়েছিল যা আকাশ থেকে বর্ষিত পানিতে সঞ্চিত হয়ে লক লক করতে থাকে, আর ফুলে-ফলে ভরে উঠে এবং তা থেকে কৃষাণ আনন্দিত হতে থাকে যে, এবার আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনাদি এর দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কৃতঘ্নতার দরুন রাতে কিংবা দিনে আমার আজাবের কোনো দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয় যা সেগুলোকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়, যেন এখানে কোনো বস্তুর অস্তিত্বই ছিল না। এ তো হলো পার্থিব জীবনের অবস্থা। এর পরবর্তী আয়াতে তার বিপরীতে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে- وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন অর্থাৎ এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোনো রকম দুঃখকষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছ রোগ তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস। 'দারুসসালাম' -এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়ত

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছতে থাকবে; বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে নসিহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দারুসসালামের দিকে আহ্বান করেছেন, তোমরা এ আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভালো করে জেনে রাখ, এ আহ্বান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌঁছে এই আহ্বানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ তা কর্মস্থল নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হলো জান্নাতের সাতটি নামের একটি। -[তাফসীরে কুরতুবী]

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোনো ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েজ নয়।

অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌঁছে দেন। এর মর্মার্থ হলো যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়েতের বিশেষ প্রকার সরল সোজা পথে তুলে দেওয়া এবং তাতে চলার তাওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

উল্লিখিত দুটি আয়াতে পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনের তুলনা এবং পৃথিবীবাসী এবং পরলোকবাসীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্তী চার আয়াতে এতদুভয় শ্রেণির লোকদের প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে জান্নাতবাসীদের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বৃহত্তর সৎকর্ম ঈমানে এবং পরে সৎকর্মে সুদৃঢ় রয়েছে তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে শুভ ও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর শুধু বিনিময় দানই নয় তার চেয়েও কিছু বেশি দেওয়া হবে।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তা হলো এই যে, এক্ষেত্রে ভালো বদলা বা বিনিময় বলতে অর্থ হলো জান্নাত। আর زِيَادَةٌ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ যা জান্নাতবাসীরা প্রাপ্ত হবে। [হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে কুরতুবী।]

সহীহ মুসলিমে হযরত সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে সারবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমাদের কি আরো কোনো কিছুর প্রয়োজন রয়েছে? যদি [কারো] থাকে, তবে বল, আমি তা পূরণ করে দেব। এতে জান্নাতবাসীগণ জবাব দেবে যে, আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত বা অব্যাহতি দান করেছেন, এর চেয়ে বেশি আর এমনকি প্রার্থনা করব? তখন আল্লাহ তা'আলার ও বান্দার মধ্যবর্তী পর্দা তুলে দেওয়া হবে এবং সমস্ত জান্নাতবাসী আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। এতে বুঝা গেল যে, বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামত অপেক্ষা বড় ও উত্তম নিয়ামত ছিল এটাই, যা আল্লাহ তা'আলা কোনো আবেদন নিবেদন ব্যতীত দান করেছেন। মাওলানা রুমীর ভাষায়-

ما نبوديم وتقاضه ما نبود

لطف تونا گفته ما مى شنود

আমরাও থাকব না এবং আমাদের কোনো চাহিদাও থাকবে না, [বরং] তোমার অনুগ্রহই আমাদের অব্যক্ত নিবেদন শুনবে। অতঃপর জান্নাতবাসীদের এ অবস্থা বিবৃত করা হয়েছে যে, তাদের মুখমণ্ডলে কখনো মলিনতা কিংবা দুঃখ-বেদনার প্রতিক্রিয়া অথবা অপমানের ছাপ পড়বে না, যেমনটি দুনিয়ার বুকে কোনো না কোনো সময় সবারই হয়ে থাকে এবং আখেরাতে জান্নাতবাসীদের হবে।

এর বিপরীতে জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেসব লোক অসৎকর্ম করেছে তাদেরকে সে অসৎকর্মের বদলা সমানভাবে দেওয়া হবে তাতে কোনো রকম বৃদ্ধি হবে না। তাদের চেহারায় কলহ লাঞ্ছনা ছেয়ে থাকবে। কেউই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের চেহারার মলিনতা এমন হবে যেন রাতের আঁধার ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পরবর্তী দুই আয়াতে একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা জান্নাতবাসী এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী মূর্তি-বিগ্রহ কিংবা শয়তানের মাঝে হাশরের ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। ইরশাদ হয়েছে, "সেদিন আমি সবাইকে একত্রে সমবেত করে দেব এবং অংশীবাদীদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের নির্বাচিত উপাস্যরা একটু নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াও, যাতে তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের তাৎপর্য জেনে নিতে পার। অতঃপর তাদের এবং তাদের উপাস্যদের মাঝে পৃথিবীতে যে ঐক্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা ছিন্ন করে দেওয়া হবে, যার ফলে তাদের [উপাস্য] মূর্তি-বিগ্রহগুলো নিজেই বলে উঠবে, তোমরা আমাদের উপাসনা করতেই না। এরা আল্লাহকে সাক্ষী করে বলবে, তোমাদের শিরকী উপাসনার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না! কারণ আমাদের মধ্যে না ছিল কোনো চেতনা-স্পন্দন, না ছিল আমাদের কোনো বিষয় বুঝবার বুদ্ধি-বিবেচনা। ষষ্ঠ আয়াতে জান্নাতি ও জাহান্নামি উভয় শ্রেণির একটা যৌথ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রতিটি লোক নিজ নিজ কৃতকর্ম যাচাই করে নেবে যে, তা লাভজনক ছিল, কি ক্ষতিকর। সবাইতে সত্য সঠিক মা'বুদের দরবারে হাজির করে দেওয়া হবে এবং যেসব ভরসা ও আশ্রয় পৃথিবীতে মানুষ খুঁজে বেড়াত, তা সবই শেষ করে দেওয়া হবে। মুশরিক তথা অংশীবাদীরা যেসব মূর্তি-বিগ্রহকে নিজেদের সহায় ও সুপারিশকারী বলে মনে করত সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে।

অনুবাদ :

৩১. قُلْ لَهُمْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ بِالنَّبَاتِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ اَىْ خَلْقَهَا وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط بَيْنَ الْخَلَائِقِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اللّٰهُ ط فَقُلْ لَهُمْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ فَتُؤْمِنُوْنَ .

৩১. তাদেরকে বল, কে তোমাদেরকে আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে ও পৃথিবী হতে উদ্ভিদ জন্মিয়ে রিজিক দান করে? শ্রবণ اَلسَّمْعَ এটা এ স্থানে তার বহুবচন اَسْمَاعٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে اَلْاَسْمَاعُ -এর উল্লেখ করা হয়েছে. ও দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ তাদের সৃজন কার আয়ত্তাধীন? কে মৃত হতে জীবিতকে বের করে আনে? কে জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করে? এবং কে সৃষ্টি জগতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন নিশ্চয়ই তারা বলবে, তিনি হলেন আল্লাহ, তাদের বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? ও ঈমান আনয়ন করবে না? اَلسَّمْعَ এটা এ স্থানে তার বহুবচন اَسْمَاعٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে اَلْاَسْمَاعُ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২. فَذٰلِكُمُ الْفَعَّالُ لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج الثَّابِتُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ ج اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَىْ لَيْسَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ فَمَنْ اَخْطَاَ الْحَقَّ وَهُوَ عِبَادَةُ اللّٰهِ وَقَعَ فِى الضَّلَالِ فَاَنّٰى كَيْفَ تُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ .

৩২. তিনিই অর্থাৎ এ সমস্ত কাজের যিনি কর্তা তিনিই আল্লাহ! তোমাদের সত্য অর্থাৎ সদা অস্তিত্বশীল প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে?। فَمَاذَا এ স্থানে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْر অর্থাৎ বক্তব্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এর পর আর অন্য কিছুই থাকে না। সত্য অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত যেজন পরিত্যাগ করবে সে বিভ্রান্তিতেই নিপতিত হবে। সুতরাং প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠার পরও ঈমান হতে তোমরা কোথায় কেমন করে অন্যদিকে চালিত হচ্ছো?

৩৩. كَذٰلِكَ كَمَا صَرَفَ هٰؤُلَاءِ عَنِ الْاِيْمَانِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا كَفَرُوْا وَهِىَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ اَوْ هِىَ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

৩৩. এভাবে অর্থাৎ যেমন তারা ঈমান হতে ফিরে গেল সেভাবে অসৎকর্মশীলদের সম্পর্কে সত্য-ত্যাগীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এ বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনয়ন করবে না। কিংবা উক্ত বাণীটি হলো– لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।,

৩৪. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ تُصْرَفُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيْلِ .

৩৪. বল, তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটায়? বল, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছো? প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেমন করে তোমরা ঈমান হতে অন্যদিকে চালিত হচ্ছো?

٣٥. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ ط بِنَصْبِ الْحُجَجِ وَخَلْقِ الْاِهْتِدَاءِ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط أَفَمَنْ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ اللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّيْ يَهْتَدِيْ إِلَّا أَنْ يُهْدٰى ج أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ وَتَوْبِيْخٍ أَيِ الْأَوَّلُ أَحَقُّ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ هٰذَا الْحُكْمَ الْفَاسِدَ مِنْ اِتِّبَاعِ مَا لَا يَحِقُّ اِتِّبَاعُهُ.

৩৫. বল, তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা ও হেদায়েত সৃজনের মাধ্যমে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল, আল্লাহই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের অধিক হকদার না সে আনুগত্যের হক রাখে যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না? নিশ্চয়ই প্রথমজনই তার অধিক হকদার। তোমাদের কি হলো? তোমরা কেমন করে যেজন আনুগত্য পাবার হক রাখে না তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মতো অলীক সিদ্ধান্ত কর? أَفَمَنْ এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ অর্থাৎ বক্তব্যটি সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বা تَوْبِيْخ তিরস্কারমূলক অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। مَنْ لَا يَهِدِّيْ অর্থাৎ যে পথ পায় না।

٣٦. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ فِيْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ إِلَّا ظَنًّا ط حَيْثُ قَلَّدُوْا فِيْهِ اٰبَاءَهُمْ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط فِيْمَا الْمَطْلُوْبُ مِنْهُ الْعِلْمُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

৩৬. তাদের অধিকাংশ জনই প্রতিমা উপাসনার বিষয়ে শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। তাই তাতে তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরই অনুকরণ করে। সত্যের বিষয়ে অভীপ্সিত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অনুমান কোনো কাজে আসে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন।

٣٧. وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ أَنْ يُفْتَرٰى أَيْ اِفْتِرَاءً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلٰكِنْ أُنْزِلَ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ تَبْيِيْنَ مَا كَتَبَ اللّٰهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِتَصْدِيْقِ أَوْ بِأُنْزِلَ الْمَحْذُوْفِ وَقُرِئَ بِرَفْعِ تَصْدِيْقٍ وَتَفْصِيْلٍ بِتَقْدِيْرِ هُوَ

৩৭. এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো তরফ হতে মিথ্যা রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তার পূর্বের অর্থাৎ পূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল সেগুলোর সমর্থক ও কিতাবের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ইত্যাদি ফরজ করে দিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ হিসেবে প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। تَصْدِيْقَ تَفْصِيْلَ অপর কেরাতে এ ক্রিয়া দুটি رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে هُوَ উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে। أَنْ يُفْتَرٰى তার أَنْ টি مَصْدَرِيَّة বা ক্রিয়ার মূল অর্থব্যঞ্জক। لَا رَيْبَ অর্থ সন্দেহ নেই। مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটা تَصْدِيْقَ-এর সাথে বা এ স্থানে উহ্য انزل-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٣٨. أَمْ بَلْ يَقُولُونَ افْتَرٰهُ ط اِخْتَلَقَ مُحَمَّدٌ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ عَلٰى وَجْهِ الْاِفْتِرَاءِ فَاِنَّكُمْ عَرَبِيُّوْنَ فُصَحَاءُ مِثْلِيْ وَادْعُوْا لِلْاِعَانَةِ عَلَيْهِ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْ اَنَّهُ افْتِرَاءٌ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى ذٰلِكَ.

৩৮. বরং أَمْ এটা এ স্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তারা কি বলে, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তা রচনা করেছেন; নিজে বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। বল, আমিই যদি রচনা করে থাকি তবে তোমরা ফাসাহাত-বালাগাত বা শব্দ, বাক্য ও ভাষালঙ্কার সকল ক্ষেত্রে এর অনুরূপ এক সূরা আনয়ন কর তো দেখি। তোমরাও তো আমারই মতো ভাষালঙ্কার জ্ঞান সমৃদ্ধ আরবি ভাষাভাষী মানুষ। আর এ কাজে সাহায্য করার জন্য তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর যদি তোমরা এক কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক যে, তিনি তা নিজে রচনা করেছেন। কিন্তু এরূপ চ্যালেঞ্জের পরও তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।

٣٩. قَالَ تَعَالٰى بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ اَيْ بِالْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوْهُ وَلَمَّا لَمْ يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ عَاقِبَةُ مَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ كَذٰلِكَ التَّكْذِيْبِ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ اَيْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَكَذٰلِكَ يُهْلَكُ هٰؤُلَاءِ.

৩৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বস্তুত তারা যে বিষয়ের অর্থাৎ আল কুরআনের জ্ঞান আয়ত্ত করে না ও চিন্তা করে না তা অস্বীকার করে। এর মর্ম অর্থাৎ এতে যে সমস্ত হুমকি বিদ্যমান তার বাস্তবতা এখনো তাদের সামনে আসেনি। لَمَّا তা এ স্থানে না-বোধক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে অস্বীকার করার ন্যায় তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং দেখ রাসূলগণকে অস্বীকার করে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। ধ্বংসই তাদের শেষ পরিণাম। তেমনিভাবে তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

٤٠. وَمِنْهُمْ اَيْ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ لِعِلْمِ اللّٰهِ ذٰلِكَ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ط اَبَدًا وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ.

৪০. তাদের মধ্যে অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কেউ তা বিশ্বাস করে কারণ তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানও তদ্রূপ আর কেউ কেউ তাতে কখনো বিশ্বাস করবে না। আর তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلسَّمْعَ -এর উপর اَلِفْ وَلَامْ টি اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হয়েছে, যাতে করে اَلْاَبْصَارُ -এর تَقَابُلْ বৈধ হতে পারে।

প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) يَمْلِكُ -এর তাফসীর خَلَقَهَا দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর. যেহেতু কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যে মালিকানা কান ও চোখওয়ালার হয়ে থাকে। আর এ কারণেই কানওয়ালাই اُذُنْ -এর মালিক হয়ে থাকে। এ সংশয়কে দূর করার জন্যই مَلَكَ -এর তাফসীর خَلَقَهَا দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ هُوَ اللّٰهُ : প্রশ্ন. هُوَ উহ্য মানার কারণ কি?

উত্তর. যেহেতু এখানে اَللّٰهُ শব্দটি যা مَقُوْلَه হয়েছে তা مُفْرَدْ বা একক শব্দ। অথচ مَقُوْلَه বাক্য হয়ে থাকে। মুফাসসির (র.) هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, هُوَ উহ্য রয়েছে। যার কারণে مَقُوْلَه জুমলা হয়েছে مُفْرَدْ হয়নি।

قَوْلُهُ اَوْ هِيَ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَلِمَتُ رَبِّكَ দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। একটি তো হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الخ আর দ্বিতীয় হলো اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ যদি প্রথম সুরত উদ্দেশ্য হয় তবে اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ টা ইল্লত হবে অর্থাৎ لِاَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

قَوْلُهُ بِنَصْبِ الْحُجَجِ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হেদায়েত দ্বারা শুধু اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা তো পথ প্রদর্শনের কর্মের আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তবে اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ এর বিপরীত। যা এখানে উদ্দেশ্য। আর তা আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট।

قَوْلُهُ يَهْدِيْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يَهِدِّيْ -এর মূল বর্ণনা করা يَهْتَدِيْ মূলে يَهْتَدِيْ ছিল। বাবে اِفْتِعَالْ হতে تَاء -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ -কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। আর اِلْتِقَاءِ سَاكِنَيْن -এর কারণে هَاء -এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ : এটা اَمَّنْ لَا يَهِدِّيْ মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণামের ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদের এমন অকাট্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যা অস্বীকার করার জো নেই। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৭, পৃ. ১৮; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত. আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ৪৬৬]

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরত হিকমতের এবং তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের অনেক দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার এমন গুণাবলির বিবরণ রয়েছে যাকে কোনো কাফের মুশরিকও অস্বীকার করতে পারে না। কেননা এ গুণাবলি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো মধ্যেই নেই। এরপর কাফের মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এ মহাসত্য উপলব্ধি করার পরও কেন তোমরা এক অদ্বিতীয়, লা-শরিক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে মাথানত কর? কেন তোমরা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা আর্চনা কর? এ আয়াতসমূহের বর্ণনা শৈলী এত হৃদয়গ্রাহী যে, মানুষ মাত্রেরই হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, মনে দাগ কাটে। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কাফের-মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আসমান জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দেয়? আসমান থেকে কে বারি বর্ষণ করে? সূর্যের তাপ কার দান? জমিন কার সৃষ্টি? জমিনের মাঝে উৎপাদন ক্ষমতা কে দান করেছে? মাটি পানি সংমিশ্রিত হওয়ার পর জমিন থেকে ফলমূল, তরি-তরকারি এককথায় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য কে উৎপাদন করে? অন্য আয়াতে কথাটিকে

এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ . অর্থাৎ তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত কর? না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ অর্থাৎ তোমরা বলবে আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা সম্পূর্ণ হৃতঃসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।

অতএব, একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই মানব জাতিকে রিজিক দান করেন। পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ

আসমান জমিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে যে, আল্লাহ তা'আলাই রিজিকদাতা। তিনি পালনকর্তা, তিনিই স্রষ্টা, তিনি এক, অদ্বিতীয়। হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! তোমার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার নিজের দেহের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ শক্তি কার দান? কোন মহাশক্তি প্রত্যেকটি মানুষকে দেখবার এবং শুনবার এ অপূর্ব শক্তি দান করেছেন। কে তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন? কে এই শক্তি দান করে, কে এই শক্তি থেকে বঞ্চিত করে? অথবা এর অর্থ হলো কে তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির হেফাজত করেন? পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন- وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا অর্থাৎ এবং আল্লাহ তা'আলা বের করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদর থেকে, অথচ তোমরা কিছুই জানতে না এবং আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং উপলব্ধিশক্তি, হয়তো তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরগুজার হবে। যেহেতু শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি তথা যাবতীয় শক্তি আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে দান করেছেন, তাই এসব শক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে বলেও পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ এভাবে যেভাবে উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, এক আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং রিজিকদাতা, ঠিক এমনিভাবে একথাও প্রমাণিত হলো যে, এ কাফের মুশরিকরা ঈমান আনবে না। [অতএব হে রাসূল ﷺ!] মক্কাবাসী কাফের মুশরিকদের ঈমান না আনার কারণে আপনি ব্যথিত হবেন না। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও যারা পথভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য মর্মাহত হওয়ার কিছুই নেই। এ কাফেরদের অন্যায় আচরণ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা কখনো ঈমান আনবে না আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ কথা জানতেন। এই দুরাত্মা কাফেররা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা জানতেন তা বাস্তব সত্যে প্রমাণ করলো।

قَوْلُهُ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর আরো দলিল পেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকরা যে নিজেদের হাতে তৈরি মূর্তির পূজা অর্চনা করত, অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা তার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ﷺ! আপনি কাফের মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার শরিক মনে করে তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে প্রথম অস্তিত্ব দিতে পারে? এবং এরপর দ্বিতীয়বারও তাকে সৃষ্টি করতে পারে? আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তাদের তথা কথিত উপাস্যরা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের উপাস্যগুলো সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম। এমন অবস্থায় [হে রাসূল ﷺ!] قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ অর্থাৎ আপনিই জবাব দিন যে, আল্লাহ তা'আলাই পৃথিবীর সব কিছুকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর পুনরায় তিনিই তাকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, যখন তোমাদের উপাস্যরা কোনো কিছু সৃষ্টি

করতে পারে না, সব বিষয়েই তারা অক্ষম, সৃষ্টি করার গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই, আর কারো নয়, এমন অবস্থায় তোমরা কোথায় ফিরে যাও? তোমরা স্বচক্ষে দেখ তোমাদের অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দান, তোমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা তথা তোমাদের যাবতীয় শক্তি এক আল্লাহ তা'আলাই দান করেছেন, আসমান জমিন এককথায় নিখিল বিশ্ব আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। এ সত্য তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আর তোমরা এসব সত্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য এমন অবস্থায় পুনরায় তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে তোমরা কেন সন্দিহান হও?

বিশেষত, যখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয়নবী ﷺ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন এবং অবশেষে হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে একত্রিত করা হবে এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এমন অবস্থায় তোমরা পুনর্জীবনের কথা, হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কথা কোন যুক্তিতে অস্বীকার কর?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বও আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন। এর পাশাপাশি এ কথাও ধ্রুব সত্য যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পুনর্জীবন দান করবেন এবং তার দরবারে হাজির করবেন, সৃষ্টির শুরুও তার হাতে এবং শেষও তার হাতে। এমন অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ ছেড়ে তোমরা কোথায় যাও? اَيْنَ تَفِرُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা কোথায় পলায়ন করছ? قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের বা তাওহীদের উপর আরো একটি দলিল- প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল ﷺ ! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক মনে কর তাদের মধ্যে কে আছে যে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে, দলিল-প্রমাণ দিয়ে মানুষকে সরল সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়? কে মানুষকে হেদায়েত করে?

কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের তথাকথিত উপাস্যরা কোনো মানুষকে সঠিক পথ দেখানো তো দূরের কথা তারা নিজেরাই তো পথ চিনে না, তারা দেখতে পারে না, চলতেও পারে না। তারা কিছুই করতে পারে না। তাই অন্যকে কিভাবে তারা পথ দেখাবে?

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ এখানে تَأْوِيْلُ -এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি ও নির্লিপ্ততার দরুন কুরআন সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

অনুবাদ :

٤١. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لَهُمْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ج أَيْ لِكُلٍّ جَزَاءُ عَمَلِهِ أَنْتُمْ بَرِيْئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَهٰذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ .

৪১. আর তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তাদেরকে বলে দাও, আমার কাজ আমার আর তোমাদের কাজ তোমাদের। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার নিজ আমলের প্রতিফল। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়িত্বমুক্ত আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি দায়িত্বমুক্ত। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা এ বিধানটি مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গেছে।

٤٢. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ط إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْاِنْتِفَاعِ بِمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ وَلَوْ كَانُوا مَعَ الصَّمَمِ لَا يَعْقِلُونَ يَتَدَبَّرُونَ .

৪২. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি বধিরদেরকে শুনাবে? আর এ বধিরতাসহ তারা কিছু না বুঝলেও? এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা না করলেও? তাদের নিকট যা পাঠ করা হয় তা হতে যেহেতু তারা কোনোরূপ উপকার লাভ করে না সেহেতু তাদেরকে বধিরের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।

٤٣. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ط أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِي عَدَمِ الْاِهْتِدَاءِ بَلْ هُمْ أَعْظَمُ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ .

৪৩. তাদের কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি অন্ধদের পথ দেখাবে তারা না দেখলেও? তারা যেহেতু সৎপথ লাভ করে না সেহেতু অন্ধের সাথে তাদের উপমা প্রদান করা হয়েছে। তারা আসলে অন্ধ হতেও অধিকতর মন্দ। কারণ তাদের দৃষ্টি লোপ পায়নি; বরং বক্ষস্থিত হৃদয় তাদের অন্ধ।

٤٤. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

৪৪. আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না বস্তুত মানুষ নিজদের প্রতি জুলুম করে থাকে।

٤٥. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ أَيْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا فِي الدُّنْيَا أَوِ الْقُبُورِ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ لِهَوْلِ مَا رَأَوْا وَجُمْلَةُ التَّشْبِيهِ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ط يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِذَا بُعِثُوا ثُمَّ يَنْقَطِعُ التَّعَارُفُ لِشِدَّةِ الْأَهْوَالِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَوْ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .

৪৫. এবং যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন সেদিনের ভয়াবহতা দর্শন করত মনে হবে যে, পৃথিবীতে বা কবরে তাদের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল। كَأَنْ এটা এ স্থানে كَأَنَّهُمْ [যেন তারা] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। جُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ অর্থাৎ উপমাসূচক বাক্যটি يَحْشُرُهُمْ-এর সর্বনাম হতে حَالٌ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরস্পরকে তারা চিনবে। অর্থাৎ যখন তারা পুনরুত্থিত হবে তখন তারা একে অপরকে চিনবে কিন্তু পরে সেই দিনের ভীষণ ভয়াবহতার দরুন এ পরিচিতি ছিন্ন হয়ে যাবে। يَتَعَارَفُوْنَ এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অথবা ظَرْفٌ বা কালবাচক শব্দ يَوْمَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তারা সৎপথপ্রাপ্ত নয়।

٤٦. وَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ أَيْ فَذَاكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ تَعْذِيبِهِمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ مُطَّلِعٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ فَيُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

৪৬. আমি তাদেরকে তোমার জীবদ্দশায়ই আজাব প্রদানের যে ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি إِمَّا তাতে অতিরিক্ত مَا -এর م এ শর্তবাচক শব্দ إِنْ -এর ن -এর إِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে। তোমাকে দেখিয়ে দেই তবে তা হলো অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের পূর্বেই তোমার কাল যদি পূর্ণ করে দেই তবে তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট; এবং তারা মিথ্যারোপ ও সত্য প্রত্যাখ্যান যা কিছু করে আল্লাহ তার সাক্ষী। তিনি তৎবিষয়ে অবহিত। সুতরাং তিনি তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। এ স্থানে جَوَابُ شَرْط উহ্য। তা হলো فَذٰلِكَ অর্থাৎ 'তবে তো হলোই।'

٤٧. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ رَسُولٌ ط فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوهُ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ فَيُعَذَّبُوا وَيُنَجِّي الرَّسُولُ وَمَنْ صَدَّقَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِتَعْذِيبِهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ فَكَذٰلِكَ يَفْعَلُ بِهٰؤُلَاءِ ـ

৪৭. জাতিসমূহের প্রত্যেক জাতির জন্য আছে রাসূল আর যখনই তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে অথচ ন্যায়ের সাথে ইনসাফের সাথে তাদের মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে। অনন্তর তারা আজাবের মধ্যে নিপতিত হয়েছে আর রাসূল এবং তাঁকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করেছে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে আর বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করত তাদের প্রতি জুলুম করা হয়নি। তাদের সাথেও তদ্রূপ আচরণ করা হবে।

٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيهِ ـ

৪৮. আর তারা বলে আজাবের এ প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? যদি তোমরা তাতে সত্যবাদী হয়ে থাক বল।

٤٩. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا أَدْفَعُهُ وَلَا نَفْعًا أَجْلِبُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ط أَنْ يُقْدِرَنِي عَلَيْهِ فَكَيْفَ أَمْلِكُ لَكُمْ حُلُولَ الْعَذَابِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ط مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ لِهَلَاكِهِمْ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهِ ـ

৪৯. বল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে বিষয়ে ক্ষমতাবান করতে ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত নিজের ক্ষতি প্রতিহত করার ও মঙ্গল অর্জন করার উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং তোমাদের বিরুদ্ধে আজাব নিয়ে আসার ক্ষমতা আমার কেমনে হবে? প্রত্যেক জাতিরই একটা নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের একটা নির্ধারিত মুদ্দত রয়েছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা তা হতে মুহূর্তকালও পিছনে অর্থাৎ বিলম্ব করতে এবং অগ্রে অর্থাৎ তা হতে ত্বরা করতে পারবে না।

٥٠. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُهٗ اَىِ اللّٰهِ بَيَاتًا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا اَىَّ شَىْءٍ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اَىِ الْعَذَابِ الْمُجْرِمُوْنَ اَلْمُشْرِكُوْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَجُمْلَةُ الْاِسْتِفْهَامِ جَوَابُ الشَّرْطِ كَقَوْلِكَ اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تُعْطِيْنِىْ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّهْوِيْلُ اَىْ مَا اَعْظَمَ مَا اسْتَعْجَلُوْهُ.

৫০. বল, তোমরা কি দেখ, অর্থাৎ তোমরা আমাকে বল, যদি তার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে বা দিনে এসে পড়ে তবে অপরাধীরা মুশরিকরা তার এ আজাবের কি বিষয় তরান্বিত করতে চায়! بَيَاتًا অর্থ রাত্রে। مَاذَا প্রশ্নবোধক এ বাক্যটি এ স্থানে جَوَابُ شَرْط রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবিতে ব্যবহার রয়েছে যে, اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تُعْطِيْنِىْ অর্থাৎ তোমার নিকট যদি আসি তবে তুমি আমাকে কি দেবে? এ উদাহরণটিতে مَاذَا تُعْطِيْنِىْ এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি جَوَابُ شَرْط রূপে ব্যবহার হয়েছে। এ স্থানে تَهْوِيْل অর্থাৎ বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝাতে এ ধরনের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর জিনিস তারা তরান্বিত করতে চাচ্ছে? وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اَلْمُجْرِمُوْنَ এস্থানে অর্থাৎ সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যের ব্যবহার হয়েছে।

٥١. اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ حَلَّ بِكُمْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ط اَىِ اللّٰهِ اَوِ الْعَذَابِ عِنْدَ نُزُوْلِهٖ وَالْهَمْزَةُ لِاِنْكَارِ التَّاخِيْرِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ وَيُقَالُ لَكُمْ آٰلْئٰنَ تُؤْمِنُوْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ اِسْتِهْزَاءً.

৫১. তা ঘটবার পর অর্থাৎ তোমাদের উপর তা আপতিত হওয়ার পর তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বা আজাব সম্পর্কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু তোমাদের হতে তখন তা গ্রহণ করা হবে না। তোমাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা বিশ্বাস আনয়ন করছ? অথচ তোমরা তো উপহাসবশত তাই তরান্বিত করতে চেয়েছিলে? اَثُمَّ এ স্থানে اِنْكَار অর্থাৎ ঈমান আনয়নে বিলম্ব করাকে অস্বীকার করার অর্থে প্রশ্নবোধক হামযার ব্যবহার করা হয়েছে।

٥٢. ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ج اَىِ الَّذِىْ تَخْلُدُوْنَ فِيْهِ هَلْ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءً بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ.

৫২. অতঃপর সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে বলা হবে, স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। অর্থাৎ তাতেই তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল ভিন্ন আর কিছুর প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে না। هَلْ এ প্রশ্নবোধক শব্দটি এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٣. وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ يَسْتَخْبِرُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ط اَىْ مَا وَعَدْتَنَا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ وَالْبَعْثِ قُلْ اِىْ نَعَمْ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ط وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ الْعَذَابَ.

৫৩. তারা তোমাদের নিকট জানতে চায় তা কি অর্থাৎ পুনরুত্থান ও আজাব সম্পর্কে আমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দাও তা কি সত্য? বল, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ, তা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। অর্থাৎ এ আজাব অতিক্রম করতে পারবে না। يَسْتَنْبِئُوْنَكَ অর্থ তারা তোমার নিকট জানতে চায়। اِىْ অর্থ হ্যাঁ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ : আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ
قَوْلُهُ بَلْ هُمْ اَعْظَمُ : কাফেরদেরকে অন্ধদের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অন্ধ হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ আর কাফের হলো مُشَبَّهٌ আর عَدَمُ الْبَصَرِ -এর তুলনায় عَدَمُ الْبَصِيْرِ -এর মধ্যে অধিক কঠোরতা হয়ে থাকে। যেহেতু কাফেররা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহিতে অন্ধদের চেয়েও অগ্রগামী।

قَوْلُهُ كَاَنَّهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَاَنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ হয়েছে এবং তার اِسْم উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ : কেননা يَوْم -এর সিফত স্বীকৃতি দেওয়ার সুরতে উহ্য ইবারত হবে- حَالَ كَوْنِهِمْ مُشَبَّهِيْنَ بِمَنْ لَمْ يَلْبَثْ اِلَّا سَاعَةً اِلخ

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো এই যে, يَتَعَارَفُوْنَ টা يَحْشُرُهُمْ -এর هُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর حَالٌ এবং ذُو الْحَالِ -এর জমানা এক হয়ে থাকে। অথচ حَشْر প্রথমে হবে এবং تَعَارُفٌ এর পরে হবে। কাজেই উভয়টির জমানা এক হলো না।

উত্তর. এটা হলো حَالٌ مُقَدَّرَةٌ যে, কাফেরদেরকে একত্রিত করা হবে। অবস্থা এরূপ যে, তাদের জন্য تَعَارُفٌ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِمْ مُقَدَّرِيْنَ التَّعَارُفَ لَا اَنَّهُمْ مُتَعَارِفُوْنَ بِالْفِعْلِ

قَوْلُهُ اَوْ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ : আর তা হলো উহ্য يَوْم; উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, يَتَعَارَفُوْنَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

قَوْلُهُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَىْ فَذٰلِكَ : এ বৃদ্ধি করার দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো اِمَّا نُرِيَنَّكَ এবং اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ শর্ত হলো দুটি আর جَزَاءٌ হলো একটি। আর তাহলো فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ অথচ اِمَّا نُرِيَنَّكَ -এর উপর فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ -এর تَرَتُّبٌ অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বৈধ নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ উভয় شَرْط -এর جَزَاءٌ নয়; বরং اِمَّا نُرِيَنَّكَ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) فَذَاكَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন. فَذَاكَ হলো جَزَاءٌ অথচ جَزَاءٌ মুফরাদ হয় না।

উত্তর. فَذَاكَ মূলত ছিল فَذَاكَ حَقٌّ

قَوْلُهُ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضَعَ الْمُضْمَرِ : প্রশ্ন. يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ বলেছেন, يَسْتَعْجِلُوْنَ مِنْهُ বলেননি, অথচ এটা তার মোকাবিলায় اَخْصَرُ

উত্তর. اَخْصَرُ -এর মোকাবিলায় مُخْتَصَرْ تَعْبِيْر কে গ্রহণ করার কারণ হলো এই যে, مُخْتَصَرْ -এর মধ্যে تَرْك -এর কারণটা اِسْتِعْجَالٌ -এর উপর বুঝায় আর তা হলো جُرْم এটা ছাড়াও তার صِفَتْ قَبِيْح -এর উপরও বুঝায়।

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الْاِسْتِفْهَامِ : এটা جَوَابُ شَرْط আর اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُهٗ হলো شَرْط আর مَاذَا يَسْتَعْجِلُ -এর فَاءٌ উহ্য -এর সাথে جَوَابُ شَرْط কেননা جُمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ টা فَاءٌ ব্যতীত جَزَاءٌ হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تُعْطِيْنِىْ : এ উপমা اِسْتِبْعَادٌ -কে দূর করার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ এটা বর্ণনা করার জন্য যে, আরবি ভাষায় جُمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ টা فَاءٌ ব্যতীতও جَزَاءٌ হতে পারে কাজেই কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّحْوِيْلُ : অর্থাৎ اِسْتِفْهَامٌ দ্বারা اِسْتِعْلَامٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং ভয়াবহতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَكُمْ : এই ইবারতকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য مُقَدَّرٌ মানা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ -এর আতফ اٰلْئٰنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ -এর উপর হয়েছে অথচ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ হলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ আর مَعْطُوْفٌ হলো جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর পূর্বে فِعْل উহ্য রয়েছে যাকে মুফাসসির (র.) وَيُقَالُ لَكُمْ বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ تُؤْمِنُوْنَ : প্রশ্ন. اٰلْئٰنَ টা يُقَالُ لَكُمْ -এর مَقُوْلَه হয়েছে। অথচ مَقُوْلَه জুমলা হয়ে থাকে। আর اٰلْئٰنَ হলো مُفْرَدٌ জবাবের সারকথা হলো, ইবারত উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اٰلْئٰنَ يُؤْمِنُوْنَ যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ : এটি এ পর্যায়ের শেষকথা, যখন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, রাসূলের রেসালাত এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতার যাবতীয় দলিল প্রমাণ পেশ করা হয় তখনও দুরাত্মা কাফের মুশরিকরা [হে রাসূল!] আপনার সত্যতাকে অস্বীকার করে, কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না।

আপনার রেসালাতকে অমান্য করে এবং আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার আমল আমার জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্য প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের কৃত কর্মের জন্য দায়ী থাকতে হবে। আর আমার আমলের জন্য তোমরা দায়ী হবে না, আর তোমাদের আমলের জন্য আমি দায়ী হবো না। আমার কর্মের বিনিময় আমি পাব, আর তোমাদের কর্মের বদলা দেওয়া হবে। আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট। তাই তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো না। আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলি তা তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলি।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে জিনিস দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার এবং আমার অবস্থার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছে, আমি ঐ পাহাড়ের অপর দিকে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি, যারা রাতের শেষ প্রহরে তোমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তোমাদেরকে হত্যা করবে। আমি তোমাদেরকে এই মহাবিপদ সম্পর্কে অবহিত করছি। তোমরা অতি সত্তর এখান থেকে বের হয়ে যাও, অনতিবিলম্বে পলায়ন কর, এই ব্যক্তির কথা কিছু লোক বিশ্বাস করল। রাতের অবকাশের সদ্ব্যবহার করে সে স্থান থেকে পলায়ন করল এবং দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো। কিন্তু কিছু লোক ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করে। সকাল পর্যন্ত সে স্থানেই রয়ে গেল। দুশমন অতি প্রত্যুষে তাদের উপর আক্রমণ করে সকলকে ধ্বংস করল। এ অবস্থায়ই সে সব লোকের যারা আমি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছি তা মেনে চলেছে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অথবা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে আমার প্রতি ঈমান আনেনি। এ হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, মানুষের মধ্যে দু-দল রয়েছে, একদল আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে আর একদল ঈমান আনে না।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি তারাও দু-ভাগে বিভক্ত। তাদের একদল হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চরম শত্রু, ইসলামের ঘোর বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনতে রাজি নয়। আর একদল এমন নয়। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রথম দলের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আপনার কথা কান পেতে শ্রবণ করে, যখন আপনি পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, শরিয়তের মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণনা করেন তখন দেখা যায় প্রকাশ্যে তারা কান পেতে শ্রবণ করে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে কিন্তু তাদের এ দেখা বা শোনার সঙ্গে তাদের মনের কোনো মিল থাকে না। অতএব তাদের দেখা বা না দেখা, শুনা বা না শুনা একই সমান। এ দু অবস্থায় মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। এজন্যে মাওলানা রুমী (র.) বলেছেন,

این سخن را از گوش دل باید شنود
گوش گل اینجا ندارد ہیچ سود

এ কথা [দীন ইসলামের কথা] শ্রবণ করতে হবে মনের কর্ণে, চর্মের কর্ণ এখানে কোনো উপকারে আসে না। তারা আসলে অন্ধ এবং বধিরের ন্যায়, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধ, আর শ্রবণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা বধির।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কাফেররা আপনার প্রতি ঈমান আনে না এ জন্য আপনি মর্মাহতো হবেন না। কেননা তারা মনের দিক থেকে অন্ধ ও বধির। আর হে রাসূল ﷺ! আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবেন না। অতএব, তাদের ঈমান না আনায় দুঃখিত হবেন না, কেননা আপনি অন্ধ বধিরকে হেদায়েত করতে পারবেন না।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা : ১১, পৃ. ৬০]

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, কোনো মানুষের অন্তরে যখন অন্য মানুষের জন্য চরম শত্রুতা থাকে তখন সে তার শত্রুর দোষ অনুসন্ধানে তৎপর থাকে। ঐ ব্যক্তির গুণ সে দেখেও দেখে না। তার ভালো কথা শুনেও শুনে না। কাফেরদের শত্রুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলেই তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

−[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৭, পৃ. ১০০-১০১]

তাদের মধ্যে যারা আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে তারা সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ এবং নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আপনার মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু যেহেতু তাদের মন অন্ধ, তাই তাদের চর্ম চক্ষের দেখা তাদের জন্য উপকারী হয় না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন− أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ হে রাসূল! তবে কি আপনি অন্ধদেরকে পথ দেখাবেন যদিও তারা কিছুই বুঝে না? যেহেতু তাদের মন ঈমান আনয়নে প্রস্তুত নয়, সত্য সন্ধানে আগ্রহী নয়, তাই তাদেরকে অন্ধ বলা হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ -এর অসাধারণ গুণাবলি, তাঁর ফজিলত ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর বিস্ময়কর মোজেজা তথা অলৌকিক ক্ষমতা তারা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু মন যেহেতু বিদ্রোহী তাই তারা ঈমান আনে না। তারা যেন অন্ধ বধির।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর গুণাবলি প্রকাশ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছে। ইসলামের প্রশংসায়ও তারা ক্ষেত্রবিশেষে পঞ্চমুখ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের ক্ষতি সাধনে তারা তৎপর এবং ইসলামের মহান শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

−[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৪৪২]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا : অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করে। মানুষ মাত্রকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন বিবেক-বুদ্ধিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে তখন সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে না, স্বভাব ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করতে রাজি হয় না, ইসলামের মহান শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে।

قَوْلُهُ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ : অর্থাৎ কিয়ামতে যখন মৃতদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। −[মাযহারী]

قَوْلُهُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْـٰٔنَ : অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আজাব পতিত হয়ে যাবে? তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে বলা হবে− آلْـٰٔنَ কি এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফেরাউন যখন বলল, اٰمَنْتُ أَنَّهٗ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোনো উপাস্য নেই তাকে ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা। উত্তরে বলা হয়েছিল− آلْـٰٔنَ অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে? বস্তুত তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আজাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আজাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল, তা এ মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল, কারণ তারা দূরে থেকে আজাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে- কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আজাব সরে যায়। যদি আজাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল করা হতো না।

অনুবাদ :

٥٤. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ كَفَرَتْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنَ الْاَمْوَالِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ط مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ عَلٰى تَرْكِ الْاِيْمَانِ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ج اَىْ اَخْفَاهَا رُؤَسَاؤُهُمْ عَنِ الضُّعَفَاءِ الَّذِيْنَ اَضَلُّوْهُمْ مَخَافَةَ التَّعْيِيْرِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْخَلَائِقِ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

৫৪. পৃথিবীতে যা কিছু আছে যত সম্পদ আছে সবকিছু যদি প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারীর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর হতো তবে তা কিয়ামতের দিন আজাব হতে মুক্তির বিনিময়ে দিয়ে দিত এবং যখন তারা আজাব প্রত্যক্ষ করবে তখন ঈমান আনয়ন পরিত্যাগ করার অনুতাপ গোপন রাখবে। অর্থাৎ সর্দারগণ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে সেই দুর্বল শ্রেণির ব্যক্তিরা লজ্জা দেবে এ ভয়ে তারা [সর্দাররা] তাদের [দুর্বলদের] নিকট তা গোপন করে রাখবে। তাদের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে ন্যায়ের সাথে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেওয়া হবে। আর তারা বিন্দুমাত্রও অত্যাচারিত হবে না।

٥٥. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ حَقٌّ ثَابِتٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اَىِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

৫৫. শুনে রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলারই সাবধান পুনরুত্থান ও প্রতিফল সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য সঠিক। কিন্তু তাদের মানুষের অধিকাংশ জনই তা অবহিত নয়।

٥٦. هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ .

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান পরকালে তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যাবলির প্রতিদান দেবেন।

٥٧. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ مَا لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَشِفَاءٌ دَوَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ وَالشُّكُوْكِ وَهُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ .

৫৭. হে লোক সকল! মক্কাবাসীগণ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি এসেছে উপদেশ, একটি কিতাব, অর্থাৎ আল কুরআন যাতে তোমাদের লাভ ও ক্ষতির সবকিছুর বিবরণ রয়েছে এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ মন্দ আকিদা ও সন্দেহের যে ব্যাধি আছে তার প্রতিষেধক ঔষধ মু'মিনদের জন্য গোমরাহি হতে হেদায়েত ও তারা মাধ্যমে রহমত।

٥٨. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ وَبِرَحْمَتِهٖ الْقُرْاٰنِ فَبِذٰلِكَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ .

৫৮. বল তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলাম ও দয়ায় অর্থাৎ আল কুরআনের ফলে, সুতরাং তাতে অর্থাৎ এ অনুগ্রহ ও দয়ায় তারা আনন্দিত হোক। পার্থিব যা তারা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়। يَجْمَعُوْنَ তা ى [তৃতীয় পুরুষ] ও ت [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] সহ পঠিত রয়েছে।

৫৯. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ مَا اَنْزَلَ خَلَقَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ط كَالْبَحِيْرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْمَيْتَةِ قُلْ آللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ مَا ذٰلِكَ بِالتَّحْرِيْمِ وَالتَّحْلِيْلِ لَا اَمْ بَلْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ تَكْذِبُوْنَ بِنِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ .

৫৯. বল, তোমরা কি দেখ অর্থাৎ তোমরা আমাকে বল আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে রিজিক নাজিল করেছেন সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তোমরা যে তার কিছু অবৈধ ও কিছু বৈধ করে নিয়েছ যেমন– বহীরা, সায়বা, মৃত বস্তু ইত্যাদি। আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ বৈধ ও অবৈধকরণের অনুমতি দিয়েছেন? না, তিনি এরূপ দেননি বরং তোমরা তার প্রতি তার আরোপ করত আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ। اَمْ এটা এ স্থানে بَلْ বরং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। تَفْتَرُوْنَ মিথ্যা আরোপ করছ।

৬০. وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اَىْ اَىُّ شَىْءٍ ظَنُّهُمْ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُ لَا يُعَاقِبُهُمْ لَا اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بِاِمْهَالِهِمْ وَالْاِنْعَامِ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ .

৬০. যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? এ বিষয়ে তাদের ধারণা কিরূপ? তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করা হবে না? না, এরূপ ধারণা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অবকাশ প্রদান করত ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করত দয়াপরায়ণ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ : এখানে لَوْ হলো شَرْطِيَّةٌ اِمْتِنَاعِيَّةٌ আর اِنَّ হলো حَرْفُ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ আর نَفْسٌ ظَلَمَتْ এটা মওসূফ সিফত মিলে اِنَّ-এর خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর مَا হলো اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ যা صِلَةٌ তার সাথে মিলে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। اَنَّ তার অধীনস্থসহ উহ্য ثَبَتَ ফে'লের فَاعِلٌ হয়েছে। مَا مَوْصُوْلَةٌ-এর সাথে মিলে জুমলা হয়ে اَنَّ-এর اِسْمٌ আর لَافْتَدَتْ بِهِ হলো جَوَابُ شَرْطٍ অর্থাৎ لَوْ ثَبَتَ ذٰلِكَ لَافْتَدَتْ بِهِ

قَوْلُهُ اَىْ اَخْفَاهَا : اَسَرُّوْا-এর তাফসীর اَخْفَاهَا দ্বারা করেছেন। অর্থ বর্ণনা করার জন্য যে اَسَرُّوْا টা اَضْدَادٌ-এর অন্তর্ভুক্ত, কেননা এর অর্থ اَظْهَرَ ও আসে এবং اَخْفَا অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অর্থটি অধিক প্রসিদ্ধ। যদিও উভয়টিই সম্ভাবনা থাকে।

قَوْلُهُ اَىُّ شَىْءٍ ظَنُّهُمْ بِهِ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ-এর মধ্যে مَا টা اَىُّ شَىْءٍ অর্থে হয়েছে যা মুবতাদা হয়েছে। আর ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ তার খবর হয়েছে। আর يَوْمَ টা ظَنَّ-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ ظَنٌّ وَاقِعٌ بِهِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ الخ : অর্থাৎ পাপিষ্ঠরা যখন কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখবে তখন তাদের অবস্থা এমন হবে যে সম্ভব হলে সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ/মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে তারা আজাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আজাব থেকে রক্ষা পাবে না।

বিগত আয়াতসমূহে কাফেরদের দুরবস্থা এবং আখেরাতে তাদের উপর নানরকম আজাবের বর্ণনা ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম দুটিতে তাদের সে দুরবস্থা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসার পন্থা এবং আখেরাতে আজাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর আনুগত্য।

মানব ও মানবতার জন্য এ দুটি বিষয় এমন সুদৃঢ় যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসূলের সুন্নতের আনুবর্তিতা মানুষকে সত্যিকার অর্থেই মানুষ বানিয়ে দেয় এবং যখন মানুষ সত্যিকার অর্থেই মানুষ হয়ে যায় তখন সমগ্র বিশ্ব সুন্দর হয়ে উঠে এবং এ পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হতে পারে।

প্রথম আয়াতে কুরআনে কারীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে–

১. مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ : مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন বিষয় প্রার্থনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ 'মাওয়েযায়ে হাসানাহ' -এর অত্যন্ত সালংকার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি প্রদর্শন, ছওয়াবের সাথে সাথে আজাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রণ আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কুরআনে কারীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের কায়া পাল্টে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةٌ -এর সাথে مِنْ رَبِّكُمْ বলে কুরআনী ওয়াজের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়াজ নিজেদেরই মতো কোনো দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোনো দুর্বলতা কিংবা আপত্তি-ওজরের আশঙ্কা নেই।

২. কুরআনে কামীদের দ্বিতীয় গুণ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া। আর صُدُورٌ হলো صَدْرٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ– বুক। আর এর মর্মার্থ হলো অন্তর।

সারকথা হচ্ছে যে, কুরআনি কারীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন যে, কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি বিশেষত অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়। –[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু অন্যান্য মনীষী বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারীতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কোরো সাধ্যের ব্যাপারে নয়, সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কুরআনে কারীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্য উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক লোক রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী ﷺ বললেন, কুরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ অর্থাৎ কুরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে]

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (র.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে জানাল যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কুরআন পড়তে থাক।

উম্মতের ওলামাগণ কিছু রেওয়ায়েত, কিছু উদ্ধৃতি এবং কিছু নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআনের আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা পৃথক গ্রন্থে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ইমাম গাযালী (র.) রচিত গ্রন্থ 'খাওয়াসে কুরআনী' এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ একখানি গ্রন্থ। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) গ্রন্থটি সংক্ষেপ করে 'আমালে কুরআনী' নামে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকে যা দেখা যায়, তাতে এ বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে, কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্য নিরাময় হিসেবে প্রমাণিত হয়ে থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে, আত্মার রোগ-ব্যাধি দূর করাই কুরআন নাজিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে আনুষঙ্গিকভাবে এটি দৈহিক রোগ-ব্যাধিরও উত্তম চিকিৎসা।

এতে সেসব লোকের নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রষ্টতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যারা কুরআন কারীমকে শুধু দৈহিক রোগের চিকিৎসা কিংবা পার্থিব প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পড়ে বা পড়ায়। না এরা আত্মিক রোগব্যাধির প্রতি লক্ষ্য করে, না কুরআনের হেদায়েতের উপর আমল করার প্রতি মনোনিবেশ করে। এমনি লোকদের ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

ترا حاصل زیس اش جزیس نیست * که از هم خوانندش اسان بمیری

অর্থাৎ তোমরা কুরআনের সূরা ইয়াসীনের দ্বারা এতটুকুই উপকৃত হয়েছ যে, এর পাঠে মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হয়। অথচ এ সূরার মর্ম তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্যের প্রতি যদি লক্ষ্য করতে, তাহলে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি উপকারিতা ও বরকত হাসিল করতে পারতে।

কোনো কোনো গবেষক তাফসীরকার বলেছেন যে, কুরআনের প্রথম গুণ مَوْعِظَةٌ -এর সম্পর্ক হলো মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে– যাকে শরিয়ত বলা হয়। কুরআন কারীম সে সমস্ত আমর সংশোধনের সর্বোত্তম উপায়। আর شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ -এর সম্পর্ক হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে, যাকে তরিকত ও তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।

৩. এ আয়াতে কুরআনের তৃতীয় গুণ هُدًى ৪. আর চতুর্থ رَحْمَةٌ বলা হয়েছে। هُدًى অর্থ– হেদায়াত। অর্থাৎ পথ-প্রদর্শন। কুরআন কারীম মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। সে মানুষকে বলে যে, সমগ্র বিশ্ব এবং স্বয়ং মানবসত্তার মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে মহান নির্দেশসমূহ দিয়ে রেখেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, যাতে তোমরা সেসব বিষয়ের স্রষ্টা ও মালিককে চিনতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনোটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, [সবই] অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়ত সততাই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধনসম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দুটি বিষয়কে আনন্দ উল্লাসের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فَضْل [ফজল], অপরটি رَحْمَةٌ [রহমত]। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার 'ফজল' এর মর্ম হলো কুরআন, আর রহমতের মর্ম হলো এই যে, তোমাদেরকে তিনি কুরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেছেন। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়া থেকে]

এ বিষয়টি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তাফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফজল' অর্থ কুরআন, আর রহমত হলো ইসলাম। বস্তুত এর মর্মার্থও তাই, যা উপরে উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। কারণ ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ফজল -এর মর্ম হলো কুরআন, আর রহমত হলো নবী করীম ﷺ। কুরআন কারীমের আয়াত– وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -এর মাঝেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়। বস্তুত এর সারমর্মও প্রথম ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কারণ কুরআন কিংবা ইসলামের উপর আমল করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর আনুগত্যেরই বিভিন্ন শিরোনাম।

এ আয়াতে সুপ্রসিদ্ধ কেরাত [পাঠ] অনুযায়ী فَلْيَفْرَحُوْا গায়েবের সীমা বা নাম পুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এর প্রকৃত লক্ষ্য হলো তখনকার উপস্থিত লোকেরা, যার চাহিদা মোতাবেক এখানে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করাই সমীচীন ছিল। যেমন, কোনো কোনো কেরাত বা পাঠে তাও রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ পাঠে নামপুরুষই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা ইসলামের ব্যাপক রহমত শুধু তখনকার উপস্থিত লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٦١. وَمَا تَكُوْنُ يَا مُحَمَّدُ فِىْ شَأْنٍ أَمْرٍ وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ أَىْ مِنَ الشَّأْنِ أَوِ اللّٰهِ مِنْ قُرْاٰنٍ أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ وَلَا تَعْمَلُوْنَ خَاطَبَهُ وَأُمَّتَهُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا رُقَبَاءَ إِذْ تُفِيْضُوْنَ تَأْخُذُوْنَ فِيْهِ ط أَىِ الْعَمَلِ وَمَا يَعْزُبُ يَغِيْبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ وَزْنِ ذَرَّةٍ أَصْغَرِ نَمْلَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ.

৬১. হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি যে অবস্থায়ই বিষয়েই থাক এবং তুমি তৎসম্পর্কে উক্ত বিষয়ে যা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমার উপর অবতীর্ণ কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোনো কর্ম কর না কেন لَا تَعْمَلُوْنَ এ স্থানে রাসূল ﷺ ও তাঁর উম্মত সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আমি তোমাদের সাক্ষী পরিদর্শক যখন তোমরা তাতে ঐ কাজে প্রবৃত্ত হও। إِذْ تُفِيْضُوْنَ যখন তোমরা প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও ছোট্ট পিপীলিকা সমান ওজনের বিষয়ও তোমার প্রতিপালক হতে দূর নয় তার অগোচরে নয়। আর তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর এমন কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে নেই।

٦٢. أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ.

৬২. জেনে রাখ! পরকালে আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

٦٣. هُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

৬৩. যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং আদেশ ও নিষেধসমূহ পালন করত আল্লাহকে ভয় করে।

٦٤. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فُسِّرَتْ فِىْ حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرٰى لَهُ وَفِى الْاٰخِرَةِ ط بِالْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط لَا خُلْفَ لِمَوَاعِيْدِهِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৬৪. তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে। একটি হাদীসে তার ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সুসংবাদ হলো মু'মিনগণ যে সৎ স্বপ্ন দেখে বা তাদের সম্পর্কে যা দেখানো হয় তা। হাকেম এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আর পরকালের জীবনেও হলো জান্নাত ও পুণ্যলাভের সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলার কথার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ তাঁর প্রতিশ্রুতির কোনো বরখেলাফ হয় না। তাই অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়টিই মহাসাফল্য।

٦٥. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ لَكَ لَسْتَ مُرْسَلاً وَغَيْرَهُ إِنَّ اِسْتِئْنَافٌ الْعِزَّةَ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ط هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ. بِالْفِعْلِ فَيُجَازِيْهِمْ وَيَنْصُرُكَ.

৬৫. তাদের তুমি প্রেরিত রাসূল নও ইত্যাদি ধরনের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সকল শক্তি ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার; اِنَّ তা এ স্থানে مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নববাক্যমূলক। তিনি সকল কথা শুনেন ও সকল কাজ সম্পর্কে খুবই অবহিতি রাখেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পরিণামফল ভোগ করাবেন আর তোমাকে সাহায্য করবেন।

٦٦. اَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط عَبِيْدًا وَمِلْكًا وَخَلْقًا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ اَصْنَامًا شُرَكَآءَ ط لَهُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ اِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ اِلَّا الظَّنَّ اَىْ ظَنَّهُمْ اَنَّهَا اٰلِهَةٌ تَشْفَعُ لَهُمْ وَاِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ يكذبون فى ذلك.

৬৬. জেনে রাখ! যারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রয়েছে সকলেরই মালিকানা, দাসত্ব, সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার! যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে অর্থাৎ প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার শরিক হিসেবে ডাকে উপাসনা করে অথচ তিনি তা হতে অনেক উর্ধ্বে, তারা কিসের অনুসরণ করে? এ বিষয়ে তারা অনুমান ভিন্ন অন্য কিছুর অনুসরণ করে না। অর্থাৎ এগুলো উপাস্য ও তারা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে এ ধারণা ভিন্ন কিছুই তাদের নেই। আর তারা এ বিষয়ে কেবল মিথ্যাই বলে। اِنْ هُمْ - اِنْ এ স্থানে اِنْ টি না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَخْرُصُوْنَ তারা মিথ্যা ধারণা করে।

٦٧. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِسْنَادُ الْاِبْصَارِ اِلَيْهِ مَجَازٌ لِاَنَّهُ مُبْصِرٌ فِيْهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَاتِّعَاظٍ.

৬৭. তিনিই রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার এবং তিনি দেখবার জন্য দিবস বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাতে রয়েছে নিদর্শন অর্থাৎ তাঁর একত্বের প্রমাণ শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ যারা চিন্তা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছায় শুনে তাদের জন্য। مُبْصِرًا অর্থ– দৃষ্টির অধিকারী। এ স্থানে দিবসের প্রতি এ শব্দটির আরোপ مَجَازٌ বা রূপক। দিন দেখে না বরং তাতে অন্য বস্তু দেখা যায়।

٦٨. قَالُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ سُبْحَانَهُ ط تَنْزِيْهًا لَهُ عَنِ الْوَلَدِ هُوَ الْغَنِىُّ ط عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاِنَّمَا يَطْلُبُ الْوَلَدَ مَنْ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ

৬৮. ইহুদি, খ্রিস্টান এবং যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দুহিতা বলে ধারণা করে তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, তিনি পবিত্র, সন্তান হতে তিনি পাক। তিনি সকল কিছু হতে অমুখাপেক্ষী যে মুখাপেক্ষী সে সন্তানের আশা করে।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا اِنْ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ حُجَّةٍ بِهٰذَا ط اَىِ الَّذِيْ تَقُوْلُوْنَهُ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ -

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেরই মালিকানা, সৃষ্টি, দাসত্ব আল্লাহ তা'আলার। এ বিষয়ে অর্থাৎ তোমরা যা বল সে বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সনদ প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। اِنْ তা এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَتَقُوْلُوْنَ এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ বা হুমকি ও তিরস্কার অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।

٦٩. اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ اِلَيْهِ لَا يُفْلِحُوْنَ لَا يَسْعَدُوْنَ لَهُمْ -

৬৯. বল, সন্তান আরোপ করত যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করবে তারা সফলকাম হবে না। সৌভাগ্যের অধিকারী হবে না।

٧٠. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ فِي الدُّنْيَا يَتَمَتَّعُوْنَ بِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ بِالْمَوْتِ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ -

৭০. পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ, জীবনকালের এ সামান্য সময়ে তারা তা ভোগ করে। পরে মৃত্যুর মাধ্যমে আমারই নিকট হবে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর অর্থাৎ মৃত্যুর পর সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ : এতে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। شَأْنٌ অর্থ- অবস্থা, কর্ম, চিন্তা, গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন। বহুবচনে شُئُوْنٌ। এখানে وَاوٌ হলো عَاطِفَةٌ আর مَا হলো نَافِيَةٌ আর تَكُوْنُ হলো ফে'লে মুযারে' নাকেস তার মধ্যস্থ যমীর হলো তার اِسْمٌ আর فِيْ شَأْنٍ টা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে تَكُوْنُ -এর খবর। আর وَمَا تَتْلُوْا -এর وَاوٌ টি হলো عَاطِفَةٌ আর مَا হলো نَافِيَةٌ আর تَتْلُوْا হলো فِعْلٌ مُضَارِعٌ তার মধ্যস্থ যমীর হলো তার فَاعِلٌ আর مِنْهُ টা تَتْلُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ আর مِنْهُ -এর যমীর قُرْاٰنٌ -এর দিকে বা شَأْنٌ -এর দিকে ফিরবে। তখন مِنْ টা تَعْلِيْلِيَّةٌ হবে আর مِنَ الْقُرْاٰنِ -এর মধ্যে مِنْ টি অতিরিক্ত। আর قُرْاٰنٌ হলো مَحَلًّا مَفْعُوْلٌ بِهٖ

প্রশ্ন. এ সুরতে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হবে।

উত্তর. تَفْخِيْم এবং تَعْظِيْم -এর কারণে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ জায়েজ হয়। مِنْهُ -এর যমীর ضَمِيْرُ شَأْنٍ -ও হতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকেও ফিরতে পারে। যেমন মুফাসসির (র.) اِلَى مِنَ الشَّأْنِ اَوِ اللّٰهِ বলে উভয় সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আপনি কোনো অবস্থার মধ্যে না হন এবং না شَأْنٌ [অবস্থা] তেলাওয়াতের মধ্যে হয়ে থাকেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

قَوْلُهُ خَاطَبَهُ وَاُمَّتَهُ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : হলো এই যে, পূর্বে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছিল। আর এ কারণেই ضَمِيْرٌ -কে مُفْرَدٌ এনেছেন। আর এখানে تَعْمَلُوْنَ -এর মধ্যে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার হয়েছে যা পূর্বের বিপরীত।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হচ্ছে এই যে, এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে উম্মতও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ إِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُودًا : এটা হলো সম্বোধিতগণের ব্যাপক অবস্থা। এটা اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَزْنَ ذَرَّةٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন হলো এই যে, مِثْقَالُ হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের নাম। অথচ এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, মুফাসসির (র.) مِثْقَالٌ -এর তাফসীর وَزْنٌ দ্বারা করে এ আপত্তির উত্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্দেশ্য নয় বরং মতলক وَزْنٌ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ هُمْ : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا -এর মধ্যে عَلَاقَةٌ হলো ظَرْفِيَتْ -এর। যেমন– نَهَارُهُ صَائِمٌ এবং وَلَيْلُهُ قَائِمٌ -এর মধ্যে ظَرْفِيَتْ -এর عَلَاقَةٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ.............. إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط : আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কিছু গোপন নেই : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদের কথা ইরশাদ হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইলম সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আসমান জমিনের কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্রতম বালুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। তিনি সর্বক্ষণ পৃথিবীর সবকিছু শিক্ষা লক্ষ্য করছেন।

بررو علم ایک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پید او پنہان بنزدش یکے است

আল্লাহ তা'আলার নিকট পৃথিবীর একটি বালুকণাও গোপন নয়। এখানকার প্রকাশ্য ও গোপন তাঁর নিকট সবই এক সমান।

আল্লাহ তা'আলার এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দুটি উদ্দেশ্য :

১. কাফের ও মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা যে, তোমরা আমার রাসূল এবং আমার দীনের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা এবং চক্রান্ত করছ তা আমার নিকট গোপন নেই। তোমাদের চক্রান্ত কখনো সফল হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের হেফাজত করবেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেতের হিসাব নেবেন।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, আপনি কাফেরদের শত্রুতা এবং ষড়যন্ত্রে চিন্তিত হবেন না, তাদের কোনো কর্মকাণ্ডই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই, তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডও আল্লাহ তা'আলার নখদর্পণে রয়েছে। আসমান জমিনে যা কিছু আছে এবং হচ্ছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত। হে রাসূল ﷺ ! আপনি যখন যে অবস্থায় থাকেন আর কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত বা সূরা পাঠ করেন সবই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষ করেন। হে মানবজাতি! তোমরা যখন যা কিছু কর এবং যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ কর আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষী থাকেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৪৮২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, যেহেতু হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং তার মরতবা এবং মান সর্বোচ্চ তাই আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এরপর সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হযেছে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আকাশে বা পাতালে একটি বালুকণা পরিমাণ বস্তুও আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই। আর ছোট বড় কোনো কিছুই এমন নেই যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত নেই।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যদিও আসমান-জমিনের উল্লেখ রয়েছে, এর উদ্দেশ্য হলো সমগ্র সৃষ্টিজগৎ কেননা মানুষ আসমান-জমিনকেই দেখে, এর বাইরের কোনো কিছু সাধারণত মানুষের বোধগম্য হয় না।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৫, পৃ. ৫১৬]

কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পবিত্র কুরআনে রয়েছে নসিহত, অন্তরের দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত। কিন্তু যাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় না, তারা পবিত্র কুরআনের এ নিয়ামত থেকে উপকৃত হয় না। ঠিক এমনিভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে যে মহান অনুপম আদর্শ পেশ করেছেন, তারা তাও বরণ করে না, অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষণ তাদের যাবতীয় কার্যক্রম লক্ষ্য করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে আছে- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ অর্থাৎ যদি তুমি তাঁকে নাও দেখতে পার কিন্তু তিনি তোমাকে দেখেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুই তাঁর অগোচর নেই। এমন অবস্থায় কাফের মুশরিকরা কোন সাহসে আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা রচনা করে এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ..... الْفَوْزُ الْعَظِيمُ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাঁদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাঁদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহর ওলী তাদের না থাকবে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহর ওলী হলেন সে সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেজগারি অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও–

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

১. আল্লাহ তা'আলার ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? ২.. ওলী-আল্লাহর সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? ৩. দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহ তা'আলার ওলীদের কোনো ভয়-শঙ্কা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতের তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোনো রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো প্রিয় ও কাজ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোনো বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছবে তাদের সবাইকে ওলীআল্লাহ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলী-আল্লাহর তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তাফসীরকার বলেছেন, ওলী-আল্লাহদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলী-আল্লাহদের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। এ ছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোনো চিন্তা ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হলো এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থি দেখা যায়। কারণ ওলী-আল্লাহর তো কথাই নেই স্বয়ং নবী-রাসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না; বরং তাঁদের ভয়ভীতি অন্যদের তুলনায় বেশিই ছিল। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ। অর্থাৎ ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন। অন্যত্র ওলী-আল্লাহগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে- وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ অর্থাৎ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় করে। কারণ তাদের পালনকর্তার আজাব এমন জিনিস যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক (রা.) সহ অন্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহগণের কান্নাকাটির ঘটনাবলি ও আখেরাতের ভয়ভীতি সন্ত্রস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলী-আল্লাহগণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হলো এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণত যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন; পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধনসম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে– আল্লাহর ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এসবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম আয়েশের কোনো গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম কোনো লক্ষ্য করার মতো বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে; বরং তাঁদের অবস্থা হলো–

نه شادی دا سامانے نه غم أورد نقصانے

به پیش همت ماهرچه امد بود مهمانے

অর্থাৎ না কোনো সম্পদ-সামগ্রী আনন্দ দিতে পারে, না তার কোনো ক্ষতিতে দুঃখ আনতে পারে, আমার সৎসাহসের সামনে যা কিছুই আসে, সবই ক্ষণিকের অতিথি মাত্র।

মহান আল্লাহ তা'আলারও প্রেম-মহত্ত্ব আর তাঁর ভয়ভীতি এসব মনীষীর উপর এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, এর মোকাবিলায় তাদের পার্থিব দুঃখ-বেদনা, আরাম-আয়েশ ও লাভ-ক্ষতির গুরুত্ব তৃণ-কণিকার মতো নয়। কবির ভাষায়–

به ننگ عاشقی هیں سود بوحاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے هیں منزل دیکھنے والے

অর্থাৎ 'প্রেমের চলার পথে যারা লাভের প্রত্যাশা করে, তারা প্রেমের কলঙ্ক। এ প্রান্তরে চলতে গিয়ে যারা মনজিলের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তারা পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহর ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি 'ওলী' শব্দের বহুবচন। আরবি ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো জীবজন্তু এমনকি কোনো বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোনো একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব প্রকৃত উপকরণ হলো সেই সংযোগ যা আল্লাহ তা'আলার সাথে রয়েছে। যদিও এ সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আউলিয়াহ' শব্দে নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং নৈকট্য প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট সে নৈকট্যকে মহব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ; তথা আল্লাহ তা'আলার ওলী। যেমন হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু সে শুনে আমার মাধ্যমেই শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হলো এই যে, তার কোনো গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোনো কাজ আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুত এ বিশেষ ওলিত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রাসূলগণের প্রাপ্য। কারণ প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ স্তর হলো সায়্যিদুল আম্বিয়া নবী করীম ﷺ -এর এবং এ বেলায়েতের

সর্বনিম্ন স্তর হলো সূফী-সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মবিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হলো এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ তা'আলার স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালোবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহর জন্যই করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালোবাসা ও শত্রুতা কোনোটিই নিজের ব্যক্তিগত কোনো কারণে হয় না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো যে তার দেহ মন, বাহ্যাভ্যন্তর সবই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হলো জিকিরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম-আহকামের অনুগত থাকা। এ দুটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকেই ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দুটির কোনো একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দুটিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা ও উচ্চতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এসব স্তরের দিক দিয়েই ওলী-আল্লাহগণের মর্যাদার বেশকম হয়ে যায়।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ -কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ' [আল্লাহর ওলীগণ] বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা পোষণ করে; কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য এর মাঝে থাকে না। [ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে মাহারী] আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

হযরত কাজি সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এ স্তর রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের সেইরূপ, যা মহানবী ﷺ পেয়েছিলেন স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী ﷺ -এর সংসর্গের ফজিলত সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাঁদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফজিলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণই বাড়তে থাকে। এ মাধ্যমে শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ তা'আলার জিকিরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। ১. কোনো ওলীর সংসর্গ, ২. তার আনুগত্য ও ৩. আল্লাহর অধিক জিকির। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, এ জিকির সুন্নত তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ অধিক জিকিরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিস বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিস হলো আল্লাহ তা'আলার জিকির। এ কথাই হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, [একবার] এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে প্রশ্ন করল যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে মহব্বত রাখে, কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌছাতে পারে না। হুজুর ﷺ বললেন- اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ "প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালোবাসে।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলী-আল্লাহগণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত রাযীন (রা.) -কে বললেন যে, তোমাকে দীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি

যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে– তা হলো এই যে, যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করে তাদের তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশি সম্ভব আল্লাহ তা'আলার জিকিরে নিজের জিহ্বা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মহব্বত রাখবে– আল্লাহ তা'আলার জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে– আল্লাহ তা'আলার জন্য করবে। –[মাযহারী]

কিন্তু এ সঙ্গ-সান্নিধ্য তাদেরই লাভজনক, যারা নিজেরাও সুন্নতের অনুসারী ওলী-আল্লাহ। পক্ষান্তরে যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নতের অনুসারী নয়, তারা ওলীত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, তাদের দ্বারা কাশ্‌ফ ও কারামত যতই প্রকাশ পাক না কেন। আর সে লোক উল্লিখিত গুণাবলি অনুযায়ী ওলী হবেন, তাঁর দ্বারা কোনো কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশ না হলেও তিনি ওলী-আল্লাহ। –[মাযহারী]

ওলী-আল্লাহগণের লক্ষণ ও পরিচয় প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে একখানি হাদীস হাদীসে কুদসীতে উদ্ধৃতিক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে সে সব লোকই আমার আওলিয়া, যারা আমার স্মরণের সাথে স্মরণে আসে এবং যাদের স্মরণের সাথে আমি স্মরণে আসি।" আর ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ওলী-আল্লাহদের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেন– اَلَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ অর্থাৎ যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা মনে হয় তারাই ওলী।

সারমর্ম এই যে, যাদের সান্নিধ্যে বসে মানুষ আল্লাহ তা'আলার জিকিরের তাওফীক লাভ করতে পারে এবং দুনিয়ার মায়া কম অনুভূত হয়, এই হলো তাদের ওলী-আল্লাহ হওয়ার লক্ষণ।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্‌ফ-কারামত ও গায়বি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোঁকা। হাজার হাজার ওলী-আল্লাহ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাঁদের দ্বারা এ ধরনের কোনো বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্‌ফ ও গায়বি সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আয়াতের শেষাংশে যে বিষয়টি বলা হয়েছে, ওলী-আল্লাহদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সুসংবাদ– তাতে আখেরাতের সুসংবাদ হলো এই যে, মৃত্যুর পর তার রূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। পরে কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উঠবে তখনও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। যেমন, ইমাম তাবারানী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন "যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর অনুসারী মৃত্যুকালেও তাদের কোনো ভয় হবে না, কবরেও নয় এবং কবর থেকে উঠার সময়েও নয়। আমার চোখ যেন তখনকার অবস্থা দর্শন করছে, যখন মানুষ কবর থেকে মাটি [ধুলাবালি] ঝাড়তে ঝাড়তে এবং একথা বলতে বলতে উঠবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া যিনি আমাদের চিন্তাভাবনা দূর করে দিয়েছেন।

আর দুনিয়ার সুসংবাদ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন, যে সমস্ত সত্য স্বপ্ন যা মানুষ নিজে দেখে কিংবা তাদের জন্য কেউ দেখতে পায়, যাতে তাদের জন্য সুসংবাদ বিদ্যমান থাকে। –[এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন।]

এ ছাড়া পৃথিবীর অপর সুসংবাদ হলো এই যে, সাধারণ মুসলমান কোনো রকম স্বার্থপরতা ব্যতিরেকে তাকে ভালোবাসে এবং ভালো মনে করে। এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের ভালো মনে করা এবং প্রশংসা করা অপর মু'মিনের একটি নগদ সুসংবাদ। –[মুসলিম ও বগবী]

অনুবাদ :

৭১. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ أَيْ كُفَّارِ مَكَّةَ نَبَأَ خَبَرَ نُوْحٍ وَيُبْدَلُ مِنْهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ شَقَّ عَلَيْكُمْ مُقَامِيْ لُبْثِيْ فِيْكُمْ وَتَذْكِيْرِيْ وَعْظِيْ إِيَّاكُمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ اَعْزِمُوْا عَلٰى اَمْرٍ تَفْعَلُوْنَهُ بِيْ وَشُرَكَاۤءَكُمْ اَلْوَاوُ بِمَعْنٰى مَعَ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً مَسْتُوْرًا بَلْ اَظْهِرُوْهُ وَجَاهِرُوْنِيْ بِهٖ ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ اَمْضُوْا فِيَّ مَا اَرَدْتُّمُوْهُ وَلَا تُنْظِرُوْنِ تُمْهِلُوْنِ فَاِنِّيْ لَسْتُ مُبَالِيًا بِكُمْ.

৭১. হে মুহাম্মদ ﷺ তাদের মক্কার কাফেরদের নিকট নূহের বৃত্তান্ত তার কাহিনী শুনাও, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দ্বারা তোমাদেরকে আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় কষ্টদায়ক হয় তবে আমি তো আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করি। যাদেরকে শরিক কর তাদের সহ তোমরা তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও অর্থাৎ আমার সাথে তোমরা যা করতে চাও সে সম্পর্কে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও আর তোমাদের নিকট তোমাদের সেই সিদ্ধান্ত যেন গোপন না থাকে বরং তা প্রকাশ করে দাও এবং আমাকেও তা জানিয়ে দাও এবং আমার বিষয়ে তোমাদের কাজ নিষ্পন্ন করে ফেল, অর্থাৎ আমার বিষয়ে তোমরা যা চাও তা সমাধা করে ফেল আর আমাকে অবসর দিও না। অবকাশ দিও না। আমি তোমাদের বিন্দুমাত্রও পরোয়া করি না। إِذْ قَالَ টা نَبَأَ نُوْحٍ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। تَذْكِيْرِيْ অর্থ আমার উপদেশ প্রদান। وَشُرَكَاۤءَكُمْ তার وَ টি এ স্থানে مَعَ [সহ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غُمَّةً অর্থ গোপন।

৭২. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ تَذْكِيْرِيْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ط ثَوَابٍ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا اِنْ مَا اَجْرِيَ ثَوَابِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৭২. তোমরা আমার উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে তা নাও আমি তো তোমাদের নিকট বিনিময় তার প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান পুণ্যফল তো আল্লাহ তা'আলারই নিকট। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি। إِنْ أَجْرِيَ এ إِنْ টি না- বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭৩. فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهُمْ اَيْ مَنْ مَّعَهٗ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج بِالطُّوْفَانِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ مِنْ اِهْلَاكِهِمْ فَكَذٰلِكَ نَفْعَلُ مَنْ كَذَّبَكَ.

৭৩. অনন্তর তারা তাকে অস্বীকার করে। আর আমি তাকে ও নৌকায় যারা তার সঙ্গে ছিল তাদেরকে উদ্ধার করি তাদেরকে অর্থাৎ তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করি এবং যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে তুফানে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের কিরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। তোমাকে যারা অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারেও আমি ঠিক তদ্রূপ করব। اَلْفُلْكِ অর্থ নৌযান।

٧٤. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ اَيْ نُوحٍ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ كَاِبْرَاهِيْمَ وَهُوْدَ وَصَالِحٍ فَجَاءُ وْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ اَيْ قَبْلَ الْبَعْثِ الرُّسُلِ اِلَيْهِمْ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ فَلَا تَقْبَلُ الْاِيْمَانَ كَمَا طَبَعْنَا عَلٰى قُلُوْبِ اُولٰئِكَ.

৭৪. অনন্তর তার পরে হযরত নূহ (আ.)-এর পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করি যেমন– হযরত ইবরাহীম, হযরত হূদ, হযরত সালেহ (আ.) প্রমুখ তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ মু'জিযাসহ এসেছিল। কিন্তু তারা পূর্বে অর্থাৎ তাদের নিকট রাসূলগণের আগমনের পূর্বে যা অস্বীকার করেছিল তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মতো ছিল না। এভাবে অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে যেমন মোহর করে দিয়েছিলাম তেমনি আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে মোহর করে দেই। অনন্তর তাদের ঈমান আর কবুল করা হয় না। نَطْبَعُ অর্থ আমরা মোহর করে দেই।

٧٥. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ قَوْمِهِ بِاٰيٰتِنَا التِّسْعِ فَاسْتَكْبَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَكَانُوْا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ.

৭৫. অতঃপর আমার নয়টি নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফেরাউন ও তার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু তারা এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করে, আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। مَلَأٌ অর্থ– পরিষদবর্গ, সম্প্রদায়।

٧٦. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُبِيْنٌ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ.

৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার নিকট হতে সত্য আসল, তখন তারা বলল, তা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু। مُبِيْنٌ অর্থ– সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

٧٧. قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اِنَّهُ لَسِحْرٌ اَسِحْرٌ هٰذَا ط وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَتٰى بِهِ وَاَبْطَلَ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاِنْكَارِ.

৭৭. মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের নিকট আসল তৎসম্পর্কে তোমরা কি বলতেছ যে, এটা জাদু এটা কি জাদু? যিনি তা নিয়ে এসেছেন তিনি তো সফলকাম হলেন আর জাদুকরদের জাদু নিষ্ফল প্রমাণিত হয়ে গেল। কারণ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না। اَتَقُوْلُوْنَ এবং أَسِحْرٌ এ উভয় স্থানেই اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

٧٨. قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا لِتَرُدَّنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ الْمُلْكُ فِي الْاَرْضِ ط اَرْضِ مِصْرَ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا مُؤْمِنِيْنَ مُصَدِّقِيْنَ.

৭৮. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা হতে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে ফিরাতে আমাদের নিকট এসেছ? এবং দেশে অর্থাৎ মিশর ভূমিতে যাতে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয় সেজন্য? আমরা তোমাদের দুজনের উপর বিশ্বাস রাখি না। তোমাদের বিষয়ে আমরা প্রত্যয়ী নই।

অনুবাদ :

٧٩. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ فَائِقٍ فِىْ عِلْمِ السِّحْرِ .

৭৯. ফেরাউন বলল, তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ জাদুকরদেরকে যারা জাদু বিদ্যায় সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাদেরকে নিয়ে আস।

٨٠. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى بَعْدَ مَا قَالُوْا لَهُ إِمَّا أَنْ تُلْقِىَ وَإِمَّا أَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ .

৮০. অতঃপর যখন জাদুকররা আসল তখন মূসা তাদেরকে বলল, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর। হযরত মূসা (আ.) -কে তারা বলেছিল, 'তুমি নিক্ষেপ করবে না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করব।' তখন হযরত মূসা (আ.) ঐ কথা বলেছিলেন।

٨١. فَلَمَّا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ قَالَ مُوْسٰى مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ط بَدَلٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِهَمْزَةٍ إِخْبَارٌ فَمَا مَوْصُوْلَةٌ مُبْتَدَأٌ إِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ ط سَيَمْحَقُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ .

৮১. যখন তারা তাদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়া নিক্ষেপ করল তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা যা নিয়ে আনলে তা জাদু। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্র তা নিষ্ফল করে দেবেন। অসার করবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। مَا جِئْتُمْ بِهِ এ مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবোধক। তা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَر বা বিধেয় হলো جِئْتُمْ بِهِ। اَلسِّحْرُ তা بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। অপর এক কেরাতে তা একটি হামযাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা خَبَر বা বিধেয় বলে গণ্য হবে। আর مَا جِئْتُمْ بِهِ-এর مَا টি مَوْصُوْلَه বা সংযোজক অব্যয়রূপে مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য বলে গণ্য হবে।

٨٢. وَيُحِقُّ يُثَبِّتُ وَيُظْهِرُ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ بِمَوَاعِيْدِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ .

৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তা'আলা তার কথা অনুসারে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, সুদৃঢ় ও প্রকাশিত করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاتْلُ : এটা اَمْر টা فِعْل যা عِلَّتْ حَرْف উহ্য থাকার উপর مَبْنِىٌّ মূলে ছিল وَاتْلُوْ শেষের وَاو টিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। عَلَيْهِمْ এটা اُتْلُ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। نَبَأَ نُوْحٍ এটা مُرَكَّب اِضَافِىْ হয়ে مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। إِذْ قَالَ-এর نَبَأَ টা إِذْ قَالَ হলো ظَرْفِيَّة যা مَاضِىْ-এর জন্য। এটা نَبَأَ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। إِذْ-এর مُتَعَلِّقٌ ও হতে পারে। نُوْحٍ-এর উপর ওয়াকফ করা আবশ্যক। কেননা إِذْ قَالَ-এর সম্পর্ক اُتْلُ-এর সাথে অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে জায়েজ নেই। কেননা اُتْلُ হলো مُسْتَقْبِلْ এবং ظَرْف হচ্ছে مَاضِىْ এ সুরতে অনুবাদ হবে যে, তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত শুনাও যখন হযরত নূহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল। অথচ এটা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ لِقَوْمِهِ : এর মধ্যে لَامْ টা تَبْلِيْغ-এর জন্য হয়েছে। مَقَامٌ [مِيْم বর্ণে যবর] অর্থ হলো– দাঁড়ানোর স্থান, মর্যাদা, ঘর, উদ্দেশ্য হলো নিজের অস্তিত্ব। আর مُقَامٌ [مِيْم বর্ণে পেশ] অর্থ– দাঁড়ানো, অবস্থান করা, اَلْقِيَامُ عَلَى الدَّعْوَةِ خِلَالَ مُدَّةِ اللُّبْثِ যেহেতু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সাধারণত দাঁড়িয়েই করা হয়।

قَوْلُهُ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ : এটা হলো إِنْ كَانَ كَبُرَ -এর جَزَاء আর যদি فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ -কে جُمْلَة مُعْتَرِضَة মানা হয় তবে فَاجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ টা جَوَاب شَرْط হবে।

قَوْلُهُ فَاجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ : এর তাফসীর اِعْزِمُوْا عَلٰى أَمْرٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, أَجْمِعْ টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং مُتَعَدِّىْ بِالْحَرْفِ ও হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ غُمَّةً : অর্থ– বায়ু বন্ধ হওয়ার কারণে এমন গরম যে দম বন্ধ হয়ে আসে, অন্ধকার, সংশয়, গোপন, কঠিন, যখন চাঁদ ডুবে যায় তখন আরবগণ বলে থাকেন– غُمَّ الْهِلَالُ

قَوْلُهُ وَاوُ بِمَعْنٰى مَعَ : অর্থাৎ شُرَكَاءَ এটা مَفْعُوْل مَعَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এর দ্বারা এ সংশয়কে বিদূরিত করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকাশ্যভাবে شُرَكَاءَ -এর عَطْف হয়েছে اَجْمِعُوْا -এর ফায়েলের যমীরের উপর। অর্থাৎ তোমরা শরিকগণ তোমাদের কৌশলকে মজবুত করে নাও। এ হিসেবে شُرَكَاءُ টা মারফূ' হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اِنَّهٗ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ اَسِحْرٌ هٰذَا : এখানে قَالَ হলো ফে'ল ও ফায়েল مُوْسٰى ও فِعْل হলো تَقُوْلُوْنَ আর اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ -এর মধ্যে হামযাটা হলো اَتَقُوْلُوْنَ। تَقُوْلُوْنَ এটা اِنَّهٗ لَسِحْرٌ এটা لَمَّا جَاءَكُمْ এটা تَقُوْلُوْنَ -এর ظَرْف হয়েছে। مُتَعَلِّقٌ -এর সাথে تَقُوْلُوْنَ এটা اَنْتُمْ لِلْحَقِّ -এর مَقُوْلَهْ যা উহ্য রয়েছে। পূর্ণবাক্য قَالَ مُوْسٰى -এর مَقُوْلَة حِكَائِىْ হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উক্তি নকল করেছেন।

قَوْلُهُ اَسِحْرٌ هٰذَا : এ উক্তি উহ্য মূসার مَقُوْلَة আর هٰذَا হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ আর وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ হলো جُمْلَة حَالِيَة

ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اِنَّهٗ لَسِحْرٌ هٰذَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী اَسِحْرٌ هٰذَا টা يَقُوْلُوْنَ -এর مَقُوْلَة নয়; বরং তার مَقُوْلَة উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اِنَّهٗ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ এ উহ্য করার قَرِيْنَة হলো এই যে, ফেরাউনরা অকাট্যভাবে সংবাদের ভিত্তিতে اِسْتِفْهَامٌ -এর ভিত্তিতে নয়, হযরত মূসা (আ.) -এর মো'জিযাকে জাদু স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَسِحْرٌ هٰذَا এটা হযরত মূসা (আ.) -এর مَقُوْلَة। অর্থ হলো এই যে, হে ফেরাউন সম্প্রদায়! তোমরা এই সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত বাস্তবতাকে জাদু বলতেছ, তোমাদের এ সকল কথা যা বাস্তবতার বিরোধী কিছুতেই মুখ থেকে বের না করা উচিত।

উল্লিখিত তারকীব প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে হয়েছে।

প্রশ্ন. হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উক্তির বর্ণনা اِسْتِفْهَامٌ -এর ভিত্তিতে অর্থাৎ اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا؛ দ্বারা কেন করলেন? অথচ ফেরাউন দৃঢ়তা ও اِخْبَارٌ -এর ভিত্তিতে অকাট্যতার স্বীয় বাক্যকে اِنَّ এবং لَامٌ দ্বারা তাকিদ করে বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ

উত্তর. এতে ফেরাউনের مَقُوْلَة حِكَائِىْ উহ্য রয়েছে। আর উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ এর জবাবে হযরত হারুন (আ.) তাদের উক্তির অস্বীকার করে বলেন– اَسِحْرٌ هٰذَا [এটা কি জাদু?] বাস্তবতা বিরোধী এমন কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বের না করাই উচিত।

قَوْلُهُ بَدَلٌ : অর্থাৎ اَلسِّحْرُ টা مَا جِئْتُمْ بِهٖ থেকে মুবতাদা উহ্য থাকার সাথে بَدَل হয়েছে। অর্থাৎ هُوَ السِّحْرُ কাজেই এ আপত্তি শেষ হয়ে গেল যে, مُفْرَدٌ টা جُمْلَة থেকে بَدَل হতে পারে না।

قَوْلُهُ فِىْ قِرَاءَةٍ : অর্থাৎ আবূ আমরের কেরাতে اَسِحْرٌ هٰذَا -এর মধ্যে একটি هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامِيَّة রয়েছে। ঐ কেরাত অনুসারে اَىُّ شَىْءٍ جِئْتُمْ بِهٖ هُوَ -এর মধ্যে مَا جِئْتُمْ টা مَا টা اِسْتِفْهَامِيَّة হবে আর اَلسِّحْرُ টা مَا হতে بَدَل হবে অর্থাৎ جِئْتُمْ بِهٖ আর অন্য কেরাতে একটি هَمْزَةِ اِخْبَارٌ -এর সাথে এ সুরতে مَا টা مَوْصُوْلَة মুবতাদা হবে। আর السِّحْرُ টা তার صِلَة হবে। আর اَلسِّحْرُ তার খবর হবে। অর্থাৎ اَلَّذِىْ جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ لَا الَّذِىْ جِئْتُ بِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْحٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত এবং কিয়ামতের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং দীন ইসলামের দুশমনদের তরফ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এবং কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার লক্ষ্যে পূর্বকালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে আরববাসী এই সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, দুনিয়ার শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এক কথায় কোনো কিছুই মানুষকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, এখানকার সুখ-সামগ্রী অবশেষে মানুষকে চিরতরে ছেড়ে যেতে হয়। কোনো কিছুই মানুষের চিরস্থায়ী হয় না। যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের শাস্তি অবধারিত। শাস্তি আসতে হয়তো বিলম্ব হয় কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পন্থা থাকে না।

হযরত নূহ (আ.) -কে 'আদমে ছানী' বলা হয়। মানব জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর যুগেই মানুষ মূর্তি পূজা শুরু করে। যদিও হযরত আদম (আ.)-ই সর্বপ্রথম মানুষ, সর্বপ্রথম নবী-রাসূল, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তবে হযরত আদম (আ.)-এর জমানায় কুফর ও নাফরমানি ছিল না। হযরত আদম (আ.)-এর দশ যুগ পর কুফরি এবং নাফরমানি শুরু হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন যেন তিনি কাফেরদেরকে তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে রাজি হয়নি। সুদীর্ঘ বছর ধরে হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য পথের নির্দেশনা দিতে থাকেন কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। এরপর হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জন্য এসেছে আল্লাহর আজাব। প্রলয়ঙ্করী বন্যা এসে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ : হযরত নূহ (আ.) শতাব্দীর পর শতাব্দী তার সম্প্রদায়কে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। কুফর ও নাফরমনি পরিত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। দীন ইসলাম গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উপহাস করেছে। অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাবের আদেশ হয়। প্রলয়ঙ্করী বন্যা এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ ঐতিহাসিক বন্যার আক্রমণ থেকে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনগণই রক্ষা পেয়েছিলেন। তাই ইরশাদ হয়েছে– نَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ অর্থাৎ অতঃপর আমি নূহ এবং তাঁর সঙ্গের মু'মিনদেরকে রক্ষা করি। আর অবাধ্য কাফেররা সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : যারা সেদিন আসমানি গজব থেকে রক্ষা পেয়েছিল সমগ্র বিশ্বমানব তাদেরই বংশধর। যারা সেদিন নিমজ্জিত হয়েছেন তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল এ মু'মিনগণ। বলাবাহুল্য, কয়েকজন মু'মিনের ঈমানের বরকতেই সেদিন মানব জাতির বংশ সংরক্ষিত থাকে। অতএব, বিশ্ববাসীর জন্যে রয়েছে এতে বিরাট শিক্ষা যারা সত্যের মোকাবিলা করেছে, আল্লাহ তা'আলার নবীকে যারা মিথ্যা জ্ঞান করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নবীর মোকাবিলায় কাফের মুশরিকদের অগাধ ধন- সম্পদ এবং ক্ষমতা প্রতাব প্রতিপত্তি কোনো কিছুই কাজে লাগেনি; বরং তাদের অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান কোথায় হয়েছে : তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, এ ঐতিহাসিক প্লাবণ হয়েছে ইরাকের দজলা এবং ফোরাত নদীর মধ্য এলাকায়। ঐতিহাসিকগণ ঐ এলাকার জরিপ কার্য চালিয়েছেন এবং পরিমাপ করেছেন। প্রায় চার'শ মাইল দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে একশত মাইল এলাকায় এ প্লাবন এসেছিল। হযরত নূহ (আ.) –কে আল্লাহ তা'আলা যে তরী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা দৈর্ঘ্যে তিনশত হাত এবং প্রস্থে ছিল পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। এর

অর্থ হলো বর্তমান যুগে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে যেসব জাহাজ চলাচল করে তার সমানই ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজ। যারা আল্লাহ তা'আলার রহমতে আল্লাহ তা'আলার নবীর অনুসরণের বরকতে সেদিন প্রলয়ঙ্করী বন্যার শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তারাই পুনরায় সেই এলাকায় আবাদ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিগণ এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, তদানীন্তনকালে হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোনো সম্প্রদায় ছিল না।

–[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৪৪৯]

যারা রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা :

قَوْلُهُ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : এ বাক্যটির তাফসীরে আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, যারা হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু যারা হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রলয়ঙ্করী বন্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন পুরুষ এবং চল্লিশজন নারী। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ. ১১, পৃ. ১৬০]

অতএব, লক্ষ্য কর যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখানো হয়েছিল সেই অবাধ্য কাফেরদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে। ক্ষণিকের মধ্যে তাদেরকে কিভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। এটি অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয়।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

অর্থাৎ দুনিয়া মন বসাবার স্থান নয়, এটি হলো শিক্ষা গ্রহণের স্থান, খেল-তামাশার স্থান এটি নয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনের অবশিষ্ট নিদর্শনাবলি : হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের নিদর্শনাবলি সাইন্স বিশেষজ্ঞরা আজও হযরত নূহ (আ.)-এর ভূমিতে খুঁজে পাচ্ছেন। এ প্লাবন ইরাকের দজলা নদী ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে হয়েছিল। এ এলাকার পরিসীমা বর্তমান বিশেষজ্ঞগণের অনুমানের ভিত্তিতে দৈর্ঘ্য চারশত মাইল এবং প্রস্থ একশত মাইল ছিল। –[মাজেদী]

তাওরাতের ভাষ্য মতে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ [তিনশত] হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ [পঞ্চাশ] হাত এবং ত্রিশ হাত উঁচু ছিল। –[মাজেদী]

হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর একনিষ্ঠ মু'মিনগণ পুনরায় এ এলাকায়ই বসতি স্থাপন করেন এবং তাদের সূত্র ধরেই নতুনভাবে মানব বিস্তার ঘটে। মানুষ বসতির ইতিহাস প্রথম যুগে শুধুমাত্র এই সীমার ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কারণেই যে সকল মুফাসসিরগণ হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবন সমগ্র বিশ্বব্যাপী হওয়ার দাবি করেছিল তারা কোনোই ভুল করেননি। সে কালে পৃথিবীর বসতি ইরাক ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল।

قَوْلُهُ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ : এ আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে মহর মেরে দেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারী এ লোকেরা একবার ভুল করে যাওয়ার পর পুনরায় স্বীয় জিদ, বক্রতা ও হটধর্মীর কারণে নিজেদের ভুলের উপর অনড় থাকে এবং যে কথার একবার অস্বীকার করে তাকে পুনরায় কোনো বুঝ ও জ্ঞানগর্ভ দলিলও তাকে মানাতে সক্ষম হয় না। ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের এ মানসিকতা অদ্যাবধি চলে আসছে। যেখানে একবার না বুঝেশুনে না বলে দিয়েছে, ব্যস শেষ পর্যন্ত তাতেই সুদৃঢ় থাকে। এ জাতীয় লোকদের উপরই আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ পড়ে যে, তারা পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসার তৌফিক প্রাপ্ত হয় না।

قَوْلُهُ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ : অর্থাৎ ফেরাউন স্বীয় ধন-দৌলত, রাজত্ব, শান-শওকত ও শ্রেষ্ঠত্বে মাতল হয়ে নিজেই নিজেকে উপাসনার থেকে বহু উর্ধ্বে মনে করে নিয়েছে এবং আনুগত্যের জন্য মাথা নত করার পরিবর্তে বাবুয়ানা ও বিলাসিতা দেখাতে শুরু করে দেয়।

অনুবাদ :

٨٣. فَمَا آمَنَ لِمُوْسٰى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ طَائِفَةٌ مِّنْ أَوْلَادِ قَوْمِهٖ أَيْ فِرْعَوْنَ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَّفْتِنَهُمْ ط يَصْرِفَهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ بِتَعْذِيْبِهٖ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ مُتَكَبِّرٍ فِي الْأَرْضِ ج أَرْضِ مِصْرَ وَإِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ . الْمُتَجَاوِزِيْنَ الْحَدَّ بِادِّعَاءِ الرُّبُوْبِيَّةِ .

৮৩. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ বিপদে ফেলবে অর্থাৎ তাদেরকে নির্যাতন করে দিন হতে ফিরিয়ে দিবে এই আশঙ্কা নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ফেরাউন বংশের কিছু সন্তান ব্যতীত অর্থাৎ তাদের একদল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে অর্থাৎ মিশর ভূমিতে প্রতিপত্তিশালী অহংকারী ছিল এবং সে নিজের রব হওয়ার দাবি করায় ন্যায়লঙ্ঘনকারীদের অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٨٤. وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ .

৮৪. মূসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক তবে তোমরা তারই উপর নির্ভর কর।

٨٥. فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ . أَيْ لَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَا فَيَظُنُّوْا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ فَيَفْتِنُوْا بِنَا .

৮৫. অতঃপর তারা বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না। অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর জয়ী করিও না। কেননা তাতে তারা মনে করবে যে, তারা ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে আমাদেরকে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করবে।

٨٦. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ .

৮৬. এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।

٨٧. وَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوْسٰى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّآ اِتَّخِذَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً مُصَلًّى تُصَلُّوْنَ فِيْهِ لِتَأْمَنُوْا مِنَ الْخَوْفِ وَكَانَ فِرْعَوْنُ مَنَعَهُمْ مِنَ الصَّلٰوةِ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ أَتِمُّوْهَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْجَنَّةِ .

৮৭. আমি মূসা ও তার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য আবাসস্থল বানাও গৃহ স্থাপন কর। এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা সালাতস্থল বানাও। আশঙ্কা হতে নিরাপদ থাকার জন্য তাতেই তোমরা সালাত আদায় কর। ঐ সময় ফেরাউন তাদেরকে সালাত হতে বারণ করে দিয়েছিল। সালাত কায়েম কর। অর্থাৎ তা পূর্ণভাবে সমাধা কর এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য বিজয় ও জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ج رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ اٰتَيْتَهُمْ ذٰلِكَ لِيُضِلُّوْا فِىْ عَاقِبَتِهٖ عَنْ سَبِيْلِكَ ع دِيْنِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ اِمْسَخْهَا وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِطْبَعْ عَلَيْهَا وَاسْتَوْثِقْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ الْمُؤْلِمَ دَعَا عَلَيْهِمْ وَاَمَّنَ هٰرُوْنُ عَلٰى دُعَائِهٖ

৮৮. মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি তা দিয়েছ যদ্দ্বারা পরিণামে তারা তোমার পথ হতে তোমার দীন হতে গুমরাহ করতে পারে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ তুমি বিনষ্ট করে দাও তাদের আকৃতি বিকৃতি করে দাও, তাদের হৃদয় কঠোর করে দাও, সীলমোহর করে শক্ত করে দাও, মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত যেন তারা বিশ্বাস আনয়ন না করে। হযরত মূসা তাদের বিরুদ্ধে এই দোয়া কবুল করেছিলেন আর হযরত হারুন (আ.) তার দোয়ার সাথে আমিন বলেছিলেন।

قَالَ تَعَالٰى قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَمُسِخَتْ اَمْوَالُهُمْ حِجَارَةً وَلَمْ يُؤْمِنْ فِرْعَوْنُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ فَاسْتَقِيْمَا عَلَى الرِّسَالَةِ وَالدَّعْوَةِ اِلٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ فِى اسْتِعْجَالِ قَضَائِىْ رُوِىَ اَنَّهٗ مَكَثَ بَعْدَهَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ

৮৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাদেরকে দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো। ফলে তাদের সম্পদসমূহ পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল আর নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষণ পর্যন্ত ফেরাউন বিশ্বাস স্থাপন করেনি। সুতরাং তাদের উপর আজাব না আসা পর্যন্ত তোমরা উভয়েই রিসালাত ও ন্যায়ের দিকে আহ্বানের কাজে দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনো আমার ফয়সালা আসার শীঘ্রতা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তাদের পথ অনুসরণ করিও না। বর্ণিত আছে যে, তারপর আরো চল্লিশ বছর তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ لَحِقَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ط مَفْعُوْلٌ لَهٗ حَتّٰى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ اَىْ بِاَنَّهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ كَرَّرَهٗ لِيُقْبَلَ مِنْهُ فَلَمْ تُقْبَلْ وَدَسَّ جِبْرِيْلُ فِىْ فِيْهِ مِنْ حَمْاَةِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ اَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ ـ

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন এবং তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হয়ে ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তাদের সাথে এসে মিলিত হলো। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হলো বলল, আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, যার উপর বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কবুলের আশায় সে তার ঈমান আনার কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। কিন্তু তার ঈমান কবুল করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার রহমত পেয়ে যাবে এ আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরাউনের মুখে সমুদ্রের কালো কাদা ঠেসি ধরেছিলেন। بَغْيًا وَّعَدْوًا এটা এস্থানে مَفْعُوْل বা হেতুবোধক কর্মকারকরূপে ব্যবহৃত রয়েছে। اَنَّهٗ তা এস্থানে بِاَنَّهٗ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে তা مُسْتَانِفَةٌ বা নববাক্যরূপে হামযার কাসরাসহ পঠিত রয়েছে।

٩١. أَالْئٰنَ تُؤْمِنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ . بِضَلَالِكَ وَاِضْلَالِكَ عَنِ الْاِيْمَانِ .

৯১. হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এতক্ষণে ঈমান আনতেছ? ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ আর তুমি নিজের পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যকেও ঈমান হতে পথভ্রষ্ট করে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

٩٢. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الْبَحْرِ بِبَدَنِكَ جَسَدِكَ الَّذِىْ لَا رُوْحَ فِيْهِ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ بَعْدَكَ اٰيَةً عِبْرَةً فَيَعْرِفُوْا عُبُوْدِيَّتَكَ وَلَا يُقْدِمُوْا عَلٰى مِثْلِ فِعْلِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ شَكُّوْا فِىْ مَوْتِهٖ فَاُخْرِجَ لَهُمْ لِيَرَوْهُ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ لَا يَعْتَبِرُوْنَ .

৯২. আজ আমি তোমার দেহ তোমার নিষ্প্রাণ শব রক্ষা করব সমুদ্র হতে বের করে নিব [যাতে তুমি তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য] পরবর্তীদের জন্য [নিদর্শন] শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত [হয়ে থাক।] অনন্তর তারা যেন চিনতে পারে তুমি একজন দাস মাত্র এবং তোমার মতো আচরণ করতে যেন তারা অগ্রণী না হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের কেউ কেউ তার মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল। সেহেতু তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তার লাশটি বের করে আনা হয়েছিল। অবশ্য মানুষের মধ্যে মক্কাবাসীদের মধ্যে অন্যকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান। এটা হতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ : فَاء হলো আতেফা مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। যা سِيَاقْ দ্বারা বুঝা যায়। আর তা হলো فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ আর فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى -এর অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর কথা মানেনি। এটাকে اِيْمَانٌ بِالتَّسْلِيْمِ বলা হয়। এটা مُتَعَدِّىْ بِاللَّامِ হয়। আর এটাকে اِيْمَانْ بِالتَّصْدِيْقِ হয়ে থাকে। আর সেটা مُتَعَدِّىْ بِالْبَاءِ হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ ذُرِّيَّةٌ : ذُرِّيَّةٌ শব্দের ذَالْ বর্ণে তিন ধরনের হরকতই হতে পারে। ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ অর্থ হলো– সন্তান সন্তুতি, বংশ। বহুবচনে ذَرَارِىُّ ; ذُرِّيَّاتٌ এখানে ذرية টা قِلَّتْ عَدَدْ -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। মুফাসসির (র.) ذُرِّيَّةٌ -এর তাফসীর طَائِفَةٌ দ্বারা করে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাফসীরে কাবীরে রয়েছে যে, هٰهُنَا مَعْنَاهَا التَّقْلِيْلُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, ذُرِّيَّةٌ শব্দটি যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর বলা হয় তখন এর দ্বারা تَحْقِيْر বা تَصْغِيْر উদ্দেশ্য হয়। قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَفْظُ الذُّرِّيَّةِ يُعَبَّرُ بِهٖ عَنِ الْقَوْمِ عَلٰى وَجْهِ التَّحْقِيْرِ وَالتَّصْغِيْرِ (كَبِيْر) যেহেতু এখানে تَحْقِيْر -এর কোনো قرينة নেই এ কারণে تصغير عدد -ই উদ্দেশ্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنْ قَوْمِهٖ : قَوْمِهٖ -এর যমীরটি দুটি ভিন্নমুখী অর্থ সৃষ্টি করে দিয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথম সুরতে উদ্দেশ্য এই নেওয়া হবে যে, ফেরাউন ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের ভয়ে শুরুতে ইসরাঈলীদের খুব কম লোকই হযরত মূসা (আ.) কথার সত্যায়ন করেছে। আর দ্বিতীয় সুরতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক জামাত উদ্দেশ্য হবে। যাতে সে সকল জাদুকররাও অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মূসা (আ.) মোকাবিলা করার জন্য এসেছিল এবং তাদের ব্যতীত ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, ফেরাউনের ট্রেজারার ও তার স্ত্রী, ফেরাউনের মেয়ের মাথা চিরুনি কারিণী এবং رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ও এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় شِقّ পছন্দ করে قَوْمِهٖ -এর যমীরকে ফেরাউনের দিকে ফিরিয়েছেন।

قَوْلُهُ أَرْضِ مِصْرَ : এতে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন فِى الْأَرْضِ-এর মধ্যে أَلِفْ لَامْ টি عَهْدِى-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّنَ هَارُونُ عَلٰى دُعَائِهِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, বদদোয়া তো হযরত মূসা (আ.) করেছেন। এরপরও قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا -এর মধ্যে দ্বি-বচনের শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো?

উত্তরের সারকথা হলো, দোয়া করা এবং দোয়ার উপর اٰمِيْن বলা একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ حَمَإٍ : অর্থ– কালো মাটির কাঁদা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতে হযরত মূসা ও হারুন (আ.) এবং বনী ইসরাঈল ও ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তাহলো এই যে, বনী ইসরাঈল যারা হযরত মূসা (আ.)-এর দীনের উপর আমল করতো তাদের সবাই অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের 'সওমাআহ' তথা উপাসনালয়েই নামাজ আদায় করতো। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী ﷺ -এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনোখানে ইচ্ছা নামাজ আদায় করে নিতে পারে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মাঝে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা জমিনকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে; সব জায়গাতেই নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে এটা আলাদা কথা যে ফরজ নামাজসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে. নফল নামাজ ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরজ নামাজই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যাহোক বনী ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামাজ আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপাসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল যাতে এরা নিজেদের ধর্মানুযায়ী নামাজ পড়তে না পারে। একই কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উভয় পয়গাম্বর হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-কে এ নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনী ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহনির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামাজ আদায় করতে পারে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপাসনালয়েই নামাজ পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামাজ আদায় করে নেওয়ার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে যে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছিল যা কিবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামাজ পড়ার অনুমতি তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী ﷺ -এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোনো নগরে কিংবা মাঠে যে কোনো স্থানে নামাজ আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী]

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মতো যে, এ আয়াতে বনী ইসরাঈলদেরকে যে কিবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এ কোন কিবলা ছিল? কা'বা ছিল, না বায়তুল মুকাদ্দাস? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য; বরং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আ.) ও তার আসহাবের কেবলা। –[কুরতুবী, রুহুল মা'আনী] কোনো কোনো ওলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের কিবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা নিজেদের নামাজে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতো, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ.) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহ হওয়ার পরিপন্থি নয়।

এ আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামাজ পড়ার জন্য কিবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের শরিয়তের নামাজের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আবাসগৃহসমূহকে কিবলামুখী করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাতেই যেন নামাজ আদায় করা হয়। সেজন্য তার পরেপরেই اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -এর নির্দেশ দানের মাধ্যমে হেদায়েত দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউন যদি নির্ধারিত উপাসনালয়ে নামাজ আদায় করতে বাধা দান করে, তবে তাতে নামাজ রহিত হয়ে যাবে না; বরং নিজ নিজ ঘরে তা আদায় করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; শত্রুর উপর তাদের জয় হবে এবং আখেরাতে তারা জান্নাতপ্রাপ্ত হবে। -[রূহুল মা'আনী]

আয়াতের শুরুতে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে দ্বিবচন পদের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে। তার কারণ, আবাসগৃহগুলোকে কিবলামুখী করে তাতে নামাজ পড়ার অনুমতি দান ছিল তাঁদেরই কাজ। অতঃপর বহুবচন পদের মাধ্যমে সমস্ত বনী ইসরাঈলকে অন্তর্ভুক্ত করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ, এ নির্দেশে পয়গাম্বর ও উম্মত সবাই শামিল। সবশেষে সুসংবাদ দানের নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মূসা (আ.)-কে। তার কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন শরিয়তের অধিকারী নবী। জান্নাতের সুসংবাদ দান তাঁরই হক বা অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হযরত মূসা (আ.) যে বদদোয়া করেছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে। এর প্রারম্ভে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করেন যে, আপনি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের পার্থিব আড়ম্বরের সাজ সরঞ্জাম ও ধনদৌলত যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়েছেন। মিসর থেকে শুরু করে আবিসিনিয়া পর্যন্ত সোনা চাঁদী, হীরা জহরতের খনিসমূহ দিয়ে রেখেছেন। -[কুরতুবী] যার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে গুমরাহ করে দিচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক সাজ সরঞ্জাম ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ বিলাস দেখে এমন সংশয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে যে, সত্যিই যদি এরা গোমরাহীর মধ্যেই থাকবে, তবে এরা আল্লাহ তা'আলার এসব নিয়ামত কেমন করে পেতে পারে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এই তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছতে পারে না যে, নেক আমল ব্যতীত যদি কারো পার্থিব উন্নতি হয়, তবে তা তার ন্যায়-নিষ্ঠার লক্ষণ হতে পারে না। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ার পর তার ধনৈশ্বর্য অন্য লোকদের গুমরাহ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে বদদোয়া করেন- رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তার ধনৈশ্বর্যের রূপকে পরিবর্তিত করে বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

হযরত কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, এই দোয়ার প্রতিক্রিয়ায় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত হীরা-জহরত, নগদ মুদ্রা এবং বাগ-বাগিচা, শস্য ক্ষেতের সমস্ত ফল ফসল পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে ফেরাউনের আমলের কিছু জিনিসপত্র রক্ষিত ছিল। তাতে ডিম এবং বাদামও দেখা যায় যা সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গিয়েছিল।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত ফলমূল, তরিতরকারি ও খাদ্যশস্যকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি ছিল আল্লাহ তা'আলার সেই নয়টি [মেজোসূলভ] নিদর্শনের একটি যার আলোচনা কুরআন কারীমের وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ আয়াতে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বদদোয়া হযরত মূসা (আ.) তাদের জন্য করেছিলেন এই وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, তাদের অন্তরগুলোকে এমন কঠিন করে দাও, যে তাতে ঈমান এবং অন্য কোনো সৎকর্মের যোগ্যতা না থাকে। যাতে তারা বেদনাদায়ক আজাব আসার পূর্বে ঈমান আনতে না পারে।

কোনো নবী রাসূলের মুখে এমন বদদোয়া বাহ্যত অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ মানুষকে ঈমান ও সৎকর্মের আমন্ত্রণ জানানো এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনা করাই হয়ে থাকে নবী রাসূলগণের জীবনের ব্রত।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনা হলো এই যে, হযরত মূসা (আ.) যাবতীয় চেষ্টা চরিত্রের পরে তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কামনা করেছিলেন যে, এরা যেন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। এতে এমন একটা সম্ভাবনাও বিদ্যমান ছিল যে, এরা যে আবার আজাব আসতে দেখে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে দেয় এবং তাতে করে আজাব স্থগিত হয়ে যায় তাই কুফরের প্রতি ঘৃণাবিদ্বেষই ছিল এই প্রার্থনার কারণ। যেমন, ফেরাউন ডুবে মরার সময় ঈমানের স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তার মুখ বন্ধ করে দেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও করুণায় সে আজাব থেকে বেঁচে যেতে না পারে।

তাছাড়া এমন হতে পারে যে, এই বদদোয়াটি প্রকৃতপক্ষে বদদোয়াই নয়, বরং শয়তানের উপর যেমন লানত করা হয় তেমনি বিষয়। সে যখন কুরআনের প্রকৃষ্ট বর্ণনার মতোই লানতপ্রাপ্ত তখন তার উপর লানত করার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার যার উপর লানত চাপিয়ে দিয়েছেন, আমরাও তার উপর লানত করি। এক্ষেত্রে মর্ম দাঁড়াবে এই যে, তাদের অন্তরসমূহের কঠোর হয়ে পড়া এবং ঈমান ও সংশোধনের যোগ্য না থাকা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) বদদোয়ার আকারে সে বিষয়টিই প্রকাশ করেছেন মাত্র।

তৃতীয় আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর উক্ত দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত হারুন (আ.)-কেও দোয়ার অংশীদার সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে- قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল করে নেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় কোনো দোয়ায় 'আমীন' বলাও দোয়ারই অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু কুরআন কারীমে নিঃশব্দে দোয়া করাকেই দোয়ার সুন্নত নিয়ম বলে অভিহিত করা হয়েছে, কাজেই এতে 'আমীন' ও নিঃশব্দে বলাই উত্তম বলে মনে হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গাম্বরকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সামান্য পরীক্ষা কর হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয় কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয় কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরিতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মতো তাড়াহুড়া করবেন না।

চতুর্থ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর বিখ্যাত মোজেজা সাগর পাড়ি দেওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি যে, যে আল্লাহর উপর বনী ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে- آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ কি এখন মুসলমান হচ্ছে। অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে?

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ হাদীসের দ্বারাও হয় যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। -[তিরমিযী]

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন : তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মু'মিন বলা যাবে না এবং কাফন দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরির অবস্থায় হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।-[রূহুল মা'আনী]

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা যদি এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় কারো মুখ দিয়ে কুফরির বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামাজ পড়ে তাকে মুসলমানদের মতো দাফন করতে হবে এবং তার কুফরির বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোনো কোনো ওলীআল্লাহর অবস্থায় দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরির বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে যখন তার কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাতলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল বটে।

সারকথা এই যে, যখন রূহ, বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোনো আমল বা কার্যকলাপ শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ ঐ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ্ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কিংবা তার পূর্ব মুহূর্ত।

قَوْلُهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ الخ : প্রথম আয়াতে ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শনও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হওয়ার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এলো এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপরে এই লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজো সে স্থানটি জাবালে ফেরাউন নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত কায়রোর জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনো ফেরাউন। কারণ ফেরাউন শব্দটি কোনো একক ব্যক্তির নাম নয়। সে যুগে মিসরে সব বাদশাহকেই ফেরাউন পদবী দেওয়া হতো।

কিন্তু এটাও কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসেবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, বহু লোক আমার আয়াতসমূহ এবং নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে অমনোযোগী, সেগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করে না এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অন্যথায় পৃথিবীর প্রতিটি অণুকণায় এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, যা লক্ষ্য করলে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

অনুবাদ :

٩٣. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مَنْزِلَ كَرَامَةٍ وَهُوَ الشَّامُ وَمِصْرُ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا بِاَنْ اٰمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ط اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ بِاِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعْذِيْبِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে مُبَوَّأَ صِدْقٍ অর্থ– উৎকৃষ্ট আবাসস্থল। অর্থাৎ সিরিয়া ও মিশরে ঠিকানা দিলাম অবতরণ করালাম। এবং তাদেরকে উত্তম ও পবিত্র জীবনোপকরণ দিলাম। অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান না আসা পর্যন্ত তারা বিভেদ করেনি। জ্ঞান আসার পরই তারা বিভেদ করল, যেমন কেউ কেউ তার উপর ঈমান আনল আর কেউ কেউ তা প্রত্যাখ্যান করল। তারা যে বিষয়ে অর্থাৎ দীন ও ধর্মের বিষয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তোমার প্রতিপালক কিয়মাতের দিন মু'মিনদেরকে মুক্তিদান ও কাফেরদেরকে শাস্তিদান করতো তার ফয়সালা করবেন।

٩٤. فَاِنْ كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْقَصَصِ فَرْضًا فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ مِنْ قَبْلِكَ ج فَاِنَّهٗ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ يُخْبِرُوْنَكَ بِصِدْقِهٖ قَالَ ﷺ لَا اَشُكُّ وَلَا اَسْاَلُ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ اَلشَّاكِّيْنَ فِيْهِ ـ

৯৪. হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি তোমার প্রতি যা যে সমস্ত কাহিনী অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তুমি সন্দিহান তবে তোমার পূর্বের কিতাব তওরাত যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। তাদের নিকট এগুলো সপ্রমাণিত, তারা তোমাকে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করবে। একথা নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, আমি সন্দেহ পোষণ করি না। সুতরাং আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্য এসেছে। তুমি কখনো এতে সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। اَلْمُمْتَرِيْنَ : সন্দেহ পোষণকারী।

٩٥. وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

৯৫. এবং যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে তুমি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।

٩٦. اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْعَذَابِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

৯৬. যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা অর্থাৎ আজাব সত্য হয়েছে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে তারা ঈমান আনবে না।

٩٧. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ فَلَا يَنْفَعُهُمْ حِيْنَئِذٍ ـ

৯৭. যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ততক্ষণ তাদের নিকট সকল নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না। কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

٩٨. فَلَوْلَا فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ أُرِيْدَ أَهْلُهَا أٰمَنَتْ قَبْلَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ بِهَا فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا لٰكِنْ قَوْمَ يُوْنُسَ ط لَمَّا أٰمَنُوْا عِنْدَ رُؤْيَةِ إِمَارَاتِ الْعَذَابِ الْمَوْعُوْدِ وَلَمْ يُؤَخِّرُوْا إِلٰى حُلُوْلِهِ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ إِلٰى حِيْنٍ انْقِضَاءِ أٰجَالِهِمْ.

৯৮. ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত এমন হয়নি যে, আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বক্ষণ কোনো জনপদ অর্থাৎ জনপদবাসী ঈমান আনয়ন করেছে আর এ ঈমান কোনো উপকার করেছে। প্রতিশ্রুত আজাবের আলামত দেখতে পেয়ে তারা যখন ঈমান আনল আজাব আপতিত হওয়া পর্যন্ত তারা ইউনুসের সম্প্রদায় বিলম্ব করল না তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবন হেয়কর শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং কিছুকালের জন্য তাদের জীবনকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবনোভোগ করতে দিলাম। لَوْلَا তা এস্থানে هَلَّ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। إِلَّا قَوْمَ : এ স্থানে إِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٩. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ بِمَا لَمْ يَشَأْ اللّٰهُ مِنْهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ لَا.

৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি আল্লাহ যা তাদের হতে চাননা সেই বিষয়ে মানুষের উপর জবরদস্তি করবে যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায় সেই জন্য? না তুমি তা করবে না।

١٠٠. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط بِإِرَادَتِهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ الْعَذَابَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. يَتَدَبَّرُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ .

১০০. আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত তার ইচ্ছা ব্যতীত ঈমান আনয়নের কারো সাধ্য নেই। যারা অনুধাবন করে না অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহে চিন্তা ভাবনা করে না আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর 'রিজস' অর্থাৎ আজাব আপতিত করেন।

١٠١. قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ انْظُرُوْا مَاذَا أَيِ الَّذِيْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مِنَ الْاٰيَاتِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ جَمْعُ نَذِيْرٍ أَيِ الرُّسُلُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ أَيْ مَا تَنْفَعُهُمْ.

১০১. মক্কার কাফেরদেরকে বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রমাণ বহু নিদর্শনসমূহের যা কিছু আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। যারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানানুসারে অবিশ্বাসী নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন সেই সম্প্রদায়ের কাজে আসে না। এ সমস্ত তাদের কোনো উপকার পৌঁছবে না। اَلنُّذُرُ : তা نَذِيْرٌ-এর বহুবচন ভীতি প্রদর্শনকারীগণ। অর্থাৎ রাসূলগণ।

١٠٢. فَهَلْ مَا يَنْتَظِرُوْنَ بِتَكْذِيْبِكَ اِلاَّ مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْاُمَمِ اَىْ مِثْلَ وَقَائِعِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ قُلْ فَانْتَظِرُوْا ذٰلِكَ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ .

১০২. তারা তোমাকে অস্বীকার করতো তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর যে ধরনের দিন অতিবাহিত হয়েছে সেরূপ ব্যতীত অন্য কিছুর অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের উপর শাস্তির যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করতেছে না। বল, তোমরা তার প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করতেছি। هَلْ এ প্রশ্নবোধক শব্দটি এস্থানে না বোধক শব্দ مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٣. ثُمَّ نُنَجِّىْ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْعَذَابِ كَذٰلِكَ ج الْاِنْجَاءُ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ . اَلنَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ حِيْنَ تَعْذِيْبِ الْمُشْرِكِيْنَ .

১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে আজাব হতে রক্ষা করি। نُنَجِّىْ অর্থাৎ আমরা উদ্ধার করতেছি। এস্থানে اَلْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ অর্থাৎ অতীতে সংঘটিত বিষয়টিকে ঘটমানরূপে চিত্রিত করতে مُضَارِعْ অর্থাৎ বর্তমানকাল বাচক ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবেই হয় রক্ষা করা; আমার দায়িত্ব হলো মু'মিনদের অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও তার সঙ্গীদের মুশরিকদেরও উৎপীড়ন হতে রক্ষা করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَوَّأْنَا : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَبْوِيَةٌ মাসদার হতে جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো– ঠিকানা দেওয়া, মুনাসিব জায়গা ক্রয় করা।

قَوْلُهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ : এখানে مُبَوَّأً টি اِسْمُ مَكَانٍ অথবা মাসদার আর صِدْقٌ -এর দিকে ইজাফত আরবদের অভ্যাস অনুযায়ী হয়েছে। আরবগণ যখন কোনো কিছুর প্রশংসা করতে চায় তখন তার ইজাফত صِدْقٌ -এর দিকে করে দেয়। যেমন– هٰذَا رَجُلُ صِدْقٍ ، قَدَمَ صِدْقٍ এখানে উদ্দেশ্য হলো প্রশংসিত স্থান। مَقَامَ صِدْقٍ দ্বারা কেউ কেউ মিসর, কেউ কেউ জর্দান ও ফিলিস্তীন, কেউ কেউ শাম দেশ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ : এই ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, نُنَجِّىْ হলো مُضَارِعْ -এর সীগাহ যা حَالْ এবং اِسْتِقْبَالْ -এর উপর বুঝায়। এর অর্থ হলো বনী ইসরাঈলকে বর্তমানকালে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। অথবা ভবিষ্যতে দেওয়া হবে। অথচ মুক্তি তো অতীত কালেই দেওয়া হয়েছে।

উত্তর. এটা حِكَايَةْ حَالْ مَاضِيَةْ -এর ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। মনে হয় যেন অতীতকালের অবস্থাকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খলীল ইবরাহীম ও তার সন্তানবর্গের জন্য মিরাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কুরআন কারীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তুসামগ্রী ও আরাম আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তার আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে তাওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করতো তাতে তার আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করতো, তার নিদর্শনসমূহ ও তার আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলতো, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ জামানার নবীর অসিলা দিয়ে দোয়া করতো, কিন্তু যখন শেষ জামানার নবী ﷺ তার যাবতীয় প্রমাণ এবং তওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমনকে جَاءَهُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে عِلْم বলতে নিশ্চিত বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে عِلْم অর্থ مَعْلُوْم অর্থাৎ যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হলো যা তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

আয়াতের শেষ ভাগে বাহ্যত মহানবী ﷺ কে সম্বোধন করা হলেও একথা অতি স্পষ্ট যে, ওহী সম্পর্কে তার সন্দেহ করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজেই এই সম্বোধনের মাধ্যমে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য। স্বয়ং তিনি উদ্দেশ্য নন। আবার এমনও হতে পারে যে, এতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, হে মানবকুল এই ওহীর ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, তাহলে তোমরা সেসব লোকের কাছে জিজ্ঞেস কর, যারা তোমাদের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করতো। তাহলে তারা তোমাদের বলে দেবে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী (আ.) ও তাদের কিতাবসমূহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সুসংবাদ দিয়ে এসেছে। তাতে তোমাদের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে লোকের মনে দীনি ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ উদয় হয়, তার কর্তব্য হলো এই যে, সত্যপন্থি আলেমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে সন্দেহ সংশয় দূর করে নেবে, সেগুলো মনের মাঝে লালন করবে না।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একই বিষয়বস্তুর সমর্থন ও তাকিদ এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের প্রতি সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে।

সপ্তম আয়াতে শৈথিল্যপরায়ণ মুনকিরদিগকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, জীবনের অবকাশকে গনিমত মনে কর, অস্বীকার এবং অবাধ্যতা থেকে এখনও বিরত হও। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে, যখন তওবা করলেও তা কবুল হবে না কিংবা ঈমান আনলেও তা কবুল হবে না। আর সে সময়টি হলো যখন মৃত্যুকালে আখেরাতের আজাব সামনে এসে উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গেই হযরত ইউনুস (আ.) ও তার সম্প্রদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমনটি কেন হলো না যে, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী জাতিসমূহ এমন এক সময়ে ঈমান নিয়ে আসতো, যখন তাদের ঈমান তাদের জন্য লাভজনক হতো। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কিংবা আজাব অনুষ্ঠিত ও আজাবে পতিত হওয়ার পর অথবা কিয়ামত সংঘটনের সময় যখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কারো ঈমান কবুল করা হবে না।

কাজেই তার পূর্বাহ্নেই নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে যেন বিরত হয়ে যায় এবং ঈমান নিয়ে আসে। অবশ্য হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন এমন সময় আসার পূর্বাহ্নে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব আসতে দেখল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিল এবং ঈমান গ্রহণ করে ফেলল যার ফলে আমি তাদের উপর থেকে অপমানজনক আজাব সরিয়ে নিলাম।

তাফসীরের সারমর্ম এই যে, দুনিয়ার আজাব সামনে এসে উপস্থিত হলেও তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় না; বরং। তখন তওবা কবুল হতে পারে, অবশ্য আখেরাতের আজাবের উপস্থিতি হয় কিয়ামতের দিন হবে কিংবা মৃত্যুকালে। তা সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু হোক অথবা কোনো পার্থিব আজাবে পতিত হওয়ার মাধ্যমেই হোক, যেমনটি হয়েছিল ফেরাউনের ক্ষেত্রে।

সে কারণেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়া সাধারণ আল্লাহ তা'আলার রীতি বিরোধী হয়নি; বরং তারই আওতায় হয়েছে। কারণ তারা যদিও আজাবের আগমন প্রত্যক্ষ করেই তওবা করেছিল, কিন্তু তারা সে আজাবে পতিত হওয়ার কিংবা মৃত্যুর পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে যেহেতু ফেরাউন ও অন্য লোকদের যারা আজাবে পতিত হওয়ার পর মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস শুরু হওয়ার সময় তওবা করেছে এবং ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেহেতু তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং সে তওবাও কবুল হয়নি।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনার একটি উদাহরণ স্বয়ং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বনী ইসরাঈলদের সে ঘটনা যাতে তার পর্বতকে তাদের মাথার উপর টাঙ্গিয়ে দিয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তাতে তারাও তওবা করে নেয় এবং সে তওবা কবুল হয়ে যায়। সূরা বাকারায় এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে- وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে টাঙ্গিয়ে দিয়ে নির্দেশ করলাম যে, যেসব হুকুম আহকাম তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর।

এর কারণ ছিল এই যে, তারা আজাব সংঘটিত হওয়ার এবং মৃত্যুতে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নে শুধু আজাবের আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করে তওবা করে নিয়েছিল। তেমনিভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় আজাবের আগমন লক্ষ্য করেই নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তওবা করে নেয় [এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে]। কাজেই ঐ তওবা কবুল হয়ে যাওয়াটা উল্লিখিত রীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় নয়। -[কুরতুবী]

এক্ষেত্রে সমকালীন কোনো কোনো লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গাম্বরের শৈথিল্যকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই শৈথিল্যকেই আল্লাহ তা'আলার রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ 'কুরআনের ইঙ্গিত এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিবষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আজাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তার সঙ্গীসাথীগণ তওবা ইস্তেগফার করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন আল্লাহ তা'আলার যেসব রীতি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতি সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আজাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলার ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আজাব দান করতে সম্মত হয়নি। -[তাফহীমুল কুরআন : মাওলানা মওদুদী, পৃ. ৩১২, জিলদ. ২]

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা কবীরা সর্বপ্রকার গুনাহ থেকেই না শুধু কবীরা গুনাহ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারো কোনো মতবিরোধ নেই. যে, নবী রাসূলগণের কেউই রিসালতের দায়িত্ব পালনে কোনো রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ নবী-রাসূলগণের জন্য এর চাইতে

বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তারা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ!

কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিশ্বাসের পরিপন্থি বাহ্যিক কোনো কথা যদি কুরআন হাদীসের মাঝেও কোনোখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কুরআান হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লিখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কুরআন কারীম ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন তা সহীফায়ে ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোনো গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কুরআনি ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরা নেওয়া হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের উপর থেকে আজাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তাফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমামগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও পরিপন্থি। তারপর এর সাথে এ কথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ঐশী রীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লঙ্ঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে একথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পয়গাম্বরের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দীনের প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সামান্যতম বিচার-বিবেচনাও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কুরআনের আয়াতের বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ -এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনইবা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসতো যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো। অর্থাৎ আজাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসতো, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আজাবের লক্ষণাদি দেখে আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোনো ঐশীরীতির লঙ্ঘন করা হয়নি। বরং একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমান ও তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তাফসীরকার বাহরে মুহীত, কুরতুবী, যমখশারী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ আল্লাহ তা'আলার রীতিই আওতায়ই হয়েছে। কুরতুবীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ غَشِيَهُمُ الْعَذَابُ كَمَا يَغْشَى الثَّوْبُ الْقَبْرَ فَلَمَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُمْ رَفَعَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ خُصَّ قَوْمُ يُوْنُسَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْاُمَمِ بِاَنْ تِيْبَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُعَيَّنَةِ الْعَذَابِ وَذَكَرَ ذٰلِكَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ اِنَّهُمْ لَمْ يَقَعْ بِهِمُ الْعَذَابُ وَاِنَّمَا رَاَوُا الْعَلَامَةَ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلَى الْعَذَابِ وَلَوْ رَاَوْا عَيْنَ الْعَذَابِ لَمَّا نَفَعَهُمْ اِيْمَانُهُمْ. قُلْتُ قَوْلُ الزَّجَّاجِ حَسَنٌ فَاِنَّ الْمُعَايَنَةَ الَّتِيْ لَا تَنْفَعُ التَّوْبَةُ مِنْهَا هِيَ التَّلَبُّسُ بِالْعَذَابِ كَقِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَلِهٰذَا جَاءَ بِقِصَّةِ قَوْمِ يُوْنُسَ عَلٰى اَثَرِ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ، وَيَعْضُدُ هٰذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ وَالْغَرْغَرَةُ الْحَشْرَجَةُ وَذٰلِكَ هُوَ حَالُ التَّلَبُّسِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ رُوِيَ مَعْنٰى مَا قُلْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) (اِلٰى) وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ تَوْبَتَهُمْ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْعَذَابِ (اِلٰى) وَعَلٰى هٰذَا فَلَا اِشْكَالَ وَلَا تَعَارُضَ وَلَا خُصُوْصَ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন যে, আজাব তাদেরকে এমনভাবে আবৃত করে নেয়, যেমন কবরের উপর চাদর। তারপর যেহেতু তাদের তওবা [আজাব আসার পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন] যথার্থ হয়ে যায়, তাই তাদের আজাব তুলে নেওয়া হয়। তাবারী (র.) বলেন যে, সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের উপর হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এই বৈশিষ্ট্য দান করা হয় যে, আজাব প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়। যুজাজ বলেন যে, তাদের উপর তখনও আজাব পতিত হয়নি; বরং আজাবের লক্ষণই শুধু দেখতে পেয়েছিল। যদি আজাব পতিত হয়ে যেত, তবে তাদের তওবাও কবুল হতো না। কুরতুবী (র.) বলেন যে, যুজাজের অভিমতটি উত্তম ও ভালো। কারণ যে আজাব দর্শনের পর তওবা কবুল হয় না, তা হলো সে আজাব যাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছে ফেরাউনের ঘটনায়। আর সে কারণেই এ সূরায় ইউনুসের সম্প্রদায়ের ঘটনাটি ফেরাউনের ঘটনার লাগালাগি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ পার্থক্য নিরূপিত হয়ে যায় যে, ফেরাউনের ঈমান ছিল আজাবে পতিত হওয়ার পর। আর তার বিপরীতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঈমান ছিল আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বে। এই দাবির সমর্থন মহানবী ﷺ -এর বাণীতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, বান্দার তওবা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না সে মৃত্যুর গরগরা বা মুমূর্ষু অবস্থার সম্মুখীন হয়। আর গরগরা বলা হয় মৃত্যুকালীন অচেতন অবস্থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতেও একথাই বুঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। কুরতুবী (র.) বলেন যে, এই বক্তব্য ও বিশ্লেষণে না কোনো আপত্তি আছে, না আছে স্ববিরোধিতা, আর নাই বা আছে ইউনুস সম্প্রদায়ের কোনো নির্দিষ্টতা।

আর তাবারী প্রমুখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউই একথা বলেন নি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল হযরত ইউনুস (আ.)-এর ত্রুটিসমূহ। বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ আল্লাহ তা'আলার রীতির পরিপন্থি নয়, বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে কুরআনের কোনো বক্তব্যে এ কথা প্রমাণিত নেই যে, আজাবের দুঃসংবাদ শুনানোর পর হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই তার সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান। বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, সমস্ত সাবেক উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ চলে আসছিল অর্থাৎ তাদের উম্মতের উপর আজাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলাও তার পয়গাম্বরগণকে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন। যেমন হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে, তেমনিভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলার সে নির্দেশ যখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হয় যে, তিনদিন পর আজাব আসবে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টত একথাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গাম্বরসুলভ মর্যদার দিক দিয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতের আয়াতসমূহে যে ভর্ৎসনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে, তা এজন্য নয় যে, তিনি রিসালাতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, বরং ঘটনাটি তাই, যা উপরে প্রমাণ্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে লেখা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ মোতাবেক তিনদিন পর আজাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। পরে যখন আজাব আসেনি, তখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ার মধ্যে প্রাণেরও আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না। কিন্তু নবী রাসূলগণের রীতি

হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামতো তারা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস (আ.)-এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ না হলেও নবী রাসূলগণের রীতির পরিপন্থি ছিল। কুরআনের আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, হযরত ইউনুস (আ.)-এর পদস্খলন রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোনো কিছুই প্রমাণিত হবে না। সূরা সাফফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে– إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে أَبَقَ শব্দ ভর্ৎসনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোনো ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে– وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রিসালাতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে–

أَيْ غَضْبَانَ عَلَى قَوْمِهِ لِشِدَّةِ شِكَايَتِهِمْ وَتَمَادِي إِصْرَارِهِمْ مَعَ طُوْلِ دَعْوَتِهِ إِيَّاهُمْ وَكَانَ ذَهَابُهُ هٰذَا مِنْهُمْ هِجْرَةً عَنْهُمْ لٰكِنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ.

অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরির উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রিসালাতের আহ্বান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন। বস্তুত তার এ সফর ছিল হিজরত হিসেবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেন নি।

এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লিখিত সমকালীন তাফসীরকারকে কোনো কোনো ওলামা তার এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা সাফফাতের তাফসীর স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তাফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনেটির দ্বারাই তার এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা [মা'আযাল্লাহ] রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তাফসীরবিদগণ নিজেদের তাফসীরে এমন সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রমাণ কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তের কোনো হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তাফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তার দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোনো তাফসীরকার এহেন কোনো মত গ্রহণও করেন নি।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা : হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা যার কিছু কুরআনের এবং কিছু হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, তা এই যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় ইরাকের বিখ্যাত মুছেল এলাকার নীনওয়া নামক জনপদে বসবাস করতো। কুরআনে তাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে পাঠান। তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে নির্দেশ দান করেন যেন এদের জানিয়ে দেন যে, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আজাব

নাজিল হবে। হযরত ইউনুস (আ.) সম্প্রদায়ের মাঝে এ ঘোষণা দিয়ে দেন। অতঃপর হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এ বিষয়ে একমত হয়ে যে, আমরা কখনো হযরত ইউনুস (আ.)-কে মিথ্যা বলতে শুনিনি। কাজেই তার কথা উপেক্ষা করার মতো নয়। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো যে, দেখা যাক, হযরত ইউনুস (আ.) রাতের বেলা আমাদের মাঝে নিজের জায়গায় অবস্থান করেন কি না। যদি তিনি তাই করেন তবে বুঝব, কিছুই হবে না। আর যদি তিনি এখান থেকে কোথাও চলে যান, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করবো যে, ভোরে আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার আজাব নেমে আসবে। হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার কথামতো রাতের বেলায় সেই বস্তি থেকে বেরিয়ে যান। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার আজাব এক কালো ধোঁয়া ও মেঘের আকারে তাদের মাথার উপর চক্রাবর্তের মতো ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আকাশ দিগন্তের নিচে তাদের নিকটবর্তী হয়ে আসতে থাকে। তখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এবার আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। এ অবস্থা দেখে তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর সন্ধান করতে আরম্ভ করে, যাতে তাঁর হাতে ঈমানের দীক্ষা নিতে এবং বিগত অস্বীকৃতির ব্যাপারে তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু যখন হযরত ইউনুস (আ.)-কে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন নিজেরা নিজেরাই একান্ত নির্মলচিত্তে, বিশুদ্ধ মনে তওবা ইস্তেগফারের উদ্দেশ্যে জনপদ থেকে এক মাঠে বেরিয়ে গেল। সমস্ত নারী, শিশু এবং জীব জন্তুকেও সে মাঠে এনে সমবেত করা হলো। চটের কাপড় পরে অতি বিনয়ের সাথে সে মাঠে তওবা ইস্তেগফার এবং আজাব থেকে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনায় এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে যায় যে, গোটা মাঠ আহাজারিতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব সরিয়ে দেন, যেমন এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ দিনটি ছিল আশুরা তথা ১০ই মহররমের দিন।

এদিকে হযরত ইউনুস (আ.) বস্তির বাইরে এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, এখনই এই সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাজিল হবে। তাদের তওবা ইস্তেগফারের বিষয় তাঁর জানা ছিল না। কাজেই যখন আজাব খণ্ড চলে গেল, তখন তার মনে চিন্তা হলো যে, আমাকে [নির্ঘাৎ] মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, তিনদিনের মধ্যে আজাব এসে যাবে। এ সম্প্রদায়ে আইন প্রচলিত ছিল যে, যার মিথ্যা সম্পর্কে জানা যায় এবং সে যদি তার দাবির পক্ষে কোনো সাফ প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। অতএব হযরত ইউনুস (আ.)-এর মনেও আশঙ্কা দেখা দেয় যে, আমাকেও মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে হত্যা করে ফেলা হবে।

নবী রাসূলগণ যাবতীয় পাপ তাপ থেকে মা'সূম হয়ে থাকেন সত্য, কিন্তু মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত বা পৃথক থাকেন না। সুতরাং তখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মনে স্বভাবতই এই ভাবনা উপস্থিত হয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মতোই ঘোষণা করেছিলাম, অথচ এখন আমি সে ঘোষণার কারণে মিথ্যুক প্রতিপন্ন হয়ে যাব। নিজের অবস্থানেই বা কোন মুখে ফিরে যাই এবং সম্প্রদায়ের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই দুঃখ-বেদনা ও পেরেশান অবস্থায় এ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন। রোম সাগরের তীরে পৌছে সেখানে একটি নৌকা দেখতে পান। তাতে লোক আরোহণ করছিল। হযরত ইউনুস (আ.)-কে আরোহীরা চিনতে পারল এবং বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। নৌকা রওয়ানা হয়ে যখন মধ্য নদীতে গিয়ে পৌছল, তখন হঠাৎ তা থেমে গেল। না সামনে যেতে পারছিল, না পিছনের দিকে ফিরে আসতে পারছিল। নৌকার আরোহীরা ঘোষণা করল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের এই নৌকার এমনই গুণ যে, এতে যখনই কোনো জালেম, পাপী কিংবা ফেরারী গোলাম আরোহণ করে, তখন এটি নিজে নিজেই থেমে যায়। কাজেই যে লোক এমন তাকে তা প্রকাশ করে ফেলাই উচিত, যাতে একজনের জন্য সবার উপর বিপদ না আসে।

হযরত ইউনুস (আ.) বলে উঠলেন, "আমি ফেরারী গোলাম, পাপীটি আমিই বটে।" কারণ নিজের শহর থেকে পালিয়ে তাঁর নৌকায় আরোহণ করাটা ছিল একটি স্বভাবজাত ভয়ের দরুন, আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে নয়। এই বিনা অনুমতিতে এদিকে চলে আসাকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ মর্যাদা একটি পাপ হিসেবেই গণ্য করল। কেননা

গাম্বরের কোনো গতিবিধি আল্লাহ তা'আলার বিনা অনুমতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যই বললেন, আমাকে সাগরে লে দিলে তোমরা সবাই এ বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু নৌকার লোকেরা তাতে সম্মত হলো না, বরং তারা লটারী ল যে, লটারীতে যার নাম উঠবে, তাকেই সাগরে ফেলে দেওয়া হবে। দৈবক্রমে লটারীতেও হযরত ইউনুস (আ.)-এর । উঠল। সবাই এতে বিস্মিত হলো। তখন কয়েকবার লটারী করা হলো এবং সব কয়বারই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠতে থাকল। কুরআন কারীমে এই লটারী এবং তাতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম র বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

রত ইউনুস (আ.)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার এ আচরণ ছিল তার বিশেষ পয়গাম্বরোচিত মর্যাদারই কারণ। যদিও ন আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেন নি যাকে পাপ বলে গণ্য করা যায় এবং কোনো পয়গাম্বরের । তার সম্ভাবনাও নেই। কারণ তারা হলেন, মা'সুম তথা নিষ্পাপ, কিন্তু তা পয়গাম্বরের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে এমনটি ভন ছিল না যে, শুধুমাত্র স্বাভাবিক ভয়ের দরুন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই কোথাও স্থানান্তরিত হবেন। এই দাবহির্ভূত কাজের জন্য ভর্ৎসনা হিসেবেই এ আচরণ করা হয়েছে।

কে লটারীতে নাম উঠার ফলে সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল আর অপরদিকে একটি বিরাটকায় মাছ আল্লাহ আলার নির্দেশক্রমে নৌকার কাছে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছিল, যাতে তিনি সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নিজের ট ঠাঁই করে দিতে পারে। তাঁকে পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর : যা তোমার পেটের ভিতরে রাখা হবে, তা কিন্তু তোমার আহার্য নয়; বরং আমি তোমার পেটকে তার আবাস করছি। রাং হযরত ইউনুস (আ.) সাগরে পৌঁছার সাথে সাথে সে মাছ তাঁকে মুখে নিয়ে নিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ .) বলেন, হযরত ইউনুস (আ.) এ মাছের পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন। সে তাকে মাটির তলদেশ পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং দূর-দূরান্তে নিয়ে বেড়াত। কোনো কোনো মনীষী সাত দিন, কেউ কেউ পাঁচ দিন, আবার কেউ কেউ এক দিনের কয়েক কাল মাছের পেটে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। -[মাযহারী]

ঃ প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ অবস্থায় হযরত ইউনুস (আ.) দোয়া করেন-

لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

ল্লাহ তা'আলা তার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় হযরত ইউনুস (আ.)-কে সাগর তীরে ফেলে দেন।

ছর পেটের উষ্ণতার দরুন তার শরীরে কোনো লোম ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছাকাছি একটি লাউ গাছ য়ে দেন, যার পাতার ছায়া হযরত ইউনুস (আ.)-এর জন্য এক প্রশান্তি হয়ে যায়। আর এক বন্য ছাগলকে আল্লাহ আলা ইশারা দিয়ে দেন, সে সকাল সন্ধ্যায় তার কাছে এসে দাঁড়াত আর তিনি তার দুধ পান করে নিতেন।

বে হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি তাঁর পদস্খলনের জন্য সতর্কীকরণ হয়ে যায়। আর পরে তাঁর সম্প্রদায় ও বিস্তারিত স্থা জানতে পারে।

কাহিনীতে যে অংশগুলো কুরআনে উল্লেখ রয়েছে কিংবা প্রামাণ্য হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো তো দেহাতীতভাবে সত্য, কিন্তু বাকি অংশগুলো ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে গৃহীত, যার উপর শরিয়তের কোনো মাসআলার

অনুবাদ :

١٠٤. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ اَنَّهُ حَقٌّ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْاَصْنَامُ لِشَكِّكُمْ فِيْهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ يَقْبِضُ اَرْوَاحَكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَىْ بِاَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقِيْلَ لِىْ -

১০৪. বল, হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ। তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি অর্থাৎ তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত হও তবে জেনে রাখ, তাতে সংশয়ের কারণে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যার অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিমার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করি না বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ তা'আলার যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। তোমাদের রূহসমূহ সংহার করেন। আর মু'মিনদেরকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। اَنْ এস্থানে بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত।

١٠٥. اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج مَائِلًا اِلَيْهِ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এই দিনেই তুমি অনুরক্ত হয়ে থাক এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

١٠٦. وَلَا تَدْعُ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ اِنْ عَبَدْتَهُ وَلَا يَضُرُّكَ اِنْ لَمْ تَعْبُدْهُ فَاِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَرْضًا فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ -

১০৬. এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, অন্য কারো ইবাদত করো না। যাদের ইবাদত করলেও তোমাদের কোনো উপকার করে না আর ইবাদত না করলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যদি তা কর তবে নিশ্চয় তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٠٧. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ يُصِبْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ كَفَقْرٍ وَمَرَضٍ فَلَا كَاشِفَ رَافِعَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ دَافِعَ لِفَضْلِهِ ط اَلَّذِىْ اَرَادَكَ بِهِ يُصِيْبُ بِهِ اَىْ بِالْخَيْرِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

১০৭. আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের ক্লেশ দেন ক্ষতি পৌছান যেমন, দারিদ্র্য, অসুস্থতা ইত্যাদি দ্বারা তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী বিদূরণকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তার অনুগ্রহ যা তিনি তোমাকে করবার ইচ্ছা করেছেন তা প্রতিহত করবার রদ করবার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি তা অর্থাৎ মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١٠٨. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ قَدْ جَاۤءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج لِاَنَّ ثَوَابَ اِهْتِدَائِهٖ لَهٗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط لِاَنَّ وَبَالَ ضَلَالِهٖ عَلَيْهَا وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ فَاُجْبِرُكُمْ عَلَى الْهُدٰى.

১০৮. বল হে মানুষ! মক্কাবাসীগণ, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। অনন্তর যারা হেদায়েত গ্রহণ করবে তারা নিজের জন্যই হেদায়েত অবলম্বন করবে। কারণ হেদায়েত অবলম্বনের ছওয়াব ও পুণ্যফল তারই। এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের অকল্যাণের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে। কারণ তার এই পথভ্রষ্টতার মন্দ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে। আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই যে তোমাদেরকে আমি কোনোরূপ জবরদস্তি করব।

١٠٩. وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ عَلَى الدَّعْوَةِ وَاَذَاهُمْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج فِيْهِمْ بِاَمْرِهٖ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ. اَعْدَلُهُمْ وَقَدْ صَبَرَ حَتّٰى حَكَمَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِالْقِتَالِ وَاَهْلِ الْكِتَابِ بِالْجِزْيَةِ.

১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং তুমি দীনের আহ্বানে এবং তাদের উৎপীড়নের সামনে ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না তাদের বিষয়টি আল্লাহ তাঁর বিধান দ্বারা ফয়সালা করে দিয়েছেন। আর তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিধানকারী। এই নির্দেশ অনুসারে তাদের বিষয়ে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের এবং কিতাবীদের বিষয়ে জিযিয়ার বিধান জারি হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَنَّهٗ حَقٌّ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, شَكٌّ -এর সম্পর্ক مُفْرَدٌ হতে হয় না। এ কারণেই মুফাসসির (র.) اِنَّهٗ حَقٌّ উহ্য মেনেছেন। যাতে করে شَكٌّ -এর সম্পর্ক জুমলার সাথে হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ يَتَوَفَّاكُمْ : এটা বাবে تَفَعُّلٌ -এর تَوَفِّيْ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ كُمْ যমীর হলো মাফউল। অর্থ হলো– তোমাদেরকে পুরোপুরি নেয়। তোমাদের রূহ কবজ করে।

قَوْلُهٗ قِيْلَ لِيْ : এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে مَا قَبْلَ -এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। কেননা مَا قَبْلَ -এর মধ্যে اُمِرْتُ আছে। এখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে– وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقِيْلَ لِيْ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ فَرْضًا : এটা হলো এই প্রশ্নের জবাব যে, নবীর দ্বারা غَيْرُ اللّٰهِ -এর ইবাদত অসম্ভব। এরপরেও কেন এরূপভাবে সম্বোধন করা হয়েছে? মুফাসসির (র.)-এর উত্তর দিয়েছেন যে, এটা عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ হয়েছে।

قَوْلُهٗ عَلَى الدَّعْوَةِ : পূর্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই قَيْد -এর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ الخ : এই সূরার শুরু থেকে এই পর্যন্ত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ যথা তাওহীদ, রেসালাত, হাশর নাশর, কিয়ামত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে দলিল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন

যে, আমি যে ধর্মের দাওয়াত তোমাদেরকে দিয়েছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি এখনও সন্দিহান থাক বা বুঝতে অপারগ হও তবে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের মনগড়া হাতের তৈরি উপাস্যদের মানি না, কোনো দিনও মানবো না। আমি সে আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগী করি যিনি জীবন মরণের মালিক, যিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং যার আদেশেই হয় মৃত্যু, বন্দেগীর উপযুক্ত একমাত্র তিনিই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে জীবন ও মৃত্যু উভয়টিই যে আল্লাহ তা'আলার আদেশে হয় একথা বলাই উদ্দেশ্য। তবে শুধু মৃত্যুর উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যেন শ্রোতার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।

আয়াতের মর্মকথা হলো এই যদি তোমরা দীন ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে তবে সে সম্পর্কে চিন্তা চর্চা করে সন্দেহ দূরীভূত কর। মনে রেখো! আমি এই পাথরের সম্মুখে মাথা নত করি না যা কোনো উপকার করতে পারে না। অপকারও করতে পারে না এমন কিছুর বন্দেগী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; বরং আমি বন্দেগী করি এক, অদ্বিতীয়, লাশারীক আল্লাহ তা'আলার, যাঁর হাতে রয়েছে আমাদের জীবন ও মরণ, আমার উপর এ আদেশ হয়েছে যেন আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হই। আর একনিষ্ঠতাবে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করি শিরক ও কুফর থেকে দূরে থাকি।

قَوْلُهُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ الخ :

বস্তুত, মানুষের লাভ ক্ষতি, ভালো মন্দ সবই এক আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে। যদি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোনো লোককে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে মর্জি করেন তবে তিনি ভিন্ন আর কেউ এমন নেই যে ঐ কষ্ট দূর করতে পারে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কারো কল্যাণ সাধন করতে চান তবে তাকে বাধা দেওয়ার শক্তিও কারো নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার কল্যাণ সাধন করেন। অতএব, বন্দেগী শুধু তারই করা উচিত আর কারো নয়, জীবনের মালিক তিনিই, আর কেউ নয়।

قَوْلُهُ قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ : ইতিপূর্বে দীন ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমাদের নিকট সত্য দীন এসেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমে তোমাদেরকে জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন তোমরা নিজেদের পথভ্রষ্টতার জন্য কোনো ওজর আপত্তি পেশ করতে পারবে না। যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর তবে তোমাদেরই উপকার। আর যদি তোমরা হেদায়াত গ্রহণ না কর তবে তাতে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহ তা'আলার পথে চলবে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তা'আলার রাসূলের কাজ হলো মানুষকে সৎপথ দেখানো। আর সে কাজ তিনি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে সর্বময় কর্তারূপে প্রেরণ করেন না, তিনি মানুষকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করবেন; বরং রাসূল আগমন করেন সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, তাই ইরশাদ হয়েছে- مَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ অর্থাৎ আর আমি তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই।

এর পরবর্তী আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা যদি সৎপথে না আসে আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যে নির্দেশ আসে তা মেনে চলুন আর কাফেরদের পক্ষ থেকে জুলুম অত্যাচার করা হলে তাতে সবর অবলম্বন করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিজয় দান করেন, অথবা যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ প্রদান করেন এবং মু'মিনদের ও কাফেরদের মধ্যে যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক নিষ্পত্তি না করে দেন সে পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে আপন কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তার নির্দেশে কোনো ভুলভ্রান্তি হয় না, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়েই সম্পূর্ণ অবগত।
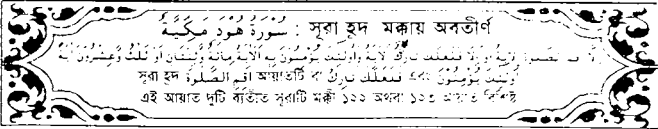
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. الٓرٰ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ هٰذَا كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ بِعَجِيْبِ النَّظْمِ وَبَدِيْعِ الْمَعَانِىْ ثُمَّ فُصِّلَتْ بُيِّنَتْ بِالْاَحْكَامِ وَالْقِصَصِ وَالْمَوَاعِظِ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ـ اَىِ اللّٰهِ ـ

১. আলিফ লাম রা তার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবহিত। এটা একটি কিতাব, তার আয়াতসমূহ অত্যাশ্চর্য বিন্যাস ও অভিনব ভাষা অলঙ্কার দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বিবৃত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিধি-বিধান, কাহিনীও উপদেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞসত্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে।

٢. اَ اَىْ بِاَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ بِالْعَذَابِ اِنْ كَفَرْتُمْ وَّبَشِيْرٌ ـ بِالثَّوَابِ اِنْ اٰمَنْتُمْ ـ

২. তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কুফরি করলে আজাব সম্পর্কে সতর্ককারী আর ঈমান আনয়ন করলে পুণ্যফল সম্পর্কে সুসংবাদ দানকারী। اَلَّا মূলত ছিল اَنْ لَا তার اَنْ টি এস্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣. وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اَرْجِعُوْا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ يُمَتِّعْكُمْ فِى الدُّنْيَا مَتَاعًا حَسَنًا بِطِيْبِ عَيْشٍ وَسَعَةِ رِزْقٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى هُوَ الْمَوْتُ وَّيُؤْتِ فِى الْاٰخِرَةِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فِى الْعَمَلِ فَضْلَهٗ جَزَاءَهٗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ اَىْ تُعْرِضُوْا فَاِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ـ

৩. আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট শিরক হতে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তার প্রতি তওবা কর, ফিরে আস। তিনি তোমাদেরকে পার্থিব জগতে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন রিজিকের মধ্যে সচ্ছলতা ও সুখী জীবন দান করবেন। আর পরকালে কার্য সম্পাদনে মর্যাদাবান প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দান করবেন। তার প্রতিফল প্রদান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহা দিবসের। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির। تَوَلَّوْا তাতে মূলত একটি ت বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও।

অনুবাদ :

٤. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَمِنْهُ الثَّوَابُ وَالْعَذَابُ ـ

৪. আল্লাহ তা'আলারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। পুণ্যফল বা শাস্তি দানও তার শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

٥. وَنَزَلَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِيْمَنْ كَانَ يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّتَخَلّٰى اَوْ يُجَامِعَ فَيُفْضِيْ اِلَى السَّمَاءِ وَقِيْلَ فِي الْمُنَافِقِيْنَ اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَيِ اللّٰهِ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَتَغَطَّوْنَ بِهَا يَعْلَمُ تَعَالٰى مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ج فَلَا يُغْنِيْ اِسْتِخْفَاؤُهُمْ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ـ اَيْ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ ـ

৫. ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, মুসলিমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যারা পেশাব-পায়খানা ও স্ত্রী সঙ্গম করতেও লজ্জা পেতেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। কেউ কেউ বলেন, মুনাফিক সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছিল। শোন এরা তার নিকট হতে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ ফিরিয়ে নেয়। শোন, তারা যখন তাদের বস্ত্র পরিধান করে তার দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করে তিনি তো জানেন তখন তারা যা লুকায় এবং প্রকাশ করে। সুতরাং তাকে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি তো নিশ্চয়ই মনে যা আছে তাও জানেন।

مَافِي الصُّدُوْرِ অর্থ– মনে যা আছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سُوْرَةُ هُوْدَ : এটা مُرَكَّب اِضَافِيْ হয়ে মুবতাদা আর مَكِّيَّةٌ হলো প্রথম খবর। اِلَّا الخ এটা দ্বিতীয় খবর مَكِّيَّةٌ হলো مُسْتَثْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ (اَلْاٰيَةَ) আর حَرْف اِسْتِثْنَاء হলো اِلَّا আর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ অর্থাৎ পূর্ণ সূরাটি মক্কী একটি আয়াত ব্যতীত। আর তা হলো وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ আয়াতটি। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি।

قَوْلُهٗ اَوْ اِلَّا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ (اَلْاٰيَةَ) : এটা দ্বারা দ্বিতীয় উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উক্তি অনুযায়ী পূর্ণ সূরাটাই মক্কী, দুটি আয়াত ব্যতীত। একটি হলো فَلَعَلَّكَ আর দ্বিতীয়টি হলো وَاُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ এটা মুকাতিল (র.)-এর উক্তি।

قَوْلُهٗ هٰذَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে كِتَابٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। নিজেই মুবতাদা নয়। কেননা نَكِرَة مَحْضَة টা মুবতাদা হতে পারে না। اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ এটা জুমলা হয়ে كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ : ثُمَّ-এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম হলো– এটা خَبَر مَحْض -এর জন্য। আর অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কুরআন চূড়ান্ত পর্যায়ের ও সর্বোত্তম প্রকারের مُحْكَمٌ এবং উত্তম تَفْصِيْل -এর সাথে مُفَصَّلٌ হয়েছে। যেমন– আরবগণ বলে থাকে فُلَانٌ كَرِيْمُ الْاَصْلِ ثُمَّ كَرِيْمُ الْفِعْلِ

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো এই যে, ثُمَّ অবতীর্ণের হিসেবে تَرْتِيْب زَمَانِيٌّ হবে। এভাবে যে, প্রথম অবতরণ তথা আরশ হতে লৌহে মাহফূজের উপর অবতরণের সময় مُحْكَمٌ করা হয়েছে। এরপর অবস্থার হিসেবে বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ : এটা كِتَابٌ -এর দ্বিতীয় সিফত।

قَوْلُهُ بِاَنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ টা হলো مَصْدَرِيَّة আবার اَنْ টা تَفْسِيْرِيَّة ও হতে পারে। تَفْسِيْرِيَّة টা اَنْ ওয়ার জন্য شَرْط এই যে, তার পূর্বে قَوْل বা قَوْل -এর সমার্থক কোনো শব্দ হবে। এখানে যদিও قَوْل শব্দটি নেই তবে তার মার্থক فُصِّلَتْ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই اَنْ টা مُفَسِّرَة হওয়াও সঠিক। আর এখানে تَفْسِيْرِيَّة হওয়াই উত্তম। (صَاوِىْ)

قَوْلُهُ قِيْلَ فِى الْمُنَافِقِيْنَ : যদি মুনাফিক দ্বারা প্রসিদ্ধ মুনাফিক উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে কথা আছে। কেননা সিদ্ধ মুনাফিকের অস্তিত্ব মক্কায় ছিল না। অথচ আয়াতটি মক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এই য়াত আখনাস ইবনে শোরাইকের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যে মক্কার মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি চাটুকার ও দর্শন ছিল। এবং রাসূল ﷺ -কে চিত্তাকর্ষক সংবাদ পরিবেশন করতো। আর অন্তরে তার বিপরীত ভাব গোপন রাখত। ার সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ يَثْنُوْ : اَلشَّيْئُ الطَّيُّ লুকানোর জন্য পেচিয়ে ফেলা, يَثْنُوْنَ মূলে ছিল يَثْنِيُوْنَ এখন يَا -এর উপর পেশ কঠিন ওয়ার কারণে نُوْنْ কে দিয়েছে। এরপর দু'সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে يَا কে ফেলে দিয়েছে ফলে يَثْنُوْنَ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহর গজব ও বিভিন্ন কঠিন আজাবের এবং রে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি এবং পুরস্কার ও শাস্তির বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর কিছু দাড়ি-মুবারক পাকা দেখে চলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।' তখন রাসূল ﷺ -ইরশাদ রেছিলেন, "হ্যাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা য়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। [আল-হাকেম ও তিরমিযী রীফ]। উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাজিল ওয়ার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র চেহারায় বাধ্যক্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ত্র সূরার প্রথম আয়াত 'আলিফ লাম-রা' বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র াল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকেই এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি, বরং এ ব্যাপারে চিন্তা রতেও বারণ করা হয়েছে।

তঃপর কুরআন মাজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা য়েছে। مُحْكَمْ শব্দ اِحْكَامٌ হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোনো বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোনো ভুল বা বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে "مُحْكَمْ" শব্দ مَنْسُوْخ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের আয়াতসমূহকে সাময়িকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, রূপে তৈরি করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পবিত্র কুরআন নাজিলের ফলে যেভাবে 'মনসূখ' বা রহিত হয়েছে কুরআন পাক নাজিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না। [কুরতুবী] তবে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কুরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تَفْصِيلٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সেজন্যই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فُصِلَ، فَصَلَ শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু আকায়িদ, ইবাদত, আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তু গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কুরআন মাজীদ একসাথে লওহে মাহফূযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বি কর্তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ এসব আয়াতে এমন এক মহান রহস্য ও হিকমত বিদ্যমান যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাজিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। পরিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতেই তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যতকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইলম ও হিকমত কখনো ভুল হওয়ার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তওহীদের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-উপাসনা করবে না।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশ্বনবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দোজাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অফুরন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, 'ভীতি প্রদর্শনকারী'। কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্র জন্তু বা অন্য কোনো অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং এমন ব্যক্তিকে 'নাযীর' বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমন সব বস্তু বা কর্ম হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

তৃতীয় আয়াতে হেদায়েতসমূহের একটি অতীব গুরত্বপূর্ণ হেদায়েত এভাবে দেওয়া হয়েছে। اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অর্থাৎ মুহকাম আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে এ পথনির্দেশ দিয়েছেন যে, "তারা যেন স্বীয় পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে।" ক্ষমার সম্পর্ক পূর্বকৃত গোনাহ সমূহের সাথে আর তওবার সম্পর্ক ভবিষ্যতে পুনরায় তার কাছেও না যাওয়ার অঙ্গীকারের সাথে। অতএব পূর্বকৃত গুনাহর জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আগামীতে পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাই হলো সত্যিকার তওবা। এজন্যই কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, ভবিষ্যতে গুনাহ হতে বিরত থাকার সংকল্প ছাড়া মৌখিক তওবা করা হলো تَوْبَةُ كَذَّابِيْنَ [অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদের তওবা। [কুরতুবী]। অনুরূপভাবে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন مَعْصِيَتْ راخنده مى آيد ز استغفارما অর্থাৎ আমাদের তওবা দেখে খোদ গুনাহেরও হাসি পায়। অন্য কথায় এ ধরনের তওবা হতে তওবা করা উচিত।

অতঃপর সত্যিকার তওবাকারীদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى বলে। অর্থাৎ যারা পূর্বকৃত গুনাহ হতে সত্যিকারভাবে তওবা করে, ভবিষ্যতে তাতে লি না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও সতর্কতা অবলম্বন করে, তাদের শুধু ক্ষমাই করা হয় না, বরং তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবন দান ক হবে। পার্থিব নশ্বর জীবন ও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন উভয়ই অত্র সুসংবাদের আওতাভুক্ত। যেমন অন্য এক আয়াতে এরূপ তওবাকারী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً অর্থাৎ আমি অবশ্যই তাকে সুখময় জীবন দান করব

যত আয়াত সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এখানে ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ই শামিল রয়েছে। ূরা নূহে তওবাকারীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে তিনি তামাদের উপর মুষলধারে রহমত বর্ষণ করবেন। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের মদদ করবেন এবং তোমাদেরকে াগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দান করবেন। এখানে রহমত বর্ষণ, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা পার্থিব নিয়ামতসমূহ বোঝানো য়েছে এবং বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দ্বারা আখেরাতের নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তএব, আলোচ্য আয়াতে مَتَاعًا حَسَنًا শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবার লশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রিজিকের সচ্ছলতা ও প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সহজলভ্য করে দেবেন, র্বপ্রকার আজাব ও অনিষ্ট হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। তবে পার্থিব জীবন যেহেতু একদিন শেষ হয়ে যাবে, কাজেই র সুখ-শান্তিও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ইহজীবনে ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বজায় থাকবে। অতঃপর মৃত্যু এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই াখেরাতের অন্তহীন জীবন শুরু হবে। তওবাকারীদের জন্য সেখানেও অফুরন্ত আরাম-আয়েশের বিপুল আয়োজন রাখা হয়েছে।

যরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, এখানে مَتَاعًا حَسَنًا দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টির দিক থেকে সরে স্রষ্টার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নবদ্ধ হওয়া। কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন مَتَاعٌ حَسَنٌ অর্থ হচ্ছে, যা আছে তার উপর তুষ্ট থাকা। আর যা খোয়া গেছে ার জন্য বিষণ্ন না হওয়া। অর্থাৎ বৈষয়িক সামগ্রী বৈধভাবে যতটুকু অর্জিত হয় তাতে সন্তুষ্ট থাকা আর যা অর্জিত নয় সজন্য পেরেশান না হওয়া।

স্তেগফার ও তওবাকারীদের জন্য দ্বিতীয় খোশখবরী শোনানো হয়েছে وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ এখানে প্রথম فَضْل ারা মানুষের নেক আমল এবং দ্বিতীয় فَضْل দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ বেহেশত বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অত্র ায়াতের মর্ম হচ্ছে যে, প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার সৎকর্ম অনুসারে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও ভাগ-বিলাস দান করবেন।

প্রথম বাক্যে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনে সুখ-সচ্ছলতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে আখেরাতের চরস্থায়ী আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ অর্থাৎ এতসব নীতিবাক্য ও হিতোপদেশ সত্ত্বেও যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বকৃত গোনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনা না কর এবং ভবিষ্যতে তা হতে বিরত থাকতে বদ্ধপরিকর না হও, তাহলে আমার ভয় হয় যে, এক মহাদিনের আজাব এসে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে মহাদিন বলে কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা ব্যক্তির দিক দিয়ে সে দিনটি হবে হাজার বছরের সমান। আর সংকট ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে তার চেয়ে বড় কোনো দিন নেই।

পঞ্চম আয়াতেও পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর উপর আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনে তোমরা যা কিছু কর আর যেভাবেই জীবন-যাপন কর না কেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে অবশ্যই আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে হবে। আর তিনি সর্বশক্তিমান, তার জন্য কোনো কার্যই দুঃসাধ্য বা দুষ্কর্ম নয়। তোমাদের মৃত্যু এবং মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তোমাদের সমস্ত অণুকণাসমূহ একত্র করে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় মানুষরূপে দাঁড় করাতে সক্ষম।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও বদভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলপাক ﷺ-এর সাথে তাদের বৈরিতা ও বিদ্বেষকে গোপন রাখার ব্যর্থপ্রয়াসে লিপ্ত। তাদের অন্তরস্থ হিংসা ও কুটিলতার আগুনকে ছাইচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, বুকের উপর চাদর আচ্ছাদিত করে রাখলে এবং চুপে চুপে চক্রান্ত করলে তাদের কুটিল মনোভাব ও দুরভিসন্ধির কথা কেউ জানতে বা আঁচ করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ ও সলা পরামর্শ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন। কেননা إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি তো অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত গুপ্ত ভেদের কথাও পূর্ণ ওয়াকিফহাল কোনো সন্দেহ নেই।

اَلْجُزْءُ الثَّانِىْ عَشَرَ : বারোতম পারা

অনুবাদ :

٦. وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ هِىَ مَا دَبَّ عَلَيْهَا اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا تُكَفَّلُ بِهِ فَضْلًا مِنْهُ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مَسْكَنَهَا فِى الدُّنْيَا اَوِ الصُّلْبِ وَمُسْتَوْدَعَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ اَوْ فِى الرَّحِمِ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ . بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ

৬. পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি অনুগ্রহ বশতঃ তার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থান অর্থাৎ দুনিয়ার বা পিতৃ পৃষ্ঠদেশে তাদের অবস্থান এবং মৃত্যুর পর বা মাতৃগর্ভে তাদের অবস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবহিত। উল্লিখিত সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে রয়েছে। مِنْ دَابَّةٍ এস্থানে مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। دَابَّةٍ অর্থ– যা ভূমিতে বিচরণ করে।

٧. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ اَوَّلُهَا اَحَدٌ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ وَكَانَ عَرْشُهٗ قَبْلَ خَلْقِهَا عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ عَلٰى مَتْنِ الرِّيْحِ لِيَبْلُوَكُمْ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ اَىْ خَلَقَهُمَا وَمَافِيْهِمَا مَنَافِعُ لَكُمْ وَمَصَالِحُ لِيَخْتَبِرَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اَىْ اَطْوَعُ لِلّٰهِ وَلَئِنْ قُلْتَ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ مَا هٰذَا الْقُرْاٰنُ النَّاطِقُ بِالْبَعْثِ اَوِ الَّذِىْ تَقُوْلُهٗ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ . بَيِّنٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ وَ الْمُشَارُ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ .

৭. তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, রবিবার ছিল শুরু আর শেষ দিনটি ছিল শুক্রবার, তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক আনুগত্যশীল তা পরীক্ষা করার জন্য। অর্থাৎ এতদুভয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তোমাদের উপকার ও কল্যাণকর সবকিছুর সৃষ্টি তোমাদেরকে যাচাই করার জন্যই। আর এতদুভয়ের সৃষ্টির পূর্বে তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। এবং তা ছিল বায়ুর পিঠে। হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে যদি বল, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে তখন কাফেররা নিশ্চয়ই বলবে এটা তো অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা সম্বলিত এই কুরআন বা তুমি যা বল তাতো স্পষ্ট জাদু। لِيَبْلُوَكُمْ উল্লিখিত خَلَقَ ক্রিয়ার সাথে তা مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। اِنْ هٰذَا এই اِنْ টি এস্থানে নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অপর এক কেরাতে سِحْرٌ শব্দটি سَاحِرٌ [জাদুকর] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা দ্বারা রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে বলে বুঝাবে।

٨. وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰى مَجِيْئِ اُمَّةٍ جَمَاعَةٍ اَوْ اَوْقَاتٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ اِسْتِهْزَاءً مَا يَحْبِسُهُ ط يَمْنَعُهُ مِنَ النُّزُوْلِ قَالَ تَعَالٰى اَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا مَدْفُوْعًا عَنْهُمْ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ ـ

৮. নির্দিষ্ট এক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ দলের বা সময়ের আগমন পর্যন্ত আমি যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা বিদ্রূপ করতো নিশ্চয়ই বলবে, কি সে তাকে নিবারণ করছে? তা আপতিত হতে কি জিনিস বাধা দিয়ে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সাবধান! যেদিন তা তাদের নিকট আসবে সেদিন তাদের নিকট হতে তা ফিরবে না। তাদের তরফ হতে তাকে আর প্রতিহত করা হবে না। যা নিয়ে অর্থাৎ যে আজাব সম্পর্কে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। অর্থাৎ এটা তাদের উপর আপতিত হবে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ تَكَفَّلَ بِهٖ فَضْلًا مِنْهُ : এই বৃদ্ধিকরণ একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর যে, اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার উপর রিজিক পৌছানো ওয়াজিব। অথচ وُجُوْب আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব।

উত্তর॥ উত্তরের সারকথা হলো সৃষ্টিজীবকে জীবিকা পৌছানো আবশ্যক হওয়া ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং শুধুমাত্র দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে।

قَوْلُهُ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كُلٌّ-এর তানভীনটি مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلُهُ بَيِّنٌ : مُبِيْنٌ-এর তাফসীর بَيِّنٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُتَعَدِّيْ টা لَازِمٌ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ جَمَاعَةٍ اَوْقَاتٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُمَّةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের দল নয়; বরং এর দ্বারা সময়ের مَعْدُوْد উদ্দেশ্য। اُمَّةٍ মূলত মানুষের দলকে বলা হয়। অর্থাৎ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ আর এখনো طَائِفَةٌ مِنَ الْاَزْمِنَةِ مَجْمُوْعَةٌ উদ্দেশ্য। যেমনটি ব্যাখ্যাকার اَوْقَاتٌ শব্দ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مَعْدُوْدَةٍ : مَعْدُوْدَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَلِيْلَةٌ কেননা حَصْرٌ بِالْعَدَدِ টা قِلَّتْ-এর উপর বুঝায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইলমের ব্যাপকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং মানুষের মনের গোপন কল্পনাও তাঁর অজানা নয় অতঃপর তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে মানুষের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শুধু মানুষেরই পানীয় ইত্যাদি রিজিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। শুধু মানুষেরই নয়, পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী যেখানেই আল্লাহর নিকট হতে কিছু গোপন করার জন্য কাফেরদের অপকৌশল ও ব্যর্থপ্রয়াস বোকামি এবং মূর্খতা বৈ নয়। এখানে مِنْ শব্দ বৃদ্ধি করে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বলে আয়াতের ব্যাপকতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, অন্য হিংস্র জন্তু, পক্ষীকুল, গুহাবাসী সরীসৃপ, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, সামুদ্রিক প্রাণী প্রভৃতি সবই অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত। সকলের রিজিকের দায়িত্বই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

دَابَّةٌ [দাব্বাতুন এমন সব প্রাণীকে বলে, যা পৃথিবীতে বিচরণ করে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিজিকের দায়িত্বই

তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন, এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যার দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ করেছেন عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'তাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।' একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে عَلٰى ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরজ বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোনো কাজ ফরজ বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رِزْق রিজিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তুও যা কোনো প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যা দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিজিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিজিক ভোগ করে থাকে। কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিজিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিজিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিজিক হালালও হতে পারে হারামও হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ্য করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিজিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিজিক বৈধ পন্থায় তার নিকট পৌঁছে যেত।

রিজিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব যেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথা নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়! এর রহস্য কি? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন। তন্মধ্যে এক জবাব হচ্ছে, এখানে রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণেই মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া এর কারণ হতে থাকে। অনুরূপভাবে রিজিক বন্ধ করে দেওয়ার কারণে অনাহার ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিজিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতঃপর রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিজিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবূ মূসা (রা.) ও হযরত আবূ মালেক (রা.) প্রমুখ আশ'আরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়েমেন হতে হিজরত করে মদিনা শরিফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হুজুর ﷺ-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রাসূলে কারীম ﷺ তাদের জন্য কোনো আহার্যের সুব্যব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রাসূলে আকরাম ﷺ -এর গৃহদ্বারে হাজির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রাসূলে পাক ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এলো وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নি উক্ত সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকূলের রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন "শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে।" তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দূরবস্থার কথা রাসূলে কারীম ﷺ কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চিত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত রুটিপূর্ণ একটি قَصْعَةً অর্থাৎ বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশ'আরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশ'আরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তারা খাঞ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলছেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার প্রেরিত রুটি গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো কোনো খানা প্রেরণ করিনি।"

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিনে। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলনে "আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের খোঁজে তূর পাহাড়ে পৌঁছে আগুনের পরিবর্তে যখন সেখানে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী দেখতে পেলেন, নবুয়ত ও রিসালত লাভ করলেন এবং ফেরাউন ও তার কওমকে হেদায়েতের জন্য মিসর গমনের নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁর মনের কোণে উদয় হলো যে, আমি স্বীয় স্ত্রীকে জনহীন-মরুপ্রান্তরে একাকিনী রেখে এসেছি, তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর সন্দেহ নিরসনের জন্য আদেশ করলেন যে, "তোমার সম্মুখে পতিত প্রস্তরখানির উপর লাঠি দ্বারা আঘাত হান।" তিনি আঘাত করলেন। তখন উক্ত প্রস্তরখানি বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্যে হতে আরেকখানি পাথর বের হলো। দ্বিতীয় প্রস্তরখানির উপর আঘাত করার জন্য পুনরায় আদেশ হলো। হযরত মূসা (আ.) আদেশ পালন করলেন। তখন তা ফেটে গিয়ে আরেকখানি প্রস্তর বের হলো। তিনি আঘাত করলেন। তা বিদীর্ণ হলো এবং এর অভ্যন্তর হতে একটি জ্যান্ত কীট বেরিয়ে এলো, যার মুখে ছিল একটি তরু-তাজা তৃণখণ্ড [সুবহানাল্লাহ]। আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের একীন হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বেও ছিল। তবে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। তাই এ দৃশ্য দেখার পর হযরত মূসা (আ.) সরাসরি মিসর পানে রওয়ানা হলেন।

সহধর্মিণীকে এটা বলা প্রয়োজন মনে করেননি যে, মিসর যাওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিজিক পৌঁছাবার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা : অত্র আয়াতে "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন" বলেই ক্ষান্ত হন নি; বরং মানুষকে আরো নিশ্চয়তা দান করার জন্য ইরশাদ করেছেন وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا আলোচ্য আয়াতে مُسْتَقَرٌّ 'মুস্তাকার' ও مُسْتَوْدَعٌ 'মুস্তাওদা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে তাফসীরে কাশশাফের ব্যাখ্যাই অধিক অভিধানসম্মত। তা হচ্ছে 'মুস্তাকার' স্থায়ী বাসস্থান বা বাসভূমিকে বলে। আর অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানস্থলকে 'মুস্তাওদা' বলা হয়।

সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারীকে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা শক্তির দায়িত্বের সাথে তুলনা করা চলে না। কারণ দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার যদি আপনার খোরাকীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে কিছুটা পরিশ্রম আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থান হতে আপনি যদি স্থানান্তরিত হতে চান, তবে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে যে, অমুক মাসের অত তারিখ হতে অত তারিখ পর্যন্ত আমি অমুক শহরে বা গ্রামে অবস্থান করব। অতএব, আমার খোরাকি সেখানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হোক। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা জিম্মাদারী গ্রহণ করলে এতটুকু মেহনতও করা লাগে না। কেননা তিনি তো সকল প্রাণীর প্রতিটি নড়াচড়া, উঠা-বসা, চলাফেরা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি যেমন আপনার স্থায়ী নিবাস জানেন, তেমনি সাময়িক আবাসও জ্ঞাত আছেন। কাজেই কোনো আবেদন অনুরোধ ছাড়াই আপনার রেশন যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবেই।

আল্লাহ তা'আলার সর্বাত্মক ইলম ও সর্বময় ক্ষমতার ফলে যাবতীয় কাজ সমাধার জন্য তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। কোনো কিতাব বা রেজিষ্টারে লেখা-লেখির আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানুষ যে ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে মনের খটকা দূর করে তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্য ইরশাদ করেছেন كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ সবকিছুই এক খোলা কিতাবে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। 'এখানে' 'খোলা কিতাব' বলে 'লওহে মাহফূজকে বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্ট জীবের আয়ু, রুজি ও ভালোমন্দ কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা যথাসময়ে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ইরশাদ ফরমান আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের তাকদীর নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। -[সহীহ মুসলিম শরীফ]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানি দীর্ঘ হাদীস বয়ান করেন যার সারমর্ম হলো মানুষ তার জন্মের পূর্বে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আসে। মাতৃগর্ভে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক একজন ফেরেশতা তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম, ভালোমন্দ তার যাবতীয় কার্যকলাপে, যা সে জীবনভর করবে। দ্বিতীয়, তার আয়ুষ্কালের বর্ষ, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট ও শ্বাস-প্রশ্বাস। তৃতীয়, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কোথায় সমাধিস্থ হবে। চতুর্থ, তার রিজিক কি পরিমাণ হবে এবং কোন পথে তার কাছে পৌছবে। সুতরাং লওহে মাহফূযে আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকা অত্র রেওয়ায়েতের বিপরীত নয়। সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ইলম ও অসীম শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি মাত্র ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সমগ্র আসমান ও জমিন সৃজন করেছেন। আর এসব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। এতদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বেই পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সূরা হা-মীম-সাজদার দশম ও একাদশ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে, দুই দিনে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা এবং প্রাণীকুলের আহার্য ও জীবন ধারণের উপকরণাদি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, এখানে আসমান দ্বারা সমগ্র উর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে এবং জমিন দ্বারা সমস্ত নিম্নজগত বোঝানো হয়েছে। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু সূর্যও ছিল না, তার উদয়-অস্তও ছিল না, সুতরাং দিনের অস্তিত্বও ছিল না। তবে এখানে 'দিন' বলে আসমান ও জমিন সৃষ্টির পরবর্তী 'একদিন পরিমাণ' সময়কে বোঝানো হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এক মুহূর্তে সবকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা করেন নি; বরং স্বীয় হিকমতের প্রেক্ষিতে ধীরে সৃজন করেছেন, যেন তা মানুষের প্রকৃতিসম্মত হয় এবং মানুষও কাজে ধীরতা, স্থিরতা অবলম্বন করে।

আয়াতের শেষভাগে আসমান ও জমিন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا সবকিছু সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যে হচ্ছে– আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করতে চাই যে, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল।

এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; বরং আমলকারী মানুষের উপকারার্থে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তারা এর মাধ্যমে নিজেদের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং এর অপার রহস্য চিন্তা করে নিজেদের প্রকৃত মালিকও পালনকর্তাকে চিনতে পারে।

সারকথা আসামান ও জমিন সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে মানুষ। বরং মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং তাদের মধ্যে আবার যারা অধিক সৎকর্মশীল তাদের খাতিরেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ ই সর্বাধিক সৎকর্মশীল ব্যক্তি। অতএব, একথা নির্ঘাত সত্য যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর পবিত্র সত্তাই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মূল কারণ।– [তাফসীরে মাযহারী]

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে اَحْسَنُ عَمَلًا -কে সবচেয়ে ভালো কাজ বলা হয়েছে, কিন্তু কে সর্বাধিক কাজ করে বলা হয়নি। অতএব, বোঝা যায় যে, নামাজ-রোজা কুরআন তেলাওয়াত, জিকির আজকার ইত্যাদি যাবতীয় নেক কাজ সংখ্যায় খুব বেশি করার চেয়ে, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আমল করাই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমলের এই সৌন্দর্যকে হাদীস শরীফে ইহসান বলা হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমল করতে হবে। পার্থিব কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য জড়িত করবে না। আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে আমল করতে হবে, যেভাবে মহানবী ﷺ নিজে করে দেখিয়েছেন। আর তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য জরুরি সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা, সুন্নত তরিকা মুতাবিক ইখলাসের সাথে অল্প আমল করাও ঐ অধিক আমলের চেয়ে উত্তম যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণ দু'টি নেই অথবা কম আছে।

সপ্তম আয়াতে কিয়ামতও আখেরাতকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের যে কথা বোধগম্য না হয় তাকেই তারা 'জাদু' বলে অভিহিত করে এড়িয়ে যেতে চায়।

অষ্টম আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে, যারা আজাবের হুশিয়ারি সত্ত্বেও নবীদের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করত না; বরং বলত যে, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছেন, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে সে আজাব কেন আপতিত হচ্ছে না?

অনুবাদ :

٩. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ مِنَّا رَحْ غِنًى وَصِحَّةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ط اِ لَيَئُوسٌ قَنُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَفُ شَدِيْدُ الْكُفْرِ بِه ـ

৯. যদি আমি মানুষকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহের সচ্ছলতা ও সুস্থতার আস্বাদ দেই ও পরে তা তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেই তখন সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে হতাশ নিরাশ এবং এতদ্বিষয়ে খুবই অকৃতজ্ঞ হয়।

١٠. وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ فَ وَشِدَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَ الْمَصَائِبُ عَنِّىْ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَوَالَهَا يَشْكُرُ عَلَيْهَا اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَرَحٌ بَ فَخُوْرٌ ـ عَلَى النَّاسِ بِمَا اُوْتِىَ ـ

১০. ক্লেশ স্পর্শ করার পর দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলে থাকে, আমার মন্দাবস্থা বিপদ আপদ কেটে গেছে। এটা বিনষ্ট হওয়ার আর সে আশঙ্কা করে না এবং তার জন্য সে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। সে হয় আনন্দিত আনন্দে উৎফুল্ল ও তাকে যা দান করা হয়েছে সে কারণে মানুষের উপর অহংকার প্রদর্শনকারী।

١١. اِلَّا لٰكِنْ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى الضَّ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط فِى النَّعْمَاءِ اُولٰ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ـ هُوَ الْجَنَّةُ ـ

১১. কিন্তু যারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণকারী ও অনুগ্রহের সময়েও সৎ কর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। অর্থাৎ জান্নাত। اِلَّا এস্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٢. فَلَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ تَارِكٌ بَعْضَ يُوْحٰى اِلَيْكَ فَلَا تُبَلِّغُهُمْ لِ لِتَهَاوُنِهِمْ بِه وَضَائِقٌ بِه صَدْ بِتِلَاوَتِه عَلَيْهِمْ لِاَجْلِ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَ هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَ يُصَدِّقُهُ كَمَا اقْتَرَحْنَا اِنَّمَا اَنْتَ نَذِ فَلَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ لَا الْاِتْيَانُ بِ اقْتَرَحُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِ حَفِيْظٌ فَيُجَازِيْهِمْ ـ

১২. হে মুহাম্মাদ ﷺ! তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি যে তার কিয়দাংশ পরিত্যাগ না করে বস, তাদের অবহেলার কারণে তার কিছু অংশ যেন তাদের নিকট পৌছবে না এমন যেন না হয় এবং তাদের এটা পাঠ করে শুনাতে তোমার মন যেন সংকোচিত না হয় এ কারণে যে, তারা বলে আমাদের দাবি অনুসারে তার উপর ধন ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন বা তার সাথে ফেরেশতা আসে না কেন? যা তাকে সত্য বলে সমর্থন করতো। তুমি তো কেবল সতর্ককারী। সুতরাং পৌছে দেওয়া ব্যতীত তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। এদের দাবি অনুসারে নিদর্শন আনয়ন তোমার কাজ নয়। আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে কর্মবিধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল প্রদান করবেন। لَوْلَا এটা এস্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٣. اَمْ بَلْ يَقُولُوْنَ افْتَرَاهُ ط اَيِ الْقُرْاٰنَ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ مُفْتَرَيٰتٍ فَاِنَّكُمْ عَرَبِيُّوْنَ فُصَحَاءُ مِّثْلِيْ تَحَدَّاهُمْ بِهَا اَوَّلًا ثُمَّ بِسُوْرَةٍ وَّادْعُوْا لِلْمُعَاوَنَةِ عَلٰى ذٰلِكَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْ اَنَّهٗ اِفْتَرَاهُ.

১৩. বরং তারা বলে তিনি এটা আল কুরআন মনগড়াভাবে রচনা করে নিয়ে এসেছেন। বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও যে তিনি এটা রচনা করেছেন তবে তোমরা ফাসাহাত, বালাগাত, ভাষা অলঙ্কার ও ভাষা সৌন্দর্য তার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর। তোমরা তো আমারই মতো আরবি ভাষাভাষী, অলঙ্কার অভিজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অপর যাকে পার তাকেও উক্ত বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আহ্বান কর। প্রথমে দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল পরে একটি সূরা আনয়নেরও চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। اَمْ এটা এস্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত।

١٤. فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اَيْ مَنْ دَعَوْتُمُوْهُمْ لِلْمُعَاوَنَةِ فَاعْلَمُوْا خِطَابٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنَّمَا اُنْزِلَ مُتَلَبِّسًا بِعِلْمِ اللّٰهِ وَلَيْسَ اِفْتِرَاءً عَلَيْهِ وَاَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اَنَّهٗ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ بَعْدَ هٰذِهِ الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ اَيْ اَسْلِمُوْا.

১৪. যদি তারা অর্থাৎ যাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছ তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে হে মুশরিকগণ! জেনে রাখ! এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তার জ্ঞানসহ অবতীর্ণ এটা মিথ্যা রচনা নয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। এই অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। بِعِلْمِ এটা এস্থানে উহ্য مُتَلَبِّسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। اَنْ لَّا এই اَنْ টি مُخَفَّفَةٌ বা লঘুকৃত। মূলত ছিল اَنَّهٗ

١٥. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا بِاَنْ اَصَرَّ عَلَى الشِّرْكِ وَقِيْلَ هِيَ فِي الْمُرَائِيْنَ نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ اَيْ جَزَاءَ مَا عَمِلُوْهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَ صِلَةِ رَحِمٍ فِيْهَا بِاَنْ نُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ وَهُمْ فِيْهَا اَيِ الدُّنْيَا لَا يُبْخَسُوْنَ يُنْقَصُوْنَ شَيْئًا.

১৫. যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে শিরক করার উপর জিদ ধরে থাকে তবে আমি তাতেই দুনিয়াতেই তাদের কর্ম অর্থাৎ দান, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ইত্যাদি ভালো কাজ যা তারা করে সেগুলোর পরিপূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দেব। যেমন তাদের রিজিক বিস্তৃত করে দেব এবং তাতে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা কম পাবে না। তাদের প্রতিদান হতে কিছু কম করা হবে না। কেউ কেউ বলল, রিয়াকার বা লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

١٦. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ط وَحَبِطَ بَطَلَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا اَيِ الْاٰخِرَةِ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

১৬. তাদের জন্যই পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে তাতে অর্থাৎ পরকালে বিনষ্ট হয়ে যাবে। নিষ্ফল হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ পুণ্যফল পাবে না। তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।

١٧. اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَهُوَ النَّبِىُّ ﷺ اَوِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهِىَ الْقُرْاٰنُ وَيَتْلُوْهُ يَتَّبِعُهٗ شَاهِدٌ يُصَدِّقُهٗ مِّنْهُ اَىْ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ جِبْرَائِيْلُ وَمِنْ قَبْلِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ كِتَابُ مُوْسٰى التَّوْرٰةُ شَاهِدٌ لَهٗ اَيْضًا اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط حَالٌ كَمَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ لَا اُولٰٓئِكَ اَىْ مَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط اَىْ بِالْقُرْاٰنِ فَلَهُمُ الْجَنَّةُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ جَمِيْعِ الْكُفَّارِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ج فَلَاتَكُ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

১৭. যারা প্রতিষ্ঠিত প্রভুর পক্ষ হতে আগত বিবরণ অর্থাৎ আল কুরআন যার অনুসরণ করে তারা প্রেরিত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত সাক্ষী অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) তা সত্য বলে সাক্ষ্য দান করেন এবং যার পূর্বে অর্থাৎ আল কুরআনের পূর্বে আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরিত মূসার কিতাব তাওরাতেও যার সাক্ষী সেই বিবরণের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ রাসূল ﷺ বা মু'মিনগণ তাদের মতো কি হতে পারে তারা যারা এরূপ নয়। না, এটা তাদের মতো হতে পার না। তারাই অর্থাৎ যারা উক্ত বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত তারাই তাতে অর্থাৎ আল কুরআনে বিশ্বাসী সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। অন্যান্য দলের অর্থাৎ সকল কাফের সম্প্রদায়ের যারা এটাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি তাতে অর্থাৎ আল কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ো না। এটাতো নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তা বিশ্বাস করে না। بَيِّنَةٍ এস্থানে এটার অর্থ بَيَانٌ বা বিবরণ। يَتْلُوْهُ অর্থ– এটার অনুসরণ করে। اِمَامًا وَّرَحْمَةً এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। مِرْيَةٍ অর্থ সন্দেহ।

١٨. وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ط بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ جُمْلَةِ الْخَلْقِ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ جَمْعُ شَاهِدٍ وَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيْبِ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ج اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ . الْمُشْرِكِيْنَ .

১৮. শরিক ও সন্তান আরোপ করত যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? না কেউ নেই। কিয়ামতের দিন অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সাথে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ, তারা রাসূলগণের সম্পর্কে পৌঁছাবার এবং কাফেরদের সম্পর্কে অস্বীকার করার সাক্ষ্য দান করবেন। বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। শোন! সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর মুশরিকদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ। اَلْاَشْهَادُ এটা شَاهِدٌ -এর বহুবচন।

١٩. اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَيَبْغُوْنَهَا يَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ عِوَجًا مُعَوَّجَةً وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ تَاكِيْدٌ كَافِرُوْنَ .

১৯. যারা আল্লাহ তা'আলার পথে দীন ইসলামের পথে বাধা দেয় এবং তাতে এপথে দোষ ত্রুটি বক্রতা অনুসন্ধান করে। আর এরাই পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসী। يَبْغُوْنَ তারা অনুসন্ধান করে। هُمْ كَافِرُوْنَ এই هُمْ সর্বনামটি এস্থানে تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٠. اُولٰئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ اَنْصَارٍ يَمْنَعُوْنَهُمْ عَذَابَهٗ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ط بِاِضْلَالِهِمْ غَيْرَهُمْ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ لِلْحَقِّ وَمَاكَانُوْا يُبْصِرُوْنَ اَىْ لِفَرْطِ كَرَاهَتِهِمْ لَهٗ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذٰلِكَ .

২০. তারা পৃথিবীতে পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাকে পরাভূত করতে পারেনি এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের অপর কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী নেই। যে তাদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে প্রতিহত করবে। অন্যদের পথভ্রষ্ট করার দরুন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। সত্য সম্পর্কে তাদেরকে শোনার সামর্থ্য ছিল না এবং তারা দেখত না। অর্থাৎ সত্যের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির আতিশয্যের কারণে তাদের যেন শোনা বা দেখার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

٢١. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ . عَلَى اللّٰهِ مِنْ دَعْوَى الشِّرْكِ .

২১. চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রত্যাবর্তন করত তারা নিজদিগেরই ক্ষতি করল এবং শিরকের দাবি করত আল্লাহ তা'আলার উপর যে সমস্ত বস্তুর তারা মিথ্যা আরোপ করত তা হারিয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল।

٢٢. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ .

২২. নিশ্চয়ই তারা হবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।

٢٣. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا سَكَنُوْا وَاطْمَاَنُّوْا وَاَنَابُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

২৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের সমীপে মিনতি প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার দিকেই প্রশান্তি লয়, তার দিকেই ফিরে আসে তারাই জান্নাতবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٢٤. مَثَلُ صِفَةُ الْفَرِيْقَيْنِ الْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ هٰذَا مَثَلُ الْكَافِرِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ط هٰذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ط لَا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ تَتَعِظُوْنَ.

২৪. দল দুটির কাফের ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত বিবরণ হলো অন্ধ ও বধির এটা কাফেরদের উদাহরণ এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রোতা এটা মু'মিনের উদাহরণ। এই উভয়ের অবস্থা কি সমান? না সমান নয়। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না। تَذَكَّرُوْنَ তাতে মূলত ذ এ ت -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً (اَلْاٰيَة) : لَئِنْ -এর মধ্যে لَامْ টি قَسَمِيَّة হয়েছে। اِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ হলো جَوَاب قَسَمْ আর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। مِنَّا হলো حَالْ আর رَحْمَةً হলো اَذَقْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর মূলত رَحْمَةً -এর সিফত مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে حَالْ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ : এই উভয়টিই مُبَالَغَة -এর সীগাহ। আর এ দুটিই اِنَّ -এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْكَافِرُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْاِنْسَانَ -এর اَلِفْ لَامْ টি عَهْدِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْكُفْرِ بِ : এটা كَفُوْرٌ -এর মুবালাগাহ -এর সীগাহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَوَالَهُ : এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ -এর মধ্যে শুধুমাত্র মসিবতসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং বক্তা এই মসিবতে ফিরে না আসার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অর্থাৎ অর্জিত নিয়ামত তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

قَوْلُهُ لٰكِنْ : এখানে اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنَّ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে। কেননা لَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ -এর মধ্যে اِنْسَانَ দ্বারা কাফের ইনসান উদ্দেশ্য। কাজেই اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ بَيَانٍ : بَيِّنَةٍ -এর তাফসীর بَيَانٍ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলার বাণী يَتْلُوْهُ -এর যমীর بَيِّنَةٍ -এর দিকে ফিরেছে। অথচ যমীর এবং مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো بَيِّنَةٍ টা بَيَانٍ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ اَوِ الْمُؤْمِنُوْنَ : এটা مَنْ كَانَ بَيِّنَة -এর মধ্যে مَنْ -এর مِصْدَاقْ -এর ব্যাখ্যা। مَنْ -এর مِصْدَاقْ -এর ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম হলো রাসূল ﷺ -আর অপরটি হলো মু'মিনগণ। আর وَهِىَ الْقُرْاٰنُ হলো بَيِّنَة -এর مِصْدَاقْ -এর বিবরণ।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ هُمَا حَالَانِ مِنْ كِتَابِ مُوْسٰى

قَوْلُهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذَالِكَ : মুফাসসির (র.) এই বাক্য বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَفَمَنْ كَانَ الخ মুবতাদার খবর উহ্য রয়েছে। আর তা হলো كَمَنْ لَيْسَ كَذَالِكَ

قَوْلُهُ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ -এর মধ্যে হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ

قَوْلُهُ يَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ : এটা এই প্রশ্নের উত্তর যে, يَبْغُوْنَهَا -এর যমীর سَبِيْل -এর দিকে ফিরেছে। অথচ যমীর স্ত্রী লিঙ্গ বা مُؤَنَّثْ আর سَبِيْل হলো مُذَكَّرْ বা পুংলিঙ্গ।

জবাবের সারকথা হলো এই যে, سَبِيْل শব্দটি مُذَكَّرْ এবং مُؤَنَّثْ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির ও জলদি-প্রিয়। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোনো নিয়ামতের স্বাদ-অস্বাদন করার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত -হারা হতাশ ও না-শোকর বনে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বাভাবত জলদি-বাজ, বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নিয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামি করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহঙ্কার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমার যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এ কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, অদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে چناں نماند چنین نیز هم نخواهد ماند তা যেমন রয়নি এও তেমনি থাকবে না, থাকাটাই বরং অসম্ভব।

অতীত ও ভবিষ্যতকে ভুলে গিয়ে বর্তমান-পূজায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাধি মানুষের মন-মগজকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, একজন ক্ষমতাসীনের রক্তমাখানো মাটির উপর আরেকজন স্বীয় মসনদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং কখনো ফিরে তাকাবার সুযোগ হয় না যে, তার পূর্বসূরী একজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিও ছিল, তার পরিণতি কত মর্মান্তিক হয়েছে। বরং ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করার নেশায় বুঁদ হয়ে এর শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকে।

এহেন বর্তমান-পূজার ব্যাধি ও ভোগমত্ততার রোগ হতে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই আসমানি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে নবী রাসূল (আ.) গণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা অতীত ইতিহাসের শিক্ষামূলক ঘটনাবলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ সাফল্যের চিন্তা সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাঁরা উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থ পর্যবেক্ষণ করে দেখ, এক পরাক্রশালী মহাশক্তি অন্তরাল হতে একে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছেন। তোমরাও তাঁ বিধি-নিষেধ মেনে চল। হযরত শায়খুল-হিন্দের ভাষায় বলতে হয়। قلابات جہاں واعظ رب ہے دیکھو - ہو تغیر سے صدا آتی ہے فافہم فافہم 'জগতের পরিবর্তনসমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশ দিচ্ছেন, প্রতিটি পট-পরিবর্তন ডাক দিে যায়-উপলব্ধির অনুধাবন কর।' পূর্ণ ঈমানদার তথা সত্যিকার মানুষ ঐ সব ব্যক্তি যারা সাময়িক সুখ-দুঃখ ও বস্তুজগতের প্রি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন না। বরং সকল সুখ-দুঃখ, প্রতিটি আবর্তন-বিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল এ মহাশক্তিকে অনুধাবন করেন। কার্যকারণের পেছনে না ছুটে বরং উহার মূল উৎস ও স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং ত সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

১১ নং আয়াতে এমন ঈনসানে-কামিল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য ইরশ করেছেন إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিে গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা।

صَبْر - সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবি ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেওয়া, বন্ধন করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যায় কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণকে করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরিয়তের পরিপন্থি যাবতীয় পাপকর্ম হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত তদ্রূপ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কিয়ামতের জবাবদেহিতার ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কাজে মশগুল থাকে তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্যধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ : অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাদের সৎকাজসমূহের বিরাট প্রতিদান দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ তা'আলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বরং মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেওয়া হয়েছে, যেন আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন বোকামি, তদ্রূপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশায়ও অত্যাধিক বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। বস্তুত দুনিয়াটাকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটি প্রদর্শনীস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নমুনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২ নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী ﷺ সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিল। প্রথমত তারা বলল 'এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি হয়তো অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন।' اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।"

–[তাফসীরে বগবী ও তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয়ত তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি ঐ সময় বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো আপনার আয়ত্তে কোনো ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা আসমান হতে কোনো ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবে এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।"

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কারণ তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তাঁর ইখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরি ও শিরকের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা তিনি রাহমাতুললি 'আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে তাদের আবদার ছিল নিরেট মুর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়, নবুয়তকে তারা বাদশাহীর উপর কিয়াস করে বসেছিল। আসলে ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোনো সম্পর্কে নেই। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলারও এমন কোনো রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। নতুবা নিখিল সৃষ্টি জগত তাঁর অপার কুদরতের করায়ত্ত। কার সাধ্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোনো কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হিকমতের তাগিদে ইহজগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকাজ সম্পাদন অথবা অন্যায়-অসত্য হতে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে মজবুর বা বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাজিল করে ভালো-মন্দের পার্থক্য এবং উহার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সৎকাজ করাও অসৎকার্য হতে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোনো ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হতো। ফলে এ দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হতো। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান-বিল গায়েব বা গায়েবের প্রতি ঈমান হতো না। অথচ ঈমান বিল-গায়েবই হচ্ছে ইমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার ইখতিয়ারও থাকত না। অথচ ইখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অতএব, তাদের আবদার ছিল নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে তাদের এহেন বেহুদা আবদার প্রমাণ করে তারা নবী ও রাসূলের হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রাসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রাসূলের কাছে তারা এমন আবদার করছে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না। যা হোক রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করা ও মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহর প্রেরিত কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন? যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরিকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে। এখানে لَعَلَّكَ শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রাসূলে পাক ﷺ কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ তিনি তো আল্লাহর পক্ষ হতে نَذِيْرٌ ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই নবীর মাধ্যমে মোজেজা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরিকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে نَذِيْرٌ বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نَذِيْرٌ [ভীতি প্রদর্শক] ছিলেন, অপরদিকে সৎ কর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بَشِيْرٌ সুসংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মোজেজা দাবি করার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মোজেজা পাক-কুরআন তোমাদের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ মোজেজার দাবি করে থাক, তাহলে কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে! সুতরাং নতুন কোনো মোজেজার দাবি করে থাক তাহলে তোমাদের মতো হঠকারী লোকেরা মোজেজা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশা করা যায় না। সারকথা, কুরআনে কারীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মোজেজা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরিকরা যেসব অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম নয়;বরং রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং তা রচনা করেছেন! যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে উম্মী ﷺ নিজে রচনা করেছেন তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেবদেবী সবাই মিলে তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরি করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কুরআন যদি কোনো মানুষের রচিত কালাম হতো তাহলে অন্য মানুষরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কুরআন আল্লাহ পাকের ইলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই।

আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হলো, তখন তাদের মতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন করীমের সূরা বাকারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ তোমরা পবিত্র কুরআনকে যদি মানুষের তৈরি কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয়, অনুরূপ টি সূরা তৈরি করে আন। কিন্তু তাদের জন্য অতদূর সহজ করে দেওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের াবিলা করতে সক্ষম হলো না। অতএব, কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম ও স্থায়ী মোজেজা হওয়া সন্দেহাতীতভাবে াণিত হলো। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ অর্থাৎ এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا : ইসলাম বিরোধীদের যখন আজাবের ভয় দেখানো হতো, তখন নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলিকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সৎকাজ সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবিদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোনো রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ াদি কোনো জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এ আয়াতে [১৫ নং] সে ভাবেরই জবাব দেওয়া হয়েছে।

বের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, এটা একমাত্র াহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলে আকরাম ﷺ-এর তরিকা বিক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ, গুণ-গরিমা, -নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। তবে ত তা যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং এর দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ জাল্লাশানুহূ এহেন তথাকথিত ার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না; বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান হবে, লোক তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় াফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নিয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার া ছিল না। কাজেই আখেরাতে তার কোনো প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরি, শিরকি ও গোনহের ণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এটাই ১৫ নং আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। এবার অত্র আয়াতের শব্দ াস লক্ষ্য করুন।

াদ হয়েছে, যারা শুধু দুনিয়ার যিন্দেগী ও এর চাকচিক্য কামনা করে তাদের যাবতীয় সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান আমি নেই দান করি, আর এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনোরূপ কমতি করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য দোজখের ন ছাড়া আর কিছুই নেই।

নে বিশেষ লক্ষণীয় যে, অত্র আয়াতে কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুসারে مَنْ أَرَادَ সংক্ষিপ্ত শব্দের পরিবর্তে দীর্ঘতর مَنْ كَانَ يُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বাকরীতিতে চলমান কাল বোঝায় এবং এর অর্থ হচ্ছে যারা পার্থিব জীবন কামনা তে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অত্র আয়াতে শুধু ঐ সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা নিজেদের সৎকাজের মেয়ে শুধু পার্থিব ফায়দাই হাসিল করতে চায়। আখেরাতে মুক্তিলাভের কল্পনা তাদের মনের কোণে কখনো উদয় হয় না। ন্তরে যারা আখেরাতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে এবং সাথে সাথে পার্থিব কিছু লাভের আশাও রাখে, তারা আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আয়াত কি কাফেরদের সম্পর্কে, না মুসলমানদের অথবা কাফের ও মুসলমান উভয়ের সম্পর্কে, এ ব্যাপারে তাফসীরকার মগণের মতভেদ রয়েছে।

াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বোঝা যায় যে, অত্র াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গুনার শাস্তি ভোগ র পর অবশেষে দোজখ হতে মুক্তিলাভ করে বেহেশত প্রবেশ করবে এবং আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত লাভ করবে। এজন্য হাক প্রমুখ মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য।

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐ মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-মান, খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোজখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তাফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকাজ শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত সেদিকে কোনো লক্ষ্য রাখে না; বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তাফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মায়মূন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (র.) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রসিদ্ধ হাদীস إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটিও অদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ কতে চায়, সে আখেরাতের নিয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবি হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্বধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি। –[তাফসীরে কুরতুবী]

হাদীস শরীফে আছে কিয়ামতের দিন ঐসব লোককে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করা হবে, যারা লোকসমাজে সুনাম ও প্রশংসা লাভের জন্য লোকদেখানো মনোভাব নিয়ে ইবাদত ও সৎকাজ করেছে। তাদেরকে বলা হবে যে, "তোমরা দুনিয়াতে নামাজ পড়েছ, দান-খয়রাত করেছ, জিহাদ করেছ, কুরআন তেলাওয়াত করেছ কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যেন লোকে তোমাদেরকে মুসল্লি, দাতা, বীর ও কারী সাহেব বলে। তোমাদের যা কাম্য ছিল, তা তোমরা পেয়েছ, দুনিয়াতেই তোমরা এসব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছ। অতএব, আজ এখানে তোমাদের কার্যাবলির কোনো প্রতিদান নেই।" অতঃপর তকাদেরকে সর্বপ্রথম দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কুরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ করবে। আর কাফেররা যেহেতু আখেরাতের কোনো ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলির প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে তখন সেখানে পাওয়ার মতো তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না। তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, মুমিন ব্যক্তি যদিও পার্থিব সাফল্য ও প্রত্যাশা করে, কিন্তু আখেরাতের আকাঙ্ক্ষাই তার প্রবলতর থাকে। সুতরাং দুনিয়ায় সে প্রয়োজন পরিমাণ পায় এবং আখেরাতে বিপুল প্রতিদান লাভ করে।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) একদা হুজুর ﷺ -এর গৃহে হাজির হলেন। সারা ঘরে হাতেগোনা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বেশি কিছু জিনিসপত্র দেখতে পেলেন না। তিনি আরজ করলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার উম্মতকে দুনিয়ায় সচ্ছলতা দান করেন। আমরা পারসিক ও রোমকদেরকে দেখেছি, তারা দুনিয়ায় অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই করে না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এতক্ষণ তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, হযরত ওমর (রা.) -এর কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে ওমর! তুমি এখন পর্যন্ত এহেন চিন্তাধারা পোষণ করছ! এরা তো ঐসব লোক যাদের কাজের প্রতিফল ইহজীবনেই দান করা হয়েছে।

জামে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে আখেরাত লাভ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও বেনিয়াজ করে দেন এবং তার পার্থিব প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে দেন, দুনিয়া তার কাছে নত হয়ে ধর্ণা দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিল করতে চায়,

আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী করে দেন। তার অভাব ও দৈন্য কখনো দূর হয় না। কারণ দুনিয়ার মোহ তাকে কখনো নিশ্চিন্তে বসার অবসর দেয় না। একটি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটি প্রয়োজন তার সামনে উপস্থিত হয়। আর অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি তাকে পেয়ে বসে। অথচ শুধু ততটুকুই সে প্রাপ্ত হয়, যতটুকু আল্লাহ তা'আলার তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হয়, কোনো কমতি করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা শুধুমাত্র পার্থিব সুখ-সম্পদ হাসিল করতে চায় এবং এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীরও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কিছুই পায় না। এর কারণ কি?

জবাব এই যে, কুরআনুল কারীমের অত্র আয়াতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর তাফসীর সূরা বনী ইসরাঈলের এই আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুইটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মুতাবিক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমার হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবিলায় তুলে ধরা হয়েছে– যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণি কখনো সমকক্ষ হতে পারে না, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশ্বমানবের জন্য রাসূল হওয়টা এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামি হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে যে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যিনি কুরআনের ধারক ও বাহক এবং তার উপর স্থির অবিচল, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যার সত্যতার একটি প্রমাণ তো এর মধ্যেই মওজুদ রয়েছে এবং এর পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবও এর সাক্ষী– যা ছিল মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য এবং রহমতস্বরূপ।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٍ বলে কুরআন পাককে বোঝানো হয়েছে شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল কুরআনে হযরত থানবী (র.) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহিদ' অর্থ পবিত্র কুরআনের إِعْجَازٌ ইজায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কুরআনের উপর কায়েম রয়েছে। আর কুরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কুরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ, তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

দ্বিতীয় বাক্যে হুজুর ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান ও একীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব-মানবের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে কোনো ব্যক্তি আপনাকে অমান্য বা অস্বীকার করবে জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ইরশাদ করেছেন আমার প্রাণ যার কুদরতের করায়ত্ত, সেই মহান সত্তার কসম: যে-কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান আমার দাওয়াত শোনা সত্ত্বেও আমার আনীত শিক্ষার উপর ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা ঐসব লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হওয়া উচিত, যারা ইহুদি খ্রিস্টান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের প্রশংসনীয় কার্যাবলি দেখে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর কায়েম বলে সাফাই পেশ করে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং কুরআনে পাক ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে শুধু বাহ্যিক সৎকার্যাবলিকেই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে। এহেন ধ্যান-ধারণা পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে কারীমা ও সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

অনুবাদ :

٢٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّيْ أَيْ بِأَنِّيْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ عَلَى حَذْفِ الْقَوْلِ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ . بَيِّنُ الْإِنْذَارِ .

২৫. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ্য সতর্ককারী। আর সুস্পষ্ট এই সতর্কীকরণ। أَنِّيْ এটা এস্থানে بِأَنِّيْ অর্থে ব্যবহৃত। অপর এক কেরাতে তার اَلِفْ এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বে قَوْل ধাতু হতে গঠিত কোনো শব্দ قَائِلٌ বা قَالَ এটা রয়েছে বলে ধরা হবে।

٢٦. أَنْ أَيْ بِأَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّا اللّٰهَ ط إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِنْ عَبَدْتُّمْ غَيْرَهُ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيْمٍ . مُؤْلِمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

২৬. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমরা যেন অন্য কারো ইবাদত না কর। যদি অন্য কারো ইবাদত কর তবে আমি তোমাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর দিবসের শাস্তি আশঙ্কা করি। أَنْ এটা এস্থানে بِأَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٧. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ وَهُمُ الْأَشْرَافُ مَا نَرٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَلَا فَضْلَ لَكَ عَلَيْنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا أَسَافِلُنَا كَالْحَاكَةِ وَالْأَسَاكِفَةِ بَادِيَ الرَّأْيِ ج بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهَا أَيْ اِبْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَفَكُّرٍ فِيْكَ وَنَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِ أَيْ وَقْتَ حُدُوْثِ أَوَّلِ رَأْيِهِمْ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَتَسْتَحِقُّوْنَ بِهِ الْاِتِّبَاعَ مِنَّا بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ فِيْ دَعْوَى الرِّسَالَةِ أَدْرَجُوْا قَوْمَهُ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ .

২৭. তার সম্প্রদায়ের যারা কুফরি করেছিল সেই প্রধানরা বলল, আমরা তোমাকে তো আমাদের মতোই মানুষ দেখতেছি। আমাদের উপর তোমার তো আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। আমরা তো দেখতেছি, তোমার অনুসরণ করতেছে তো তারাই যারা আমাদের মধ্যে দুর্বল। নীচ শ্রেণির যেমন তাতী, মুচি ইত্যাদি হালকা মতামত পোষণ করে। তোমার বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই তারা এটা করতেছে। আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বও দেখতে পাচ্ছি না। যে তোমরা আমাদের অনুসরণের হকদার হতে পার বরং রেসালাতের দাবি করার মধ্যে আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। اَلْمَلَأُ তারা ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। بَادِيَ এটার শেষে هَمْزَة সহ ও তা ব্যতিরেকে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। ظَرْف বা কালাধিকরণরূপে তা مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, গভীরভাবে না তলিয়ে ধারণা সৃষ্টির শুরুতেই মত দিয়ে বসে। نَظُنُّكُمْ এস্থানে সম্বোধনের বেলায় তার সাথে তার সম্প্রদায়কেও শামিল করা হয়েছে।

٢٨. قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ أَخْبِرُوْنِيْ إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً نُبُوَّةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ خَفِيَتْ عَلَيْكُمْ ط

২৮. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? তোমরা আমাকে বল আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে সুস্পষ্ট বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ অর্থাৎ নবুয়ত দান করে থাকেন। অনন্তর তা তোমাদের চোখে না পড়ে গোপন হয়ে যায়

وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا أَنُجْبِرُكُمْ عَلٰى قَبُوْلِهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ لَا نَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

فَعُمِّيَتْ অপর এক কেরাতে এটার مِيْم এ তাশদীদসহ مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পঠিত রয়েছে। আমরা কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি এটা গ্রহণ করতে কি তোমাদেরকে জবরদস্তি করতে পারি যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর? না আমরা এটার অধিকার রাখি না।

২৯. وَيٰقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ مَالًا ط تُعْطُوْنِيْهِ إِنْ مَا أَجْرِيَ ثَوَابِيْ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كَمَا أَمَرْتُمُوْنِيْ إِنَّهُمْ مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْهِمْ وَيَأْخُذُ لَهُمْ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَطَرَدَهُمْ وَلٰكِنِّيْ أَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! তার পরিবর্তে অর্থাৎ রেসালাতের পয়গাম পৌঁছানোর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোনো অর্থসম্পদ যাচ্ঞা করি না যে তোমরা তা আমাকে দিবে। আমার বিনিময় পুণ্যফল কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছে। তোমাদের নির্দেশানুসারে মু'মিনদেরকে আমি তাড়িয়ে দেওয়ার নই। পুনরুত্থানের মাধ্যমে নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। অনন্তর তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। যারা তাদের উপর জুলুম করবে ও তাড়িয়ে দিবে তাদের পক্ষ হতে তিনি প্রতিশোধ নিবেন। কিন্তু আমি দেখতেছি তোমরা তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ এক সম্প্রদায়। إِنْ এটা এস্থানে নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত।

৩০. وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ يَمْنَعُنِيْ مِنَ اللّٰهِ أَيْ عَذَابِهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ أَيْ لَا نَاصِرَ لِيْ أَفَلَا فَهَلَّا تَذَكَّرُوْنَ . بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْأَصْلِ فِى الذَّالِ تَتَّعِظُوْنَ

৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহ তা'আলা হতে অর্থাৎ তার শাস্তি হতে আমাকে কে সাহায্য করবে? কে রক্ষা করবে? আর কেউই আমার সাহায্যকারী নেই। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না। শিক্ষাগ্রহণ করবে না? تَذَكَّرُوْنَ তাতে ذ এ প্রথম ت টির إِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে।

৩১. وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَنِّيْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ إِنِّيْ مَلَكٌ بَلْ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَا أَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْ تَحْتَقِرُ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ أَنْفُسِهِمْ ع قُلُوْبِهِمْ إِنِّيْ إِذًا إِنْ قُلْتُ ذٰلِكَ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

৩১. আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার ধন ভাণ্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত নই এবং আমি তাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। বরং আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় নীচ তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। ঐরূপ বললে আমি অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। أَنْفُسِهِمْ অর্থ তাদের অন্তরে।

٣٢. قَالُوا يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا خَاصَمْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْهِ .

৩২. তারা বলল হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক বাক বিতণ্ডা করেছ আর অতিমাত্রায় বিতণ্ডা করেছ। তুমি যদি এই বিষয়ে সত্যবাদী হয়ে থাক তবে আমাদেরকে যার যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছে তা নিয়ে আস।

٣٣. قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاۤءَ تَعْجِيْلَهُ لَكُمْ فَاِنَّ اَمْرَهُ اِلَيْهِ لَا اِلَيَّ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ اللّٰهَ .

৩৩. সে বলল আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের ব্যাপারে শীঘ্র করতে চাহেন তবে তিনি তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন। কারণ এটা আমার দায়িত্ব নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাভুক্ত। আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে হারিয়ে যেতে পারবে না।

٣٤. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ اَيْ اِغْوَائَكُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

৩৪. আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান তোমাদের বিভ্রান্তিই যদি তার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। اِنْ كَانَ اللّٰهُ আল্লাহ যদি চান। এই শর্তবাচক বাক্যটির জওয়াব এই স্থানে উহ্য। পূর্ববর্তী لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ বাক্যটি তার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

٣٥. قَالَ تَعَالٰى اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ افْتَرٰىهُ اِخْتَلَقَ مُحَمَّدٌ الْقُرْاٰنَ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ اَيْ عُقُوْبَتُهُ وَاَنَا بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ مِنْ اِجْرَامِكُمْ فِيْ نِسْبَةِ الْاِفْتِرَاۤءِ اِلَيَّ .

৩৫. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ বরং বলে যে, সে তা রচনা করেছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ নিজে এই কুরআন তৈরি করে নিয়ে এসেছেন বল আমি যদি এটা রচনা করে থাকি তবে আমার উপরই আমার এই অপরাধ অর্থাৎ তার শাস্তি। আর আমার প্রতি মিথ্যা রচনার দোষ আরোপ করতো তোমরা যে অপরাধ করতেছ তা হতে আমি দায়িত্ব মুক্ত। اَمْ এটা এস্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ الخ : অর্থাৎ تَذَكَّرُوْنَ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ হতে হয়েছে বাবে تَفْعِيْل থেকে নয়।

قَوْلُهُ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ : এটা مُبِيْنٌ -এর তাফসীর بَيِّنٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُبِيْنٌ এখানে اِبَانٌ লাজেম।

قَوْلُهُ عَذَابَ يَوْمِ اَلِيْمٍ : يَوْم -এর সিফত اَلِيْم -এর সাথে اِسْنَاد مَجَازِيٌّ -এর ভিত্তিতে হয়েছে عَلَاقَة ظَرْفِيَّتْ -এর কারণে

قَوْلُهُ كَالْحَاكَةِ : এটা حَائِكٌ -এর বহুবচন অর্থ তাঁতী।

قَوْلُهُ اَسَاكِفَةِ : এটা سَكَّافٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মুচি, জুতা, সেণ্ডেল সেলাইকারী।

قَوْلُهُ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهِ : অর্থাৎ হামযাকে বাকি রেখে (اَلرَّائِي) এবং হামযাকে ফেলে দিয়ে (اَلرَّاي)

قَوْلُهُ اِبْتِدَاءُ الخ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بَادِيَ টা بَدَأَ থেকে অর্থ হলো اِبْتِدَا [সূচনা] بُدُوٌّ থেকে নয়। যার অর্থ ظُهُوْر বা প্রকাশ পাওয়া।

قَوْلُهُ نَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ : অর্থাৎ بَادِيَ টা اِتَّبَعَكَ -এর ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقْتَ حُدُوْثِ أَوَّلِ رَأْيِهِمْ : এখানে وَقْتَ মুযাফ উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, ظَرْف টা হয়তো زَمَانٌ হবে অথবা مَكَانٌ হবে। আর بَادِيَ টা زَمَانٌ ও নয় আবার مَكَانٌ ও নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো بَادِيَ -এর পূর্বে একটি وَقْتَ শব্দ উহ্য রয়েছে, কাজেই এখন কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ اَدْرَجُوْا قَوْمَهُ مَعَهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো। প্রশ্ন হলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) তো একক ব্যক্তি ছিলেন। এরপরও তার জন্য نَظُنُّكُمْ বহুবচনের সীগাহ কেন ব্যবহার করলেন?

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, كَذِبٌ -এর নিসবতে হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের কেও অংশীদার করে নিয়েছে। এ কারণেই বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ عَلَى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ : এই বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো عَلَيْهِ -এর যমীরের مَرْجِعْ বর্ণনা করা।

প্রশ্ন. পূর্বে تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ -এর কোথাও উল্লেখ নেই। কাজেই এতে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো যদিও পূর্বে প্রকাশ্যভাবে تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ -এর কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু বাক্যের ধরন দ্বারা তা বুঝা যায়। কাজেই اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ اِنِّيْ : মুফাসসির (র.) اِنِّيْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَا اَعْلَمُ টা عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ -এর উপর আতফ হয়েছে। اَقُوْلُ -এর উপর নয়। এজন্যই উদ্দেশ্য হলো اِنِّيْ لَا اَقُوْلُ لَكَ اِنِّيْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

قَوْلُهُ تَزْدَرِيْ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِزْدِرَاءٌ মাসদার হতে। এটা زَرٰى يَزْرِيْ থেকে مُشْتَقٌ -এর অর্থ হলো কালিমা লেপন করা, দোষ লাগানো। زَرٰى عَلَيْهِ অর্থ হলো عَابَهُ ; এর মূল ছিল تَزْتَرِيْ এরপর تَاء কে دَالٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় تَزْدَرِيْ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর উহ্য রয়েছে। مَا মাওসূলাহ

قَوْلُهُ اِغْوَائِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে أَنْ يُغْوِيَكُمْ -এর মধ্যস্থ أَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ

قَوْلُهُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ : দ্বিতীয় شَرْط অর্থাৎ اِنْ كَانَ اللّٰهُ الخ -এর جَوَابُ উহ্য রয়েছে। যার উপর وَلَا يَنْفَعُكُمْ টা বুঝাচ্ছে। আর দ্বিতীয় شَرْط তার جَوَابُ شَرْط -এর সাথে মিলে প্রথম شَرْط তথা اِنْ اَرَدْتُّ الخ -এর جَوَابُ হয়েছে। এই তারকীব হলো বসরীগণের মতানুযায়ী।

আর কূফীগণের নিকট প্রথম شَرْط -এর جَزَاء . وَلَا يَنْفَعُكُمْ মুকাদ্দম হয়েছে। এই সুরতে উহ্য বাক্য হবে اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ فَاِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ আর দ্বিতীয় তারকীব এ কারণে যে, যখন দুটি شَرْط এবং একটি جَوَابُ একত্রিত হয়ে যায় তখন جَوَابُ টা দ্বিতীয় شَرْط -এর জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় شَرْط তার জবাবের সাথে মিলে প্রথম شَرْط -এর جَزَاء হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) যখন তার জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহ এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাসাপেক্ষে কয়েকটি শব্দের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

مَلَأٌ 'মালাউ' শব্দের সাধারণ অর্থ জামাত বা দল। কোনো কোনো ভাষাবিদ ইমামের মতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জামাতকে مَلَأٌ বলে। بَشَرٌ 'বাশার' অর্থ– ইনসান বা মানুষ। اَرَاذِلُ বহুবচন, তার এক একবচন اَرْذَلُ অর্থ নীচাশয়, নীচ লোক। কওমের মধ্যে যাদের কোনো মান মর্যাদা নেই। بَادِيَ الرَّأْيِ অর্থ– স্থূলবুদ্ধি, ভাসাভাসা মতামত।

হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল- مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا অর্থাৎ আমরা তো দেখি যে, আপনিও আমাদের মতোই মানুষ মাত্র। আমাদের মতো পানাহার করেন, হাটবাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলরূপে কোনো মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে এর জবাবে ইরশাদ হয়েছে- يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ.

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থি নয়। বরং চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার কাছে দীনি শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হতো, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হতো। কেননা ফেরেশতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তালীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার নবী হতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার কাছে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে, যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পয়গাম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মোজেজাই তার নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আ.) বলেছেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে স্পষ্ট দলিল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করতে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ তা'আলার রহমত জোরজবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকতো তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম কিন্তু এটা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন বিধানের পরিপন্থি। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হেচ্ছ যে, জোর জবরদস্তি কাউকে মুমিন বা মুসলমান বানানো কোনো নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রচনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রথমে স্পষ্টত বোঝা গেল যে, কোনো ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ ফেরেশতার অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং তাদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার সাধ্য ছিল কার? আর কোনো পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে ত ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ঈমান বিল গায়েব অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি ঈমা আনয়ন করতে হবে।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল- وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ অর্থাৎ আমরা দেখছি যে, আপনার প্রা ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে দুটি দিক রয়েছে এক. আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করতো। কিন্তু তারা ত প্রত্যাখ্যান করেছে। আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আন

আমরাও আহমকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হবো। দুই. সমাজের নিকৃষ্ট ও ইতর ও ছোট লোকগুলো আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসেবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হবো, নামাজের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

বস্তুবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণিকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল, যাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলত তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুত পক্ষে ইজ্জত ও উন্নতি, ধন-দৌলত বা বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোনো অন্তরায় থাকে না, কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে এর স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রাসূলে পাক ﷺ -এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই এর তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করলো। কেননা সে তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পারদর্শী ছিল, তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল তাদের একত্র করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তার অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি ঈমান আনয়ন করছে, না বিত্তশালী বড় লোকেরা? তারা জবাব দিল, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল,এ তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বল শ্রেণিই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মুর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই- যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন, যারা বাদশাহও রাজ কর্মচারীদের খোশামোদ-তোশামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, যারা দীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমিনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের (রা.) নিন্দা সমালোচনা করে, সেই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ তারাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরিয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

যা হোক ৩৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলা হয়েছে যে, কারো ধনসম্পদের প্রতি নবী রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজের খেদমত ও তা'লীম তাবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়তো আমাদের বিত্ত সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। কারণ আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ তা'আলার ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকারও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায়-অসঙ্গত। مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ -এর আরেক অর্থও হতে পারে যে, ধরে নেওয়া যাক, আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে কিয়ামতের দিন তারা যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানাবে, তখন আমি কি জবাব দেব?

৩০ নং আয়াতে একই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে আমাকে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন, তখন আমাকে আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে কে রক্ষা করবে? পরিশেষে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, মানুষের

জন্য নবুয়ত প্রাপ্তিকে অসম্ভব মনে করা, দরিদ্রদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার আবদার করা ইত্যাদি সবই তাদের জাহিলিয়াত ও মূর্খতার লক্ষণ ৩১ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা তিনি তার কওমের প্রশ্ন ও আপত্তি শ্রবণ করার পর তাদের মৌলিক হেদায়েত দানের জন্য ব্যক্ত করেছেন। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ধন-ভাণ্ডার থাকা, গায়েবের খবর জানা ফেরেশতা হওয়া প্রভৃতি যা কিছু তোমরা নবী রাসূলগণের জন্য আবশ্যক মনে করছ, আসলে তার একটিও নবুয়ত বা রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

তিনি প্রথমেই বলেছেন– وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার ধন ভাণ্ডার আছে। এখানে তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে। তারা বলতো যে, তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার নবীরূপে আগমন করে থাকেন, তবে তার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ধন ভাণ্ডার থাকা উচিত ছিল, যা থেকে লোকদেরকে সাহায্য দান করবেন। হযরত নূহ (আ.) জানিয়ে দিলেন যে, পার্থিব ধন সম্পদে মানুষকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হননি। বরং ধনসম্পদের মোহমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্যই তারা প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, ধন ভাণ্ডারের সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্ভবত এখানে আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, নবী রাসূল এমনকি আল্লাহ তা'আলার ওলীগণকে পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত হয়েছে, তাদের হাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ভাণ্ডার তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে যাকে খুশি তাকে দিতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখতে পারেন। এহেন ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে হযরত নূহ (আ.) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতের ভাণ্ডার কোনো নবী রাসূলের হাতে তুলে দেননি। ওলী আবদাল তো দূরের কথা। তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য নিজ অনুগ্রহে তাদের দোয়া ও চাহিদা স্বীয় মর্জি মোতাবেক পূরণ করে থাকেন।

হযরত নূহ (আ.)-এর দ্বিতীয় উক্তি ছিল– وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ অর্থাৎ আর আমি গায়েবও জানি না।" কেননা উক্ত জাহিলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গাম্বর তারা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আ.)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য গায়েবের ইলম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সিফত বা বৈশিষ্ট্য। কোনো নবী, ওলী বা ফেরেশতা তার অংশীদার হতে পারে না। তাদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শিরক। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তদীয় পয়গাম্বরগণের মধ্যে যাকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের ইলম দান করেন। তা নবী ওলীগণের ইখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তারা যখন তখন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন অবহিত করেন, তখন তাদের জন্য তা আর গায়েব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল গায়েব বলা হারাম ও শিরক।

তার তৃতীয় উক্তি হয়েছে– وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী রাসূল রূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে– তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মতো এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কোনো কল্যাণ ও কামিয়াবি দান করবেন না। কারণ প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবি ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না; বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবি হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) বলেন, তোমাদের মতো আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমি জালিমরূপ পরিগণিত হবো।

অনুবাদ :

٣٦. وَ اُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ مِنَ الشَّرِّ فَدَعَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ رَبِّ لَا تَذَرْ الخ فَاَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ وَقَالَ

৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল যে যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না। দুঃখ করিও না। অনন্তর হযরত নূহ (আ.) তাদের প্রতি বদদোয়া করেন .... رَبِّ لَا تَذَرْ অর্থাৎ প্রভু! পৃথিবীতে কোনো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। আল্লাহ তা'আলার তার দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন,

٣٧. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِيْنَةَ بِاَعْيُنِنَا بِمَرْأًى مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحْيِنَا اَمْرِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج كَفَرُوْا بِتَرْكِ اِهْلَاكِهِمْ اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ .

৩৭. তুমি আমার দৃষ্টির সমক্ষে আমার তত্ত্বাবধানে ও চক্ষের সামনে এবং আমার ওহী অর্থাৎ নির্দেশ অনুসারে নৌযান নৌকা নির্মাণ কর আর সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে কাফেরদের সম্পর্কে অর্থাৎ তাদের ধ্বংস করা হতে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে আমাকে কিছু বলিও না। তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

٣٨. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ جَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ ط اِسْتَهْزَؤُوْا بِهِ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ اِذَا نَجَوْنَا وَغَرِقْتُمْ .

৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল। যখনই তার সম্প্রদায়ের কোনো দল তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করত তাকে উপহাস করতো। এই বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। সে বলত তোমারা যদি আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরা যখন উদ্ধার পাইব আর তোমরা নিমজ্জিত হবে তখন আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করতেছ। يَصْنَعُ এস্থানে অতীতের ঘটনাটিকে বর্তমানেও ঘটমানরূপে চিত্রিত করতে যেয়ে مُضَارِعْ বা বর্তমানকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। اَلْمَلَأُ অর্থ দল।

٣٩. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ . دَائِمٌ .

৩৯. অনন্তর তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। مَنْ এটা مَوْصُوْلَةٌ বা সংযোগবাচক বিশেষ্য। পূর্বোল্লিখিত تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل বা কর্মকারকরূপে এস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। مُقِيْمٌ অর্থ– দণ্ডায়মান, স্থায়ী।

٤٠. حَتّٰى غَايَةٌ لِلصُّنْعِ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ وَفَارَ التَّنُّوْرُ لِلْخَبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةً لِنُوْحٍ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا فِى السَّفِيْنَةِ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اَىْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى اَىْ مِنْ كُلِّ اَنْوَاعِهِمَا اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَ اُنْثٰى وَهُوَ مَفْعُوْلٌ .

৪০. অবশেষে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্পর্কে আমার আদেশ আসল এবং রুটি তৈরিকারীদের চুলা প্লাবিত হলো। এটা ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য আজাব আসার আলামত। আমি বললাম, তাতে এই নৌকায় উঠিয়ে লও প্রত্যেক জীবের দুটি করে এক এক জোড়া অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে নর ও নারী এক একটি করে এক এক জোড়া লও। مِنْ كُلٍّ এটা এস্থানে مَفْعُوْل অর্থাৎ কার্যকারকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَفِى الْقِصَّةِ إِنَّ اللّٰهَ حَشَرَ لِنُوْحٍ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِىْ كُلِّ نَوْعٍ فَتَقَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى عَلَى الذَّكَرِ وَالْيُسْرٰى عَلَى الْاُنْثٰى فَيَحْمِلُهُمَا فِى السَّفِيْنَةِ وَاَهْلَكَ اَىْ زَوْجَتَهُ وَاَوْلَادَهُ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اَىْ مِنْهُمْ بِالْاِهْلَاكِ وَهُوَ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كِنْعَانُ بِخِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثٍ فَحَمَلَهُمْ وَزَوْجَاتِهِمْ ثَلٰثَةً وَمَنْ اٰمَنَ ط وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ قِيْلَ كَانُوْا سِتَّةَ رِجَالٍ وَنِسَاءَهُمْ وَقِيْلَ جَمِيْعُ مَنْ كَانَ فِى السَّفِيْنَةِ ثَمَانُوْنَ نِصْفُهُمْ رِجَالٌ وَنِصْفُهُمْ نِسَاءٌ.

উপাখ্যানে আছে, আল্লাহ তা'আলা হিংস্র পশু, পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাণী হযরত নূহ (আ.)-এর সামনে একত্রিত করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধরনের প্রাণীর দিকে হাত প্রসারিত করতে ছিলেন। তাঁর ডান হাত নর ও বাম হাত নারী জাতীয় প্রাণীর গায়ে পড়তেছিল। অনন্তর তিনি ঐগুলো নৌকায় তুলে নিতেছিলেন। আর তুলে লও তোমার পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তবে তাদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে ধ্বংসের পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা অর্থাৎ তার এক স্ত্রী ও তার পুত্র কিনআন ব্যতীত; সুতরাং তারা ব্যতীত তার অন্যান্য পুত্র সাম, হাম, ইয়াফিছ ও অপর তিন স্ত্রীকে তিনি নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। আর তুলে নাও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন মাত্র ঈমান এনেছিল। বলা হয়, তারা ছিল ছয়জন পুরুষ এবং তাদের স্ত্রীগণ। অপর কেউ কেউ বলেন, সকলে মিলে ঐ নৌকা আরোহীদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের অর্ধেক ছিল পুরুষ আর অর্ধেক নারী। حَتّٰى এটা এস্থানে নৌকা নির্মাণের সময় সীমা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤١. وَقَالَ نُوْحٌ اِرْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا بِفَتْحِ الْمِيْمَيْنِ وَضَمِّهِمَا مَصْدَرَانِ اَىْ جَرْيُهَا وَرُسُوُّهَا اَىْ مُنْتَهٰى سَيْرِهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. حَيْثُ لَمْ يُهْلِكْنَا.

৪১. আর নূহ বলল, তাতে আরোহণ কর, আল্লাহ তা'আলার নামে এটার গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তাই তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করেন নি। مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا এই উভয় শব্দই مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল। অর্থ তার [নৌকার] চলা ও থামা। অর্থাৎ এটার চলার চূড়ান্ত পর্যায়ও।

٤٢. وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فِى الْاِرْتِفَاعِ وَالْعِظَمِ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهُ كِنْعَانَ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ عَنِ السَّفِيْنَةِ يَا بُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ.

৪২. উচ্চতা ও বিরাটত্বে পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে চলল। নূহ তার পুত্র কেনআনকে ডেকে বললেন, আর সে ছিল নৌকা হতে পৃথক, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গী হয়ো না।

٤٣. قَالَ سَاٰوِىْٓ اِلَى الْجَبَلِ يَعْصِمُنِىْ يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ عَذَابِهٖ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ فَهُوَ الْمَعْصُوْمُ قَالَ تَعَالٰى وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ .

৪৩. সে বলল, আমি শীঘ্র পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করব। যা আমাকে জলপ্লাবন হতে বাঁচাবে : রক্ষা করবে। নূহ বললেন, আজ আল্লাহ তা'আলার বিধান হতে অর্থাৎ তার আজাব হতে রক্ষা করবার কেউ নেই। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করেছেন সে ব্যতীত। সে হবে রক্ষাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। اِلَّا مَنْ رَّحِمَ এস্থানে اِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٤. وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ الَّذِىْ نَبَعَ مِنْكِ فَشَرِبَتْهُ دُوْنَ مَا اُنْزِلَ مِنَ السَّمَآءِ فَصَارَ اَنْهَارًا وَبِحَارًا وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ اَمْسِكِىْ عَنِ الْمَطَرِ فَاَمْسَكَتْ وَغِيْضَ نَقَصَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ تَمَّ اَمْرُ هَلَاكِ قَوْمِ نُوْحٍ وَاسْتَوَتْ وَقَفَتِ السَّفِيْنَةُ عَلَى الْجُوْدِىِّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ بِقُرْبِ الْمُوْصِلِ وَقِيْلَ بُعْدًا اِهْلَاكًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الْكٰفِرِيْنَ .

৪৪. আর বলা হলো, হে পৃথিবী! তোমার পানি অর্থাৎ যে পানি তোমার হতে নির্গত হয়েছিল তা তুমি শোষণ করে নাও। অনন্তর তা আকাশ হতে যা বর্ষিত হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য পানি শুষে নেয়। ফলে তা নদনদী ও সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। অর্থ তোমার বারি বর্ষণ বন্ধ কর। ফলে তার বর্ষণ ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর বন্যা প্রশমিত হলো। পানি হ্রাস পেল এবং কার্য সমাপ্ত হলো। অর্থাৎ নূহ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বিষয়টি পূর্ণ হলো এটা অর্থাৎ নৌকাটি জুদীতে এটা মুছিলের সন্নিকট দজলা ফুরাতের মধ্যবর্তী জাযীরার একটি পাহাড়ের নাম স্থির হলো থামল আর বলা হলো ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের অর্থাৎ কাফেরদের পরিণাম। بُعْدًا অর্থ এস্থানে ধ্বংস।

٤٥. وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ كَنْعَانَ مِنْ اَهْلِىْ ج وَقَدْ وَعَدْتَنِىْ بِنَجَاتِهِمْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ الَّذِىْ لَا خُلْفَ فِيْهِ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ . اَعْلَمُهُمْ وَاَعْدَلُهُمْ .

৪৫. নূহ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কিনআন আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনি আমার পরিবারবর্গকে রক্ষার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনার প্রতিশ্রুতি তো নিশ্চয়ই সত্য এটার বরখেলাফ তো হওয়ার নয়। এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ।

٤٦. قَالَ تَعَالٰى يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج النَّاجِيْنَ اَوْمِنْ اَهْلِ دِيْنِكَ اِنَّهٗ سُؤَالُكَ اِيَّاىَ بِنَجَاتِهٖ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ز فَاِنَّهٗ كَافِرٌ وَلَا نَجَاةَ لِلْكٰفِرِيْنَ .

৪৬. তিনি আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে নূহ সে তোমার রক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। বা তোমার দীন ও আদর্শভুক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ এটাকে রক্ষা করার জন্য আমার নিকট তোমার প্রার্থনা করা ভালো কাজ হয়নি। কারণ সে কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফেরদের জন্য মুক্তি নেই।

وَفِي قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ مِيمِ عَمِلَ فِعْلٌ وَنَصْبِ غَيْرَ فَالضَّمِيرُ لِابْنِهِ فَلَا تَسْئَلْنِ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط مِنْ إِنْجَاءِ ابْنِكَ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ بِسُؤَالِكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ.

عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ অপর এক কেরাতে عَمِلَ -এর مِيْم অক্ষরে কাসরাসহ ক্রিয়া হিসেবে এবং غَيْرَ শব্দটির শেষে نَصَبْ সহ পঠিত রয়েছে। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। যেমন তোমার ঐ পুত্রের মুক্তির বিষয়টি সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও। এমতাবস্থায় এই বাক্যটির ضَمِيْر বা সর্বনাম দ্বারা اِبْنٌ বা তার পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বুঝাবে। لَا تَسْئَلْنِ এটার ن অক্ষরটি تَخْفِيْف ও تَشْدِيْد বা রূঢ় এবং তাশদীদ ব্যতীত লঘুরূপেও পঠিত রয়েছে।

٤٧. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ط وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي مَا فَرَطَ مِنِّي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

৪৭. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করা হতে আমি আপনারই শরণ নিতেছি। আমার পক্ষ হতে ত্রুটি হয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

٤٨. قِيْلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ اِنْزِلْ مِنَ السَّفِيْنَةِ بِسَلَامٍ بِسَلَامَةٍ أَوْ بِتَحِيَّةٍ مِنَّا وَبَرَكٰتٍ خَيْرَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ فِي السَّفِيْنَةِ أَيْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأُمَمٌ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَعَكَ سَنُمَتِّعُهُمْ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الْاٰخِرَةِ وَهُمُ الْكُفَّارُ.

৪৮. বলা হলো হে নূহ! নৌকা হতে অবতরণ কর আমার দেওয়া শান্তিসহ নিরাপত্তা বা আমার তরফ হতে অভিবাদন ও শুভেচ্ছাসহ। আর তোমার এবং তোমার সাথে নৌকায় যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে তাদের উপর অর্থাৎ তাদের আল আওলাদ ও সন্তান সন্ততিদের উপর বরকতসহ কল্যাণসহ। তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে ছাড়া অপর সম্প্রদায়কে অর্থাৎ যারা কাফের হবে তাদেরকে দুনিয়ার জীবন উপভোগ করতে দিব; পরে আমার তরফ হতে পরকালে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবে। اِهْبِطْ অর্থ অবতরণ কর। بِسَلَامٍ অর্থ শান্তিসহ বা শুভেচ্ছা ও অভিবাদনসহ। এই وَأُمَمٌ শব্দটি رَفْع সহ পঠিত রয়েছে।

٤٩. تِلْكَ أَيْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الْمُتَضَمِّنَةُ قِصَّةَ نُوحٍ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ أَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ نُوحِيْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ فَاصْبِرْ عَلَى التَّبْلِيْغِ وَأَذٰى قَوْمِكَ كَمَا صَبَرَ نُوحٌ إِنَّ الْعَاقِبَةَ الْمَحْمُوْدَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

৪৯. এই অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী সংবলিত এই আয়াতসমূহ অদৃশ্য লোকের সংবাদ এমন বিষয়ের সংবাদ যা তোমাদের হতে অদৃশ্য। হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি তোমাকে এতদ্বিষয়ে ওহী দ্বারা জ্ঞাত করেছি যা ইতিপূর্বে অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমিও জানতে না তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং নূহ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তুমিও তোমার সম্প্রদায় প্রদত্ত পীড়ন ও ক্লেশ এবং দীন প্রচারের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় পরিণাম তাকওয়ার অধিকারীদের জন্যই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ : এখানে أُوْحِيَ হলো فِعْل مَاضِى مَجْهُوْل আর إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ হলো নায়েবে ফায়েল অর্থাৎ أُوْحِيَ إِلَيْهِ عَدَمُ إِيْمَانِ بَعْضِ قَوْمِهِ

قَوْلُهُ تَبْتَئِسْ : এ শব্দটি বাবে إِفْتِعَالٌ-এর إِبْتِئَاسٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ-এর وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرٌ-এর সীগাহ। এখানে যেহেতু حَرْف نَفِيْ প্রবেশ করেছে এজন্য এটা نَهِيْ হয়েছে। অর্থ হলো তুমি রাগ করিও না।

قَوْلُهُ بِمَرَأَىٰ مِنَّا وَحِفْظِنَا : এই বৃদ্ধিকরণও একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন হলো بِأَعْيُنِنَا দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার أَعْضَاء তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। আর যার أَعْضَاء হয় সে مُجَسَّمٌ বা শরীর বিশিষ্ট হয়। কাজেই আল্লাহর জন্য جِسْم হওয়া প্রমাণিত হলো যেমনটি মুজাসসামিয়াদের বিশ্বাস।

জবাবের সার হলো এই যে, بِأَعْيُنِنَا এটা حِفْظ এবং رُؤْيَنَا থেকে কেনায়া হয়েছে। যেমন بَسَطَ اللّٰهُ يَدَهٗ এটা বদান্যতার থেকে কেনায়া হয়েছে। بِأَعْيُنِنَا টা حَالٌ مَحَلًّا হয়েছে উহ্য ইবারত হলো مُتَلَبِّسًا بِأَعْيُنِنَا।

قَوْلُهُ حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো يَصْنَعُ যারে`-এর সীগাহ। যা حَالٌ এবং إِسْتِقْبَالٌ-এর উপর বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নৌকা নির্মাণ করা খবর দেওয়ার পরে হয়েছে। অথচ নৌকা অতীত কালে নির্মাণ করা হয়েছিল।

উত্তর হলো এই যে, অতীত কালের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নৌকা নির্মাণের দৃশ্য টেনে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ : مَنْ يَأْتِيْهِ-এর মধ্যে مَنْ টা مَوْصُوْلَه এবং تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْل بِهٖ তারকীব দ্বারা এই সংশয়ের নিরসন হলো যে, مَنْ টি إِسْتِفْهَامِيَّة তার জন্য صَدَارَتْ প্রয়োজন।

قَوْلُهُ غَايَةٌ لِلصُّنْعِ : অর্থাৎ حَتّٰى টা صُنْع-এর غَايَتْ এটা يَأْتِيْهِ বা يَحِلُّ-এর غَايَتْ নয়। যেমন নাকি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সন্দেহ হয়। حَتّٰى হলো إِبْتِدَائِيَّة যা جُمْلَه شَرْطِيَّة-এর উপর প্রবেশ করেছে এবং وَاصْنَعِ الْفُلْكَ-এর غَايَتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى السَّفِيْنَةِ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِيْهَا-এর যমীর পূর্বে উল্লিখিত الْفُلْكِ-এর দিকে ফিরেছে। যা مُذَكَّرٌ বা পুংলিঙ্গ। অথচ فِيْهَا-এর যমীর হলো مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গ।

উত্তর হলো فُلْك টা سَفِيْنَة-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো সংশয় নেই।

قَوْلُهُ إِنَّهُ سُؤَالُكَ إِيَّايَ بِنَجَاتِهِ : মুফাসসির (র.) إِنَّهُ-এর যমীরের নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন যে, مَرْجِعْ স্বীয় সন্তান কেনানের মুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন। অর্থাৎ তোমাদের প্রশ্ন অনুচিত। জমহুর মুফাসসিরগণ , যমীরের مَرْجِعْ বলেছেন إِبْنٌ কে অর্থাৎ কেনান তোমার পরিবার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর দ্বারা مَجَازْ আবশ্যক হয়। কেননা বাস্তবিক পক্ষে পরিবার থেকে نَفِيْ করা বৈধ নয়। যার কারণে مَجَازِيْ পরিবার তথা দীনি পরিবার উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ مِيْمِ عَمِلَ فِعْلٌ وَنَصْبُ غَيْرُ فَالضَّمِيْرُ لِإِبْنِهِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَمَلٌ-এর إِعْرَابْ বর্ণনা করা। জমহুরের কেরাত হলো عَمَلٌ মাসদার আর غَيْرُ صَالِحٍ তার সিফত। অর্থ হলো তোমার জন্য নিজ সন্তান কেনানের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করা অনুচিত। কেননা সে কাফের। আর কাফেরের জন্য মুক্তি নেই। আবার এক কেরাতে عَمِلَ ফে'লে মাযী রূপে এসেছে সেই সুরতে غَيْرُ টা উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। উহ্য ইবারত হবে إِنَّهُ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ এই সুরতে إِنَّهُ-এর যমীর إِبْنٌ-এর দিকে ফিরবে। অর্থাৎ কেনান অসৎ কর্ম করেছে। মুফাসসির (র.) প্রথম সুরতকে পছন্দ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর স্বীয় কাফের সন্তানের জন্য মুক্তির সুপারিশ করা অনুচিত কর্ম হয়েছে। একারণেই পূর্বে বলা হয়েছে যে, إِنِّىْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ এর দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর দিকে جَهْل বা অজ্ঞতার নিসবত করা আবশ্যক হচ্ছে।

قَوْلُهُ فَلَا تَسْئَلْنِ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ : অর্থাৎ نُوْن বর্ণে তাশদীদসহ ও পূর্বের বর্ণে যবর। আর এটা হলো নাফে (র.) -এর কেরাত। আর ইবনে কাছীর ইবনে আমের এবং বাকূন (র.) لَامْ কে সাকিন এবং نُوْن কে তা খফীফ সহকারে পড়েছেন। এবং وَصْل-এর অবস্থায় نُوْنْ-এর সাথে يَاء কে বাকি রেখেছেন। ওয়াকফের অবস্থায় তা করেননি। আর ওয়ারশ ও আবূ আমর (র.) ওয়াকফ ও ওয়াসল উভয় অবস্থাতেই يَاء কে অবশিষ্ট রেখেছেন।

قَوْلُهُ بِسَلَامَةٍ اَوْ بِتَحِيَّةٍ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَلَامٍ-এর দুটি অর্থ বর্ণনা করা। بِسَلَامَةٍ বলে নিরাপত্তা ও শান্তির অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর بِتَحِيَّةٍ বলে সালাম ও অভিবাদনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো এখানে উভয় অর্থই বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَّعَكَ : اُمَمٌ টা رَفْع-এর সাথে। মুবতাদা হওয়ার কারণে। আর سَنُمَتِّعُهُمْ হলো তার খবর। পূর্বের اُمَمٍ-এর উপর مَعْطُوْف হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়নি। কেননা এ সকল লোকের শান্তি নিরাপত্তা ও বরকতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন. اُمَمٌ টা نَكِرَة হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়?

উত্তর. اُمَمٌ হলো مَوْصُوْف আর مِمَّنْ مَّعَكَ হলো তার صِفَتْ কাজেই اُمَمٌ টা نَكِرَة مَوْصُوْفَه হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। মুফাসসির (র.) مِمَّنْ مَّعَكَ বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الْمُتَضَمِّنَةُ الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো এই যে, تِلْكَ হলো اِسْم اِشَارَه যা স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। তা মুবাতাদা হয়েছে। অথচ তার তিনটি খবর রয়েছে। আর তিনটিই مُذَكَّرٌ হয়েছে। ১. اَنْبَاءِ الْغَيْبِ ২. نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ ৩. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا কাজেই খবরের رِعَايَتْ-এর কারণে মুবতাদা ও مُذَكَّرٌ হওয়া উচিত ছিল?

উত্তর. হলো এই যে, هٰذِهِ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উল্লিখিত খবর সমূহ নয়। বরং তা مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো اَلْاٰيَاتُ যা উহ্য রয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। কাজেই কোনো আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেন হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বুঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়তো তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন, اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤئِىْٓ اِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্য পথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। −[সূরা নূহ]

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করতেন رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ হে আল্লাহ! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। [১৮ পারা, আয়াত ৩৯ সূরা আল মু'মিনুন।] দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন। −[বগভী ও মাযহারী]

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আজাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলো নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আ.) নৌকা

তৈরি করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতে লাগল। তখন নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করানোর জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীর সংখ্যায় অতি অল্প ছিল

আলোচ্য আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হলো, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুসঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ওহী নাজিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায় হযরত নূহ (আ.) -এর মুখে তাঁর কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল– رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। [পারা ২৯, সূরা নূহ, আয়াত : ২৬] এই বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো, যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান : হযরত নূহ (আ.)-কে যখন নৌকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরি করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا "আর আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত নূহ (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর বিবরণ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের হুকুম হয়েছে যে, কাঠ কেটে শুষ্ক করে নৌকা নির্মাণের জন্য তৈরি কর। এতে ১০০ বছর অতিবাহিত হয়। সম্পূর্ণ ভাবে নৌকা তৈরিতে আরো ১০০ বছর ব্যয় হয়, মতান্তরে ৪০ বছর।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত এই নৌকাটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৮০ হাত এবং প্রস্থে ৫০ হাত ছিল বাইরে এবং ভেতরে কাষ্ঠের উপর এক প্রকার তৈল ব্যবহার করা হয়েছিল।

কাতাদা (র.) বলেছেন, দৈর্ঘ্যে তরীটি ৩০০ হাত ছিল। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত, আর প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু'হাজার হাত এবং প্রস্থ ছিল ১০০ হাত। এর উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। নৈকাটি ছিল ত্রিতল। এক এক তলের উচ্চতা ছিল দশ হাত। সর্বনিম্ন তলে চতুষ্পদ জন্তু রাখা হয়েছিল। মধ্যম তলে মানুষ ছিল। আর উপরের তলে পাখিদের রাখা হয়েছিল।

ইবনে জারীর (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীরা তাঁর নিকট এই আরজি পেশ করেন যে, যদি আপনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমে এমন কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন যে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকাটি দেখেছিল তবে আমরা এ সম্পর্কে কিছু অবগত হতে পারতাম। তখন হযরত ঈসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করলেন। সেখানে হাম ইবনে নূহ এর কবর ছিল। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠে দাড়াও" তখন একজন বৃদ্ধ মানুষ মাটির অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসলো। সে তার মাথার উপর থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছিল। হযরত ঈসা (আ.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মৃত্যু কি বৃদ্ধ বয়সে হয়েছে? সে বলল, না, যৌবনেই আমার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেয়ামত কায়েম হয়েছে এ ধারণা করে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছি। আর সে ভয় আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। হযরত ঈসা (আ.) তখন বললেন, তুমি আমাদেরকে হযরত নূহ (আ.) -এর তরী সম্পর্কে কিছু জানাও। সে বলল তরীটির দীর্ঘ ১২০০ হাত ছিল এবং তার প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। এতে তিনটির স্তর ছিল প্রথম স্তরে বিভিন্ন প্রকার জন্তু রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ, আর তৃতীয় স্তরে ছিল পাখি।

হযরত ঈসা (আ.) ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন হযরত নূহ (আ.) কি করে জানতে পারলেন যে, শহরগুলো নিমজ্জিত হয়েছে? তখন লোকটি বলল, হযরত নূহ (আ.) এ সম্পর্কীয় খবর সংগ্রহের জন্যে কাককে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু কাক একটি লাশের উপর বসে গিয়েছিল। সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসলোনা তাই হযরত নূহ (আ.) তার জন্য এ বদদোয়া করলেন যে সে যেন সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এজন্যই কাকেরা কোনো সময় ঘরে থাকেনা। অবশেষে হযরত নূহ (আ.) কবুতরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। সে তার ঠোঁটে জয়তুন বৃক্ষের সামান্য নমুনা নিয়ে আসলো এবং সঙ্গে সামান্য শুকনো মাটিও আনলো। এর দ্বারা জানা গেল যে, শহর নিমজ্জিত হয়েছে। এরপর হযরত নূহ (আ.) কবুতরের জন্য নিরাপত্তার এবং মিলে মিশে থাকার তৌফিকের দোয়া করলেন, এজন্যই কুবুতরেরা মানুষের বাড়িতে বাসা বেধে থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বললেন হে, আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। তাঁর নিকট থেকে আরো কথা জানতে পারবো। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, সে তোমাদের সঙ্গে কি করে যাবে? তার তো দুনিয়াতে জীবিকা নেই। এরপর তিনি বললেন, "যেমন ছিলে আল্লাহর হুকুমে তেমন হয়ে যাও"। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা হলো এই– ইবনে আসাকের সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) -এর সূত্রে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং হযরত কাব (রা.) -এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আল্লামা বগভী হযরত কাব (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ৫০ হাত। উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। এর মধ্যে তিনটি স্তর ছিল। সর্ব নিম্ন স্তরে বণ্য এবং চতুষ্পদ জন্তু ছিল। দ্বিতীয় স্তরে অশ্ব, উষ্ট্র আর গৃহ পালিত জন্তু ছিল এবং সর্বোচ্চ স্তরে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সাথী মোমেনগণ ছিলেন এবং খাদ্যদ্রব্যও ছিল।

ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, নৌকাটিতে তিনটি স্তর ছিল। একটি স্তরে বন্য ও চতুষ্পদ জন্তু ছিল। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সর্বনিম্ন স্তরে ছিল জীব জন্তু কীট-পতঙ্গ। আর মধ্যম স্তরে ছিল খাদ্যদ্রব্য পোশাক পরিচ্ছদ, আর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল মানুষ। আর আল্লামা শামী লিখেছেন, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। আর হাতের অর্থ হলো আঙ্গুল থেকে বাজু পর্যন্ত।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬]

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে : হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত 'আত-তিববুন-নববী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোনো নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি যেসব ওহী নাজিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ি হযরত আদম (আ.)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ির ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি হতে শুরু মোটর ও রেলগাড়ি সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ.)–ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এর দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন। আল্লাহ ত'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোনো সুপারিশ যেন না করেন।

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন যে, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত "এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চলার ফিকিরে আছেন" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ.) বলতেন, যদিও আজ

তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখ সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুত পক্ষে নবীগণ কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শানে ও মর্যাদার পরিপন্থি বরং হারাম। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে- لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে [আল্লাহর কাছে] তারাই শ্রেষ্ঠতর।" [পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত] সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। সেমতে "আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব।" বাক্যের অর্থ হচ্ছে তোমরা যখন আজাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, "এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।" যেমন ৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাকর আজাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আজাব কাদের উপর হয়। প্রথম عَذَابٌ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আজাব এবং عَذَابٌ مُّقِيمٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য।

৪০ নং আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ অর্থাৎ "অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হলো এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।"

التَّنُّورُ : তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানো তন্দুরকেও তান্নুর বলে, জমিনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ.)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عَيْنُ وَرْدَةٍ (আইনে অরদাহ) নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুর অভ্যন্তর হতেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে, যা কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী (র.) মুজাহিদ (র.) শা'বী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসির এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (র.) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ (আ.) তাঁর নৌকা তৈরি করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশদ্বার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাস স্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে।

-[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্লাবন যখন শুরু হয়েছে তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু জমিন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কূফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কুরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট ইরশাদ করা হয়েছে। فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا অর্থাৎ "অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং জমিনকে প্রস্রবণরূপে প্রবহমান করলাম। [২৭ পারা, সূরা আল কামার, আয়াত : ১১]

ইমাম শা'বী (র.) আরো বলেছেন যে, কূফার এই জা'মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে -আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তূফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আ.)-কে হুকুম দেওয়া হলো- احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ "জোড়াবিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখি উঠানো হয়েছিল। জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখি কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা ঐ সন্দেহ দূরীভূত হলো যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সংকুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কুরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেসও তাদের ৩জন স্ত্রীও ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছে।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ নং আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জলযানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে আরোহণ করবে।

مَجْرٰى 'মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مُرْسٰى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহর নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও কুদরতের অধীন!

প্রতিটি যানবাহনের গতি স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন : সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান ও শূন্যযান অথবা কোনো জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা তৈরি করা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূল দৃষ্টিতে মানুষ হয়তো এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা এটা তৈরি করেছি, আমরা এটা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটার লোহা লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লৌহ বা এক ইঞ্চি কাঠও তৈরি করার ক্ষমতা তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারি যন্ত্রাংশ তৈরি করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত তাহলে দুনিয়ায় কোনো নির্বোধ লোক থাকত না, সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরি হয় অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মন মালামাল বহন করে জমিনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য, তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে হোক বা জ্বালানি তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন? বায়ু বা পানি কে সে সৃষ্টি করেছে? তেল বা পেট্রোল কে সে সৃষ্টি করেছে? এর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায় তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖيهَا وَمُرْسٰهَا : একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মাত্র দুই শব্দ বিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুত এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যা দ্বারা মানুষ বস্তু জগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মু'মিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মু'মিন যখন কোনো যানবাহনে আরোহণ করে তখন সে শুধু জমিনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে হযরত নূহ (আ.)-এর সকল পরিবার-পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু 'কেনআন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশত হযরত নূহ (আ.) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেক না, পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগসাজশ ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরি সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহ্বানের মর্ম হবে নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরি হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ

করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেনআন' তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল আপনি চিন্তিত হবেন না আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আ.) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আজকে কোনো উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া আজ বাঁচার জন্য কোনো উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

৪৪ নং আয়াতে প্লাবন সমাপ্তি ও পরিবেশ শান্ত হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জমিনকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিলেন يَاۤ اَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ অর্থাৎ " হে জমিন, তোমার সব পানি গিলে ফেল।" অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি জমিন উদগীরণ করেছিল, সে সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হলো যেন জমিন তা শুষে নেয়। আকাশকে অর্থাৎ মেঘমালাকে নির্দেশ দিলেন "ক্ষান্ত হও, বারি বর্ষণ বন্ধ কর।" ফলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলো, জমিনের পানি ভূ-অভ্যন্তরে চলে গেল। আর আসমান হতে ইতিপূর্বে বর্ষিত পানি নদ-নদীর আকার ধারণ করল যা দ্বারা পরবর্তীকালে মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে।

–[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জমিন ও আসমানকে সম্বোধন করে নির্দেশ দান করেছেন। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো কোনো অনুভূতিসম্পন্ন বস্তু নয়। তাই কেউ কেউ এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের যেসব বস্তু অনুভূতিহীন নির্জীব জড় পদার্থ মাত্র, আসলে তা সবাই অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রাণবিশিষ্ট। অবশ্য তাদের আত্মা ও অনুভূতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পর্যায়ের নয়। তাই তাদের প্রাণহীন ও অনুভূতিহীন সাব্যস্ত করে শরিয়তের বিধি নিষেধ হতে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে যেমন وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ "এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ পাঠ করছে না।" আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর মারেফত ও পরিচয় ছাড়া হামদ ও তাসবীহ পাঠ সক্ষম হওয়া সম্ভব নয়। আর পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞান ও অনুভূতি থাকা অপরিহার্য। অতএব উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যথাযোগ্য অনুভূতি রয়েছে, যা দ্বারা সে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে ও জানতে পারে; স্রষ্টা তাকে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোন কাজে নিয়োজিত করেছেন, তাও উত্তমরূপে জানে এবং তা পূরণ করার জন্য আত্মনিয়োজিত থাকে। কুরআন পাকের আয়াতে اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى-এর মধ্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে আসমান ও জমিনকে সরাসরি সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বললে কোনো অসুবিধা নেই। মাওলানা রূমী (র.) বলেন خاك وباد واب واتش زنده اند- با من وتو مرده باحق زنده اند "মাটি বায়ু, আগুন ও পানিরও প্রাণ আছে। আমার ও তোমার কাছে তা প্রাণহীন, কিন্তু আল্লাহর কাছে জীবন্ত।" আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেওয়া হলো যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে। জুদি পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। এটা হযরত নূহ (আ.)-এর মূল আবাসভূমি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুত এটি একটি পর্বতমালার অংশ বিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তাফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌঁছল, তখন সাতবার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ.) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোজা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোজা পালন করেছিল।

–[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

পূর্ববর্তী নবীগণের সব শরিয়তেই মুহাররম মাসের দশম তারিখে অর্থাৎ আশুরার দিনটিকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আশুরার রোজা ফরজ ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজা ফরজ থাকেনি, তবে তা সুন্নত ও বিশেষ ছওয়াবের কাজ হিসাবে সর্বদা পরিগণিত।

জুদী পাহাড়টি কোথায়? : তাফসীরকার যাহ্হাক (র.) বর্ণনা করেছেন, জুদী পাহাড়টি মোসেল এলাকায় রয়েছে। মোসেল আধুনিক ইরাকের একটি প্রদেশ।

উল্লেখ, যে এই প্রদেশের নাইনুয়া শহরেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাজার রয়েছে। যেখানে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে মাছ তাঁকে ফেলে দিয়েছিল। আর এই বিশেষ এলাকাতেই হযরত নূহ (আ.) -এর নৌকাটি আল্লাহ পাকের হুকুমে থেমে যায়। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তুর পাহাড়কে জুদী বলা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ নৌকাতে ৮০ জন লোক ছিলেন। একশ' পঞ্চাশ দিন তারা নৌকায় ছিলেন। আল্লাহ পাক নৌকাটির মুখ মক্কা শরীফের দিকে করে দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তা'আলা বন্যার সময় কা'বা শরীফকে পানির উপর তুলে রেখেছিলেন। নৌকাটি চল্লিশ দিন যাবত বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে রত ছিল। এরপর আল্লাহ পাক জুদী পাহাড়ের দিকে তাকে প্রেরণ করেন।

হযরত নূহ (আ.) জুদী পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেন। এই ৮০ জন মানুষকে নিয়ে সেখানে একটি বসতি গড়ে উঠে যাকে "ছামানিন" বলা হয়। একদিন সকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেকের ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। ৮০ জন লোক ৮০-টি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ভাষা ছিল আরবি। বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, কেউ একে অন্যের কথা বুঝতে সক্ষম হচ্ছিলনা। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে সকলের ভাষা বোঝাবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন তখন সকলের অনুবাদক। তিনি পরস্পরকে তাদের কথা বুঝিয়ে দিতেন।

কাবে আহবার বর্ণনা করেন হযরত নূহ (আ.) -এর নৌকাটি প্রাচ্যে এবং প্রাতিচ্যে চলাফেরা করে এরপর জুদী পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে থেমে যায়।

قَوْلُهُ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ الخ : আলোচ্য ৫টি আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট হেদায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র কিনআন যখন মহান পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য ও আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল তখন তার ধ্বংস অনিবার্য দেখে হযরত নূহ (আ.)-এর পিতৃস্নেহ ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। তিনি আল্লাহ রাব্বুল-ইজ্জতের মহান দরবারে আরজ করলেন, হে প্রভু! আপনি আমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আপনার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। কিন্তু অবস্থা দেখছি যে, আমার পুত্র কিনআন তুফানে মারা পড়বে। এখনও তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি তো আহকামুল হাকিমীন, আপনি সর্বশক্তিমান। অতএব, আপনি নিজ ক্ষমতাবলে তাকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি।

৪৬ নং আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোনো আবেদন করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞ-সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসিহত করছি।

আল্লাহ তা'আলার অত্র ফরমানের মধ্যে দুটি বিষয়ই জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ (আ.) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; বরং তার মুনাফিকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, فَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ "অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোনো অবাধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।" এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে এটা কুফরি অবস্থায় কেনানকে রক্ষা করার আবদার ছিল না; বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর মতো একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালোমতে না জেনেশুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন নি; বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার জন্য এটা এমন একটি ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও জালিমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয় : উপরিউক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাস'আলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে তা জায়েজ, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেওয়া সন্দেহজনক কোনো বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তাফসীরে বায়জাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনেশুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম হবে।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযর্গানের নীতি হচ্ছে– যে-কোনো ব্যক্তি যে কোনো দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুজর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি জালিম ও অন্যায়কারী অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোনো চাকরি বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনেশুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে নেওয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মু'মিন ও কাফেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না: এখানে জানা গেল যে, মু'মিন ও কাফেরদের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোনো মূল্য নেই! ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد * فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد

অর্থাৎ হাজারো আপন লোক আল্লাহর খাতিরে পর হয়েছে। আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত পরও আপন হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তারা যে-কোনো বংশের, যে-কোনো গোত্রের, যে-কোনো বর্ণের, যে-কোনো দেশের যে -কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন, সবই মিলে এক জাতি একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُسْلِمُوْنَ إِخْوَةٌ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়। এ তত্ত্বটি কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জবানীতে অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা'বুদের উপাসনা করছ যেসব উপাস্যের প্রতিও বিরক্ত। -[২৮ পারা, সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত ৪]

আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি دِيْنِىْ مُعَامَلَاتْ 'ধর্মীয় ব্যাপারে শর্ত' অতিরিক্ত আরোপ করেছি। কেননা দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠ লেনদেন, ভালো আচার-ব্যবহার, পরোপকার, দয়াশীলতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে কোনো ব্যক্তির সাথে তা করা জায়েজ, উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সদ্ব্যবহার, কাফের ও অমুসলিমদের প্রতি তাদের উদারতা ও সদয় ব্যবহারের অসংখ্য ঘটনা এর উজ্জ্বলতা বহন করেছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে আঞ্চলিক ভৌগলিক, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী, আরবি, হিন্দী, সিন্ধীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তারূপে পরিগণিত হচ্ছে। এহেন জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের পরিপন্থি তথা রাসূলে কারীম ﷺ -এর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহের শামিল।

৪৭ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক পেশকৃত ওজরখাহীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া মাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ, তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, অন্যায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য কামনা, অতীত দোষত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে তাঁর অনুগ্রহের জন্য আবেদন।

এতদ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের কোনো ভুলত্রুটি হওয়ার পর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শুধু নিজের সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে কাজ হবে না; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করবে এবং দোয়া করবে যে, আয় পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে নিজ কুদরত ও রহমতে ত্রুটি -বিচ্যুতি, পাপ-তাপ হতে রক্ষা করুন!

৪৮ নং আয়াতে তুফানের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্লাবনের উদ্দেশ্য যখন সাধিত হলো, তখন আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলো, জমিনের পানি জমিন গ্রাস করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতি জুদী পাহাড়ে ভিড়ল, অবশিষ্ট বৃষ্টির পানি নদ-নদীরূপে সংরক্ষিত হলো। ফলে জমিন মানুষের বসবাসের যোগ্য হলো। হযরত নূহ (আ.)-কে পাহাড় হতে সদলবলে সমতল ভূমিতে অবতরণের হুকুম দিয়ে বলা হলো, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না। কেননা আপনার প্রতি আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা থাকবে, অথবা সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা দেওয়া হলো এবং আপনার ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দের মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হলো।

কুরআনে কারীমের এই ইরশাদ অনুযায়ী প্লাবন -পরবর্তীকালের সমস্ত মানব মণ্ডলী হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الْبَاقِيْنَ "আর শুধু তাঁর বংশধরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছি।" এ জন্যই ইতিহাসবেত্তাগণ হযরত নূহ (আ.)-কে দ্বিতীয় আদম উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

নিরাপত্তা ও বরকতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা শুধু হযরত নূহ (আ.)-এ সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইরশাদ হয়েছে وَعَلٰى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ "আর আপনার সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলোর উপরও সালামতি ও বরকত রয়েছে।" এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর সহযাত্রী ঈমানদারগণকে أُمَمٌ বলা হয়েছে, যা أُمَّةٌ উম্মত -এর বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, কিশতিতে আরোহণকারীরা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অথচ ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, কিশতির আরোহীগণ অধিকাংশ হযরত নূহ (আ.)-এর খান্দানের লোক ছিল। আসলে গনাকয়েকজন মাত্র অন্য বংশের ছিল। এতদসঙ্গেও তাদের প্রতি أُمَمٌ مِّمَّنْ مَّعَكَ শব্দ প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধরগণকে সালামতি ও বরকতের শামিল করা হয়েছে।

অতএব, এখানে সালামতি ও বরকতের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যেমন মু'মিনও থাকবে, তদ্রূপ বহু জাতি কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকও হয়ে যাবে। মু'মিনদের জন্য তো দুনিয়া ও আখেরাতে সালামতি ও বরকত রয়েছে। কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের, মুশরিক, নাস্তিক তারা তো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের জন্য নিরাপত্তা ও বরকত কিভাবে হতে পারে? আয়াতের শেষ বাক্যে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আমি পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য দান করব, সর্বপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রী দ্বারা সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেব। কেননা পার্থিব নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য সাধারণ দস্তরখান-স্বরূপ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই তা উপভোগ করতে পারে। অতএব, কিশতি আরোহীগণের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের হবে তারাও এর অংশীদার হবে। কিন্তু আখেরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবি শুধু ঈমানদারদের জন্য সংরক্ষিত। কাফেরদের সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান ইহজীবনেই বুঝিয়ে দেওয়া হবে। অতএব, আখেরাতে তাদের উপর শুধু আমার আজাবই নির্ধারিত রয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর জমানায় সংঘটিত মহাপ্লাবনের বিস্তারিত বিবরণ হুজুর ﷺ ওহীর মাধ্যমে অবহিত হয়ে স্বীয় দেশবাসীকে শুনালেন, ওহীর পূর্ব পর্যন্ত এসব ঘটনা তিনিও জানতেন না, তাঁর দেশবাসীও জানতো না। একমাত্র ওহী ছাড়া তা জানার কোনো উপায়-উপকরণও তাদের কাছে ছিল না। সমগ্র জাতি যে ঘটনা সম্পর্কে বেখবর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কখনো বিদেশ যান নি, সুতরাং এটা জানার একমাত্র পন্থা ওহী সাব্যস্ত হলো। আর ওহীপ্রাপ্ত হওয়াই নবুয়ত ও রিসালতের অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে রাসূলে আকরাম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, আপনার নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার পক্ষে সূর্যের চেয়ে ভাস্বর অনস্বীকার্য যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বদবখত যদি আপনাকে অমান্য করে, আপনার সাথে কলহ করে, আপনাকে কষ্ট-ক্লেশ দেয়, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনাবলি চিন্তা করুন। তিনি প্রায় এক হাজার বছর যাবত অপরিসীম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন, আপনি তাঁর মতো ধৈর্য অবলম্বন করুন। কারণ পরিশেষে আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই কল্যাণ ও কামিয়াবি লাভ করবেন।

অনুবাদ :

৫০. وَاَرْسَلْنَا اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيْلَةِ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط اِنْ مَا اَنْتُمْ فِىْ عِبَادَتِكُمُ الْاَوْثَانَ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ كَاذِبُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

৫০. আদ জাতির নিকট তাদের গোত্রীয় ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাকে এক বলে বিশ্বাস কর. তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা প্রতিমা উপাসনার ক্ষেত্রে মিথ্যা রচনাকারী বৈ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী বৈ কিছু নয়। مِنْ اِلٰهٍ : এই مِنْ টি এই স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত إِنْ أَنْتُمْ : এই ان টি এই স্থানে না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫১. يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى التَّوْحِيْدِ اَجْرًا ط اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ خَلَقَنِىْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

৫১. হে আমার সম্প্রদায়! এটার উপর অর্থাৎ এই তাওহীদের বিনিময়ে তোমাদের নিকট আমি কোনোরূপ পারিশ্রমিক যাচনা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? إِنْ أَجْرِىَ -এই إِنْ টি এই স্থানে না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلَّذِىْ فَطَرَنِىْ : অর্থ আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

৫২. وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ تُوْبُوْا ارْجِعُوْا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ يُرْسِلِ السَّمَاۤءَ الْمَطَرَ وَكَانُوْا قَدْ مُنِعُوْهُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا كَثِيْرَ الدُّرُوْرِ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى مَعَ قُوَّتِكُمْ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ مُشْرِكِيْنَ ـ

৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট শিরক হতে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি তওবা কর প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাবেন। তৎসময়ে এদের অঞ্চলে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করত তিনি তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুশরিকরূপে পরিগণিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। اَلسَّمَاۤءَ : অর্থ আকাশ, এই স্থানে مَجَازٌ বা রূপক হিসাবে বৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِدْرَارًا : অর্থ প্রবল বর্ষণ। اِلٰى قُوَّتِكُمْ : এই স্থানে اِلٰى [পর্যন্ত, প্রতি] শব্দটি مَعَ [সঙ্গে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৩. قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ بِبُرْهَانٍ عَلٰى قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اَىْ لِقَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

৫৩. তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোনো স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমার দাবির উপর কোনো দলিলসহ আগমন করনি তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদিগকে পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা তোমার বিষয়ে বিশ্বাসীও নই। عَنْ قَوْلِكَ : এই স্থানে عَنْ [হতে] শব্দটি ل [জন্য] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٤. اِنْ نَقُوْلُ فِىْ شَاْنِكَ اِلَّا اعْتَرٰىكَ اَصَابَكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ ط فَخَبَلَكَ بِسَبِّكَ اِيَّاهَا فَاَنْتَ تَهْذِىْ قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَىَّ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ

৫৪. আমরা তোমার সম্পর্কে তো এটাই বলি, আমাদের ইলাহদিগের কেউ তোমাকে অশুভ কিছু করেছে। তাদের মন্দ বলায় তোমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়ে দিয়েছে। তাই তুমি এরূপ প্রলাপ বকতেছ। সে বলল, আমি আমার সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী করতেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক; তোমরা তাঁর সাথে যা শরিক কর তা হতে আমি মুক্ত। اِنْ-এটা এস্থানে নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اِعْتَرَاكَ : অর্থ তোমাকে স্পর্শ করেছে, আবিষ্ট করেছে।

٥٥. مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ اِحْتَالُوْا فِىْ هَلَاكِىْ جَمِيْعًا اَنْتُمْ وَاَوْثَانُكُمْ ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ تُمْهِلُوْنِ ـ

৫৫. তিনি ব্যতীত। তোমরা সকলে অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের দেবতাগণ সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর আমাকে ধ্বংস করার বিষয়ে ষড়যন্ত্র কর অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না। সময় ও সুযোগ দিও না।

٥٦. اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ زَائِدَةٌ دَآبَّةٍ نَسَمَةٍ تَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اَىْ مَالِكُهَا وَقَاهِرُهَا فَلَا نَفْعَ وَلَا ضَرَرَ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَخَصَّ النَّاصِيَةَ بِالذِّكْرِ لِاَنَّ مَنْ اَخَذَ بِنَاصِيَتِهٖ يَكُوْنُ فِىْ غَايَةِ الذُّلِّ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَىْ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ ـ

৫৬. আমি নির্ভর করি আল্লাহর উপর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর উপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব-জন্তু নেই প্রাণী নেই যার মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ তাঁর মুষ্টিতে নেই অর্থাৎ তিনি যার মালিক নন এবং যা তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। এই স্থানে মস্তকের সম্মুখভাগের কেশ গুচ্ছের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, যার ঐ কেশগুচ্ছ ধরা হয় সে চরম অনুগত ও লাঞ্ছিত বলে ইঙ্গিত হয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে সত্য ও ন্যায়ের পথে আছেন। مِنْ دَآبَّةٍ : এই স্থানে مِنْ-টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত।

٥٧. فَاِنْ تَوَلَّوْا فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ اَىْ تُعْرِضُوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ ط وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا ط بِاِشْرَاكِكُمْ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ رَقِيْبٌ ـ

৫৭. অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি আমি তো তোমাদের নিকট তা পৌছে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে ভিন্ন কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তোমাদের শিরক করা দ্বারা– তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক সকল কিছুর রক্ষাকর্তা নেগাহবান। تَوَلَّوْا-এতে মূলত একটি ت উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।

٥٨. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا عَذَابُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ هِدَايَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ شَدِيْدٍ -

৫৮. আর যখন আমার নির্দেশ অর্থাৎ শাস্তি আসল তখন আমি আমার রহমতে অর্থাৎ হেদায়েত দান করে হূদকে ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে।

٥٩. وَتِلْكَ عَادٌ اِشَارَةٌ اِلٰى اٰثَارِهِمْ اَىْ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ وَانْظُرُوْا اِلَيْهَا ثُمَّ وَصَفَ اَحْوَالَهُمْ فَقَالَ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ جُمِعَ لِاَنَّ مَنْ عَصٰى رَسُوْلًا عَصٰى جَمِيْعَ الرُّسُلِ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِىْ اَصْلِ مَا جَاءُوْا بِهٖ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ وَاتَّبَعُوْا اَىِ السَّفَلَةُ اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ مُعَانِدٍ مُعَارِضٍ لِلْحَقِّ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ -

৫৯. এই আদ জাতি تِلْكَ : অর্থ তা। এই স্থানে তাদের [আদ জাতির] পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও আলামত সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা পৃথিবী পর্যটন কর এবং এইগুলো [ঐ নিদর্শনগুলো] পর্যবেক্ষণ কর। তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলগণকে আর তারা অর্থাৎ নীচ শ্রেণির লোকেরা প্রত্যেক উদ্ধত বিরুদ্ধাচারীর অর্থাৎ সত্য ও হকের বিরুদ্ধাচারী, তাদের নেতাদের নির্দেশ অনুসরণ করত। جَحَدُوْا : এই শব্দাবলি দ্বারা এদের অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। رُسُلَ : এটা বহুবচন। একজন রাসূলের অবাধ্যাচরণ ও অস্বীকার করা সকল রাসূলকে অস্বীকার করা বুঝায়। কারণ মূল আনীত বিষয় ও তাওহীদের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলই এক। এই হিসাবে এই স্থানে একবচন ব্যবহার না করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

٦٠. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً مِنَ النَّاسِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط لَعْنَةً عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا جَحَدُوْا رَبَّهُمْ ط اَلَا بُعْدًا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ

৬০. এই দুনিয়া মানুষের পক্ষ হতে তাদেরকে করা হয়েছে অভিশাপগ্রস্ত এবং কিয়ামত-দিবসেও তারা সকল সৃষ্টির সম্মুখে লা'নতের অধিকারী হবে। শোন! আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে প্রত্যাখ্যান করেছিল অস্বীকার করেছিল। শোন! আল্লাহর রহমত হতে বিদূরিত হওয়াই ছিল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَرْسَلْنَا : এর আতফ হলো نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ-এর উপর এটাকে عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ বলা হয়।

قَوْلُهٗ هُوْدًا : এটা হলো اَخَاهُمْ -এর عَطْفِ بَيَانٌ

قَوْلُهٗ اَىْ بِقَوْلِكَ : عَنْ -এর তাফসীর بِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, عَنْ -টি تَعْلِيْلِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِعْتَرَاكَ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ-এর اِعْتِرَاءٌ মাসদার হতে فِعْلِ مَاضِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ হলো সামনে আসা, ইচ্ছা করা, সংযুক্ত হওয়া, মসিবতে নিপতিত হওয়া।

قَوْلُهٗ بِسُوْءٍ : এতে بَاءٌ টা تَعْدِيَةٌ -এর জন্য হয়েছে।

প্রশ্ন. اِيَّاهَا -এর যমীর بَعْضَ শব্দের দিকে ফিরেছে। অথচ بَعْض শব্দটি مُذَكَّرٌ তাই যমীর ও مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. মুযাফ ইলাইহি -এর رِعَايَتْ করে اِيَّاهَا -এর মধ্যে مُؤَنَّثْ-এর যমীর নিয়েছেন।

قَوْلُهُ إِشَارَةٌ إِلَى آثَارِهِمْ : এই বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের জবাব দান কল্পে হয়েছে যে, تِلْكَ عَادٌ মুবতাদা ও খবর হয়েছে আর عَادٌ হলো مُذَكَّرٌ কাজেই تِلْكَ-এর স্থলে هٰذَا হওয়া উচিত ছিল?

জবাবের সারকথা, হলো এই যে, خَبَرٌ হলো آثَارٌ যা উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ تِلْكَ الْآثَارُ آثَارُ عَادٍ

قَوْلُهُ عَنِيْدٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে عُنُدٌ অর্থ হলো ঔদ্ধত, অহংকারী, অবাধ্য, জেদি, গোঁয়াড়, শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হূদ (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত সাতজন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কুরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যেকোনো অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাতজন পয়গাম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হূদ (আ.)-এর নামে। এতে বোঝা যায় যে, এখানে হযরত হূদ (আ.)-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত হূদ (আ.)-কে জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হূদ (আ.) ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন أَخَاهُمْ هُوْدًا 'তাদের ভাই হূদ' শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হূদ (আ.) তাঁর কওমের নিকট যে দীনি দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে: এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে, তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি জীবন উসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোনো ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ-নসিহত ও দীনি দাওয়াতের পারিশ্রমিক : কুরআনে কারীমে প্রায় সব নবী (আ.)-এর জবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দীনি-দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরি, শিরকি ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, যেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে কাছেও যাবে না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও ইস্তেগফার করতে পার, [তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,] অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও ইস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধনসম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হূদ (আ.)-এর আহ্বানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতালুত উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোনো মোজেজা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপদাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করব না এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

তদুত্তরে হযরত হূদ (আ.) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না।

এত বড় কথা আমি এ জন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদিগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটা কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এও হযরত হূদ (আ.)-এর একটি মোজেজা। এর দ্বারা একে-তো তাদের এ কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোনো মোজেজা প্রদর্শন করেন নি। দ্বিতীয়ত, তারা যে বলত, "আমাদের কোনো কোনো দেবতা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে" তাও বাতিল করা হলো। কারণ দেব-দেবীর যদি কোনো ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌঁছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব ও গজব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আ.)-এর কোনো কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আজাব নেমে এলো। সাতদিন আটরাত যাবত অনবরত ঝড়-তুফান বইতে লাগল। বাড়ি-ঘর ধসে গেল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে জমিনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আজাব নাজিল হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হূদ (আ.) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আজাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আজাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য ইরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামতো কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গজব নাজিল হয়েছে এবং আখেরাতেও অভিশপ্ত আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মুমিনূন'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়তো উভয় প্রকার আজাবই নাজিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ আদ জাতি আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে। وَعَصَوْا رُسُلَهٗ তারা আল্লাহর রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। যদিও আদ জাতি শুধু হযরত হূদ (আ.)-কে অস্বীকার করেছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে رُسُلَهٗ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনো একজন রাসূলকে অস্বীকার করার অর্থ

সকল রাসূলকে অস্বীকার করা। কেননা সকল রাসূলের শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং আদর্শ একই। অতএব, যারা একজন রাসূলকে অস্বীকার করলো তারা যেন সকল রাসূলকেই অস্বীকার করলো। এই আয়াতে পবিত্র কুরআন ইসলামের এই মূলনীতি পুনরায় ঘোষণা করেছে যা সূরায়ে বাকারার একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ আমরা আল্লাহ পাকের কোনো রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করিনা।

وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ আর তারা এমন লোকদের কথা মেনে চলে যারা ছিল জালেম, যারা ছিল সত্যের দুশমন। [তাফসীরে কবীর খণ্ড-১৮,পৃষ্ঠা-১৫.]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, এই বাক্যটি দ্বারা আদ জাতির পথভ্রষ্ট, অহংকারী তথাকথিত নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নের স্থলে তাঁদের বিরোধিতা করেছে। আর যে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তারা চিরশান্তি, চিরমুক্তি লাভ করতো সে শিক্ষাকে তারা বর্জন করেছে। আর এমন জালেম, সত্য বিরোধী লোকদের অনুসরণ করেছে, যারা কুফরি ও নাফরমানিকে তাদের জন্য বেছে নিয়েছে, যা তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯]

তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, আদ জাতি আল্লাহর নিয়ামতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সমৃদ্ধির কারণে তাদের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদের নিদর্শন সমূহকে তারা অস্বীকার করেছিল। আর তা করেছিল শুধু জিদ এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে- وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ আদ জাতি তখন কঠোর শাস্তি ভোগ করে ধ্বংস হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের প্রতি রয়েছে লানত। এই লানত তাদের প্রতি অব্যাহত থাকবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। এরপর শুরু হবে চিরশাস্তি।

আল্লাহ পাকের নাফরমানির পরিণাম ভয়াবহ : কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুনিয়ার জিন্দেগিতে তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে লানত বা অভিশাপ অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এটি হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানির পরিমাণ।

এ অর্থ হতে পারে যে, পার্থিব জীবনেও তারা নানা প্রকার বালা মসিবতে গ্রেফতার হবে, অশান্তি অকল্যাণ হবে তাদের চির সাথী। বর্তমান যুগেও পবিত্র কুরআনে ঘোষিত এ সত্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় যেমন পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সুখ-সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শান্তির অভাব চরম। তার পাশাপাশি রয়েছে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে, মানুষকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং খাদ্যের অভাব জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কারণে তারা এটম বোমা তৈরি করে চলেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের দেশের মানুষের মুখে এক মুঠো খাদ্য তুলে দিতে পারছে না। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিধি নিষেধকে অমান্য করার এটিই হলো অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে না তাদের প্রতি লানত, দুনিয়াতেও হবে এবং আখেরাতেও হবে। কারণ পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে- اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ "সাবধান! আদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাই ধ্বংসই তাদের পরিণতি।" আর জেনে রাখ হূদের জাতি আদের প্রতি আল্লাহ পাকের অভিশাপ রয়েছে। আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের এই ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের بُعْدً শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে ১. এর অর্থ হলো দূরত্ব অর্থাৎ আদ জাতি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে। ২. এর অর্থ হলো, ধ্বংস অর্থাৎ আদ জাতি উল্লিখিত অপরাধ সমূহের কারণে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আদ জাতির পরিণতিকে পৃথিবীর অন্য জাতি সমূহের জন্যে শিক্ষণীয় হিসেবে পেশ করার লক্ষ্যে ألا শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ কথাও লিখেছেন, যে, قَوْمُ هُوْدٍ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ এই যে, দু'টি জাতির নামই আদ ছিল। প্রথম আদ এবং দ্বিতীয় আদ নামে তারা ছিল পরিচিত। দ্বিতীয় আদ হলো সমূদ জাতি। আর প্রথম আদ হলো হূদ (আ.) -এর জাতি "কওমে"হূদ শব্দটি ব্যবহার করে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে সামূদ জাতি উদ্দেশ্য নয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০ তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৬]

অনুবাদ :

٦١. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيْلَةِ صَالِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ هُوَ اَنْشَاَكُمْ اِبْتِدَاءً خَلَقَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا تَسْكُنُوْنَ بِهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ تُوْبُوْا ارْجِعُوْا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مِنْ خَلْقِهٖ بِعِلْمِهٖ مُجِيْبٌ لِمَنْ سَاَلَهٗ

৬১. ছামূদ জাতির নিকট তাদের গোত্রীয় ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করত, শুরুতে তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন, তোমাদেরকে আবাদকারী বানিয়েছেন যাতে তাতে তোমরা বসবাস কর। সুতরাং তোমরা শিরক হতে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রতিই তোমরা তওবা কর, প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক জ্ঞান হিসাবে তাঁর সৃষ্টির নিকটই যে ব্যক্তি তাঁকে আহ্বান করে তার আহ্বানে তিনি সাড়া দেন।

٦٢. قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا نَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ سَيِّدًا قَبْلَ هٰذَا الَّذِيْ صَدَرَ مِنْكَ اَتَنْهٰنَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا مِنَ الْاَوْثَانِ وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ مُرِيْبٍ مُوْقِعٍ فِي الرَّيْبِ ۔

৬২. তারা বলল, হে সালেহ! এটার পূর্বে অর্থাৎ তোমার নিকট হতে যে আচরণ প্রকাশ পেল এটার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের পিতৃ-পুরুষ যাদের অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিমার উপাসনা করতে তুমি কি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করতেছ? যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করতেছ অর্থাৎ তাওহীদ আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে সংশয়ে নিপতিতকারী সন্দেহে আছি। مُرِيْبٍ : অর্থ সংশয়ে নিপতিতকারী

٦٣. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً نُبُوَّةً فَمَنْ يَنْصُرُنِيْ يَمْنَعُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَيْ عَذَابِهٖ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۔ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ بِاَمْرِكُمْ لِيْ بِذٰلِكَ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ تَضْلِيْلٍ

৬৩. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তাঁর পক্ষ হতে যদি আমার নিকট রহমত অর্থাৎ নবুয়ত [এসে থাকে তবে আল্লাহ হতে] অর্থাৎ তাঁর শাস্তি হতে কে আমাকে সাহায্য করবে কে আমাকে রক্ষা করবে আমি যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ করি? আমাকে তোমরা এই ধরনের নির্দেশ দিয়ে কেবল আমার ক্ষতিই অর্থাৎ গুমরাহকরণ কার্যেরই বৃদ্ধি করতেছ। بَيِّنَةٌ : এই স্থানে এটার অর্থ বিবরণ।

٦٤. وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً حَالٌ عَامِلُهُ الْاِشَارَةُ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ عَقْرٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ اِنْ عَقَرْتُمُوْهَا

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর এই উষ্ট্র তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটাকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও। এটাকে মন্দভাবে স্পর্শ করিও না, বধ করে ফেলিও না। যদি তোমরা এটাকে বধ করে ফেল তবে তোমাদেরকে আশু শাস্তি পাকড়াও করবে। اٰيَةً : এটা এই স্থানে حَالٌ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْمُ اِشَارَةٍ বা ইঙ্গিত নির্দেশক বিশেষ্য هٰذِهٖ এটার عَامِلٌ

٦٥. فَعَقَرُوْهَا عَقَرَهَا قُدَارٌ بِاَمْرِهِمْ فَقَالَ صَالِحٌ تَمَتَّعُوْا عِيْشُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ تَهْلِكُوْنَ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ فِيْهِ

৬৫. কিন্তু তারা তাকে বধ করল তাদের নির্দেশে কুদার নামক এক ব্যক্তি তাকে বধ করেছিল। অনন্তর সে হযরত সালেহ বলল, তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও, জীবিত থাকার স্বাদ নিয়ে নাও। অতঃপর তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটা একটি প্রতিশ্রুতি, এই বিষয়ে মিথ্যা কিছু হওয়ার নয়।

٦٦. فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَهُمْ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ بِكَسْرِ الْمِيْمِ اِعْرَابًا وَفَتْحِهَا بِنَاءً لِاِضَافَتِهٖ اِلٰى مَبْنِيٍّ وَهُوَ الْاَكْثَرُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ

৬৬. অনন্তর যখন অর্থাৎ এদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্পর্কে আমার নির্দেশ আসলে তখন আমি সালেহ এবং তাঁর সঙ্গী মু'মিনদেরকে এরা সংখ্যায় ছিল চার হাজার আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, এবং ঐদিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল يَوْمَئِذٍ : এটার يَوْمٌ শব্দটি مُعْرَبٌ রূপে গণ্য হলে তার مِيْم অক্ষরটি কাসরাসহ পঠিত হবে। আর مَبْنِيّ-এর দিকে اِضَافَتْ বা সম্বন্ধিত বলে তার مِيْم অক্ষরটি ফাতাহ সহও পঠিত হয়। এটার এই ধরনের ব্যবহারই সর্বাধিক।

٦٧. وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ

৬৭. অতঃপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে পাকড়াও করল; ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু হয়ে মরে পড়ে রইল। جٰثِمِيْنَ অর্থ নতজানু হয়ে মরে পড়ে রইল।

٦٨. كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيْمُوْا فِيْهَا فِيْ دَارٍ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهٖ عَلٰى مَعْنَى الْحَيِّ وَالْقَبِيْلَةِ

৬৮. যেন তারা সেথায় তাদের গৃহসমূহে কখনও অবস্থান করেনি।] বসবাস করে নি। শোন! ছামূদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। শোন! ধ্বংসই ছিল ছামূদ জাতির পরিণাম। ثَمُوْد শব্দটি مُنْصَرِفٌ পাঠ করা যায়। আর কবীলা ও গোত্রের নাম হিসাবে এটাকে غَيْرُ مُنْصَرِفٍ রূপেও পাঠ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثَمُوْدُ : ছামূদ একটি সম্প্রদায়ের নাম, যার তাদের পরদাদা ছামূদ ইবনে আবির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)-এর দিকে مَنْسُوْبٌ হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের সাথে ই হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্পর্ক ছিল এবং এ সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁকে রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا تَسْكُنُوْنَ بِهٖ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে اِسْتَعْمَرَ-এর মধ্যে س- ت টা تَصْيِيْرٌ-এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উহাকে আবাদকারী রূপে বানিয়েছি। আবার কেউ কেউ عَمَرَ- يَعْمُرُ থেকে নিয়েছেন, ঐ সময় তার অর্থ হবে তোমাদেরকে বাসিন্দা বানিয়েছেন। এই সুরতে س - ت টা অতিরিক্ত হবে।

قَوْلُهُ صَالِحٌ : তিনি প্রসিদ্ধ নবীগণের একজন। পবিত্র কুরআনের নয়টি স্থানে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন?

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থা نَاقَةٌ টা اٰيَةً থেকে حَالٌ হয়েছে আর তাতে আমেল হলো هٰذِهٖ যা اُشِيْرُ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فَعَقَرُوْهَا : এ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর عَقْرًا মাসদার হতে এসেছে অর্থ হলো পায়ের গোড়ালী কেটে ফেলা, আরবদের নিয়ম ছিল যখন কোনো উটকে ধ্বংস করতে চাইত তখন তার গোড়ালী কেটে দিত। পায়ের গোড়ালী কেটে দিত। পায়ের গোড়ালী কর্তনের জন্য ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

قَوْلُهُ بِنَاءً لِاِضَافَةٍ : অর্থাৎ يَوْمٌ-এর ইযাফত যখন اِذْ-এর দিকে হবে তখন يَوْمَئِذٍ টা فَتْحَةٌ-এর উপর مَبْنِىٌّ হবে। কেননা ظَرْفٌ টা যখন اِسْمِ مُبْهَمْ-এর দিকে মুযাফ হয় তখন مُضَافٌ اِلَيْهٖ থেকে بِنَاءً অর্জন করে নেয়। اِذْ টা يَوْمٌ-এর ظَرْفٌ مُضَافٌ হয়েছে যার কারণে مَبْنِىٌّ عَلَى الْفَتْحِ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত সালেহ (আ.)-এর বংশ সূত্র : হযরত সালেহ (আ.) যে সম্প্রদায়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তাকে ছামূদ বলা হয়। পবিত্র কুরআনের ৯ স্থানে ثَمُوْدُ-এর উল্লেখ রয়েছে। তা হলো সূরা আ'রাফ, হূদ, হজর নমল, ফুসসিলাত, নাজম, কামার, হাক্কাহ ও শামস সূরা সমূহে। হযরত সালেহ (আ.) -এর বংশ পরম্পরার মধ্যে বংশ বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস ইমাম বগভী (র.) তাঁর বংশ সূত্র এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সালেহ ইবনে ওবায়দ ইবনে আসিফ ইবনে মাশেহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে হাদির ইবনে ছামূদ এই বংশ সূত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের পরদাদার নাম ছামূদ থাকায় এদেরকে ছামূদ সম্প্রদায় বা ছামূদ জাতি বলা হয়। প্রতিটি বংশ সূত্রই সর্বশেষ সাম ইবনে নূহ (আ.) -এর সাথে গিয়ে মিলে যায়। মোটকথা সকল বর্ণনার সমষ্টির দ্বারা বুঝা যায় যে, ছামূদ সম্প্রদায় ও সামী গোত্রের একটি শাখা ছিল। আর এটা হলো সেই গোত্র যা عَادْ اُوْلٰى তথা হূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে হযরত হূদ (আ.)-এর সাথে বেচে গিয়েছিল। আর এদেরকে عَادْ ثَانِيَةٌ-এর বংশধরও বলা হয়।

৬১ হতে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে ছামূদ' -এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল "এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হতে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজি আছি।"

হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মুতাবিক মোজেজা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ ত'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আজাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা হতে বিরত হলো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মুতাবিক মোজেজা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলি সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনোরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা

হয়, তবে তোমাদের প্রতি আজাব নাজিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হলো। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বললেন قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো, যেমন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে নবুয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুয়তের দাবি ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মাত্র তিনদিন তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো, এ তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا "যখন আমার আজাবের আদেশ আসল তখন আমি সালেহকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করেছি সেদিনের কঠিন আজাব থেকে এবং অপমানজনক শাস্তি থেকে আর তা করেছি আমার রহমতে।" আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে–

১. আল্লাহর অবাধ্য নাফরমানদের যখন কঠোর আজাব হয় তখনও তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে রক্ষা করেন যেমন হযরত সালেহ (আ.) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

২. আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে শুধু তাঁর রহমতে রক্ষা করেছেন, যদি তিনি রহমত নাজিল না করতেন তবে এ ভয়ংকর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পন্থা ছিলনা।

وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ : ৩. [সেদিনের অপমান থেকে] অর্থাৎ একটি আজাব ছিল ধ্বংসের, আর দ্বিতীয় আজাব ছিল অপমানের। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে উভয় আজাব থেকেই হযরত সালেহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করেছেন।

قَوْلُهٗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ : [হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ধ্বংসও করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষাও করতে পারেন। কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একই সময় ধ্বংস করা ও রক্ষা করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি পরাক্রমশালী।

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯২ তাফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৩]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিনদিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রোববার প্রত্যুষে তাদের উপর আজাব নাজিল হলো।

قَوْلُهٗ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ : অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোনো জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপে প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, কওমে ছামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা 'আরাফ'-এর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোনো বিরোধ নেই; হয়তো প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

অনুবাদ :

٦٩. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى اَىْ بِاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ بَعْدَهٗ قَالُوْا سَلَامًا مَصْدَرٌ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ مَشْوِيٍّ

৬৯. আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইসহাক ও তৎপর ইয়াকুবের সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসল, তারা বলল, সালাম। সে বলল, তোমাদের উপরও সালাম। সে অনতিবিলম্ব কাবাব করা গো-বৎস নিয়ে আসল। سَلَامًا -এটা مَصْدَرٌ বা উহ্য একটি ক্রিয়ার সমধাতুজ কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। حَنِيْذٍ : অর্থ কাবাবকৃত, ভুনা।

٧٠. فَلَمَّا رَاٰى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ بِمَعْنٰى اَنْكَرَهُمْ فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ فِىْ نَفْسِهٖ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط خَوْفًا قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ لِنُهْلِكَهُمْ

৭০. সে যখন দেখল, উহার দিকে তাদের হাত বাড়তেছে না তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত বোধ করল এবং তাদের সম্বন্ধে মনে ভীতি সঞ্চার হলো। তারা বলল, ভয় করিও না। আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। نَكِرَهُمْ -অর্থ তাদেরকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করল। اَوْجَسَ -অর্থ মনে গোপনে উদয় হলো। خِيْفَةً -অর্থ ভয়।

٧١. وَامْرَاَتُهٗ اَىْ اِمْرَاَةُ اِبْرَاهِيْمَ سَارَةُ قَائِمَةٌ تَخْدِمُهُمْ فَضَحِكَتْ اِسْتِبْشَارًا بِهَلَاكِهِمْ فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ بَعْدِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ وَلَدَهٗ تَعِيْشُ اِلٰى اَنْ تَرَاهُ

৭১. তার স্ত্রী অর্থাৎ ইবরাহীমের স্ত্রী সারা দাঁড়ানো ছিল। সে তাদের খেদমত করতেছিল। সে এদের ধ্বংসের সংবাদে খুশি হয়ে হেসে উঠল অনন্তর তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তীতে তৎসন্তান ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম সে তাকে ইয়াকুবকে দর্শন না করা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। وَرَاءٌ -এই স্থানে অর্থ পরবর্তী।

٧٢. قَالَتْ يَاوَيْلَتٰى كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَالْاَلِفُ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ لِىْ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ سَنَةً وَهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ط لَهٗ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ سَنَةً وَنَصَبُهٗ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهِ مَا فِىْ ذَا مِنَ الْاِشَارَةِ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ اَنْ يُّوْلَدَ وَلَدٌ لِهَرِمَيْنِ

৭২. সে বলল, কি আশ্চর্য! وَيْلَتٰى সাঙ্ঘাতিক কোনো বিষয়ের বেলায় এই শব্দটি বলা হয়ে থাকে। এটার শেষের اَلِفْ -টি يَاءِ اِضَافَةْ হতে পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। সন্তানের জননী হবো আমি অথচ আমি বৃদ্ধা! তখন তার বয়স ছিল নিরানব্বই। এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ। তাঁর বয়স ছিল একশত বিশ বৎসর। এটা অর্থাৎ দুই সাতিশয় বৃদ্ধ বৃদ্ধার সন্তান হওয়া সত্যই এক অদ্ভুত ব্যবহার شَيْخًا -এটা حَالٌ বাচক পদ হিসাবে مَنْصُوْبٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় اِسْمُ اِشَارَةْ বা ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য هٰذَا স্থিত ক্রিয়া اُشِيْرُ এটার عَامِلٌ রূপে গণ্য হবে।

٧٣. قَالُوْآ أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ قُدْرَتِهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ط بَيْتِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ مَجِيْدٌ كَرِيْمٌ

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহর কাজে তাঁর কুদরত সম্পর্কে তুমি বিস্ময় বোধ করতেছ? হে গৃহবাসী অর্থাৎ হে ইবরাহীমের পরিবার, তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত। তিনি নিশ্চয় প্রশংসিত ও সম্মানিত। حَمِيْدٌ-অর্থ مَحْمُوْدٌ বা প্রশংসিত। مَجِيْدٌ -অর্থ كَرِيْمٌ বা সম্মানিত।

٧٤. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ الْخَوْفُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى بِالْوَلَدِ أَخَذَ يُجَادِلُنَا يُجَادِلُ رُسُلَنَا فِيْ شَأْنِ قَوْمِ لُوْطٍ .

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীম ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার নিকট সন্তানের সুসংবাদ আসল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমার সাথে আমার প্রেরিত রাসূলগণের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। اَلرَّوْعُ-অর্থ ভয়।

٧٥. إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ كَثِيْرُ الْأَنَاةِ أَوَّاهٌ مُنِيْبٌ رَجَّاعٌ فَقَالَ لَهُمْ أَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا ثَلَاثُمِائَةِ مُؤْمِنٍ قَالُوْا لَا قَالَ أَفَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا مِائَتَا مُؤْمِنٍ قَالُوْا لَا قَالَ أَفَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا أَرْبَعُوْنَ مُؤْمِنًا قَالُوْا لَا قَالَ أَفَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ مُؤْمِنًا قَالُوْا لَا قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ فِيْهَا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ قَالُوْا لَا قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا الخ فَلَمَّا أَطَالَ مُجَادَلَتَهُمْ قَالُوْا .

৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহ অভিমুখী। اَلْحَلِيْمُ -অর্থ যিনি ধীরে সুস্থে কাজ করেন। مُنِيْبٌ -অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহ অভিমুখী। তিনি তাদের বলেছিলেন, আপনারা কি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে তিনশত মু'মিনের বাস? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে দুইশত মু'মিনের বাস? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে চল্লিশ জন মু'মিনের বাস? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে চৌদ্দ জন মু'মিনের বাস? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, যদি একজন মু'মিনের বাস হয় তবে আপনাদের মত কি? তাঁরা বললেন, তখনও না। তিনি বললেন, ঐ জনপদে তো লূত আছেন? তাঁরা বললেন, সেখানে কে আছেন আমরা ভালো করে জানি।

٧٦. يَا إِبْرٰهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا الْجِدَالِ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ بِهَلَاكِهِمْ وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ .

৭৬. যা হউক এই বাদানুবাদ দীর্ঘায়িত হলো তাঁরা বললেন, হে ইবরাহীম! এটা এই বাদানুবাদ হতে বিরত হও এদের ধ্বংস সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গিয়েছে। এদের প্রতি অনিবার্যরূপে শাস্তি আসবে যা প্রত্যাহার করা হবে না।

৭৭. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ـ ٧٧

৭৭. এবং আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসল তখন সে বিষণ্ন হলো এদের আগমনের দরুন চিন্তিত হয়ে পড়ল, এবং তার বাহু সংকুচিত বলে বোধ হলো অর্থাৎ তার মন শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কারণ তারা সুন্দর চেহারার বালক আকৃতি ধারণ করে মেহমান হিসাবে এসেছিলেন। সেহেতু এদের সম্পর্কে তিনি তার সম্প্রদায়ের মন্দ আচরণের আশঙ্কা করতেছিলেন। এবং বলল, 'এটা নিদারুণ দিন।' কঠিন এক দিন।

حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِأَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوهِ فِي صُورَةِ أَضْيَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِمْ قَوْمَهُ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ شَدِيدٌ ـ

৭৮. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ لَمَّا عَلِمُوا بِهِمْ يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ قَبْلِ مَجِيئِهِمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط هِيَ إِتْيَانُ الرِّجَالِ فِي الْأَدْبَارِ قَالَ لُوطٌ يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي فَتَزَوَّجُوهُنَّ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ تَفْضَحُونِي فِي ضَيْفِي ط أَضْيَافِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

৭৮. তাদের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে তার সম্প্রদায় তার নিকট দ্রুত দৌড়ে আসল। পূর্ব হতে তাদের আগমনের পূর্ব হতে তারা কুকর্মে অর্থাৎ সমকামের মতো জঘন্য কর্মে লিপ্ত ছিল। সে হযরত লূত (আ.) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার কন্যাগণ, তাদেরকে তোমরা বিধান মতো বিবাহ করে নিও তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার অতিথিদিগের বিষয়ে আমাকে হেয় করিওনা, অপমান করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? যে সৎ কর্মের আদেশ দিবে ও অসৎ কর্ম হতে বিরত করবে। يُهْرَعُونَ - إِهْرَاعٌ দ্রুত দৌড়ে আসা। ضَيْف-এটা এই স্থানে বহুবচন أَضْيَاف [অতিথিগণ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাফসীরে أَضْيَاف শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৯. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ حَاجَةٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ مِنْ إِتْيَانِ الرِّجَالِ

৭৯. তারা বলল, তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা তুমি তো ভালো করে জান। আর তা হলো সমকাম কর্ম। حَقّ -এই স্থানে এটার অর্থ হলো প্রয়োজন ।

৮০. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً طَاقَةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ عَشِيرَةٍ تَنْصُرُنِي لَبَطَشْتُ بِكُمْ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَلٰئِكَةُ ذٰلِكَ

৮০. সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার ক্ষমতা শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোনো শক্তিশালী দলের গোত্রের আশ্রয় পেতাম! যারা আমাকে তোমাদের দাপট হতে রক্ষা পেতে সাহায্য করত।

٨١. قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ بِسُوْءٍ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ طَائِفَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ لِئَلَّا يَرٰى عَظِيْمَ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ اِلَّا امْرَاَتُكَ بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ اَحَدٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصَبِ اِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْاَهْلِ اَيْ فَلَا تُسْرِبِهَا اِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ ط فَقِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَا وَقِيْلَ خَرَجَتْ وَالْتَفَتَتْ فَقَالَتْ وَاقَوْمَاهُ فَجَاءَهَا حَجَرٌ فَقَتَلَهَا وَسَأَلَهُمْ عَنْ وَقْتِ هَلَاكِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ فَقَالَ اُرِيْدُ اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ

৮১. এই অবস্থা দর্শনে ফেরেশতাগণ বললেন, 'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনই মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময়ে কোনো একভাগে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে যেন না দেখে। যেন সে এটার উপর যে ভীষণ বিভীষিকা আপতিত হবে তা না দেখতে পায়। তোমার স্ত্রী ব্যতীত। সে অবশ্য পিছনের দিকে তাকাবে তাদের অর্থাৎ লুতের সম্প্রদায়ের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। কথিত আছে যে, সে ঐ অঞ্চল হতে বাইরেই যায় নি। কেউ কেউ বলেন, সে তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল বটে কিন্তু [নিষেধ থাকা সত্ত্বেও] পিছনের দিকে তাকিয়ে তার সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ে দর্শন বলে উঠে وَا قَوْمَاهُ হায় আমার সম্প্রদায়! তখন একটি পাথর ছুটে এসে তাকে আঘাত করে এবং তাকে মেরে ফেলে। হযরত লূত তাদেরকে ফেরেশতাদেরকে তাদের ধ্বংসের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত কাল। তিনি বললেন, আরো শীঘ্র হউক। তারা বলল, প্রভাত কি নিকট নয়? اِمْرَاَتَكَ-এটা اَحَدٌ-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদরূপে رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। অপর এক কিরাতে اَهْل হতে اِسْتِثْنَاءٌ ব রূপে اَهْل হতে -نَصَبٌ اِسْتِثْنَاءٌ রূপে نَصَبٌ সহও পঠিত রয়েছে, এমতাবস্থায় অর্থ হবে এটাকে [স্ত্রীকে] নিয়ে যেয়ো না।

٨٢. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ جَعَلْنَا عَالِيَهَا اَيْ قُرَاهُمْ سَافِلَهَا بِاَنْ رَفَعَهَا جِبْرَئِيْلُ اِلَى السَّمَاءِ وَاَسْقَطَهَا مَقْلُوْبَةً اِلَى الْاَرْضِ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ طِيْنٍ طُبِخَ بِالنَّارِ مَنْضُوْدٍ مُتَتَابِعٍ

৮২. অতঃপর যখন এদের ধ্বংসের সম্পর্কে আমার আদেশ আসল। এই গুলোকে এই জনপদগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) এগুলোকে আকাশে তুলে পৃথিবীতে উল্টিয়ে ছুড়ে ফেললেন। এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম কঙ্কর, سِجِّيْل -আগুনে পোড়া মাটি, কঙ্কর। مَنْضُوْدٌ -একের পর এক ক্রমাগত।

٨٣. مُسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً عَلَيْهَا اِسْمُ مَنْ يُّرْمٰى بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ظَرْفٌ لَهَا وَمَاهِيَ الْحِجَارَةُ اَوْ بِلَادُهُمْ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اَيْ اَهْلِ مَكَّةَ بِبَعِيْدٍ

৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। যাকে তা ছুঁড়া হবে তার নাম তাতে অঙ্কিত ছিল। [এটা] এই পাথর বা তাদের জনপদসমূহ সীমালঙ্ঘনকারীদের হতে অর্থাৎ মক্কাবাসীদের হতে দূরে নয়। عِنْدَ رَبِّكَ -এটা এইস্থানে ظَرْف রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَصْدَرٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, سَلَامًا টা سَلَّمْنَا উহ্য ফে'লের মাসদার। এতে এই আপত্তিরও নিরসন হয়ে গেল যে, سَلَامًا টা قَالُوا -এর مَقُوْلَه হয়েছে অথচ مَقُوْلَه টা مُفْرَدْ হয় না। এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এটাও হলো যে, سَلَامًا টা مُفْرَدْ নয়; বরং سَلَّمْنَا -এর সাথে মিলে জুমলা বা বাক্য হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَيْكُمْ : মুফাসসির (র.) عَلَيْكُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, سَلَامٌ হলো মুবতাদা আর عَلَيْكُمْ তার খবর উহ্য রয়েছে।

প্রশ্ন. سَلَامٌ হলো نَكِرَةٌ আর نَكِرَةٌ টা মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়?

উত্তর. হলো سَلَامٌ -এর তানভীনটা হলো تَعْظِيْم-এর জন্য অর্থাৎ سَلَامٌ عَظِيْمٌ কাজেই سَلَامٌ -এর মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। এটা شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ -এর অন্তর্গত। এখানে مَقُوْلَه মুফরাদ হওয়ার প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেলে।

قَوْلُهُ بُشْرٰى : এর অর্থ হলো সুসংবাদ। সুসংবাদের প্রতিক্রিয়া যেহেতু চেহারায় প্রকাশ পায় এ কারণেই তাকে بُشْرٰى বলা হয়। এখানে بُشْرٰى দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকূবের সুসংবাদ উদ্দেশ্য। যাকে আগত فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এবং এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, بُشْرٰى দ্বারা ব্যাপক সুসংবাদ উদ্দেশ্য হবে। তখন তাতে হযরত লূত (আ.) ও অন্যান্যদের মুক্তি এবং তার দুশ্চরিত্র সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সুসংবাদও অন্তর্ভুক্ত হবে। মুফাসসির (র.) এই শেষোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন।

প্রশ্ন. হযরত ইব্রাহীম (আ.) জবাবে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ ব্যবহার করেছেন আর ফেরেশতাগণ جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ -এর কারণ কি?

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো– সালামের জবাব সালামের চেয়ে উত্তম হওয়া চাই। কেননা শরিয়তের নীতিমালাও এটাই, আর সালামের জবাব তখনই উত্তম হবে যখন জবাবে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ ব্যবহার করা হয়। جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ টা جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ হতে উত্তম হয়ে থাকে। কেননা جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ টা دَوَامْ এবং ثَبَاتْ -এর উপর বুঝায়।

قَوْلُهُ اَنْكَرَهُمْ : نَكِرَهُمْ -এর তাফসীর اَنْكَرَهُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَازِمْ টা مُتَعَدِّىْ-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ يَا وَيْلَتَا : এ শব্দটি মূলে ছিল يَاوَيْلَتِىْ ইযাফতের يَاءْ -কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়ার ফলে يَاوَيْلَتَا হয়েছে।

قَوْلُهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ الخ : এটা مُسْتَانِفَهْ বাক্য; এবং اِنْكَارُ تَعَجُّبْ -এর ইল্লত। অর্থাৎ তুমি তাতে আশ্চর্যবোধ করো না। কেননা এটা তোমাদের উপর আল্লাহর অনুকম্পা ও বরকত স্বরূপ।

قَوْلُهُ اَخَذَ يُجَادِلُنَا : এটা সেই উহ্য প্রশ্নের জবাব যে, لَمَّا-এর জবাব مَاضِىْ হয়ে থাকে مُضَارِعْ নয়। আর এখানে لَمَّا-এর জবাব يُجَادِلُنَا তথা مُضَارِعْ হয়েছে?

قَوْلُهُ شَانْ : যেহেতু قَوْمْ শব্দের মধ্যে ظَرْف হওয়ার যোগ্যতা নেই, এ কারণেই شَانْ শব্দটিকে উহ্য মেনে নিয়েছেন যাতে করে فِىْ এর ظَرْف হওয়া বৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَبَطَشْتُ بِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَوْ-এর জবাব উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ بَدَلٌ الخ : কেননা اِسْتِثْنَاءْ كَلَامٌ غَيْرُ مُوْجَبْ -এর মধ্যে بَدَلْ ই পছন্দনীয় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْاَهْلِ : অর্থাৎ اِلَّا امْرَاَتَكَ টা مِنَ الْاَهْلِ হতে اِسْتِثْنَاءْ হয়েছে اَحَدْ থেকে নয়। কেননা اَحَدْ থেকে اِسْتِثْنَاءْ বলার সুরতে اِمْرَأَةْ কে اِلْتِفَاتْ -এর হুকুম দেওয়া আবশ্যক হবে। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়।

ফায়েদা : اِلَّا امْرَاَتَكَ নসবের সাথে জমহুরের কেরাত আবূ আমের এবং ইবনে কাছীরের নিকট اَحَدْ থেকে بَدَلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعْ হয়েছে। প্রথম কেরাতের সুরতে اِمْرَاَتَه টা فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ হতে مُسْتَثْنٰى হবে অর্থাৎ اَسْرِ بِاَهْلِكَ جَمِيْعًا اِلَّا امْرَاَتَكَ একদল رَفْعْ -এর কেরাত কে অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে আবূ ওবায়দও রয়েছেন। فَلَا تُسْرِيْكَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ...... حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ : আলোচ্য পাঁচটি আয়াতে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত সন্তান লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিল না এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন তাঁর নামকরণ করা হলো ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো যে, হযরত ইসহাক (আ.) দীর্ঘজীবি হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকূব' (আ.)। উভয়েই নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তাঁরা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়তো এদের মনে কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহর ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কওমের উপর আজাব নাজিল করা।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যার অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনা তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার। এবার আয়াত সমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনে তৃতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মীকাঈল (আ.) ও ইসরাফীল (আ.) এ তিনজন ফেরেশতা ছিলেন। -[কুরতুবী]

তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সালাম করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাঁদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। -[কুরতুবী]

তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে ইসরাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন 'বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বল।' সে বলল 'আল্লাহ কাকে বলে আমি জানি না।' হযরত ইবরাহীম (আ.) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান হতে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আমি তার কুফরি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন তাকে আহার্য-পানীয় দিয়ে আসছি আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। এ কথা শোনামাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে বলল, যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে এ কথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যিই পরম দয়ালু। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবাই করলেন এবং তা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হিকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নি।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তাঁরা এর ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণ হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। –[তাফসীরে কুরতুবী] অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহর ফেরেশতা।

আহকাম ও মাসায়েল : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তদীয় তাফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত : قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ 'তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম' এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ -মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাকালে বিশেষ কোনো বাক্যে উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহর একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর জিকির করা হলো, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হলো, নিজের পক্ষ হতে তার জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

এখানে কুরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سَلٰمًا 'সালামান' এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তরফ হতে শুধু سَلٰمٌ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যত অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মুতাবিক সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্যেই বোঝানো হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্যে শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ আসসালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ' বলবে।

মেহমানদারির কতিপয় মূলনীতি : فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ একটি ভুনা বাছুর উপস্থাপন করতে যতটুকু সময় একান্ত অপরিহার্য, তিনি তার চেয়ে বেশি বিলম্ব করলেন না।

এতদ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেল। **প্রথমত,** মেহমান হাজির হওয়ার পরে আহার্য-পানীয় যা কিছু তাৎক্ষণিকভাবে গৃহে মওজুদ থাকে তা মেহমানের সামনে পেশ করা এবং সামর্থ্যবান হলে উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়

–[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয়ত, মেহমান আপ্যায়নের জন্য বাড়াবাড়ি বা সাধ্যাতিরিক্ত আয়োজন করা সমীচীন নয়। সহজে যতটুকু ভালো খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায়, তাই মেহমানের সামনে নিঃসঙ্কোচ পেশ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে অনেকগুলো গরু ছিল। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাছুর জবাই করে ভুনে মেহমানগণের সামনে পেশ করেছিলেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

তৃতীয়ত, বহিরাগত আগন্তুকদের আতিথেয়তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নৈতিক ও মহৎ কার্য। এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মহান বুজুর্গগণের একটি ঐতিহ্যও বটে। আতিথেয়তা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ

রয়েছে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। কোনো কোনো আলেমের মতে বাহিরাগত আগন্তুকদের মেহমানদারি করা গ্রামবাসীদের জন্য ওয়াজিব। কেননা গ্রামে তাদের জন্য সাধারণত কোনো হোটেলের ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে শহরে হোটেল-রেষ্টুরেন্টের সুব্যবস্থা থাকায় বিদেশী লোকদের মেহমানদারি করা শহরবাসীদের জন্য ওয়াজিব নয়। -[তাফসীরে কুরতুবী।]

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ : অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন দেখলেন যে, উক্ত আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্ত্রস্ত হলেন।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মেহমানের সম্মুখে মেজবান কর্তৃক যা কিছু পেশ করা হয়, তা সাদরে গ্রহণ করা মেহমানের কর্তব্য। তা তার কাছে অরুচিকর হলেও গৃহকর্তার সন্তুষ্টির জন্য যৎসামান্য স্বাদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে আরো জানা গেল যে, অতিথির সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রেখে দূরে সরে যাওয়া রীতি নয়, বরং মেহমান আহার করেন কি না তা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। হযরত ইবরাহীম (আ.) ফেরেশতাদের হাত গুটিয়ে রাখা লক্ষ্য করেছিলেন। তবে মেহমানের আহারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাও রীতিবিরুদ্ধ, বরং ভাসা-ভাসাভাবে লক্ষ্য করবে। কেননা লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকা ভদ্রতার পরিপন্থি এবং মেহমানের জন্য বিব্রতকর। একদা খলীফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের খানার মজলিসে জনৈক বেদুঈনও শরিক ছিল। তার লোকমার মধ্যে একটা পশম লক্ষ্য করে খলীফা সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তাতে বেদুঈন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমরা এমন লোকের সাথে খানা খেতে পছন্দ করি না যারা আমাদের লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখানে ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ প্রথমে আহার্য গ্রহণ করার অজুহাত হিসাবে বলেছিলেন যে, আমরা মুফত [বিনামূল্য] খানা খাই না। আপনি মূল্য ধার্য করুন, তাহলে খেতে পারি। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, "ঠিক আছে, খানার মূল্য ধার্য করছি যে, শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন। একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আ.) তদীয় সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন-'আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় খলীল [অন্তরঙ্গ বন্ধু] রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি সত্যিই এর যোগ্য এর দ্বারা জানা গেল যে, খানার প্রারম্ভে বিসিমল্লাহ ও সমাপ্তিতে আল-হামদুলিল্লাহ বলা সুন্নত।

قَوْلُهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ الخ : সূরা হুদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানি আজাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আ.)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য অপরাধ। এজন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আজাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোনো অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নি।

হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আজাব নাজিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তিনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আজাবই নাজিল করে থাকেন। এক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ.)-ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন 'আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।'

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজাব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আজরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন

হযরত লূত (আ.)-এর মতো একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন।

-[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

হযরত লূত (আ.)-এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হলো। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ "আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এলো। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল।" এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কুকর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ.)-এর মতো একজন সম্মানিত পয়গাম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আ.) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল। হুজুরে আকরাম ﷺ -এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হুজুর ﷺ স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবূ লাহাব ও আবুল আসইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরির হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষিত হয়।

-[তাফসীরে কুরতুবী।]

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এখানে হযরত লূত (আ.) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ-কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তান স্বরূপ। যেমন কুরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ -এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ বাক্যেও বর্ণিত আছে, যার মধ্যে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সমগ্র 'উম্মতের পিতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তাফসীর অনুসারে হযরত লূত (আ.)-এর কথার অর্থ হলো, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আ.) তাদেরকে আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর' এবং কাকুতি-মিনতি করে বললেন وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন, اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ভালো মানুষ নেই?" আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মানুষত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

হযরত লূত (আ.) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জালিমের হাত হতে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো!

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না; বরং আজাব নাজিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ.)-এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। -[কুরতুবী] স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে কুরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও

পৃষ্ঠপোশকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিকে দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এজন্যই সম্পূর্ণ বনী হাশিম গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শামিল ছিল যখন কুরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আ.)-এর গৃহদ্বারে সমবেত হলো, তখন তিনি গৃহদ্বারে রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলো। এমন কঠিন মুহূর্তে হযরত লূত (আ.) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং পালাতে লাগল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আ.)-কে বললেন, আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ অন্যদের উপর যে আজাব আপতিত হবে, তাকেও সে আজাব ভোগ করতে হবে।

এর এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। [দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুঁশিয়ারি মেনে চলবে না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল। [তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আজাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আ.) বললেন- "আমি চাই, আরো জলদি আজাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ "প্রত্যুষকাল দূরে নয়; বরং সমাগত প্রায়।"

অতঃপর উক্ত আজাবের ধরন সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে যখন আজাবের হুকুম কার্যকর করার সময় হলো, তখন আমি তাদের বস্তির উপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসিত ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআন পাকের অন্য আয়াতে مُؤْتَفِكَاتٌ 'মুতাফিকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের জমিনে তলদেশে প্রবিষ্ট করত এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমন কি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐ সব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হলো। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল, তাই এই ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আ.)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ প্রস্তর বর্ষণের আজাব বর্তমানকালের জালিমদের থেকেও দূরে নয়; বরং কুরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থলে ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠও যেন নিজেদেরকে এহেন আজাব হতে দূরে মনে না করে। রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে যখন এরূপ হতে দেখবে তখন তাদের উপরও অনুরূপ আজাব আসার অপেক্ষা কর।'

অনুবাদ :

٨٤. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ نِعْمَةٍ تُغْنِيْكُمْ عَنِ التَّطْفِيْفِ وَاِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْا عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ بِكُمْ يُهْلِكُكُمْ ووَصْفُ الْيَوْمِ بِهٖ مَجَازٌ لِوُقُوْعِهٖ فِيْهِ ـ

৮৪. আর মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। মাপ ও ওজনে কম করিও না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখতেছি। স্বচ্ছল দেখতেছি। যা মাপে কম দেওয়া হতে তোমাদেরকে অনপেক্ষ করে দিয়েছে। তোমরা যদি ঈমান আনয়ন না কর, তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসে শাস্তির, যা তোমাদের বিধ্বংস করে দিবে। مُحِيْطٍ -বেষ্টনকারী। অর্থাৎ যা তোমাদেরকে সকল দিক হতে বেষ্টন করে ফেলবে। এই স্থানে يَوْمٍ অর্থাৎ দিবসের বিশেষণ হিসাবে এটাকে مَجَازٌ বা রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তা ঐ দিবসের মাঝে সংঘটিত হবে।

٨٥. وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اَتِمُّوْهُمَا بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ لَا تَنْقُصُوْهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهٖ مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ وَمُفْسِدِيْنَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنٰى عَامِلِهَا تَعْثَوْا ـ

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ইনসাফের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পূরণ করবে এইগুলো পরিপূর্ণরূপে করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু দিবে ক্রটি করবে না তাদের প্রাপকের কিছুমাত্র কম করবে না, এবং খুন-খারাবি ইত্যাদি করে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ে ঘুরবে না। تَعْثَوْا-এটা ث অক্ষরে তিন হরকত বিশিষ্ট ক্রিয়া عَثِيَ হতে গঠিত। অর্থ বিশৃঙ্খলা ঘটানো। مُفْسِدِيْنَ এটা حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ অর্থাৎ তার আমেল تَعْثَوْا-এর অর্থের তাকিদব্যঞ্জক حَالٌ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٦. بَقِيَّتُ اللّٰهِ رِزْقُهُ الْبَاقِيْ لَكُمْ بَعْدَ اِيْفَاءِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْبَخْسِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ع وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ رَقِيْبٍ اُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ اِنَّمَا بُعِثْتُ نَذِيْرًا ـ

৮৬. যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ-অনুমোদিত যা থাকবে। মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে প্রদানের পর আল্লাহ প্রদত্ত যে রিজিক তোমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তোমাদের জন্য তা মাপে কম করা হতে শ্রেয়। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই নিগাহবান নই যে, তোমাদের কার্যাবলির আমি প্রতিফল দিব, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়েছি।

٨٧. قَالُوْا لَهُ اسْتِهْزَاءً يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ بِتَكْلِيْفِنَا اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا مِنَ الْاَصْنَامِ اَوْ نَتْرُكَ اَنْ نَفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط اَلْمَعْنٰى هٰذَا اَمْرٌ بَاطِلٌ لَا يَدْعُوْ اِلَيْهِ دَاعِيْ خَيْرٍ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ قَالُوْا ذٰلِكَ اسْتِهْزَاءً.

৮৭. তারা তাকে উপহাস করে বলল, 'হে শুআয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় আমাদের উপর এই বিষয় চাপাতে যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করত অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ তা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে এবং আমাদের ধনসম্পদে যা খুশি করার অধিকারও ছেড়ে দিতে হবে? অর্থাৎ এই ধরনের হুকুম তো অন্যায়। কল্যাণের পথে আহ্বানকারী কোনো ব্যক্তি এটা আহ্বান জানাতে পারে না। তুমি তো অবশ্যই সহনশীল, সদাচারী। এরা তাকে বিদ্রূপ করে এই কথা বলেছিল।

٨٨. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ط حَلَالًا اَفَاَشُوْبُهُ بِالْحَرَامِ مِنَ الْبَخْسِ وَالتَّطْفِيْفِ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ وَاَذْهَبَ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط فَارْتَكِبَهُ اِنْ مَا اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ لَكُمْ بِالْعَدْلِ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْ قُدْرَتِيْ عَلٰى ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ اَرْجِعُ.

৮৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ হালাল জীবনোপকরণ দান করে থাকেন তবে কি আমি মাপে কম দিয়ে এই হালালের সঙ্গে হারাম মিশ্রিত করব? আমি চাই না যে, তোমাদের বিরোধিতা করব আর যে জিনিস হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতেছি তা নিজে করতে যাব। যতটুকু সম্ভব ন্যায়ের মাধ্যমে আমি কেবল তোমাদের সংশোধন করতে চাই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। اِنْ اُرِيْدُ-এই স্থানে اِنْ শব্দটি নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٩. وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شِقَاقِيْ خِلَافِيْ فَاعِلُ يَجْرِمُ وَالضَّمِيْرُ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ وَالثَّانِيْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط مِنَ الْعَذَابِ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ اَيْ مَنَازِلُهُمْ اَوْ زَمَنُ هَلَاكِهِمْ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ فَاعْتَبِرُوْا.

৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে মতানৈক্য আমার বিরোধিতা কিছুতেই যেন তোমাদেরকে এমন আচরণ না করায় তোমাদেরকে এমন কাজে লিপ্ত না করায় যা দ্বারা নূহ সম্প্রদায় কিংবা সালেহ সম্প্রদায়ের উপর যা অর্থাৎ যে শাস্তি আপতিত হয়েছিল অনুরূপ তোমাদের উপরও আপতিত হবে। আর লূতের সম্প্রদায় তো তাদের আবাসস্থল বা তাদের ধ্বংস কাল তোমাদের হতে দূরে নয়। সুতরাং তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। لَا يَجْرِمَنَّكُمْ -এই স্থানে كُمْ [তোমাদেরকে] সর্বনামটি হলো এই ক্রিয়াটির مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ। شِقَاقِيْ-এটা لَا يَجْرِمُ ক্রিয়ার কর্তা। اَنْ يُّصِيْبَكُمْ-এটা لَا يَجْرِمُ ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ।

٩٠. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَدُوْدٌ مُحِبٌّ لَهُمْ.

৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু প্রেমময়। তাদের প্রতি তিনি ভালোবাসা পোষণকারী।

٩١. قَالُوْا اِيْذَانًا بِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ نَفْهَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ذَلِيْلًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ عَشِيْرَتُكَ لَرَجَمْنٰكَ بِالْحِجَارَةِ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ كَرِيْمٍ عَنِ الرَّجْمِ وَاِنَّمَا رَهْطُكَ هُمُ الْاَعِزَّةُ.

৯১. তার কথার প্রতি নিজেদের অবহেলা ও লক্ষ্য প্রদানের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করে তারা বলল, হে শুআয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না। আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল হেয় দেখতে পাচ্ছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে তোমার গোত্র যদি না থাকত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করতাম। আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও। তুমি এমন কোনো সম্মানী নও যে, প্রস্তরাঘাত করা যাবে না। তোমার গোত্র অবশ্য সম্মানী ও শক্তিশালী। مَا نَفْقَهُ অর্থ আমরা বুঝি না।

٩٢. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط فَتَتْرُكُوْا قَتْلِيْ لِاَجْلِهِمْ وَلَا تَحْفَظُوْنِيْ لِلّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ اَيِ اللّٰهَ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ط مَنْبُوْذًا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ لَا تُرَاقِبُوْنَهُ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ عِلْمًا فَيُجَازِيْكُمْ

৯২. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হলো? এদের কারণে তোমরা আমার হত্যা পরিহার করতেছ? আল্লাহর জন্য তোমরা আমাকে রক্ষা করতেছ না।? তোমরা তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ, তোমাদের পিঠের পিছনে নিক্ষিপ্ত করে রেখেছ। তাঁর খেয়াল তোমরা কর না। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তা তাঁর জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতিফল প্রদান করবেন।

٩٣. وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ط عَلٰى حَالَتِيْ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوْا انْتَظِرُوْا عَاقِبَةَ اَمْرِكُمْ اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ مُنْتَظِرٌ

৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের স্থানে তোমাদের অবস্থায় কাজ কর। আমিও আমার অবস্থায় কাজ করতেছি; তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর। তোমাদের শেষ পরিণামের অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে লক্ষ্য করতেছি। প্রতীক্ষারত আছি। مَنْ -এটা مَوْصُوْلَةٌ বা সংযোজক বিশেষ্য। উপরিউক্ত تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل

٩٤. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ صَاحَ بِهِمْ جِبْرِيْلُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ.

৯৪. যখন এদের ধ্বংস সম্পর্কে আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শুআয়ব ও তার সঙ্গী মু'মিনদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে পাকড়াও করল। হযরত জিবরাঈল (আ.) এই ভীষণ চিৎকার দিয়েছিলেন, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। মরে নতজানু অবস্থায় পড়ে রইল।

٩٥. كَأَنْ مُخَفَّفَةٌ أَيْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيْمُوْا فِيْهَا ط أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ

৯৫. যেন তারা সেথায় কখনও অবস্থান করেনি বসবাস করেনি শোন! ধ্বংসই ছিল মাদয়ানবাসীর পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়! كَأَنْ-এটার أَنْ-টি এইস্থানে مُخَفَّفَه অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে পরিবর্তিত। এটা মূলত ছিল, كَأَنَّ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَدْيَنَ أَيْ أَهْلَ مَدْيَنَ : হযরত শুআয়ব (আ.)-এ সম্প্রদায়েরই একজন সদস্য ছিলেন, যাকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। মাদইয়ান হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক সন্তানের নাম। যিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতূরা-এর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। তার নামেই এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে মাদয়ান বলে। তার মহল رُقُوع عُقْبَه হতে পূর্বে দিকে ছিল। বর্তমানে তাকে مَعَادِنٌ বলে। এই ব্যক্তি ব্যবসায়ী ছিল। মিশর, ফিলিস্তীন এবং লেবাননে ব্যবসা করত।

قَوْلُهُ وُصِفَ الْيَوْمُ بِهِ مَجَازٌ لِوُقُوْعِهِ فِيْهِ : এই ইবারত দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, مُحِيْط হলো عَذَاب- এর সিফত يَوْم-এর নয়। অথচ مُحِيْط-এর ইযাফত يَوْم-এর দিকে হয়েছে। উত্তরের সারকথা হলো এই যে, এতে مَجَازٌ হয়েছে। যেহেতু শাস্তি يَوْم-এর মধ্যে হবে। আর يَوْم টা عَذَاب- এর ظَرْف হবে। মুনাসাবাতের কারণে مَظْرُوْف -এর ইযাফত ظَرْف দিকে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ : এটা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর যে, تَعْثَوْا-এর অর্থ হলো فَسَادٌ আর مُفْسِدِيْنَ-এর অর্থও হলে। কাজেই তাতে تَكْرَارٌ রয়েছে।

উত্তর. হলো এই যে, এটা تَكْرَارٌ নয়; বরং অর্থের হিসেবে তাকিদ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَعْثَوْا : এ শব্দটি عَثْيٌ বা عِثِيٌّ হতে نَهْيٌ- এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ-এর সীগাহ। অর্থ হলো তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।

قَوْلُهُ لِمَعْنَى عَامِلِهَا : অর্থাৎ مُفْسِدِيْنَ স্বীয় আমেল لَا تَعْثَوْا-এর অর্থ থেকে حَالٌ হয়েছে। এবং অর্থ হলো فَسَادٌ

قَوْلُهُ بَقِيَّتُ اللّٰهِ : لِبَنِيْ এটাকে تَائِي مَجْرُوْرَة-এর সাথে আর আবূ আমের কেসায়ী ও বাকূন (র.) تانے مدورة -এর সাথে পড়েছেন। بَقِيَّة অর্থ হলো উদ্বৃত্ত বস্তু। এটা فَعِيْلَة- এর ওজনে হয়েছে صِفَت مُشَبَّه-এর সীগাহ। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ওজন করার পর এবং মানুষের হক আদায় করার পর যা অতিরিক্ত হয়/ বেচে যায়। তা তোমাদের জন্য তা থেকে অনেক গুণে উত্তম যা তোমরা ওজনে কম দিয়ে ও মানুষের হক বিনষ্ট করে সঞ্চয় কর। যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই জীবিকা দান করেন এজন্য بَقِيَّت-এর ইযাফত আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। এখানে আনুগত্য ও সৎ আমল সমূহের অর্থে হয়নি।

قَوْلُهُ بِتَكْلِيْفِنَا : অর্থাৎ بِتَكْلِيْفِكَ إِيَّانَا এখানে بِتَكْلِيْفِنَا উহ্য মেনে মুফাসসির (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এই যে, تَرْك হলো কাফেরদের কর্ম আর أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ-এর মধ্যে مَأْمُوْر হলো হযরত শুআয়ব (আ.)। تَرْك-এর অনুবাদ এই হবে যে, হে শুআয়ব তোমার নামাজ কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমরা মূর্তিদের উপাসনা ছেড়ে দিব, আর এটা সম্ভব নয় যে, تَرْك -এর হুকুম হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর জন্য হবে। আর তার উপর কাফের আমল করবে।

উত্তর. এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো بِتَكْلِيْفِنَا এখন অনুবাদ হবে যে, হে শুআয়ব! তোমার নামাজ তোমাকে এ কথার নির্দেশ দেয় যে, তুমি আমাদেরকে মূর্তিদের উপাসনা পরিহার করতে বাধ্য করবে।

قَوْلُهُ تَتْرُكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, أَنْ تَفْعَلَ টা بِتَاوِيْل مَصْدَرٌ হয়ে مَا-এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ أَفَأَشُوْبُهُ : একে উহ্য করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছ যে, إِنْ شَرْطِيَّه-এর জবাব উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَذْهَبُ : প্রশ্ন. أَذْهَبُ উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. কেননা এখানে أَخَالِفَ-এর সেলাহ إِلَى আনা হয়েছে। অথচ أَخَالِفَ-এর সেলাহ إِلَى আসে না; বরং عَنْ আসে। أَذْهَبُ উহ্য মেনে বলে দিয়েছেন যে, أَخَالِفَ-টা أَذْهَبُ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কাজেই إِلَى সেলাহ নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ ظِهْرِيًّا : এ শব্দের অর্থ হলো পিঠের পেছনে ফেলে রাখা। اَلظِّهْرِيُّ শব্দটি -এর দিকে নিসবত কৃত। আরবের এই অভ্যাস রয়েছে যে, যখন কোনো বস্তুর দিকে নিসবত করে তখন উচ্চারণে পরিবর্তন করে নেয়। কিন্তু তার উপর অন্য শব্দকে কিয়াস করা যায় না। কেননা এই পরিবর্তন কোনো নীতিমালা অনুপাতে হয়নি, বরং এটা غَيْر قِيَاسٌ হয়েছে। যেমন بِصْرِيٌّ [بَ বর্ণে যের সহকারে] বলে থাকেন। অথচ কিয়াস হলো যবর সহকারে হওয়া। এই পদ্ধতিতেই ظِهْرِيٌّ শব্দটিও হয়েছে। অথচ কিয়াসের চাহিদা ছিল ظَا. বর্ণে যবর হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়াইব (আ.) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরি ও শিরকি ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কমেবেশি করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও নাফরমানির উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আজাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আর আমি মাদয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আ.)-কে প্রেরণ করেছি।' মাদয়ান আসলে একটি শহরের নাম। মাদায়ান ইবনে ইবরাহীম (আ.)-এর পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান مُعَانٌ 'মোয়ান' নামক স্থানে তা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু 'মাদয়ান' বলা হতো। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ "তিনি বললেন হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়াইব (আ.) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা তারা ছিল মুশরিক, গাছ-পালার পূজা করত। এজন্যই মাদয়ানবাসীকে 'আসহাবুল আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এহেন কুফরি ও শিরকির সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরি ও শিরকিই সকল পাপের মূল। যে জাতি এতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমেই তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কাজ-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোনো দখল থাকে না। কুরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এর প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরির সাথে সাথে তাদের বদআমলেরও দখল ছিল। এক. হযরত লূত (আ.)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরি ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়. হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কওম। যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার জন্য কুফরি ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ এটা এমন দুই কাজ যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ওজন-পরিমাপে হেরফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন- إِنِّيْ أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভালো ও সচ্ছল দেখছি। তস্করকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করার মতো কোনো কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ

তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোনো সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আজাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আজাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আজাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আজাব হচ্ছে, তোমাদের সচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন "যখন কোনো জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি জনিত শাস্তিতে পতিত করেন।

-ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) উদাত্ত আহ্বান জানালেন يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ "হে আমার জাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিস-পত্রে কম দিও না, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ মানুষের পাওনা ঠিকমতো ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখো তোমাদের উপর কোনো আজাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্বন্ধে রাসূলে কারীম ﷺ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল-আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল, তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলল اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰۤؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ অর্থাৎ আপনার নামাজ কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার পূজা করে আসছে! আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শু'আয়ব (আ.) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামাজ ও নফল ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতিবাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো আপনার নামাজ কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে? [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক]

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোনো দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশি ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিধি -নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোনো কোনো অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কত বড় রূঢ় মন্তব্য করল! কিন্তু হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস-পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেন يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا অর্থাৎ হে আমার জাতি! তোমরা বল তো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিজিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিজিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি বিবেচনা তথা নবুয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মতো অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন, مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাইনা। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল। এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসিহত ও তাবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তাঁর কথায় শ্রোতাদের কোনো ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ "আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বারবার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয়; বরং وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহর সাহায্যে করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।"

নসিহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে সতর্ক করে বললেন وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ অর্থাৎ হে আমার কওম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হূদ কিংবা সালেহ (আ.)-এর কওমের মতো বিপদ ডেকে আনবে না। আর হযরত লূত (আ.)-এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ কওমে লূতের উল্টিয়ে দেওয়া জনপদগুলো মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোনো ব্যাপার নয়। অতএব, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল"আপনার গোষ্ঠি-জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শুআয়ব (আ.) তাদেরকে নসিহত করে বললেন, "তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কোনো কথা মানল না, তখন তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা এখন আজাবের অপেক্ষা করতে থাক।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শুআয়ব (আ.)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেল।

আহকাম ও মাসায়েল : মাপে কম দেওয়া : আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসীদের ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেওয়াকে, আরবিতে যাকে "তাতফীক"বলা হয়। কুরআন করীমের وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে উম্মতের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালিক (র.) তদীয় 'মুয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে -পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে আসলে বোঝানো হয়েছে কারো কোনো ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোনো বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোনো' কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোনো শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজের সুন্নতগুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। [নাঊযুবিল্লাহ মিনহু]

মাস'আসলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শুআয়ব (আ.) তাদেরকে এ কাজ হতেও নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ১৯ পারা, সূরা নমল, ৪৮ নং আয়াত تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, মাদায়ানবাসীরা দিনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো, যাকে কুরআনে কারীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) -এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলীফা দোররা মারা ও মস্তক মুণ্ডন করে শহর প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দিলেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

অনুবাদ :

٩٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ.

৯৬. আমি মূসাকে আমার নির্দেশাবলি ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রকাশ্য ও পরিষ্কার দলিলসহ প্রেরণ করেছিলাম। سُلْطَانٍ -এই স্থানে এটার অর্থ প্রমাণ, দলিল

٩٧. إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ج وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ سَدِيْدٍ.

৯৭. ফেরাউন ও তার দল-বলের নিকট। কিন্তু তারা ফেরাউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করল, আর ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু অর্থাৎ সঠিক ছিল না।

٩٨. يَقْدُمُ يَتَقَدَّمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَتَّبِعُوْنَهٗ كَمَا اتَّبَعُوْهُ فِي الدُّنْيَا فَأَوْرَدَهُمُ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ ط وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ هِيَ.

৯৮. সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগ থাকবে। এরা দুনিয়াতে যেমন তার অনুসরণ করত তেমনি তখনও তার অনুসরণ করবে। সে অনন্তর তাদেরকে জাহান্নামে অবতরণ করাবে। প্রবেশ করাবে। কতই না নিকৃষ্ট অবতরণস্থলে অবতরণ! তা يَقْدُمُ-অর্থ এই স্থানে يَتَقَدَّمُ অগ্রে থাকবে।

٩٩. وَأُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ أَيِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَعْنَةً بِئْسَ الرِّفْدُ الْعَوْنُ الْمَرْفُوْدُ رِفْدُهُمْ

৯৯. এতে এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশপ্ত এবং কিয়ামতের দিনেও হবে অভিশপ্ত। কত নিকৃষ্ট সহযোগিতা, যা তারা লাভ করেছে। তাদের জন্য এই সাহায্য-সহযোগিতা কতই না মন্দ! اَلرِّفْدُ অর্থ সাহায্য।

١٠٠. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْهَا أَيِ الْقُرٰى قَائِمٌ هَلَكَ أَهْلُهٗ دُوْنَهٗ وَّ مِنْهَا حَصِيْدٌ هَلَكَ بِأَهْلِهٖ فَلَا أَثَرَ لَهٗ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ.

১০০. তা অর্থাৎ উল্লিখিত বিবরণসমূহ জনপদসমূহের কিছু সংবাদ হে মুহাম্মদ! যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করতেছি। এগুলোর মধ্যে জনপদ সমূহের মধ্যে কতক এখনও দণ্ডায়মান, বিদ্যমান কিন্তু তার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর কতক নির্মূল হয়েছে। কাস্তে দ্বারা কর্তিত শস্যের মতো অধিবাসীরাসহ বিধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। ذٰلِكَ -এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য مِنْ أَنْبَاءِ -এটা خَبَرٌ বা বিধেয়।

١٠١. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَّلٰكِنْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ فَمَا أَغْنَتْ دَفَعَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهٖ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ط عَذَابُهٗ وَمَا زَادُوْهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا غَيْرَ تَتْبِيْبٍ تَخْسِيْرٍ.

১০১. বিনা অপরাধে ধ্বংস করে আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং শিরক করত তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ অর্থাৎ তাঁর আজাব আসল তখন তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত ইলাহকে ডাকত অর্থাৎ উপাসনা করত তাদের সেই ইলাহগণ তাদের কোনো কাজে আসল না, তারা তাদের হতে আজাব প্রতিহত করল না। এই সমস্ত উপাসনা ধ্বংস ব্যতীত তাদের জন্য আর কিছুই বৃদ্ধি করল না। تَتْبِيْبٍ -অর্থ ধ্বংস, ক্ষতি।

١٠٢. وَكَذٰلِكَ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاَخْذِ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى اُرِيْدَ اَهْلُهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ بِالذُّنُوْبِ اَىْ فَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِنْ اَخْذِهِ شَيْءٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ ﷺ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ (الْاٰيَةَ)

১০২. এরূপই এই ধরনের পাকড়াও করার মতো তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন, যখন তারা পাপে লিপ্ত হয়ে সীমালঙ্ঘনকারীরূপে পরিগণিত হয়। তাঁর পাকড়াও হতে কোনো কিছুই আর তাদের বাঁচাতে পারে না। শায়খান অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমকে প্রথম অবকাশ দেন। পরে তাকে যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর রাসূল ﷺ তেলাওয়াত করলেন وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ

١٠٣. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْقِصَصِ لَاٰيَةً لَعِبْرَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ط ذٰلِكَ اَىْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ فِيْهِ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ يَشْهَدُهٗ جَمِيْعُ الْخَلَائِقِ

১০৩. নিশ্চয় এতে উল্লিখিত কাহিনীসমূহে নিদর্শন অর্থাৎ শিক্ষা বিদ্যমান যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য। তা অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঐদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। তা সেই দিন যেদিন সকলকেই হাজির করা হবে। সকল সৃষ্টি সেই দিন গিয়ে হাজির হবে। مَجْمُوْعٌ لَّهُ -এই স্থানে لَهُ [যার জন্য] শব্দটি فِيْهِ [যাতে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাফসীরে فِيْهِ উল্লেখ করা হয়েছে।

١٠٤. وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ لِوَقْتٍ مَعْلُوْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ

১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য তা স্থগিত রাখব।

١٠٥. يَوْمَ يَاْتِ ذٰلِكَ الْيَوْمُ لَا تَكَلَّمُ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ تَعَالٰى فَمِنْهُمْ اَىِ الْخَلْقِ شَقِىٌّ وَّ مِنْهُمْ سَعِيْدٌ كُتِبَ كُلُّ ذٰلِكَ فِى الْاَزَلِ

১০৫. যখন আসবে ঐ দিন তখন তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না; তাদের মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে অনেকে হতভাগ্য এবং তাদের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যশালী। আদিতেই এই সব কিছু তাদের জন্য লিখে রাখা হয়েছে। تَكَلَّمُ -এতে একটি ت উহ্য রয়েছে। মূলত ছিল تَتَكَلَّمُ।

١٠٦. فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فِىْ عِلْمِهٖ تَعَالٰى فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ صَوْتٌ شَدِيْدٌ وَّشَهِيْقٌ صَوْتٌ ضَعِيْفٌ

১০৬. অনন্তর যারা আল্লাহর জ্ঞানে হতভাগ্য তারা থাকবে জাহান্নামে। সেথায় তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। زَفِيْرٌ -ভীষণ চিৎকার। شَهِيْقٌ - দুর্বল আওয়াজ।

١٠٧. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اَىْ مُدَّةَ دَوَامِهِمَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط مِنَ الزِّيَادَةِ عَلٰى مُدَّتِهِمَا مِمَّا لَا مُنْتَهٰى لَهٗ وَالْمَعْنٰى خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ .

১০৭. সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, অর্থাৎ দুনিয়ায় এই উভয়ের যতদিন স্থায়িত্ব ছিল সেই মুদ্দত তারা থাকবে যদি না তোমার প্রভু অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ সীমাহীন সময়ের জন্য তিনি এই মুদ্দত বাড়াতে ইচ্ছা করেন। তখন চিরকালের জন্য তারা তাতে স্থায়ী হবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা করেন। اِلَّا -এটা এই স্থানে حَرْف اِسْتِثْنَاء হিসাবে নয়; বরং غَيْر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٨. وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ ط كَمَال تَقَدَّمَ وَدَلَّ عَلَيْهِ فِيْهِمْ قَوْلُهٗ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ مَقْطُوْعٍ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّاوِيْلِ هُوَ الَّذِىْ ظَهَرَ لِىْ وَهُوَ خَالٍ عَنِ التَّكَلُّفِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ .

১০৮. এবং যারা ভাগ্যবান তারা জান্নাতে থাকবে; সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। পূর্ববর্তী আয়াতটিতে এটার যে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে এই স্থানেও অদ্রূপ অর্থ হবে। এই স্থানের বেলায় পরবর্তী বাক্যটি উক্ত অর্থের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ। ইরশাদ হচ্ছে– এটা এক নিরবচ্ছিন্ন দান। এই আয়াতটির উল্লিখিত মর্মই আমার নিকট অধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। এটা تَكَلُّفْ বা কষ্ট কল্পনা হতে মুক্ত। আল্লাহ এটার মর্ম সম্পর্কে অবহিত। سُعِدُوْا -এটার س অক্ষরটি ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। اِلَّا এটা এই স্থানে حَرْف اِسْتِثْنَاء হিসাবে নয়; বরং غَيْر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غَيْرَ مَجْذُوْذٍ - অর্থ নিরবচ্ছিন্ন।

١٠٩. فَلَا تَكُ يَا مُحَمَّدُ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ مِنَ الْاَصْنَامِ اِنَّا نُعَذِّبُهُمْ كَمَا عَذَّبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ اَىْ كَعِبَادَتِهِمْ مِّنْ قَبْلُ وَقَدْ عَذَّبْنَاهُمْ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ مِثْلَهُمْ نَصِيْبَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ اَىْ تَامًّا .

১০৯. সুতরাং হে মুহাম্মদ! তারা যাদের উপাসনা করে অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ তাদের সম্পর্কে সংশয়ে সন্দেহে থেকো না তাদের পূর্ববর্তীদের যেমন আমি শাস্তি প্রদান করেছি। তাদেরকেও নিশ্চয় শাস্তি প্রদান করব। এই বক্তব্যটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ। পূর্বে এদের পিতৃপুরুষরা যেমন উপাসনা করত তারাও তদ্রূপ উপাসনা করে তাদের ন্যায়ই এদের এই উপাসনা। আর তাদেরকেও আমি শাস্তি দান করেছি। আর নিশ্চয় আমি তাদের মতো এদেরকেও এদের প্রাপ্য অর্থাৎ আজাবের হিস্যা পুরোপুরি দিব কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। অর্থাৎ পরিপূর্ণ হিস্যা তারা পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِيْنٍ : اٰيٰتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত। আর سُلْطَانٍ مُبِيْنٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোজেজা সমূহ। [ফাতহুলকাদীর]

قَوْلُهُ اَلْمَرْفُوْدُ : এর অর্থ হলো -দান, পুরস্কার, সাহায্য, সহযোগিতা, সাহায্যকৃত। লা'নত বা ভর্ৎসনাকে বিদ্রূপভাবে مَرْفُوْد বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْوِرْدُ : এর অর্থ হলো অবতরণ স্থল, ঘাট।

قَوْلُهُ مِنْهَا : আল্লামা সুয়ূতী (র.) مِنْهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, حَصِيْدٌ-এর আতফ হয়েছে قَائِمٌ-এর উপর خَبَر مُقَدَّم হলো مِنْهَا আর مُبْتَدَأ مُؤَخَّر হলো حَصِيْدٌ

قَوْلُهُ حَصِيْدٌ : এটা صِفَت مُشَبَّه ওযনে فَعِيْلٌ মাফউল مَفْعُوْل অর্থে, অর্থ হলো কর্তিত ক্ষেত।

قَوْلُهُ يُفْلِتَهُ : এটা বাবে اِفْعَال হতে অর্থ হলো ছেড়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ فِيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে لَهُ-এর মধ্যে لَامْ টা فِيْ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ يَشْهَدُهُ : এর অর্থ হলো- يَشْهَدُ فِيْهِ

قَوْلُهُ غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ : এর মধ্যে اِلَّا টা غَيْرَ অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন. اِلَّا কে غَيْرَ অর্থে নেওয়ার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত? এটা একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো- اِلَّا-এর মাধ্যমে যদি خُلُوْد থেকে اِسْتِثْنَاء হয় যেমনটি কেউ কেউ করেছেন, তাহলে এটা কাফেরদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী না হওয়াকে বুঝাবে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। আর যদি فِى النَّار حُكْم اَصْلِيْ থেকে اِسْتِثْنَاء করা হয় যা হলো আল্লাহর বাণী তখন তা হতে এটা এটা বুঝা যায় যে, কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কোনো কোনো সময় জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে, অথচ এটাও বাস্তবতার পরিপন্থি।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, اِلَّا টা غَيْرَ অর্থে হয়েছে। আর এটা আরবদের সেই উক্তির মতো যে, عَلَيَّ اَلْفٌ اِلَّا اَلْفَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ অর্থাৎ আমার উপর অমুক ব্যক্তির এক হাজার রয়েছে পূর্বের দুই হাজারের সাথে অর্থাৎ এক হাজার দু হাজারের সাথে মিলে তিন হাজার। সে সময় আয়াতের অর্থ হবে-

اِنَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُدَّةَ دَوَامِ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ فِى الدُّنْيَا مَعَ الزِّيَادَةِ الَّتِىْ لَا اٰخِرَ لَهَا عَلٰى مُدَّةِ بَقَاءِ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ

قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلٰى مُدَّتِهِمَا مِمَّا لَا مُنْتَهٰى لَهُ : অর্থাৎ পূর্বে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটাই এখানে হবে।

قَوْلُهُ اِنَّا نُعَذِّبُهُمْ الخ : এটি সেই প্রশ্নের উত্তর যে, شَكٌّ টা حُكْم-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর مِرْيَةٍ এটা হুকুম নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, اَىْ لَا تَكُ اَىْ مُحَمَّدُ فِىْ مِرْيَةٍ اِنَّا نُعَذِّبُهُمْ الخ

قَوْلُهُ كَعِبَادَتِهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا يَعْبُدُوْنَ-এর মধ্যে مَا টা হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ এ সকল লোকেরা তাদের পূর্ব পুরুষদের ন্যায় উপাসনা করে।

قَوْلُهُ تَامًّا : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কোনো সময় كُلّ বলে بَعْض উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে বিষয়টি এরূপ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُبِيْنٍ : আর আমি মূসাকে প্রেরণ করি আমার নিদর্শন সমূহ এবং প্রকাশ্য সনদসহ। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.) -এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। এ পর্যায়ের এটি হলো সপ্তম ঘটনা এবং এ সূরায় বর্ণিত সর্বশেষ ঘটনা। এ ঘটনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মোকাবিলায় কোনো রাজশক্তি, ধন-শক্তি, জনশক্তি এককথায় কোনো কিছুই কাজে আসেনা। এ সত্য উপলব্ধি করার জন্য আলোচ্য ঘটনার অবতারণা।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى : আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে অনেক নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়ে ফেরাউন এবং তার দলবলের নিকট প্রেরণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে নিদর্শন বলতে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর মোজেজা সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হলো তাঁর লাঠি। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সম্ভবত হযরত মূসা (আ.) -এর লাঠির এ মোজেজাকেই سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা ফেরাউনের সম্মুখে হযরত মূসা (আ.) তাওহীদের যে দলিল উপস্থিত করেছেন, তা উদ্দেশ্য হতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ -এর ব্যাখ্যা করেছেন, এর অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর প্রাধান্য। কেননা হযরত মূসা (আ.) একা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল ফেরাউন ও তার বিরাট সৈন্য বাহিনী। হযরত মূসা (আ.)-কে তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করেছেন এবং হযরত মূসা (আ.)-কে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন। ফেরাউন এবং তার দলবলকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে চিরতরে ধ্বংস করেছেন।

قَوْلُهُ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ : হযরত মূসা (আ.) -এর মোজেজা সত্ত্বেও ফেরাউন তার দলবল তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি; বরং তারা ফেরাউনের অনুসরণই করে অথচ ফেরাউনের মত এবং তার বিধি-নিষেধ সঠিক ছিলনা। তার নাফরমানি চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। এ আয়াতে ফেরাউনের দলবলের পথভ্রষ্টতার এবং মূর্খতার কথা বলা হয়েছে। ফেরাউন তাদের মতো একজন সাধারণ মানুষই ছিল। অন্যায় অনাচারে, কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। এমনকি, সে খোদায়ী দাবি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার মূর্খ সম্প্রদায় তারই অনুসরণ করতো।

পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী, সত্যের আহ্বায়ক, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন, সর্বক্ষণ সাধনারত, আল্লাহ তাঁকে অনেক বিস্ময়কর মোজেজা দান করেছেন, তাঁর মোকাবিলায় দুরাত্মা ফেরাউনের সকল চক্রান্ত, সকল শক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও দুর্ভাগা ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ করেনি।

قَوْلُهُ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ : সে তাদেরকে দোজখে পৌছিয়ে দেবে এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, কাফেরদেরকে দোজখে পৌছাবার ব্যাপারে যে, ঘোষণা রয়েছে, তার বর্ণনার জন্যে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা অতীত কাল বোঝায়। [অর্থাৎ সে তাদেরকে দোজখে পৌছে দিয়েছে।]

তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু দোজখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত এবং নিশ্চিত, তাই যে, তারা দোজখে পৌছে গেছে, এজন্যে অতীত অর্থের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ : আর দোজখ অত্যন্ত মন্দ এবং নিকৃষ্ট স্থান যেখানে তারা পৌছেছে, সেখানে ঠাণ্ডা পানির স্থলে তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন পূর্ববর্তী একটি আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন। وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ "আর ফেরাউনের মত সঠিক ছিল একটি দাবি। আর আলোচ্য আয়াত হলো এ দাবির দলিল। এ মর্মে যে, ফেরাউনের কুফরি নাফরমানির কারণেই সে অভিশপ্ত এবং ধ্বংস হয়েছে। আর তার এ অন্যায়ের কারণেই সে তার দলবলসহ দোজখে যাবে।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তার নেতৃত্বই ছিল ধ্বংসাত্মক এবং বিপজ্জনক। এজন্যে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন সে কাজই শুভ এবং পছন্দনীয় যার পরিণাম শুভ হয়, সে সম্পর্কে رَشِيْد শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. - পৃ. -৬

ইমাম তাবারী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, اَلْوِرْدُ শব্দটি পবিত্র কুরআনের চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. সূরায়ে হুদে بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ
২. সূরায়ে মারয়ামে وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا
৩. সূরায়ে আম্বিয়ায় اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ
৪. পুনরায় সূরায়ে মারয়ামে وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

اَلْوِرْدُ শব্দটির অর্থ হলো প্রবেশ করা। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. -৬, পৃ. -৮৬]

قَوْلُهُ وَاتْبِعُوا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ : ফেরাউন ও তার দলবলের উপর দুনিয়াতেও লানত এবং আখেরাতেও লানত, দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং মুমিনগণ এই জালেম ফেরাউন এবং তার দলবলের উপর লানত দিয়েছেন, ঠিক এমনিভাবে আখেরাতেও তাদের প্রতি লানত দেওয়া হবে। তাদের অন্যায়, অনাচার, কুফরি এবং নাফরমানির কারণে আল্লাহ পাকের লানত এবং ফেরেশতাদের লানত দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে হতে থাকবে, তারা চির অভিশপ্ত, এ লানত থেকে তাদের রেহাই নেই কোনোদিনও।

قَوْلُهُ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ : "অত্যন্ত মন্দ পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।"

رِفْد শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. সাহায্য, দুই. পুরস্কার। বিখ্যাত আরবি অভিধান গ্রন্থ, কামূসে, আলোচ্য শব্দটির এ দু'টি অর্থই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অতএব, বাক্যটির অর্থ "হলো অত্যন্ত মন্দ পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে"। আর এ কথার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়। ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহিনী নিয়ে যেভাবে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটি বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা, আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে কঠিন কঠোর শাস্তি।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ : প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : [হে রাসূল!] এ হলো উক্ত জনপদ গুলোর কিছু ঘটনা, যা আপনার নিকট বর্ণনা করছি।

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদের সাথে শত্রুতা করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায় বর্ণিত ঘটনাবলিতে। ইতিপূর্বে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে কাফেররা যে আচরণ করেছে তার ভয়ঙ্কর পরিণাম লক্ষ্য করা যায় আলোচ্য আয়াত সমূহে। এর দ্বারা একদিকে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এই মর্মে যে, [হে রাসূল!] মক্কাবাসী কাফেররা আপনার সাথে যে আচরণ করেছে তা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গেও এমনি কষ্টদায়ক ব্যবহার করা হয়েছে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : দ্বিতীয়ত : এর দ্বারা এই উম্মতের কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাথে তাদের অন্যায় আচরণ পরিহার না করে তবে তাদের পরিণামও হবে ভয়াবহ।

قَوْلُهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ : হাশরের ময়দানে হতভাগ্য এবং ভাগ্যবান উভয় প্রকার লোকই থাকবে। যার জন্যে বদনসিবী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে বদনসিবই হবে। আর যার জন্যে সৌভাগ্য লেখা হয়েছে, সে ভাগ্যবানই হবে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিভ আছে তিনি বলেন, আমি একটি জানাযার সঙ্গে বাকীতে [মদীনা শরীফের কবরস্থান] পৌঁছি। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ [একটি ছড়ি হাতে করে] আগমন করেন। তিনি সেখানে উপবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ ছড়ি দ্বারা মাটিতে দাগ দিতে থাকেন, এরপর তিনি ইরশাদ করলেন, এমন কোনো প্রাণ নেই যার নাম জান্নাত বা দোজখে লিপিবদ্ধ রয়নি, তার ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ রয়নি। একথা শ্রবণ করে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তাহলে আমরা তকদীরের উপর ভরসা রাখি না কেন এবং আমল বর্জন করিনা কেন? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা আমল করে যাও, প্রত্যেককেই তার তকদীর অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেওয়া হয়। যে হতভাগা হবে, তাকে সে অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেওয়া হয়। যে ভাগ্যবান হবে তাকে ভাগ্যবানের আমলের তৌফিক দেওয়া হবে। এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى তেলাওয়াত করেন।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. -৬, পৃ. -৮৯; বুখারী, মুসলিম]

قَوْلُهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ : অতএব, যারা হতভাগা হবে তারা দোজখে যাবে, সেখানে তারা চিৎকার এবং আর্তনাদ করতে থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, زَفِيْر শব্দটির অর্থ হলো অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা। আর شَهِيْق অর্থ হলো নিম্নস্বরে চিৎকার।

তাফসীরকার যাহহাক এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, গাধার চিৎকারের প্রাথমিক অবস্থাকে زَفِيْر বলা হয়। আর এ আওয়াজের শেষ অবস্থাকে شَهِيْق বলা হয়। আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামূসেও আলোচ্য দু'টি শব্দের এ ব্যাখ্যাই লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاۤءَ رَبُّكَ : দোজখীরা তাতে চিরদিন থাকবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আসমান জমিন দুনিয়াতে রয়েছে আর কিয়ামতের পূর্বে আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে। [তবে যতদিন আসমান জমিন থাকবে] এর তাৎপর্য কি?

তাফসীরকার এর দু'টি জবাব দিয়েছেন। এক. যাহহাক (র.) বলেছেন, জান্নাত এবং দোজখেরও আসমান জমিন থাকবে। মূলত যা মাথার উপর থাকে তাইতো আসমান। আর যার উপর মানুষ পা রাখে তারই নাম জমিন। আর একথা অনস্বীকার্য যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে। তা কোনো স্থানে অবশ্যই হবে এবং পায়ের নীচেও কোনো জিনিস থাকবে। আর মাথার উপরও কিছু থাকবে।

দুই. অর্থাৎ যতদিন আসমান জমিন টিকে থাকবে। আরবের লোকেরা অনন্তকাল বুঝানোর জন্যে এ বাক্যটি ব্যবহার করে। আলোচ্য আয়াতেও বাক্যটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আর যদি এর দ্বারা আখেরাতের আসমান জমিন উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা আরো জোরদার হয়। কেননা আখেরাতের আসমান জমিন পৃথিবীর আসমান জমিন থেকে হবে স্বতন্ত্র।

ভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের কথা : আলোচ্য আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, পৃথিবীতে সব যুগেই এবং সকল দেশেই দু'দল লোক বাস করে। একদলকে পবিত্র কুরআন ভাগ্যবান বলেছে, অন্য দলকে হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়েছে। উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে, যার সারমর্ম হলো ভাগ্যবান হলো সে সব লোক যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং বিশ্বাস করে নবী রাসূলগণের প্রতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, অনুরক্তি রাখে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান না আনে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারাই হতভাগা বা বদনসীব। উভয় দলের পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এক দল চির সুখী হবে আর একদল হবে চির দুঃখী। ইমাম বলখী (র.) উভয় দলের পাঁচটি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন

ভাগ্যবানদের বৈশিষ্ট্য : ভাগ্যবানদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য :

১. তাদের অন্তর বিনম্র হয়।
২. আল্লাহর ভয়ে তারা কাঁদতে থাকে।
৩. দুনিয়ার জীবনে দীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে না।
৪. দুনিয়ার প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়না।
৫. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারা লজ্জিত থাকে।

হতভাগ্যদের পাঁচটি আলামত :

১. তাদের অন্তর হয় কঠিন কঠোর।
২. নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়না।
৩. দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে অধিকতর।
৪. তারা সুদীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।
৫. তারা নির্লজ্জ হয়। -[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. -৩. পৃ. -৫৭৪]

অনুবাদ:

১১০. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرَاةَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ كَالْقُرْاٰنِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاْخِيْرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَاِنَّهُمْ اَىِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِهٖ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ مَوْقِعُ الرِّيْبَةِ .

১১০. আমি মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত দিয়েছিলাম; অতঃপর এতে আল কুরআনের মতোই স্বীকার করা না করার বিষয়ে মতভেদ ঘটে। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সকল সৃষ্টির হিসাব-কিতাব ও প্রতিদান প্রদান বিলম্বিত করা সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছে দুনিয়াতেই সেই বিষয়ের মীমাংসা করে দেওয়া হতো। অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা অবশ্যই এটার সম্বন্ধে সংশয়কর সন্দেহে বিদ্যমান। مُرِيْبٍ -অর্থ সংশয়কর।

১১১. وَاِنَّ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كُلًّا اَىْ كُلُّ الْخَلَائِقِ لَّمَّا مَا زَائِدَةٌ وَاللَّامُ مُوَطِّئَةٌ لِقَسَمٍ مُقَدَّرٍ اَوْ فَارِقَةٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ لَمَّا بِمَعْنٰى اِلَّا فَاِنْ نَافِيَةٌ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ط اَىْ جَزَاءَهَا اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ عَالِمٌ بِبَوَاطِنِهٖ كَظَوَاهِرِهٖ .

১১১. নিশ্চয় প্রত্যেককে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রত্যেককে তোমার প্রতিপালক তাদের কাজ অর্থাৎ কাজের বিনিময় পুরোপুরি দিবেন। তারা যা করে তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত। অর্থাৎ বাহ্যিক দিকের মতো তার আভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কেও তিনি অবহিত। اِنَّ-এটার ن অক্ষরটি এই স্থানে তাশদীদ ও তাখফীক [তাশদীদ ব্যতীত] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। لَمَّا -এটার مَا -টি এই স্থানে زَائِدَة বা অতিরিক্ত। আর ل-টি হলো قَسَم مُقَدَّرٌ বা উহ্য কসমের অর্থদানকারী শব্দ। কিংবা এটা না বোধক اِنْ ও তাকীদবাচক اِنَّ-এর মধ্যে فَارِقَة বা পার্থক্যকারীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে م -এ তাশদীদসহ لَمَّا রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা اِلَّا অর্থে ব্যবহৃত বলে এবং উল্লিখিত اِنْ শব্দটি نَافِيَة বা নাবোধক বলে গণ্য হবে।

১১২. فَاسْتَقِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِاَمْرِ رَبِّكَ وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ كَمَا اُمِرْتَ وَلْيَسْتَقِمْ مَنْ تَابَ اٰمَنَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا تَجَاوَزُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

১১২. সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশ মতো কাজে ও তাঁর প্রতি দোয়া যেভাবে আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে স্থির থাকো। আর তোমার সাথে যারা তওবা করেছে অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তারাও যেন তাতে স্থির থাকে। এবং অবাধ্য হয়োনা, আল্লাহর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কর তিনি নিশ্চয় তা দেখেন অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় প্রদান করবেন।

١١٣. وَلَا تَرْكَنُوْٓا تَمِيْلُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِمَوَادَّةٍ اَوْ مُدَاهَنَةٍ اَوْ رِضًى بِاَعْمَالِهِمْ فَتَمَسَّكُمُ تُصِيْبَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ زَائِدَةٌ اَوْلِيَاۤءَ يَحْفَظُوْنَكَ مِنْهُ ثُمَّ لَا تُبْصَرُوْنَ تُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِهٖ .

১১৩. যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করত বা শিথিলতা প্রদর্শন করত বা তাদের কার্যকলাপে সন্তুষ্টি প্রকাশ করত ঝুঁকে পড়িও না। অনুরক্ত হয়ে যেয়োনা। পড়লে, অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে তা তোমাদের শরীরে লাগবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, যে তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবে। অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না, অর্থাৎ তোমাদের হতে তার আজাব প্রতিহত করা হবে না। مِنْ اَوْلِيَاۤءَ -এই স্থানে مِنْ টি زَائِدَه বা অতিরিক্ত।

١١٤. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اَيِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَزُلَفًا جَمْعُ زُلْفَةٍ اَىْ طَائِفَةٍ مِّنَ الَّيْلِ اَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط الذُّنُوْبَ الصَّغَائِرَ نَزَلَتْ فِيْمَنْ قَبَّلَ اَجْنَبِيَّةً فَاَخْبَرَهٗ ﷺ فَقَالَ اَلِىْ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِىْ كُلِّهِمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ عِظَةٌ لِلْمُتَّعِظِيْنَ .

১১৪. আর তোমরা সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্ত ভাগে ভোরে এবং বিকালে অর্থাৎ ফজর, জোহর ও আসর এবং রজনীর একাংশে অর্থাৎ মাগরিব ও এশা। নিশ্চয় সৎকর্ম যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অসৎকর্ম অর্থাৎ ছোট পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। এটা স্মরণকারীদের জন্য একটি স্মরণিকা। অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। শায়খান অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো এক অপরিচিতা মহিলাকে চুম্বন করেছিল। সে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি বিবৃত করে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। ঐ ব্যক্তি তখন বলল, এটা কি কেবল আমার জন্যই? রাসূল ﷺ বললেন, এটা আমার উম্মতের সকলের জন্য। زُلَفًا-এটা زُلْفَةٌ-এর বহুবচন ; অর্থ এক অংশ।

١١٥. وَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى اَذٰى قَوْمِكَ اَوْ عَلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ .

১১৫. হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের সামনে বা সালাত পালনের ক্ষেত্রে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ বন্দেগী পালনে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সৎকর্মশীলদের শ্রম-ফল নষ্ট করেন না।

١١٦. فَلَوْلَا فَهَلَّا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ اَصْحَابُ دِيْنٍ وَفَضْلٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اَلْمُرَادُ بِهِ النَّفْىُ اَىْ مَا كَانَ فِيْهِمْ ذٰلِكَ . اِلَّا لٰكِنْ قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج نُهُوْا فَنَجَوْا وَمِنْ لِلْبَيَانِ

১১৬. তোমাদের পূর্বযুগে অতীত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অল্প কতক জনই সজ্জন ছিল যাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। তারা এ ধরনের নিষেধ করত বলে রক্ষা পেয়েছিল। فَلَوْلَا -এটা এই স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা এই স্থানে না বোধক; অর্থ তাদের মধ্যে উক্তরূপ [সজ্জন] ছিল না কিন্তু মাত্র কতকজন। اُولُوْ بَقِيَّةٍ-অর্থ দীনদার ও মর্যাদার অধিকারীগণ, সজ্জন। اِلَّا-এটা এই স্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِمَّنْ-এটার مِنْ টি بَيَانِيَة বা বিবরণমূলক

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْفَسَادِ اَوْ تَرْكِ النَّهْيِ مَآ اُتْرِفُوْا نُعِمُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ

বিপর্যয় ঘটিয়ে ও নিষেধ করা বর্জন করে যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তারা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান ভোগ-বিলাস বিদ্যমান তারই অনুসরণ করত। আর তারা ছিল অপরাধী।

١١٧. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ مِنْهُ لَهَا وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ

১১৭. আল্লাহর নিজের তরফ হতে অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস তোমার প্রতিপালকের কাজ নয় যখন হয় তার অধিবাসীরা শুদ্ধাচারী অর্থাৎ বিশ্বাসী।

١١٨. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَهْلَ دِيْنٍ وَاحِدٍ وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ فِي الدِّيْنِ

১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতেন। অর্থাৎ একই ধর্মের অনুসারী করতেন। কিন্তু ধর্মের বিষয়ে তারা মতভেদ করতে থাকবেই।

١١٩. اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط اَرَادَ لَهُمُ الْخَيْرَ فَلَا يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط اَيْ اَهْلَ الْاِخْتِلَافِ لَهٗ وَاَهْلَ الرَّحْمَةِ لَهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَهِيَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الْجِنِّ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

১১৯. তবে যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করবেন অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তিনি শুভতার ইচ্ছা করেছেন তারা এই সম্পর্কে মতভেদ করবেন না। আর তিনি তাদেরকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মতভেদকারীদেরকে মতভেদ করার জন্য আর দয়া পাওয়ার অধিকারীদের দয়া লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আর তা হলো আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।

١٢٠. وَكُلًّا نَّصْبٌ بِنَقُصُّ وَتَنْوِيْنُهٗ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ اَيْ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا بَدَلٌ مِنْ كُلًّا نُثَبِّتُ نُطَمْئِنُ بِهٖ فُؤَادَكَ قَلْبَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْاَنْبَاءِ اَوِ الْاٰيَاتِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاِنْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ

১২০. যতটুকু প্রয়োজন সেই অনুসারে রাসূলদের সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করতেছি যা দ্বারা আমি তোমার চিত্ত দৃঢ় করি, প্রশান্ত ও সুস্থির করি। এতে অর্থাৎ এই বৃত্তান্ত ও নিদর্শনের মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য আর মুমিনদের জন্য রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা। যেহেতু এটা দ্বারা মু'মিনরাই বিশেষ করে উপকৃত হয়; পক্ষান্তরে কাফেরগণ তদ্রূপ নয়; সেহেতু এই স্থানে বিশেষ করে তাদেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। كُلًّا-এটা نَقُصُّ ক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্থানে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটার تَنْوِيْن [তানবীন]-টি مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল كُلَّ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ যতটুকু প্রয়োজন তার সকল কিছু। مَا نُثَبِّتُ -এই স্থানে مَا-টি উপরোল্লিখিত كُلًّا-এর بَدَلٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। فُؤَادَكَ : তোমার হৃদয়, চিত্ত।

١٢١. وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنَّا عٰمِلُوْنَ عَلٰى حَالَتِنَا تَهْدِيْدٌ لَهُمْ

১২১. যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বল, তোমরা তোমাদের স্থানে অর্থাৎ তোমাদের অবস্থায় কাজ কর। আমরাও আমাদের অবস্থায় কাজ করেতেছি। এই আয়াতটি তাদের প্রতি হুমকিমূলক।

١٢٢. وَانْتَظِرُوْا ج عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ذٰلِكَ

১২২. এবং তোমরা তোমাদের পরিণামের অপেক্ষা কর আমরাও তার অপেক্ষা করতেছি।

١٢٣. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ عِلْمَ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ يَعُوْدُ وَلِلْمَفْعُوْلِ يُرَدُّ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ عَصٰى فَاعْبُدْهُ وَحْدَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط ثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِيْكَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِوَقْتِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ অর্থাৎ এই গুলিতে যা অদৃশ্য সেইসব কিছুর জ্ঞান আল্লাহরই তাঁরই নিকট সকল বিষয় প্রত্যানীত হবে। অনন্তর যারা অবাধ্যতা করত তাদের নিকট হতে তিনি বদলা নিবেন। সুতারং তাঁর ইবাদত কর, তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর এবং তাঁর উপরই নির্ভর কর. ভরসা রাখ কারণ তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। নির্ধারিত সময়ের জন্য তিনি তাদের [শাস্তি] স্থগিত করে রেখেছেন মাত্র। يُرْجَعُ-এটা بِنَاءً لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যরূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে ফিরে আসবে। আর بِنَاءً لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ কর্মবাচ্যরূপেও পঠিত রয়েছে। তখন অর্থ হবে প্রত্যানীত হবে। يَعْمَلُوْنَ-এই ক্রিয়াটি ت সহ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন রূপেও পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَإِنَّ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كُلًّا أَيْ كُلَّ الْخَلَائِقِ لَمَّا : এখানে إِنَّ-এবং لَمَّا-এর মধ্যে সর্বমোট চারটি কেরাত রয়েছে।

১. إِنْ এবং لَمَا উভয়টি مُخَفَّفْ হবে।
২. إِنَّ এবং لَمَّا উভয়টি مُشَدَّدْ হবে।
৩. إِنَّ টা مُشَدَّدَه আর لَمَا টা مُخَفَّفَة হবে।
৪. إِنْ টা مُخَفَّفَة আর لَمَّا টা مُشَدَّدَه হবে।

আর এই চারটি কেরাতই মুতাওয়াতির। এই চারটি কেরাতেই كُلًّا টা إِنَّ-এর إِسْم হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর لَيُوَفِّيَنَّهُمْ الخ হবে خَبَرْ-এর لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ তথা جُمْلَه قَسَمِيَّه আর لَمَّا টা مُشَدَّدْ হওয়ার সুরতে জুমলা হয়ে إِنَّ-এর খবর হবে।

قَوْلُهُ الْخَلَائِق : এখানে خَلَائِق শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন كُلٌّ-এর তানভীনটা مُضَافْ إِلَيْه-এর পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا زَائِدَةٌ : لَمَّا টা مُخَفَّفَه হওয়ার সুরতে مَا টা অতিরিক্ত। যদি مَازَائِدَه-কে উহ্য করে দেওয়া হয় তবে এ শব্দের উপর দুই لَامْ অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক হবে। যা কঠিন্যতার কারণ হবে। আর উহ্য ইবারত হবে لَلَيُوَفِّيَنَّهُمْ

قَوْلُهُ وَالَّا لَامُ مُوَطِّئَةٌ لِقَسَمٍ مُقَدَّرٍ : অর্থাৎ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-এর মধ্যে لَامْ টা قَسَم উহ্য হওয়ার উপর বুঝাবে। অর্থাৎ এ কথাকে বুঝাবে যে, قَسَمْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ فَارِقَةٌ : অর্থাৎ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-এর لَامْ টা হলো فَارِقَه-এর মাধ্যমে لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-এর لَامْ-এর ব্যাপারে দ্বিতীয় মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। لَام فَارِقَة-এর অর্থ হলো إِنْ مُخَفَّفَة এবং إِنْ نَافِيَه-এর মাঝে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ যদি خَبَرْ-এর উপর لَامْ প্রবেশ করে তবে এর দ্বারা জানা যাবে যে, এটা إِنْ مُخَفَّفَة عَنِ الْمُثَقَّلَةِ হয়েছে।

সতর্কীকরণ : এটা স্মরণযোগ্য যে, لَام فَارِقَه টা إِنْ مُخَفَّفَة-এর خَبَرْ-এর উপর সেই সময় প্রবেশ করে যখন إِنْ مُخَفَّفَه কে আমল করা হতে বিরত রাখা- হয়। অর্থাৎ [إِهْمَالْ-এর সুরতে] যেমন إِنْ زَيْدٌ لَقَائِمٌ আর যদি إِنْ زَيْدًا لَقَائِمٌ পড়ে তবে

اِلْتِبَاسٌ [মিলে যাওয়ার ভয়] না হওয়ার কারণে لَامٌ فَارِقَة -এর প্রয়োজন হবে না। আয়াতে اِنَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ -এর মধ্যে যেহেতু اِنَّ টা عَامِلَه হয়েছে। কাজেই এখানে لَامٌ فَارِقَة বলা ঠিক হবে না। কেননা اِنْ نَافِيَه এবং مُخَفَّفَة -এর মধ্যে সে সময়েই اِلْتِبَاسٌ হয় যখন তাকে আমল করা থেকে বিরত রাখা হয়। আবার কেউ কেউ উল্লিখিত ইবারতের এই অর্থও করেছেন যে, لَامٌ موطبه -এর সম্পর্ক اِنَّ مُشَدَّدَة -এর সুরতে, আর فَارِقَة -এর সম্পর্ক مُخَفَّفَة-এর সাথে হয়েছে।

قَوْلُهُ كُلًّا نُصِبَ بِنَقُصُّ : অর্থাৎ كُلًّا-এর পূর্বে نَقُصُّ উহ্য রয়েছে। যা كُلًّا কে نَصَب দানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদে হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হিকমত, আহকাম ও হেদায়েতও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলি হতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاۤئِمٌ وَّحَصِيْدٌ অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোনো কোনো জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোনো চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের প্রতি কোনো জুলুম করিনি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া হাতে তৈরি মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে, যার ফলে আল্লাহর আজাব যখন নেমে এলো, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বূদেরা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জনপদবাসীকে আজাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোনো গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য ইরশাদ করেন যে, এসব ঘটনার মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলি রয়েছে, যারা পরকালের আজাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে পুনরায় ইরশাদ করেছেন, فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ আপনি দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরি হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবেন না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন।

ইস্তিকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল : 'ইস্তিকামতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনো দিকে একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুত এটা কোনো সহজ কাজ নয়। কোনো লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোনো সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তিকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ইস্তিকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতায় যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানেবামে ঝুঁকে পড়া ইস্তিকামতের পরিপন্থি।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তিকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকাইদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তিকামত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফরি ও শিরকি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ

তা'আলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে সুষ্ঠ ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভালো হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূলগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। তেমনি কোনো রাসূলকে আল্লাহর গুণাবলি ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেওয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য কুরআনে আযীম ও রাসূলে কারীম ﷺ যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনোরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তিকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে। অনুরূপভাবে এর মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোনো বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করছি। অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য-নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোনো কার্য সে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কিনা? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনে করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রাসূলে কারীম ﷺ বাস্তবে শরিয়ত করে একটি সুষ্ঠ-সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্র মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। এটা হতে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তিকামতের তাফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন, যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তিকামত অবলম্বন কর। –[মুসলিম শরীফ ও তাফসীরে কুরতুবী]

উসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সমীপে উপস্থি হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ اِتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ও ইস্তিকামত অবলম্বন কর, হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না। –[তাফসীরে দারেমী ও কুরতুবী]

এ দুনিয়ায় ইস্তিকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কাজ। এজন্যই বুযুর্গানে দীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তিকামতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তিকামত অবলম্বন করে রয়েছে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "পূর্ণ কুরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়েও কষ্টকর কোনো হুকুম রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর নাজিল হয়নি।" তিনি আরো বলেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাড়ি মোবারকের কয়েক গাছি পাক ধরেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আজাবের ঘটনাবলিও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'ইস্তিকামতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ আলী সিররী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জিয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন 'হ্যা'। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আ.)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কওমসমূহের উপর আজাবের ঘটনাবলি কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন না'। বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ "ইস্তিকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রাসূলে কারীম ﷺ পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তবে নমুনারূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তিকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ ত'আলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং كَمَا أُمِرْتَ "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রাসূলগণের অন্তরে অপরিসীম আল্লাহভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজনা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তিকামতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ইস্তিকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কিনা?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইস্তিকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা আল্লাহর ফজলে তা পুরো মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াত সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তিকামতের আদেশ দানের পর বলেন, وَلَا تَطْغَوْا "সীমালঙ্ঘন করো না। এটা طُغْيَانٌ শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয়নি; বরং এর নিতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফ্যাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ "ঐ সব পাপিষ্ঠের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" لَا تَرْكَنُوا " শব্দের মূল হচ্ছে رُكُونٌ যার অর্থ "কোনো দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা। "সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ কি এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটির উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রেও সঠিক।

'পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না' এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামতো চলবে না। "হযরত ইবনে জুরাইয বলেন, "পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না" [কুরতুবী] 'সুদ্দী' (র.) বলেন, "তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।" ইকরামা (র.) বলেন– "তাদের সংসর্গে থাকবে না।" কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, "বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাক চাল চলন তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়যাবী (র.) আরো বলেন, পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কই শুধু নিষেধ করা হয়নি; বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র) বলেন– সমগ্র জগতে ঐ আলেমই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়, যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।– [তাফসীরে মাযহারী] বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফের, মুশরিক, বিদ'আতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে মানুষের ভালো-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশত অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েজ আছে।

হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ দীনকে দু'টি لَا হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক لَا تَطْغَوْا সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয় لَا تَرْكَنُوا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারির সার সংক্ষেপ।

রাসূলে পাক ﷺ -এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত : সূরা হূদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলি বর্ণনা করার পর নবী করীম ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কুরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" [১১২ নং আয়াত] ১১৪ নং আয়াত وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আপনি নামাজ কায়েম রাখুন।' ১১৫ তম আয়াত وَاصْبِرْ "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২ তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا 'আর তোমরা সীমলঙ্ঘন করবে না", ১১৩ নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا " এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কুরআন মজীদে সাধারণত একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা প্রকশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কার্য আছে, রাসূলে পাক ﷺ নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে এমন স্বভাব প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোনো নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েজ ও হালাল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল; রাসূলে পাক ﷺ জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যাননি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামাজ কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে তাফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরজ নামাজ, [বাহরে মুহীত ও তাফসীরে কুরতুবী] এবং ইকামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করা। কোনো কোনো আলেমের মতে নামাজ কায়েম করার অর্থ সুমুদয় সুন্নত ও মোস্তাহাবসহ নামাজ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়া أَقِمِ الصَّلٰوةَ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোনে মতানৈক্য নয়। বস্তুত আলোচ্য সবগুলোই ইকামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের পর ইজমালীভাবে নামাজের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামাজ কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রান্তের নামাজের মধ্যে প্রথম ভাগের নামাজ সম্পর্কে সবাই একমত যে, এটা ফজরের নামাজ। কিন্তু শেষ প্রান্তরে নামাজ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন– তা মাগরিবের নামাজ। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামাজ পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাজকেই দিনের শেষ নামাজ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তাই দিনের সর্বশেষ নামাজ। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়। বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামাজ পড়া হয়। زُلَفًا শব্দ বহুবচন, তার একবচন زُلْفَةً যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ। অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামাজ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এটা মাগরিব ও ইশার নামাজ। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ মাগরিব ও ইশার নামাজ। তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ ফজর ও আসরের নামাজ এবং যে, زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশার নামাজ। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাজের বর্ণন পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামাজ। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ "নামাজ কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।"

আলোচ্য আয়াতে নামাজ কায়েম করার নির্দেশদানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ "পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।" শ্রদ্ধেয় তাফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সদকা, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝানো হয়েছে

তবে তন্মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গুনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদের অন্য এক আয়াত এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গুনাহ. বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ বিশেষ করে নামাজ সগীরা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় [কবীরা] গুনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট [সগীরা] গুনাহগুলো মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামাজ এবং এক জুমা হতে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান হতে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় [সগীরা] গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ, তো তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গুনাহ নামাজ, রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকার্য করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে 'বাহরে মুহীত' নামক তাফসীরে উসূল শাস্ত্রের মুহাক্কিক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গুনাহে বারবার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায়। সগীরা গুনাহ মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে , সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হওয়ার শর্ত রয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে ১. আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলির মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। ২. শরিয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া। ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৪. ব্যভিচার করা। ৫. চুরি করা ৬. মদ্য পান করা। ৭. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ৮. মিথ্যা কসম করা। ৯. মিথ্যা সাক্ষী দান করা। ১০. জাদু করা। ১১. সুদ খাওয়া। ১২. অবৈধভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করা। ১৩. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। ১৪. সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। ১৫. অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। ১৬. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ১৭. আমানতের মাল খেয়ানত করা ১৮. অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া। ১৯. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গুনাহও সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে ওলামায়ে কেরাম সহস্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন। মুফতি শফী (র.)-এর লেখা 'গুনাহে বে-লজ্জত' বা বেহুদা গুনাহ কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, " তোমাদের থেকে কোনো মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসিখুশি ব্যবহার কর। -[মুসনাদে আহমদ ও তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে আরজ করলাম যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাকে একটি উপদেশে দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমার থেকে কোনো গুনাহর কাজ হয়ে যায় তবে পরক্ষণেই কোনো নেক কাজ কর, তাহলে গুনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গুনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরিকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি কোনো মুসলমান কোনো পাপকার্য করে বসে তবে অজু করে তার দু'রাকাত নামাজ পড়া উচিত । তাহলে উক্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাজকে তওবার নামাজ বলে [উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহ তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে গৃহীত]।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ : এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ 'এটা' শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই কুরআন পাক অথবা তাতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসিহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদি হঠকারী লোক যারা নিরপক্ষে দৃষ্টিতে কোনো কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

قَوْلُهُ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ : অর্থাৎ "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্য ধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাঁধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে অবিচল রাখা এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রাসূলে আকরাম ﷺ -কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশদানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তিকামাত ও নামাজ কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম-নির্যাতন ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।' এখানে স্পষ্টত 'মুহসিনীন'বা সৎকর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তিকামাতের উপর কায়েম, শরিয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাজকে সুষ্ঠ ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরিয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকাজ করতে হবে যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্তত এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলি সম্পর্কে যখন কোনো ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠ ও সুন্দর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ প্রচলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলো অনায়াসলব্ধ এবং সু-সম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা'আলার স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভালো করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। সেই তিনটি বাক্যের মূল হলো

وَكَانَ اَهْلُ الْخَيْرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ بِثَلَاثِ كَلِمٰتٍ مَنْ عَمِلَ لِاٰخِرَتِهٖ كَفَاهُ اللّٰهُ اَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ اَصْلَحَ سَرِيْرَتَهٗ اَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهٗ وَمَنْ اَصْلَحَ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ اَصْلَحَ اللّٰهُ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّاسِ

–[তাফসীরে রূহুল বয়ান, ২য় জিল ১৩১. পৃ.]

১১৬ ও ১১৭ তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপর আজাব নাজিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মানুষকে তা হতে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, "আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না? যারা জাতিকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত, তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হতো না। তবে মুষ্টিময় কিছু লোক ছিল, যারা নবী গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারা আজাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল।"

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে اُولُوْا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٌ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও তা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে بَقِيَّةٌ বলা হয়। কেননা তা সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নি এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্ম সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোনো আশঙ্কা নেই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য অপরাধী।

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظُلْمٌ (জুলুম) অর্থ শিরকি এবং مُصْلِحُوْنَ অর্থে ঐ সব লোক যারা কাফের-মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেনদেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভালো। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোঁকাবাজি করে না, কারো কোনো ক্ষতি করে না। সে-মতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরিক হওয়া দুনিয়ার

কোনো জাতির উপর আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করো। পূর্ববর্তী যতগুলো জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই এজন্য দায়ী। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আ.)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আ.) -এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। তাদের এসব কার্যকলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরি বা শিরকির কারণে দুনিয়ায় আজাব সংঘটিত হয় না; কেননা তার শাস্তি তো দোজখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবে। এজন্য কোনো কোনো আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরি ও শিরকিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বাজায় থাকতে পারে না।

মতবিরোধ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক : ১১৮তম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেতো, কোনো মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোনো কাজের জন্য বাধ্য করবেন না; বরং তিনি মানুষকে অনেকটা ইখতিয়ার দান করেছেন, যার ফলে মানুষ ভালোমন্দ পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্ব যুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ যারা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছেন তাঁরা কখনো সত্য-বিচ্যুত হননি।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে উলামায়ে-দীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের পরিপন্থি নয়; বরং তা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. الٓرٰ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاٰيٰتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِيْنِ الْمُظْهِرِ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ ـ

১. আলিফ লাম-রা এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবহিত। এগুলো এই আয়াতসমূহ সুস্পষ্টকারী অর্থাৎ সত্যকে অসত্য হতে সুস্পষ্টকারী একটি কিতাবের অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত। اٰيٰتُ الْكِتٰبِ শব্দটির এই স্থানে مِنْ [হতে] অর্থে- الْكِتٰبِ প্রতি اٰيٰتُ -এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ পদের ব্যবহার হয়েছে।

٢. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا بِلُغَةِ الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ تَعْقِلُوْنَ تَفْهَمُوْنَ مَعَانِيَهٗ ـ

২. কুরআন, এটা আমি আরবিতে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি হে মক্কাবাসীগণ! যাতে তোমরা বুঝতে পার। তার মর্ম অনুধাবন করতে পার।

٣. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ بِاِيْحَائِنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ج وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ وَاِنَّهٗ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

৩. তোমার নিকট এই কুরআন ওহী হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে আমি তোমার নিকট সর্বোত্তম এক কাহিনী বর্ণনা করতেছি। আর এটার পূর্বে তুমি তো ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত। بِمَآ اَوْحَيْنَا-এই স্থানে مَا-টি مَصْدَرِيَه এই দিকে ইঙ্গিত করতে এটার তাফসীরে بِاِيْحَائِنَا [আমার ওহী করার মাধ্যমে] উল্লেখ করা হয়েছে। اِنْ-এটা এই স্থানে مُخَفَّفَه বা লঘুকৃত [তাশদীদহীন] রূপে পঠিত। মূলত ছিল اِنَّهٗ

٤. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَعْقُوْبَ يٰٓاَبَتِ بِالْكَسْرِ دَلَالَةٌ عَلٰى يَاءِ الْاِضَافَةِ الْمَحْذُوْفَةِ وَالْفَتْحِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَلِفٍ مَحْذُوْفَةٍ قُلِبَتْ عَنِ الْيَاءِ اِنِّيْ رَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ تَاكِيْدٌ لِيْ سٰجِدِيْنَ جُمِعَ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ لِلْوَصْفِ بِالسُّجُوْدِ الَّذِيْ هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْعُقَلَاءِ ـ

৪. স্মরণ কর যখন হযরত ইউসুফ (আ.) তার পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.) -কে বলেছিলেন হে আমার পিতা! আমি স্বপ্নে একাদশ নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র দেখেছি- দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়। اَبَتِ-এটার শেষের اِضَافَة বাচক উহ্য ى-এর প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে এটা ت-এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। আর تَ ফাতাহসহও পাঠ করা যায়। এমতাবস্থায় এটা সম্বন্ধবাচক ى-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত এই স্থানে উহ্য اَلِفْ -এর প্রতি ইঙ্গিতবহ বলে বিবেচ্য হবে। رَاَيْتُهُمْ-এই স্থানে تَاكِيْد সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই ক্রিয়াটির পুনরুক্তি করা হয়েছে। سٰجِدِيْنَ-এই স্থানে যেহেতু ঐ বস্তুসমূহকে সেজদারত হওয়ার বিশেষণে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে; আর সেজদা হলো মূলত ذَوِى الْعُقُوْلِ বা বিবেকবান প্রাণীর গুণ, সেহেতু এই স্থানেও শব্দটিকে ذَوِى الْعُقُوْلِ প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ى ও ن-এর সাহায্যে جَمْع বা বহুবচন গঠনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৫. قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ط يَحْتَالُوْا فِيْ هَلَاكِكَ حَسَدًا لِعِلْمِهِمْ بِتَاوِيْلِهَا مِنْ اَنَّهُمُ الْكَوَاكِبُ وَالشَّمْسُ اُمُّكَ وَالْقَمَرُ اَبُوْكَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ.

৫. সে বলল, হে আমার প্রিয় বৎস, তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করিও না, করলে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। তারা যেহেতু এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে যে, নক্ষত্র বলতে তাদেরকে, আর চন্দ্র বলতে তোমার মাতা ও সূর্য বলতে তোমার পিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেহেতু তোমার প্রতি ঈর্ষায় তারা তোমাকে বিনাশ করার চক্রান্ত করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু তার শত্রুতা তো সুস্পষ্ট।

৬. وَكَذٰلِكَ كَمَا رَاَيْتَ يَجْتَبِيْكَ يَخْتَارُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ اَوْلَادِهٖ كَمَا اَتَمَّهَا بِالنُّبُوَّةِ عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهٖ بِهِمْ.

৬. এইভাবে অর্থাৎ যেভাবে তুমি এই স্বপ্ন দেখলে সেভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করে নিবেন يَجْتَبِيْكَ অর্থ তোমাকে মনোনীত করে নিবেন। এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন, تَاْوِيْل الْاَحَادِيْث -এই স্থানে অর্থ স্বপ্নের ব্যাখ্যা। তোমার প্রতি ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারে প্রতি তাঁর বংশধরদের প্রতি নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি পূর্বে নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে এটা পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে খুবই জানেন, এবং তাদের সাথে আচরণে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ : এতে تِلْكَ ইসমে ইশারা مُؤَنَّثْ নেওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

قَوْلُهٗ اَلْمُظْهِرُ لِلْحَقِّ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُبِيْن টা اَبَانَ হতে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاِيْحَائِنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا টা হলো مَصْدَرِيَّة মওসূলাহ নয়। যে, এর সেলা হতে عَائِدْ-এর প্রয়োজন হবে।

قَوْلُهٗ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اِنَّهٗ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ আর اِنْ ইসিম হলো উহ্য ضَمِيْر شَانْ অর্থাৎ আর اِنَّهٗ -এর মধ্যে لَامْ টা হলো لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ فَارِقَه

قَوْلُهٗ دَلَالَةٌ عَلٰى اَلِفٍ مَحْذُوْفٍ : কেননা এর আসল يَا اَبَتَا ছিল। اَلِفْ ফেলে দিয়ে যবর অবশিষ্ট রাখা হয়েছে উহ্য اَلِفْ কে বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهٗ فِي الْمَنَامِ : এই বৃদ্ধিকরণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رَاَيْتُ টা رُؤْيَا থেকে بَدَل হয়েছে رُؤْيَتْ থেকে নয়।

قَوْلُهٗ تَاكِيْد : رَاَيْتُهُمْ টা رَاَيْتُ -এর تَاكِيْد কাজেই অহেতুক تَكْرَارْ-এর আপত্তি শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ يَحْتَالُوْا : এ বৃদ্ধিকরণের দ্বারা এই কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, كَيْدًا টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِه হয়ে থাকে, অথচ এখানে مُتَعَدِّىْ بِاللَّامِ নেওয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা হলো كَيْدًا-এর اِحْتِيَالْ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে مُتَعَدِّىْ بِاللَّامِ নেওয়া বৈধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে ইউসুফ প্রসঙ্গে : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এজন্যেই তাঁর নামেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। বিগত সূরায় বকয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় শুধু একজন নবীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক অনেক ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে বার বার বর্ণনা করেননি। কেননা এ ঘটনা মানুষের ফরমায়েশের কারণে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে তা একই স্থানে একবারে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইনের ঘটনাও একবারই বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরায়ে হূদে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্যে অতীতকালের ঘটনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই সূরায়ে ইউসুফেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনা প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অবস্থার অনুরূপ। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের প্রারম্ভিক অবস্থায় সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট ওহী শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে, [আল হাদীস] যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবুয়ত আরম্ভ হয় একটি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে তার বিবরণ। (اَلْاٰيَةَ) اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাঁকে হিংসা করেছে এবং চরম কষ্ট দিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মান মর্যাদা এবং প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.)-তাঁর ভাইদের থেকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" এমনকি হযরত ইউসুফ (আ.) কখনও তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগও করেননি; বরং তাদেরকে অনেক দান দক্ষিণায় ধন্য করেছেন। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে কুরায়েশ গোত্রের লোকেরা তথা তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাই প্রিয়নবী ﷺ -কে চরম কষ্ট দিয়েছে। সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি তাদের দ্বারা নির্যাতীত উৎপীড়িত হয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক অসাধারণ সবর এবং ইস্তেকামাতের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। এমনকি, অবশেষে প্রিয়নবী ﷺ তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ চলে গিয়েছেন। তারপরও তারা বারে বারে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি বললেন- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি পরম দয়ালু। আরও বললেন; اِذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ তোমরা আজ মুক্ত

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় তিনিও মক্কার কুরায়েশদেরকে যখন তারা ইসলাম কবুল করেছে, তখন হুনায়নের যুদ্ধের গনিমত থেকে প্রত্যেককে একশত করে উষ্ট্র দান করেছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর জালেম ভাইদের সাথে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ মক্কার কুরায়শদের সাথে অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র মাধুর্যের প্রমাণ রয়েছে এ ঘটনায় শয়তান কোনোভাবেই তাঁকে কবু করতে পারেনি, ঠিক এভাবে এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিরাপদ।

যেভাবে হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলির বর্ণনা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিল ছিল, ঠিক এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাও পবিত্র কুরআনের আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে রয়েছে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-তাঁর ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও সবর অবলম্বন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনিও মক্কাবাসীর জুলুম অত্যাচারে সবর অবলম্বন করুন, সত্যের উপর অটল অবিচল থাকুন এবং পরিণামের অপেক্ষা করুন।

−[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদিরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১-২]

শানে নুযুল : এই সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে

১. হযত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআন অনেক দিন থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি নাজিল হয়ে আসছিল। প্রিয়নবী ﷺ পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শ্রবণ করাতেন। ঐ সময় তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি কোনো ঘটনা বর্ণনা করতেন, তবে ভালো হতো। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

২. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে। কেননা মক্কায় কুরায়শ বংশের লোকেরা তথা প্রিয়নবী ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করছিল, তাতে তাঁর মনক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে প্রিয়নবী ﷺ -এর মনে সান্ত্বনা আশাও স্বাভাবিক।

৩. এ পর্যায়ে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে হযরত ইয়াকুব (আ.) ও তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

৪. আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা মক্কার কাফেরদেরকে বলেছিল, যেন তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করে যে, বনী ইসরাঈলরা কেন সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা জানতে চেয়েছিল, তখন এ সূরা নাজিল হয়। −[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ. -১২, পৃ. -১৭০ ; খোলাসাতুত্তাফাসীর, খ. ২ পৃ. ৩৯২]

এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি হিজরতের সময় মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মধ্যখানে নাজিল হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরার ৪টি আয়াত ব্যতীত আর সবই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। অবশ্যই নোহাস, আবুশ শেখ ইবনে মরদবীয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। −[তাফসীরে ফতহুল কাদীর., খ. ৩, পৃ. ৯]

قَوْلُهُ الٓر : এ অক্ষর গুলোকে "মোকাত্তা'আত" বলা হয়। আল্লাহ পাক ব্যতীত এর প্রকৃত অর্থ কারোই জানা নেই, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীদের এটিই অভিমত। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, এ অক্ষরগুলো আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলের মধ্যে একটি রহস্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ রহস্য সম্পর্কে অবগত। পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ২৯টি সূরা মোকাত্তাআত, অক্ষর দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তন্মধ্যে আলিফ, লাম, রা, অক্ষর দ্বারা পাঁচটি সূরা আরম্ভ করা হয়েছে।

এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কিত কহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ.)-এর কাহনী ও ঘটনাবলি সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশ নামা হিসাবে প্রেরিত কুরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য আমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কুরআন পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কেও স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কোনো ইতিহাস গ্রন্থ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও

উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করা হয়েছে, সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলি পাঠ করা এবং স্মরণ রাখা স্বয়ং কোনো লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোনো না কোনো শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং জনৈক অনুসন্ধানবিদ বলেছেন মানুষের বাক্যাবলির দুটি প্রকারের মধ্যে خَبَرْ [ঘটনা বর্ণনা] ও اِنْشَاء [রচনা]-এর মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই আসল উদ্দেশ্য। خَبَرْ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে কখনও উদ্দেশ্য হয়না; বরং প্রত্যেক খবর ও ঘটনা শোনা ও দেখার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একমাত্র স্বীয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয় যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত আলোচ্য কাহিনীর কুরআনী বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান করা হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং কোনো গ্রন্থও পাঠ করেন নি। এতদসত্ত্বেও তাওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেন, যেগুলো তাওরাতে উল্লিখিত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিধি বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তাওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদিরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ আমি একে আরবি কুরআন হিসাবে নাজিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাজিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলিকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এজন্য এখানে لَعَلَّ শব্দটি 'সম্ভবত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এসব সন্দেহে ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সামনে এসে যাবার পরেও তাদের কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা ছিল সুদূর পরাহত।

قَوْلُهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ .... قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ : অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদিদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ .... رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতাকে বললেন, পিত: আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে। এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে- হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ .... لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ : অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ কড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

স্বপ্নের তাৎপর্য,স্তর ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তাফসীরে মাযহারীতে কাজী সানাউল্লাহ (র.) বলেন, স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু-প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটি প্রকার মৌলকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোনো কোনো সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সেগুলোই স্বপ্নে আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোনো কোনো সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলি মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حَدِيثُ النَّفْسِ তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تَسْوِيلُ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম [আল্লাহর ইশারা] যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোনো কোনো বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তাবারানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী]

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিছাল' অর্থাৎ উপমা জগতে বিদ্যমান থাকে। তেমনি 'মাআনী' তথা অবস্তুবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমন সব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপরিউক্ত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোনো কোনো স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায় যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোনো উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে।

পয়গাম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোনো কোনো সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোনো সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানি। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন নবুয়তের অংশ এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। কোনো হাদীসে নবুয়তের ৪০ তম অংশ, কোনো হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোনো হাদীসে ৪৯ তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তাফসীরে কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আব্দুল বার (র.)-এর বিশ্লেষণ এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই; বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা ভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ আরো কম তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তা সাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ এর অর্থ কি? তাফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোনো বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানি দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন : এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিতে হয়েছে। তারা বলে নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কুরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থি এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোনো বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরি হয়ে পড়ে না। যদি কোনো ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কলকব্জার মধ্য থেকে কোনো একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারও কাছে থাকে এবং সে দাবি করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ অর্থাৎ ভবিষ্যতে 'মুবাশ্‌শিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোনো অংশ বাকি থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'মুবাশ্‌শিরাত' বলতে কি বোঝায়? উত্তর হলো সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোনো প্রকার অথবা কোনো আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্‌শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কোনো সময় কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কুরআনও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলিম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত

হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফুফু আতেকা কাফের থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফের বাদশাহ বখতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়েল (আ.) দিয়েছেন এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হবে এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। ফাসিক ও পাপাচারীদের সাধারণত মনে সংলাপ ও শয়তানি প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুঁশিয়ারির চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোনো ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরিয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানি অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) কে কতিপয় নিয়ামত দানে ওয়াদা করেছেন। **প্রথম.** كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। **দ্বিতীয়.** وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এখানে اَحَادِيْث বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাস'আলা : তাফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয়. ওয়াদা وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ আপনার প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম ও ইসহাক (আ.)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোনো শাস্ত্র শেখানো তাঁর কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককে তা শেখান না; বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোনো কোনো ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

অনুবাদ :

٧. لَقَدْ كَانَ فِىْ خَبَرِ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ وَهُمْ اَحَدَ عَشَرَ اٰيٰتٌ عِبَرٌ لِلسَّآئِلِيْنَ عَنْ خَبَرِهِمْ .

৭. হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার ভ্রাতাগণের কাহিনীতে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন শিক্ষা। হযরত ইউসুফের ভ্রাতার সংখ্যা ছিল এগারো।

٨. اُذْكُرْ اِذْ قَالُوْا اَىْ بَعْضُ اِخْوَةِ يُوْسُفَ لِبَعْضِهِمْ لَيُوْسُفُ مُبْتَدَأٌ وَاَخُوْهُ شَقِيْقُهٗ بِنْيَامِيْنُ اَحَبُّ خَبَرٌ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جَمَاعَةٌ اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ خَطَأٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ بِاِيْثَارِهِمَا عَلَيْنَا .

৮. স্মরণ কর তারা অর্থাৎ হযরত ইউসুফের ভ্রাতারা কতকজনকে অপর কতজন বলেছিল, আমাদের পিতার নিকট হযরত ইউসুফ ও তার সহোদর ভ্রাতা বিনয়ামিন আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একদল। এক জামাত। নিশ্চয় আমাদের পিতা এদের দুজনকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে অর্থাৎ ভুলে আছেন لَيُوْسُفُ-এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَحَبُّ-এটা خَبَرٌ বা বিধেয়।

٩. اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا اَىْ بِاَرْضٍ بَعِيْدَةٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ بِاَنْ يُقْبِلَ عَلَيْكُمْ وَلَا يَلْتَفِتَ لِغَيْرِكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ قَتْلِ يُوْسُفَ اَوْ طَرْحِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ بِاَنْ تَتُوْبُوْا .

৯. হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হত্যা কর অথবা তাকে কোনো স্থানে দূরবর্তী কোনো জায়গায় নির্বাসন দাও। এতে তোমাদের পিতার লক্ষ্য তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে। তিনি তখন কেবল তোমাদের দিকেই লক্ষ্য দিবেন অন্য কারও দিকে ফিরে তাকাবেন না। এটার পর অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হত্যা কিংবা দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপের পর ভালো লোক হয়ে যাবে। তওবা করে নিবে।

١٠. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ هُوَ يَهُوْدَا لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ اِطْرَحُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ مُظْلِمِ الْبِيْرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْجَمْعِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ الْمُسَافِرِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ مَا اَرَدْتُّمْ مِنَ التَّفْرِيْقِ فَاكْتَفُوْا بِذٰلِكَ .

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, তার নাম ছিল ইয়াহুদা ইউসুফকে হত্যা করো না। তাকে কোনো গভীরকূপে কূপের অন্ধকারময় তলায় নিক্ষেপ কর। ফেলে দাও। যাত্রীদের কেউ অর্থাৎ কোনো মুসাফির তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তার পিতার সাথে বিচ্ছেদ সৃষ্টির যে ইচ্ছা তোমরা করেছো তা যদি তোমরা একান্তই করতে চাও এতটুকুতেই যথেষ্ট করিও। غَيٰبَةٌ-এটা অপর এক কেরাতে বহুবচন غَيٰبٰتٌ রূপে পঠিত রয়েছে।

١١. قَالُوْا يٰاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ لَقَآئِمُوْنَ بِمَصَالِحِهٖ .

১১. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! কি হলো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করো না? নিশ্চয় আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী।' আমরা তার কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।

١٢. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا إِلَى الصَّحْرَاءِ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ فِيْهِمَا نَنْشَطْ وَنَتَّسِعْ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে মাঠে প্রেরণ করি; সে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে; নিশ্চয় আমরা তার রক্ষাণাবেক্ষণকারী। يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ -এই উভয় ক্রিয়াই ى [অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ] এবং ن [অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচনরূপে] সহ পঠিত রয়েছে। শেষোক্ত অবস্থায় অর্থ, আমরা আনন্দ-আহলাদ করব।

١٣. قَالَ إِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْ أَنْ تَذْهَبُوْا أَيْ ذَهَابُكُمْ بِهِ لِفِرَاقِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَكَانَتْ أَرْضُهُمْ كَثِيْرَةُ الذِّئَابِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ مَشْغُوْلُوْنَ

১৩. সে বলল, এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে। তোমরা তাকে নিয়ে গেলে তার বিচ্ছেদে আমার কষ্ট হবে। আর আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের অমনোযোগ অবস্থায় অন্য কাজে লিপ্ত থাকাকালে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। أَنْ تَذْهَبُوْا-এটার أن-টি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার মূল অর্থব্যঞ্জক। اَلذِّئْبُ -এই স্থানে নির্দিষ্ট কোনো বাঘ নয় বরং জাতি অর্থে তাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলে বহু বাঘ ছিল বলে শব্দটিকে مَعْرِفَةٌ বা নির্দিষ্ট পদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

١٤. قَالُوْا لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جَمَاعَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ عَاجِزُوْنَ فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ

১৪. তারা বলল, আমরা এক জামাত অর্থাৎ একদল হওয়া সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরা সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত অক্ষম ও অযোগ্য বলে পরিগণিত হবো। অনন্তর তিনি তাকে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। لَئِنْ-এটা لَا-টি قَسَمِيَّةٌ ব শপথব্যঞ্জক

١٥. فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَأَجْمَعُوْا عَزَمُوْا أَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَجَوَابُ لَمَّا مَحْذُوْفٌ أَيْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ بِأَنْ نَزَعُوْا قَمِيْصَهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ وَإِهَانَتِهِ وَإِرَادَةِ قَتْلِهِ وَأَدْلَوْهُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى نِصْفِ الْبِئْرِ أَلْقَوْهُ لِيَمُوْتَ فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَوٰى إِلَى صَخْرَةٍ فَنَادَوْهُ فَأَجَابَهُمْ لِظَنِّ رَحْمَتِهِمْ فَأَرَادُوْا رَضْخَهُ بِصَخْرَةٍ فَمَنَعَهُمْ يَهُوْذَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِي الْجُبِّ وَحْيَ حَقِيْقَةٍ وَلَهُ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ دُوْنَهَا تَطْمِيْنًا لِقَلْبِهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ بِأَمْرِهِمْ بِصُنْعِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِكَ حَالَ الْإِنْبَاءِ

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল সংকল্প করল, তখন তারা তা সম্পাদন করল। তারা তাকে মারধর এবং অপমান ও হত্যার ইচ্ছা প্রদর্শনের পর জামা খুলে রেখে কূপের ভিতর লটকিয়ে নামাতে থাকে এবং অর্ধ পরিমাণ পৌঁছলে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য ধপাস করে ফেলে দেয়। হযরত ইউসুফ (আ.) কূপের পানিতে পড়েন এবং একটি পাথরে আশ্রয় নেন। তাঁর ভ্রাতাগণ বেঁচে আছেন কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। তাঁর নাম ধরে ডাক দেয়। হয়তো এদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছে এই ভেবে তিনি তাদের ডাকের জওয়াব দেন। তখন তারা পাথর ছুঁড়ে তাঁকে চূর্ণ করে দিতে চাইল। তখন ভাই ইয়াহুদা এতে তাদেরকে নিষেধ করে। আর আমি কূপের ভিতরেই তার মনকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে ওহী পাঠালাম। রূপকার্থে নয় মূলত সত্য সত্যই ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বৎসর বা কিছু কম। পরে তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা আচরণের কথা অবশ্যই বলবে কিন্তু ঐ কথা বলার অবস্থায় তারা তোমাকে চিনবে না। لَمَّا -এই শর্তবাচক শব্দটির জওয়াব এই স্থানে উহ্য। তা হলো فَعَلُوْا ذٰلِكَ

١٦. وَجَآءُوْٓا اَبَاهُمْ عِشَآءً وَقْتَ الْمَسَاءِ يَبْكُوْنَ

১৬. তারা রাত্রিতে অর্থাৎ সন্ধ্যায় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসল।

١٧. قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ نَرْمِىْ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ثِيَابِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ مُصَدِّقٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ عِنْدَكَ لَاتَّهَمْتَنَا فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ لِمَحَبَّةِ يُوْسُفَ فَكَيْفَ وَاَنْتَ تُسِىْءُ الظَّنَّ بِنَا

১৭. তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা প্রতিযোগিতা করতে ছিলাম তীরান্দাজী করতেছিলাম আর হযরত ইউসুফকে আমাদের মাল পত্রের নিকট কাপড় চোপড়ের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে তাকে একটি বাঘ এসে খেয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না সত্যবাদী বলে মনে করবে না। যদিও আমরা তোমার নিকট সত্য বলব; হযরত ইউসুফের প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে তুমি আমাদেরকে এই ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করবে। আমাদের সম্পর্কে যখন তোমার এই খারাপ ধারণা তখন আমাদের কথায় আর কেমন করে বিশ্বাস করতে পারবে?

١٨. وَجَآءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ مَحَلُّهٗ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ اَىْ فَوْقَهٗ بِدَمٍ كَذِبٍ اَىْ ذِىْ كِذْبٍ بِاَنْ ذَبَحُوْا سَخْلَةً وَلَطَخُوْهُ بِدَمِهَا وَذَهَلُوْا عَنْ شِقِّهٖ وَقَالُوْا اِنَّهٗ دَمُهٗ قَالَ يَعْقُوْبُ لَمَّا رَاٰهُ صَحِيْحًا وَعَلِمَ كِذْبَهُمْ بَلْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَفَعَلْتُمُوْهُ بِهٖ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ اَمْرِىْ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ الْمَطْلُوْبُ مِنْهُ الْعَوْنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ تَذْكُرُوْنَ مِنْ اَمْرِ يُوْسُفَ

১৮. তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। একটি ভেড়ার বাচ্চা জবাই করে তার রক্ত লেপন করে এসে বলল, এটা হযরত ইউসুফের রক্ত; কিন্তু জামাটি ছিঁড়ে আনতে ভুলে গিয়েছিল। জামাটি অক্ষত দেখতে পেয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) এদের মিথ্যা বুঝে ফেললেন। সে বলল, তোমাদের মন একটি বিষয় তোমাদের নিকট বানিয়ে পেশ করেছে, শোভন করে তুলে ধরেছে, আর তোমরা তাই করে বসেছো সুতরাং আমি পূর্ণ ধৈর্যধারণ করলাম। কোনো অভিযোগ ও হা-হুতাশ আমার নেই। তোমরা যা বলতেছ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে তোমরা যা কিছু বর্ণনা করতেছ সে বিষয়ে আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল। তাঁরই নিকট আমার সাহায্য প্রার্থনা। عَلٰى قَمِيْصِهٖ-এটা এই স্থানে ظَرْف বা স্থানাধিকরণরূপে مَحَلّ বা স্থান হিসাবে মূলত مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত। অর্থ, তার জামার উপরে। كَذِبٍ-এটা ذِىْ كِذْبٍ [মিথ্যা দ্বারা সজ্জিত করে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ-এটা خَبَرْ বা বিধেয়। এটার مُبْتَدَاٌ উহ্য তা হলো اَمْرِىْ অর্থাৎ আমার কাজ হলো পূর্ণ ধৈর্যধারণ।

١٩. وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ مُسَافِرُوْنَ مِنْ مَدْيَنَ اِلٰى مِصْرَ فَنَزَلُوْا قَرِيْبًا مِنْ جُبِّ يُوْسُفَ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ الَّذِىْ يَرِدُ الْمَاءَ لِيَسْتَقِىَ مِنْهُ فَاَدْلٰى اَرْسَلَ دَلْوَهٗ فِى الْبِئْرِ فَتَعَلَّقَ بِهَا يُوْسُفُ فَاَخْرَجَهٗ.

১৯. এক যাত্রীদল আসল। মাদয়ান হতে মিসরের দিকে যাত্রী একদল মুসাফির আসল। হযরত ইউসুফ যে কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তারা তার নিকটেই বিশ্রামের জন্য অবতরণ করল। অনন্তর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল সে ঐ কূপে তার পানির ডোল লটকিয়ে দিল, নামিয়ে দিল। হযরত ইউসুফ তা জড়িয়ে ধরলেন। ফলে সে তাঁকেও বাইরে উঠিয়ে আনল।

فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ يٰبُشْرٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بُشْرٰىْ وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ اَىْ اُحْضُرِىْ فَهٰذَا وَقْتُكِ هٰذَا غُلٰمٌ فَعَلِمَ بِهٖ اِخْوَتُهٗ فَاَتَوْهُمْ وَاَسَرُّوْهُ اَىْ اَخْفَوْا اَمْرَهٗ جَاعِلِيْهِ بِضَاعَةً بِاَنْ قَالُوْا هُوَ عَبْدُنَا اَبَقَ وَسَكَتَ يُوْسُفُ خَوْفًا اَنْ يَّقْتُلُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

তাকে দেখে সে বলে উঠল, ও হে সুসংবাদ! এই যে এক বালক! হযরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ এটা জানতে পেরে ঐ যাত্রীদের নিকট আসল এবং তাকে পণ্যরূপে আখ্যা দিয়ে তার বিষয়টি লুকিয়ে রাখল : গোপন করে রাখল। বলল, এ আমাদের ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিল। এরা হত্যা করে ফেলবে এই ভয়ে হযরত ইউসুফ নিজে চুপ করে রইলেন। এরা যা করতেছে আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। وَارِدٌ অর্থ পানীয় জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি পানির স্থলে যায়। يٰبُشْرٰى এই- بُشْرٰى শব্দটি অপর এক কেরাতে নিজের দিকে اِضَافَةٌ করত بُشْرٰىْ [আমার সুসংবাদ] রূপে পঠিত রয়েছে। এই স্থানে مَجَازٌ হিসাবে তাকে ওহে বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটার অর্থ হলো, সুসংবাদ, এখনি এসে হাজির হও, এটাই তো তোমার উপস্থিতির মোক্ষম সময়।

২٠. وَشَرَوْهُ اَىْ بَاعُوْهُ مِنْهُمْ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ع نَاقِصٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ج عِشْرِيْنَ اَوْ اِثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَكَانُوْا اَىْ اِخْوَتُهٗ فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ فَجَاءَتْ بِهِ السَّيَّارَةُ اِلٰى مِصْرَ فَبَاعَهُ الَّذِىْ اِشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَزَوْجَىْ نَعْلٍ وَثَوْبَيْنِ ـ

২০. এবং তারা তাকে এদের নিকট বিক্রয় করল স্বল্প মূল্যে شَرَوْهُ-এই স্থানে অর্থ, তারা তাকে বিক্রি করল। মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। بَخْسٍ-অর্থ কম। অর্থাৎ বিশ দিরহাম বা বাইশ দিরহাম তারা অর্থাৎ তার ভ্রাতাগণ হতে নিরুৎসাহী ছিল। অতঃপর তারা তাঁকে মিসরে নিয়ে আসলে তার ক্রেতা তাকে বাইশ দীনার এবং দুই জোড়া জুতা ও দুই জোড়া কাপড়ের বিনিময়ে ক্রয় করল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ خَبَرٌ : মুফাসসির (র.) خَبَرٌ মুযাফ উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এই যে, আয়াতে يُوْسُفُ টা فِىْ-এর ظَرْفٌ হয়েছে। অথচ يُوْسُفُ যেহেতু ذَاتٌ কাজেই তাতে ظَرْفٌ হওয়ার যোগ্যতা নেই।

জবাবের সারকথা হলো এই যে, يُوْسُفُ টা ظَرْفٌ হয়নি; বরং يُوْسُفَ-এর পূর্বে خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই আর কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهٗ مُبْتَدَاٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِيُوْسُفُ -এর উপর لَامٌ টা হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ এটা قَسَمِيَّةٌ নয়।

قَوْلُهٗ شَقِيْقُهٗ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিনয়ামিন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাকীকী ভাই ছিলেন। আর বাকিরা ছিলেন আল্লাতী [বাবা শরিক] ভাই তথা বাবা এক মা দুই।

قَوْلُهٗ بِاَرْضٍ بَعِيْدَةٍ : এখানে بَعِيْدَةٌ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَرْضٌ -এর তানভীনটি تَعْظِيْم -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ غَيَابَةِ الْجُبِّ : অন্ধকার কূপ, কূপের গভীরতার অন্ধকার।

قَوْلُه فاكتفوا بذالك : এটা اِنْ كُنْتُمْ -এর জবাব যা উহ্য রয়েছে

قَوْلُهٗ يَرْتَعْ : এটা বাবে رَتَعَ হতে মুযারে وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থ ফল খাবে। স্বাদ উপভোগ করবে। رَاتِعٌ বলা হয় স্বিখণ্ডিতকারীকে।

قَوْلُهٗ فَعَلُوْا ذَالِكَ : এটা হলো لَمَّا-এর জবাব।

قَوْلُهُ بِاَنْ نَزَعُوْا قَمِيْصَهُ : এখানে بَاءٌ টা تَصْوِيْرِيَّة যা صُوْرَتْ فِعْل কে বর্ণনা করার জন্য। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) কে কিভাবে কূপে নিক্ষেপ করা হলো?

قَوْلُهُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ فِيْهَا نَنْشَطْ وَنَتَّسِعْ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يَرْتَعْ এবং يَلْعَبْ-এর দুই কেরাতকে বর্ণনা করা অর্থাৎ يَرْتَعْ এবং يَلْعَبْ যেভাবে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ হতে পারে অনুরূপভাবে جَمْعْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহও হতে পারে। আর نَنْشَطْ হলো نَلْعَبْ-এর তাফসীর। অর্থাৎ যাতে আমরা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করতে পারি। আর نَتَّسِعْ হলো نَرْتَعْ-এর তাফসীর অর্থাৎ যাতে আমরা খাবো উপভোগ করব। এই তাফসীরে لَفْ نَشَرْ غَيْرُ مُرَتَّبْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلذِّئْبُ-এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টা عَهْدِيْ-এর জন্য নয়। কেননা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মনে কোনো নির্দিষ্ট বাঘ ছিলনা। বরং اَلِفْ وَلَامْ টা جِنْس-এর জন্য হবে অর্থাৎ বাঘের মধ্য হতে কোনো একটা বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।

قَوْلُهُ اِنَّا اِذًا لَخٰسِرُوْنَ : এটা জবাবে কসম হয়েছে।

قَوْلُهُ جَوَابُ لَمَّا مَحْذُوْفٌ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, বাক্য পরিপূর্ণ নয়। কেননা فَلَمَّا ذَهَبُوْا-এর জবাব উল্লেখ নেই।

উত্তরের সারকথা হলো لَمَّا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَعَلُوْا ذٰلِكَ

قَوْلُهُ مَحَلُّهُ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ : অর্থাৎ عَلٰى قَمِيْصِهِ টা ظَرْف হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَجَاءُوْا فَوْقَ قَمِيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

قَوْلُهُ اَىْ ذِىْ كَذِبٍ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আপত্তির খণ্ডন করা যে, بِدَمٍ كَذِبٍ-এর মধ্যে মাসদারের حَمْل জাতের উপর হয়েছে। যা বৈধ নয়। এখানে ذِىْ বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, মাসদার টা اِسْمُ فَاعِلْ-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো আপত্তি অবশিষ্ট থাকেনা। আর যদি ذِىْ উহ্য মানা না হয় তবে মুবালাগার ভিত্তিতে حَمْل বৈধ হবে। যেমনটি زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মধ্যে হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِىْ يَرِدُ الْمَاءَ : এটা হলো وَارِدْ-এর তাফসীর অর্থাৎ যে ব্যক্তি পানির ব্যবস্থা করেন যাকে سَقَّاءْ বলে। ঐ سَقّٰى-এর নাম মালেক ইবনে যা'র খোযায়ী ছিল।

قَوْلُهُ لِيَسْتَسْقِىْ مِنْهُ : যাতে করে কূপ হতে পানি আনয়ন করতে পারে। আবার কোনো কোনো নুসখায় لِيَسْتَقِىْ রয়েছে। উভয়টির সেলাহ مِنْ আসে। اِسْتَقٰى مِنَ النَّهْرِ অর্থ হলো নদী থেকে পানি সংগ্রহ করেছে।

قَوْلُهُ فِىْ قِرَاءَةٍ بُشْرٰىْ : আমার শুভ সংবাদ بَشَارَتْ কে আহ্বান করা مَجَازًا হয়েছে। কেননা بَشَارَتْ-এর মধ্যে مُخَاطَبْ হওয়ার যোগ্যতা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলি রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদি পরীক্ষার উদ্দেশ্য নবী কারীম ﷺ -কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌছেছিল, তখন মদীনায় ইহুদিরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল। যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়?

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোনো অংশবিশেষ জানা যেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি প্রকাশ্য মোজেজা।

আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইহুদিদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ, বিধান ও মাস'আলা বিদ্যমান রয়েছে। যে বালককে ভ্রাতারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহর অপরিসীম শক্তি তাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে, কিভাবে তার হেফাজত হয়েছে! এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে স্বীয় নির্দেশাবলি পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সুযোগ হাতে আসা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর ভয়ে প্রবৃত্তিকে কিভাবে পরাভূত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহভীতির পথ থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহ ভীতির পথে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের বিপরীতে কিরূপ ইজ্জত দান করেন এবং শত্রুদেরকে কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আল্লাহর শক্তির মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝা যায়। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) সহ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।

বার পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী নিয়ে বিনতে লাইয়্যানের গর্তে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকূব (আ.) লাইয়্যানের ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামিন। এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই ইউসুফ জননী রাহীলও বিনয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় আয়াত থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে দেখল যে, তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনোরূপে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা হযরভ ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার অনুজ বিনয়ামিনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হলো এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় হযরত ইউসুফ (আ.)- কে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

এ আয়াতে ভ্রাতারা নিজেদের সম্পর্কে عُصْبَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছে। আরবি ভাষায় পাঁচ থেকে দশজনের একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতা সম্পর্কে তারা বলেছে إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এতে ضَلَالٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ পথভ্রষ্টতা। কিন্তু এখানে ধর্মীয় পথ ভ্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা এরূপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফের হয়ে যেত। কেননা হযরত ইয়াকূব (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত কুফর।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফেরাতের দোয়া প্রার্থনা করেছিল। পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, যখন তাদের মুসলমান ধরা হয়। নতুবা কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই ভ্রাতাদের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে তো আলেমরা মতভেদ করেছেন কিন্তু মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এখানে ضَلَالٌ শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তিনি সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না।

তৃতীয় আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল তাকে কোনো অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গুনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরিউক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবীরা গুনাহ করেছে। একজন নিরাপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলেমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গাম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গুনাহ হতে পারে না।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর. যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোনো দূর দেশে যেতে হবে না। কোনো কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর দূরান্তে পৌছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ছোট ভাই বিনয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

আয়াতে غَيَابَةُ الْجُبِّ বলা হয়েছে যা কোনো বস্তুকে ঢেকে ফেলে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, তাকেই غَيَابَةٌ বলা হয়। এ কারণেই কবরকেও غَيَابَةٌ বলা হয়। যে কূপের পাড় তৈরি করা হয় না, তাকে جُبٌّ বলা হয়।

يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ এখানে اَلْتِقَاطٌ শব্দটি لُقَطَةٌ থেকে উদ্ভূত। যে পড়ে থাকা বস্তু অন্বেষণ ব্যতিরেকেই কেউ পেয়ে ফেলে, তাকে لُقَطَةٌ বলা হয়। অ-প্রাণী বাচক বস্তু হলে لُقَطَةٌ এবং প্রাণীবাচক হলে ফিকহবিদদের পরিভাষায় لَقِيط বলা হয়। অপ্রাপ্ত বয়বস্ক ও অপরিপক্ক বালক হলেও কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে لَقِيْط বলা হবে। কুরতুবী এ শব্দ দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)কে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন। এছাড়া ইয়াকূব (আ.)-এর এরূপ বলাও তাঁর বালক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমার আশঙ্কা হয় ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলবে। কেননা ব্যাঘ্রে খেয়ে ফেলা বালকদের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তখন ইউসুফ (আ.)-এর বয়স ছিল সাত বছর। [তাফসীরে মাযহারী]

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে لقط ও لَقِيط -এর বিস্তারিত বিধানাবলি বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হেফাজত পথঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারি বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয় প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথেঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোনো আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোনো বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরা, পাথর ইত্যাদি, তাহলে এগুলোকে সরানো শুধু তার প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও ছওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই তবে তাকে প্রত্যার্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজা-খুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকির-মিসকিনদের দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দান রূপে গণ্য করা হবে। দানের ছওয়াব সেই পাবে যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়!

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল আব্বাজান! ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোনো সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে প্রমোদ ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু হযরত ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয় বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরিয়তের সীমালঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরিয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোনো কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, তাকে প্রেরণ করা আমি দু' কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত, এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মূহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে। বাঘে খাওয়ার আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের পাদদেশে হযরত ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কথা শুনে বলল, আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্য বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকূব (আ.) পয়গম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হতো, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোনো সময় কোনো ছলছুতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে হযরত ইউসুফের কোনোরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোর্পদ করে বললেন, তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখাশোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে হযরত ইউসুফকে (আ.) কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ.)

পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনোরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিতাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুমি যে, এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছ তাদেরকে ডাক; তারাই তোমাকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতে বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোনো না কোনো উপায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ.) ইয়াহুদাকে বললেন, আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনে কষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হলো এবং তাকে বলল, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল, নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা উত্তর দিল আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল, তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোনো সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোনো কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোনো দেশে পৌছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াত এভাবে বর্ণিত হয়েছে। فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ ত'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

এখানে وَاَوْحَيْنَا শব্দটি فَلَمَّا ذَهَبُوْا -এর جَزَاءْ বা جَوَابٌ এখানে وَاوْ অক্ষরটি অতিরিক্ত ।-[তাফসীরে কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, ভাইয়েরা যখন মিলিতভাবে তাকে কূপে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেই ফেলল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সান্ত্বনার জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। এতে ভবিষ্যতে কোনো সময় ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং সাথে সাথে এ বিষয়েও সুসংবাদ দেওয়া হলো যে, তখন সে ভাইদের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং তাদের ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে থাকবে। ফলে সে তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিচার করবে অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। এক. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। দুই. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলি বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসরে

পৌছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন, যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল। -[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মিসর পৌছার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। -[কুরতুবী] এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো একজন পয়গাম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোনো ব্যবস্থা করেন নি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোনো কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা রাখা যে, আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাচনাকারীর বেশে ভাইদেরকেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ এস্থলে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তা দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারোটি নক্ষত্র তোমাকে সেজদা করে, তাদেরকে ডাক দাও। তারাই তোমার সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত ইউসুফের হেফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনোরূপ আঘাত পান নি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

হযরত ইউসুফ (আ.) তিনদিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌছে দিত।

قَوْلُهُ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ : অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌছল। হযরত ইয়াকূব (আ.) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ অর্থাৎ পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। ইবনে আরাবী 'আহকামুল কুরআনে' বলেন পারস্পরিক [দৌড়] প্রতিযোগিতা শরিয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব-প্রতিযোগিতা করানো [অর্থাৎ ঘোড়দৌড়]ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েজ। কিন্তু পরস্পর হারজিতে কোনো টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনোটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও না জায়েজ।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি জরুরি বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর

সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। হযরত ইয়াকূব (আ.) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে কিন্তু জামার কোনো অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি!

এভাবে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাস'আলা : হযরত ইয়াকূব (আ.) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবি ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারস্পরিক অবস্থা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা। মাওয়ারদি বলেন, হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হলো, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তার জামাটিই মোজেজার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা : কোনো কোনো আলেম বলেন, কাহিনীর এ পর্যায়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) পুত্রদেরকে বলেছেন بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا অর্থাৎ তোমাদের মন একটি বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হুবহু এই উক্তি তখনও করেছিলেন, যখন মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাই বিনয়ামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় এবং তার ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে এর সংবাদ দেয়। এ সংবাদ শুনেও তিনি بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا বলেছিলেন। এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, হযরত ইযাকূব (আ.) উভয় ক্ষেত্রে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তা নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। কেননা এক্ষেত্রে ভাইদের কোনো দোষ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, পয়গম্বরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে ভ্রান্ত হতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকতে দেওয়া হয় না।

কুরতুবী বলেন, এতে বুঝা যায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রদানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় যে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সম্মত নয়।

قَوْلُهٗ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ : এখানে سَيَّارَةٌ শব্দের অর্থ কাফেলা وَارِدٌ বলে কাফেলার অগ্রবর্তী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কাফেলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব اِدْلَاءٌ শব্দের অর্থ কূপে বালতি নিক্ষেপ করা। উদ্দেশ্য এই যে, ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদেরকে কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলা পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধ কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। হযরত ইউসুফের স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থা তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোনো কিছু হয়না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ [তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন]। তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলির সাথে তার কোনো সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব মনে করে বসে।

মোটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলি তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ

অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল : يَا بُشْرَى هٰذَا غُلَامٌ আরে, আনন্দের কথা! এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ মুসলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً : অর্থাৎ তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানো জন্য যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বের করল। তখন তারা বলল, এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফেলা কি করবে সব আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোনো রহস্যের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেন নি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর বলেন, এ বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, আপনার কওম আপনার সাথে যা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জ্ঞান ও শক্তির আওতাধীন রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে পারি কিন্তু আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়াই হিকমতের চাহিদা। পরিণামে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা হবে যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ : আরবি ভাষায় شِرَاءٌ শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে হযরত ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা হযরত ইউসুফ (আ.) কে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেন, আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دَرَاهِمُ শব্দের সাথে مَعْدُوْدَةٌ [গুণাগুনতি] শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেন, বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিয়েছিল। দিরহামের সংখ্যা কত ছিল এ ব্যাপারে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে বাইশ এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে চল্লিশ।- [তাফসীরে ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ : এখানে زَاهِدِيْنَ শব্দটি زَاهِدٌ-এর বহুবচন زُهْدٌ থেকে এর উৎপত্তি। زُهْدٌ-এর শাব্দিক অর্থ বৈরাগ্য ও নির্লিপ্ততা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় সাংসারিক ধনসম্পদের প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা এ ব্যাপারে আসলে ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষী ছিল না। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাই অল্প সংখ্যক দিরহামের বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়।

অনুবাদ :

٢١. وَقَالَ الَّذِيْ اشْتَرٰهُ مِنْ مِصْرَ وَهُوَ قِطْفِيْرُ الْعَزِيْزُ لِامْرَاَتِهٖ زُلَيْخَا اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ مَقَامَهٗ عِنْدَنَا عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ط وَكَانَ حَصُوْرًا وَكَذٰلِكَ كَمَا نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجُبِّ وَعَطَفْنَا قَلْبَ الْعَزِيْزِ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ حَتّٰى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ط تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا عَطْفٌ عَلٰى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَكَّنَّا اَيْ لِنُمَكِّنَهٗ اَوِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ تَعَالٰى لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ.

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে অর্থাৎ মিসর সম্রাটের সভাসদ কিতফীর তার স্ত্রী যুলায়খাকে বলল, আমাদের নিকট তার অবস্থান সম্মানজনক কর। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। সে রতিক্রিয়ায় অক্ষম এক পুরুষ ছিল। এবং এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তাকে নিহত হওয়া হতে এবং কূপ হতে রক্ষা করলাম ও আযীয বা মিসর সম্রাটের সভাসদের মনে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক করে দিলাম সেভাবে আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সেই দেশে অর্থাৎ মিসর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলাম। শেষে যা হওয়ার তা হলো, এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করলাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর কার্যে অপ্রতিরোধ্য। তাঁকে কোনো কিছু অক্ষম ও প্রতিহত করতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ তা অবগত নয়। مَثْوٰى অর্থ অবস্থান। وَلِنُعَلِّمَ উপরিউক্ত مَكَّنَّا ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এ স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়া। لِنُمَكِّنَهٗ -এর সাথে এটার عَطْفٌ বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। অথবা , টি এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এ স্থানে এটার অর্থ স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

٢٢. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَهُوَ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً اَوْ ثَلٰثٌ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا حِكْمَةً وَعِلْمًا ط فِقْهًا فِي الدِّيْنِ قَبْلَ اَنْ يُبْعَثَ نَبِيًّا وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ.

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো অর্থাৎ তার বয়স যখন ত্রিশ বা তেত্রিশ তখন তাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করার পূর্বেই হুকুম অর্থাৎ হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দীনের বিশেষ উপলব্ধি দান করলাম। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে আমি তাকে পুরস্কৃত করেছি সেভাবে নিজেদের প্রতি যারা দয়াশীল তাদেরকে পুরস্কৃত করি।

٢٣. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا هِيَ زُلَيْخَا عَنْ نَّفْسِهٖ اَيْ طَلَبَتْ مِنْهُ اَنْ يُّوَاقِعَهَا وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ لِلْبَيْتِ وَقَالَتْ لَهٗ هَيْتَ لَكَ ط اَيْ هَلُمَّ وَاللَّامُ لِلتَّبْيِيْنِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَاُخْرٰى بِضَمِّ التَّاءِ.

২৩. সে যে মহিলার গৃহে ছিল সে অর্থাৎ জুলায়খা তাকে নিজের দিকে ফুসলাইল, অর্থাৎ অসৎভাবে তার সাথে সঙ্গত হতে আহ্বান করল এবং ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও তাকে বলল আস। هَيْتَ অপর এক কেরাতে এ কাসরাসহ এবং অপর আরেক কেরাতে ت-এ পেশ সহ পঠিত রয়েছে। لَكَ-এটার ل-টি تَبْيِيْن বা [এ স্থানের مَفْعُوْل বা কর্মপদটির] সুস্পষ্টকরণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّهُ اَىْ اَلَّذِىْ اشْتَرَانِىْ رَبِّىْ سَيِّدِىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ط مَقَامِىْ فَلَا اَخُوْنُهُ فِىْ اَهْلِهِ اِنَّهُ اَىْ اَلشَّاْنُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ الزُّنَاةَ ـ

সে বলল, আল্লাহ পানাহ অর্থাৎ তা হতে আমি আল্লাহর আশ্রয় নিতেছি, নিশ্চয় তিনি অর্থাৎ যিনি আমাকে ক্রয় করে এনেছেন তিনি আমার প্রভু অর্থাৎ মালিক তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন তাঁর পরিবারের বিষয়ে আমি কোনোরূপ খেয়ানত করতে পারি না। مَثْوَاىَ অর্থ আমার অবস্থান। اِنَّ এটার শেষের ضَمِيْر বা সর্বনামটি شَانٌ বা অবস্থাবাচক নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীগণ ব্যভিচারীগণ সফলকাম হয় না

٢٤. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ قَصَدَتْ مِنْهُ الْجِمَاعَ وَهَمَّ بِهَا قَصَدَ ذٰلِكَ لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) مُثِّلَ لَهُ يَعْقُوْبُ فَضَرَبَ صَدْرَهُ فَخَرَجَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ اَنَامِلِهٖ وَجَوَابُ لَوْلَا لَجَامَعَهَا كَذٰلِكَ اَرَيْنَاهُ الْبُرْهَانَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ الْخِيَانَةَ وَالْفَحْشَاۤءَ ط اَلزِّنَا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِيْنَ فِى الطَّاعَةِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ اَىْ اَلْمُخْتَارِيْنَ ـ

২৪. সেই মহিলা তার কথা ভাবে, তার সাথে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করে আরও সেও তার প্রতি অনুরক্ত হয়, তার ইচ্ছা করে, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তবে সে নিশ্চয় তাতে রত হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঐ সময় তার সামনে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রতিকৃতি ভেসে উঠে। তিনি তাঁর বুক চাপড়িয়ে দেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলের মাথা দিয়ে সম্ভোগ-লিপ্সা বের হয়ে চলে যায়। لَوْلَا [যদি না] এটার জওয়াব এ স্থানে উহ্য। উহা হলো لَجَامَعَهَا [তবে নিশ্চয় সে সঙ্গত হতো]। এভাবে আমি তাকে নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়েছিলাম তার থেকে মন্দকর্ম বিশ্বাসভঙ্গ করা ও অশ্লীলতা ব্যভিচার বিদূরিত করে রাখার উদ্দেশ্যে। সে ছিল আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। اَلْمُخْلِصِيْنَ-অপর এক কেরাতে তার ل অক্ষরটিতে ফাতহাসহ اَلْمُخْلَصِيْنَ রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থ, আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

٢٥. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ بَادِرًا اِلَيْهِ يُوْسُفُ لِلْفِرَارِ وَهِىَ لِلتَّشَبُّثِ بِهٖ فَاَمْسَكَتْ ثَوْبَهُ وَجَذَبَتْهُ اِلَيْهَا وَقَدَّتْ شَقَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا وَجَدَا سَيِّدَهَا زَوْجَهَا لَدَا الْبَابِ ط فَنَزَّهَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ قَالَتْ مَا جَزَاۤءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا زِنًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَىْ يُحْبَسَ فِى السِّجْنِ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِاَنْ يُّضْرَبَ ـ

২৫. তারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়ে গেল। হযরত ইউসুফ (আ.) পালাতে ছুটলেন আর ঐ মেয়েটি তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গেল। সে পিছন দিক হতে তাঁর কাপড় ধরে নিজের দিকে টান দিল। এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল আর তারা তার সর্দারকে অর্থাৎ যুলায়খার স্বামীকে দরজার নিকট পেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করে বলল, যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে ব্যভিচার করতে চায় তাকে কারাগারে প্রেরণ জেলে বন্দী করে রাখা বা প্রহার করত মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি দান ব্যতীত তার জন্য আর কি দণ্ড হতে পারে? اِسْتَبَقَا। অর্থ– তারা উভয়ে দৌড়াল। قَدَّتْ অর্থ– ছিঁড়ে ফেলল। اَلْفَيَا অর্থ– তারা উভয়েই পেল।

٢٦. قَالَ يُوسُفُ مُتَبَرِّئًا هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ط ابْنِ عَمِّهَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَهْدِ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ قُدَّامٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

২৬. হযরত ইউসুফ নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে বলল, সেই আমাকে ফুসলিয়েছিল। ঐ স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী তার চাচাতো ভাই বর্ণিত আছে যে, সে তখন দোলনার শিশু ছিল, সাক্ষ্য দিল। বলল, যদি তার জামার সম্মুখে ভাগ ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে আর সে [হযরত ইউসুফ (আ.)] মিথ্যাবাদীর অন্তর্ভুক্ত। قُبُلٌ অর্থ– সম্মুখে ভাগ

٢٧. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ خَلْفٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

২৭. আর তার জামা যদি পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে আর সে [হযরত ইউসুফ (আ.)] সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। دُبُرٌ অর্থ– পিছনের দিক।

٢٨. فَلَمَّا رَاٰ زَوْجُهَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ أَيْ قَوْلُكِ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ الخ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط إِنَّ كَيْدَكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ عَظِيْمٌ

২৮. স্ত্রীলোকটির স্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল, এটা অর্থাৎ কি দণ্ড হবে? তোমার এ কথা বলা তোমরা নারীদের ছলনা। হে নারী জাতি! তোমাদের ছলনা ভীষণ!

٢٩. ثُمَّ قَالَ يَا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ وَلَا تَذْكُرْهُ لِئَلَّا يَشِيْعَ وَاسْتَغْفِرِيْ يَا زُلَيْخَا لِذَنْبِكِ ج إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ الْاٰثِمِيْنَ

২৯. অতঃপর সে বলল, হে ইউসুফ! এটা অর্থাৎ এই ব্যাপারটিকে উপেক্ষা কর। কাউকেও এটা বলো না, এটা যেন প্রচার না হয়। আর হে যুলায়খা! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমিই অপরাধীদের পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقَالَ : وَاو হলো عَاطِفَهْ আর عَلَيْهِ হলো مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ অর্থাৎ فَاشْتَرَاهُ عَزِيْزُ مِصْرَ আর الَّذِيْ فَاشْتَرَاهُ وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ হলো قَالَ -এর ফায়েল। আর مِنْ مِصْرَ এটা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে فَاعِلٌ থেকে حَالٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ مِصْرَ শব্দের পূর্বে أَهْلِ -কে উহ্য মেনেছেন। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, الَّذِيْ اشْتَرَاهُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ আবার কেউ কেউ مِنْ -কে فِيْ অর্থে নিয়েছেন অর্থাৎ اشْتَرَاهُ فِيْ مِصْرَ এ সুরতে কোনো اِلْتِبَاسٌ থাকে না। -[মাজেদী] قَالَ لِامْرَأَتِهِ হলো مُتَعَلِّقٌ আর أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ হলো مَقُوْلَهْ -এর

قَوْلُهُ قِطْفِيْر : এটা قِنْدِيْلٌ -এর ওযনে মিশরের ধনাগারের মন্ত্রীর নাম। তার উপাধি হলো 'আজীজ"।

قَوْلُهُ أَكْرِمِيْ مَقَامَهُ عِنْدَنَا : অর্থাৎ তাকে নিজেদের নিকট ইজ্জত ও সম্মানের সাথে রাখ।

قَوْلُهُ حَصُوْرًا : এটা মুবলাগার সীগাহ, অর্থ হলো– সহবাসে অক্ষম ব্যক্তি।

قَوْلُهُ لِنُعَلِّمَهُ :এটা মুযারে'-এর সীগাহ, যা لَامْ-এর পরে أَنْ উহ্য থাকার কারণে মানসূব হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) لِنُعَلِّمَهُ-এর মধ্যে দুটি তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম হলো وَاو টা আতেফা হবে, এ সুরতে উহ্য ইবারত হবে-

লِنُمَلِّكَهُ-এর আতফ উহ্য لِنُعَلِّمَهُ এ সুরতে مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ لِنُمَلِّكَهُ مَا فِيهَا وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ-এর উপর হবে. মুফাসসির (র.) -এর উক্তি عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ-এর উদ্দেশ্য এটাই। দ্বিতীয় সুরত হলো واو টি অতিরিক্ত হবে. এ সুরতে উহা ইবারত হবে- مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ যদি نُمَلِّكَهُ টি مِلْكٌ [মীমের নিচে যের] হতে নির্গত হয় তবে অর্থ হবে যাতে আমি তাকে মালিক বানাই। আর যদি مُلْكٌ [بِضَمِّ الْمِيمِ] নির্গত হয় তবে অর্থ হবে- যাতে করে তাকে বাদশাহ বানাই। (جُمَلٌ)

قَوْلُهُ أَشُدَّهُ : এটা একবচন তবে বহুবচনের ওযনে হয়েছে।

সতর্কীকরণ : জালালাইনের নোসখায় لِنُمَكِّنَهُ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ ইবারত হবে- لِنُمَلِّكَهُ

قَوْلُهُ رَاوَدَتْهُ : সেই নারী তাকে প্রবঞ্চিত করল। এটা وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ এর-مَاضِى-এর সীগাহ। আর ه যমীর হলো وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর।

قَوْلُهُ طَلَبَتْ مِنْهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে مُفَاعَلَةٌ থেকে হলেও একদিকের জন্য হবে।

قَوْلُهُ هَيْتَ لَكَ : এ বাক্যটি দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত। একটি হলো هَيْتَ আর অপরটি হলো لَكَ আর هَيْتَ টা اِسْمُ فِعْلٍ যা أَقْبِلْ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থ আস। আর لَكَ-এর لَامٌ টি হলো حَرْفُ جَارٍّ আর كَافٌ হলো مَجْرُورٌ ; جَارٌّ مَجْرُورٌ মিলে উহ্য أَمْرٌ-এর ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। এর অর্থ হলো আমি তোমাকেই বলতেছি যে, দ্রুত আস। (رُوحٌ)

سِرَاجٌ-এর মধ্যে খতীব লিখেছেন যে, هَيْتَ لَكَ পুরোটাই اِسْمُ فِعْلٍ এটা هَلُمَّ-এর অর্থে হয়েছে। যার অর্থ হলো- আস। আর هَيْتَ-এর تَاءٌ বর্ণে তিন প্রকার اِعْرَابٌ-ই রয়েছে। لَكَ-এর মধ্যে لَامٌ-টি مُخَاطَبٌ-এর ব্যাখ্যার জন্য। অর্থাৎ هَيْتَ-এর মধ্যে যে مُخَاطَبٌ রয়েছে তাকে لَكَ দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে كَافٌ مُخَاطَبٌ-এর প্রয়োজন না হওয়ার কারণে শুধুমাত্র সুস্পষ্ট করার জন্যই নেওয়া হয়েছে। কেননা هَيْتَ-এর অর্থ যা, তাই هَيْتَ لَكَ-এর অর্থও; যেমন سُقْيًا لَكَ বলে থাকে। অথচ لَكَ-এর كَافٌ خِطَابٌ-এর প্রয়োজন নেই। কেননা سَقْيًا-এর অর্থ এবং سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا-এর অর্থ হুবহু একই অর্থ سَقْيٌ-কে শুধুমাত্র تَاكِيدٌ বৃদ্ধি করার জন্যই নেওয়া হয়েছে। (اِعْرَابُ الْقُرْآنِ لِلدَّرْوِيشِ)

قَوْلُهُ مَعَاذَ اللّٰهِ : এটা عَاذَ يَعُوذُ-এর একটি মাসদার।

قَوْلُهُ وَجَوَابُ لَوْلَا لَجَامَعَهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَوْلَا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত هَمَّ بِهَا নয়। কেননা لَوْلَا-এর জবাব لَوْلَا-এর উপর مُقَدَّمٌ হয় না।

قَوْلُهُ أَرَيْنَاهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِذٰلِكَ উহ্যের মাফউল হওয়ার কারণে نَصَبٌ-এর স্থানে হয়েছে। অর্থাৎ أَرَيْنَاهُ كَذٰلِكَ আর لِنَصْرِفَ-এর لَامٌ টা উহ্য أَرَيْنَا-এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রাথমিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফেলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন তার ভাইয়েরা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমত তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকাপয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোনো রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তাফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফেলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল, দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না; বরং বেঁধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা অজ্ঞ কাফেলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কুরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বুঝা যায়, তার বেশি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণত কাফেলার বিভিন্ন মঞ্জিল

অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌঁছা, সেখানে পৌঁছে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে– وَقَالَ الَّذِىْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهٖ اَكْرِمِىْ مَثْوَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ইউসুফ-এর বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতার প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ রেশমি বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা এ রত্ন আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কুরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোনো দৈবাৎ ঘটনা নয়; বরং বিশ্বপালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে কাছীর বলেন, যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম 'কিতফীর' কিংবার 'ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি 'রাইয়ান ইবনে ওসায়দ'। তিনি পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। –[মাযহারী] ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল 'রাইল' কিংবা 'জুলায়খা' আজীজে মিসর 'কিতফীর' হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন: তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও; ক্রীতাদাসের মতো রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। **প্রথম.** আজীজে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরিউক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। **দ্বিতীয়.** হযরত শো'আয়ব (আ.)-এর ঐ কন্যা, যে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল يَآ اَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ পিতা! 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' **তৃতীয়.** হযরত আবূ বকর সিদ্দীক যিনি ফারূকে আজম (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেছিলেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ : অর্থাৎ এমনভাবে আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এখন ক্রীতদাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্ব প্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

قَوْلُهٗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ : এখানে শুরুতে وَاوْ কে عَطْف -এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরিউক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরি জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

قَوْلُهٗ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا : অর্থাৎ যখন হযরত ইউসুফ (আ.) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন' কোন বয়সে অর্জিত হলো, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রা.) বলেন, তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহহাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন; তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুয়ত দান করা। এতে আরও চল

গেল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)- মিসর পৌঁছারও অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না; বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গম্বর নয় এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায় যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ : আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি : উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সদাচরণ, আল্লাহ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে : وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে হযরত ইউসুফ (আ.) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল, শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কুরআন 'আজীজ পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গুনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেন নি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গাম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং জুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং জুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েক দিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশি স্বীকার করা দরকার।

এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) আজীজে মিসরকে স্বীয় 'রব' পালনকর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোনো দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোনো প্রভু স্বীয়দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে চিত্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর اِنَّهٗ رَبِّىْ 'তিনি আমার পালনকর্তা বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে اِنَّهٗ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল, তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর জুলায়খা বলল, তোমার নেত্রদ্বয় কতই না

মনোহর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। জুলায়খা আরও বলল, তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশি প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী জুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল; কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, জুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ ত'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি [কল্পনা অর্থে] যুলায়খা ও হযরত ইউসুফ (আ.) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, জুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থি। কেননা সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গুনাহ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনোরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গুনাহ অনিচ্ছা ও ভুলবশত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গাম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া পরিণত ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরি। কেননা যদি পয়গাম্বরগণের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোনো উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোনো উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই গুনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া গেছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনে যে কল্পনা ছিল তা পাপ পর্যায়ের ছিল না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, আরবি ভাষায় هَمَّ শব্দটি দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. কোনো কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করে ফেলা। দুই. শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমোক্ত প্রকারটি পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর একমাত্র আল্লাহর ভয়ে কেউ এ গুনাহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কার্যে করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, গ্রীষ্মকালীন রোজায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোজা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ জন্য কোনো শাস্তি বা গুনাহ নেই।

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। –[তাফসীরে কুরতুবী]

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা যখন কোনো সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎ কাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোনো পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে তখন, পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপ কাজটি করেই ফেলে, তবে একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ কর। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তাফসীরে কুরতুবীতে উপরিউক্ত দু' অর্থে هَمَّ শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে আরবদের প্রচলিত বাকপদ্ধতি ও কবিতার সাক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

এতে বুঝা গেল যে, আয়াতে যদিও هَمّ শব্দটিকে জুলায়খা ও হযরত ইউসুফ (আ.) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের هَمّ অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গিও এ দাবির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা উভয়ের কল্পনা যদি একই প্রকার হতো, তবে এ ক্ষেত্রে تَثْنِيَةٌ তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে وَلَقَدْ هَمَّا বলা হতো, যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা ছেড়ে উভয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক বর্ণনা করে هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا বলা হয়েছে। জুলায়খার কল্পনার সাথে তাকিদের শব্দ لَقَدْ যোগ করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর هَمّ ও কল্পনার সাথে তা যোগ করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জুলায়খার কল্পনা এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরজ করল, আপনার এ খাঁটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, অপেক্ষা কর। যদি সে এ গুনাহ করে ফেলে, তবে যেরূপ কাজ করে, তদ্রূপই তার আমলনামায় লিখে দাও; আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা সে একমাত্র আমার ভয়ে স্বীয় খাহেশ পরিত্যাগ করেছে। এটা খুব বড় নেকী। –[তাফসীরে কুরতুবী]

মোটকথা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আয়াতের বাক্যাংশে অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ : অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হতো যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তী বাক্য হচ্ছে لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ এখানে এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণাও অন্তরে থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল? কুরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মোজেজা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আজীজে মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কুরআন পাকের এ আয়াতে লিখিত দেখলেন।

لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاۤءَ سَبِيْلًا অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা এটা খুবই নির্লজ্জতা, [আল্লাহর শাস্তির কারণ] এবং [সমাজের জন্য] অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন জুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিকে জুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গুনাহ করার মতো সাহস আমার নেই। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমার উপাস্য আরও বেশি লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারও কারও মতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবুয়ত ও বিভুজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তার প্রমাণ।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, কুরআন পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালঙ্ঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরীত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল। তাফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যে কোনো একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَاۤءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ : অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ.)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গুনাহ এবং 'নির্লজ্জলতা' বলে কবীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানো কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নবুয়তের কারণে এ গুনাহ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কুরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) কোনো সামান্যতম গুনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হতো যে, আমি হযরত ইউসুফকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম এভাবে বলা হতো না যে, গুনাহকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে مُخْلَصِيْنَ শব্দটির লামের যবর-যোগে مُخْلَصٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার ঐ সব বান্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ রিসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এমন লোকদের চারপাশে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ মনোনীত বান্দাদের উপর তার কলাকৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ আপনার ইজ্জত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করবই, তবে যে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি مُخْلِصِيْنَ লামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। مُخْلِصٌ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে, এতে কোনো পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ سُوْءٌ ও فَحْشَاءٌ ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। فَحْشَاءٌ শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। এতদ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি যে هَمٌّ অর্থাৎ কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোনো প্রকারের গুনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাফ।

قَوْلُهُ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আজীজে-মিসরের পত্নী যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গাম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোনো এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোনো আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এ নির্জন কক্ষে আল্লাহর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ পত্নী তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত ইউসুফ (আ.) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে জুলায়খাও তথায় উপস্থিত হলো। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) দৌড়ে দরজায় পৌঁছতেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্য বলল, যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোনো কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন, هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي অর্থাৎ সেই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবত কথা বলতে অক্ষম এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে হযরত মূসা (আ.)-কে শৈশবে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনি ভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কারও ধারণা ছিল যে, সে এসব কার্যকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বে প্রত্যেকটি অণু-পরামাণু তাঁর গুপ্ত পুলিশ [গোয়েন্দা বাহিনী]। এরা অপরাধীকে ভালোভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী যখন স্বীয় অরপাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনোটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী।

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশু বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মোজেজা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নির্দোষ এবং দোষ জুলায়খার, তবে তাও একটি মোজেজারূপে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি দেখ যদি তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে জুলায়খার কথা সত্য এবং হযরত ইউসুফ (আ.) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোনো আশঙ্কাই নেই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পলায়নরত ছিলেন এবং জুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়া এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা চারটি শিশুকে দোলনায় বাকশক্তি দান করেছেন। এ শিশু চতুষ্টয় তারাই, যাদের কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাক্ষ্যদাতা'র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে জারীর ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য।

মোটকথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, জুলায়খা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ থেকে এ বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা প্রকাশ করলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি দেখা হোক। যদি তা পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিষ্কার আলামত যে, তিনি পলায়ন করেছিলেন এবং জুলায়খা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছিল। কাজেই হযরত ইউসূফ (আ.) নির্দোষ।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজীজে -মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক তথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ জুলায়খার এবং হযরত ইউসুফ (আ.) পবিত্র। তদনুসারে সে জুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল, নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বুঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাব বশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে। -[তাফসীরে মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয়নি; বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছলচাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর জুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলল يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا অর্থাৎ ইউসুফ এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না। যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর জুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ অর্থাৎ ভুল তোমারই। তুমি নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধীরতা ও স্থিরতা সহকারে কথাবার্তা বলা মানবস্বভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে কোনো কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে গুনাহ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য যে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই অংশ হিসেবে আজীজে মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি। নতুবা সহজাত অভ্যাস অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য হারা হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুলী বিষয়। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে যেত, তবে তার মুখ কিংবা হাত দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে মর্যাদাহানিকর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এটা আল্লাহর কুদরতেরই লীলা। তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে পদে হেফাজত করেন। تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

পরবর্তী আয়াতসমূহে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা পরবর্তী কাহিনীর সাথেই সংশ্লিষ্ট। তা এই যে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্ত্রী। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। আজীজে-মিসরের বেগম এত বড় পদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের তরুণ ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়! আমরা তাকে নিদারুণ পথভ্রষ্ট মনে করি। আয়াতে فَتًى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ। সাধারণের পরিভাষায় অল্পবয়স্ক ক্রীতদাসকে গোলাম, যুবক ক্রীতদাসকে فَتًى এবং যুবতী ক্রীতদাসীকে فَتَاةٌ বলা যায়। এখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জুলায়খার ক্রীতদাস বলার কারণ হয়তো এই যে, স্বামীর জিনিসকেও স্ত্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল। -[তাফসীরে কুরতুবী]

৩০. وَاشْتَهَرَ الْخَبَرُ وَشَاعَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ مِصْرَ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَبْدَهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ج قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تَمْيِيْزٌ اَيْ دَخَلَ حُبُّهُ شِغَافَ قَلْبِهَا اَيْ غِلَافَهُ اِنَّا لَنَرٰهَا فِيْ ضَلٰلٍ خَطَأٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ بِحُبِّهَا اِيَّاهُ.

৩১. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ غِيْبَتِهِنَّ لَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ اَعَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً طَعَامًا يَقْطَعُ بِالسِّكِّيْنِ لِلْاِتِّكَاءِ عِنْدَهُ وَهُوَ الْاُتْرُجُّ وَاٰتَتْ اَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتْ لِيُوْسُفَ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ اَعْظَمْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ز بِالسَّكَاكِيْنِ وَلَمْ يَشْعُرْنَ بِالْاَلَمِ لِشُغْلِ قَلْبِهِنَّ بِيُوْسُفَ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهٗ مَا هٰذَا اَيْ يُوْسُفُ بَشَرًا ط اِنْ مَا هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ لِمَا حَوَاهُ مِنَ الْحُسْنِ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ عَادَةً فِي النَّسَمَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَفِي الصَّحِيْحِ اَنَّهٗ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ .

৩২. قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ لَمَّا رَاَتْ مَا حَلَّ بِهِنَّ فَذٰلِكُنَّ فَهٰذَا هُوَ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ط فِيْ حُبِّهٖ بَيَانٌ لِعُذْرِهَا وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ امْتَنَعَ

অনুবাদ :

৩০. এই ঘটনাটি প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করে ; তখন নগরের মিসর নগরের কিছু নারী বলল, আযীযের অর্থাৎ মিসর সম্রাটের সভাসদের স্ত্রী তার যুবকটির উপর অর্থাৎ দাসটিকে নিজের প্রতি ফুসলায় ; প্রেম তার অন্তস্থলে স্থান করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে অর্থাৎ একে ভালোবাসার মধ্যে সে স্পষ্ট ভুলে নিপতিত দেখতেছি। حُبًّا এটা এই স্থানে تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। شَغَفَهَا حُبًّا-অর্থ, ভালোবাসা তার অন্তরের আবরণের ভিতর গিয়ে ঢুকে গেছে شِغَاف -অর্থ আবরণ

৩১. ঐ নারী যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তার নিন্দা শুনল তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য এমন আহার প্রস্তুত করল اَعْتَدَتْ অর্থ প্রস্তুত করল مُتَّكَأً -এমন আহার যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়। কেননা সেই সময় হেলান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এটার শাব্দিক অর্থ হলো, যাতে হেলান দেওয়া হয়। যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়। এটা ছিল লেবু জাতীয় ফল বিশেষ। আর তাদের প্রত্যেকের নিকট একটি করে ছুরি আনল অর্থাৎ প্রত্যেককে ছুরি দিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলল, 'তাদের সম্মুখে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন একে বিরাট বলে মনে করল দারুণ বলে মনে করল এবং ছুরি দিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল হযরত ইউসুফ (আ.) কে দেখে তাদের মন এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তাতে ব্যথাও টের পেল না। বলল, আল্লাহর অপূর্ব লীলা! সকল মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা তাঁরই, এ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) তো মানুষ নয়। এতো মহিমান্বিত এক ফেরেশতা। কারণ তার মধ্যে সুন্দরের এত সমাবেশ যে, সাধারণত মানুষ জাতির মধ্যে তা হয় না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে সমস্ত সৌন্দর্যের অর্ধাংশ প্রদান করা হয়েছিল।

৩২. আযীয বা মিসর সম্রাটের ঐ সভাসদের স্ত্রী তাদের অবস্থা দেখে বলল, এই সে যার বিষয়ে যার ভালোবাসার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে নিন্দা করেছ। এই বাক্যটি ঐ স্ত্রীলোকটির কৈফিয়তের বিবরণস্বরূপ। আমি তো আমার সম্পর্কে তাকে খুবই ফুসলিয়েছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, তা হতে নিজকে বিরত রেখেছে।

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ بِهٖ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ الذَّلِيْلِيْنَ فَقُلْنَ لَهٗ اَطِعْ مَوْلَاتَكَ .

আমি তাকে যার আদেশ করতেছি সে যদি তা না করে তবে অবশ্যই তাকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নীচদিগের হেয়দিগের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন ঐ আমন্ত্রিত মহিলারাও তাঁকে তাঁর মালিক স্ত্রীলোকটির কথা মেনে নিতে বলে।... ذَالِكُنَّ الَّذِىْ - এই সে যার সম্পর্কে...

৩৩. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ ج وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اَمِرْ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ اَصِرْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَالْقَصْدُ بِذٰلِكَ الدُّعَاءُ فَلِذَا قَالَ تَعَالٰى .

৩৩. সে হযরত ইউসুফ (আ.) বলল, হে আমার রব, এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করতেছে তা অপেক্ষা কারগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব ঝুঁকে পড়ব এবং অজ্ঞদের পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। এই বক্তব্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দরবারে নিজের অবস্থা সম্পর্কে দোয়া করা। তাই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতটিতে ইরশাদ করেন-

৩৪. فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ دُعَاءَهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ .

৩৪. অতঃপর তার প্রতিপালক তার প্রার্থনা কবুল করে নিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি নিশ্চয় কথা শুনেন, আর সকল কাজ সম্পর্কে জানেন।

৩৫. ثُمَّ بَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى بَرَاءَةِ يُوْسُفَ اَنْ يَّسْجُنُوْهُ دَلَّ عَلٰى هٰذَا لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى اِلٰى حِيْنٍ يَنْقَطِعُ فِيْهِ كَلَامُ النَّاسِ فَسُجِنَ .

৩৫. অনন্তর নিদর্শনাদি দেখার পরও অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষিতার প্রমাণ দেখার পরও তাদের নিকট স্পষ্ট হলো, এই কথা তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল যে, তাকে করারুদ্ধ করতে হবে। এ কথার প্রমাণ হলো পরবর্তী বাক্য لَيَسْجُنُنَّهٗ নিশ্চয়ই তাকে তারা কিছুকালের জন্য কারাগারে দিবে। যাতে এই বিষয়ে মানুষের আলোচনা-সমালোচনা বন্ধ হয়ে যায়। অনন্তর তাকে কারা রুদ্ধ করা হলো حِيْنٍ -এটার পূর্বে একটি اِلٰى [পর্যন্ত] উহ্য রয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য এটার তাফসীরে اِلٰى -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نِسْوَةٌ : অর্থ মহিলাদের দল, এটা اِسْمُ جَمْعٍ এই শব্দের একবচন নেই। আর অর্থের হিসেবে اِمْرَاَةٌ এর একবচন। نِسْوَةٌ হলো مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِىْ এর ফে'ল مُذَكَّرٌ এবং مُؤَنَّثٌ উভয়টি নেওয়াই বৈধ। এ কারণেই قَالَتْ -এর পরিবর্তে قَالَ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهٗ مَدِيْنَةُ مِصْرَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْمَدِيْنَةُ-এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ-টি عَهْدِىْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِمْرَاَةُ الْعَزِيْزِ : এটা হলো মুবতাদা আর تُرَاوِدُ হলো তার খবর, تُرَاوِدُ টা বাবে مُفَاعَلَةٌ হতে মুযারে' -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ, অর্থ হলো সে প্রবঞ্চিত করে, ফুসলায়।

قَوْلُهٗ تَمْيِيْزٌ : এটা একটি আপত্তির জবাব, যে, شَغَفَ টা مُتَعَدِّىْ بَيَكْ مَفْعُوْلْ হয়ে থাকে। অথচ এখানে তার দুটি মাফউল হয়েছে একটি হলো هَا অপরটি হলো حُبًّا

উত্তর. হলো حُبًّا টা হলো تَمْيِيز এটা মাফউল নয়। এটা ফায়েল হতে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। মূল ইবারত এরূপ ছিল যে, دَخَلَ حُبُّهُ فِيْ شِغَافِ قَلْبِهَا

قَوْلُهُ شِغَافُ : شِغَافُ الْقَلْبِ বলা হয় ঐ ঝিল্লি বা চামড়ার পাতলা আবরণ কে যা অন্তকরণকে বেষ্টন করে রাখে।

قَوْلُهُ اَعْتَدَتْ : এ শব্দটি اِعْتَادٌ থেকে مَاضِىْ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ, অর্থ তৈরি করা।

قَوْلُهُ مُتَّكَأ : এটা اِسْمُ مَكَانٍ অর্থ হেলান দেওয়ার স্থান, মসনদের উপর রক্ষিত বালিশ, মসনদ। আরবগণ مُتَّكَأٌ বলতে সেই বস্তুকে বুঝিয়ে থাকেন, যাতে খাওয়া দাওয়া ও কথাবর্তা বলার সময় হেলান দেওয়া হয়। ইমাম রাযী (র.) বলেন, ঐ খাবার কে বলা হয় যা খেতে ছুরির প্রয়োজন হয়ে থাকে। [তাফসীরে কাবীর]

বর্তমান কালে যেরূপভাবে খাওয়ার জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপ ভাবে পূর্ববর্তী সভ্যতায় দস্তর খানের আশে পাশে বালিশের ব্যবস্থা করা হতো। এবং বর্তমানে যেভাবে টেবিল লাগানো ও দস্তরখানা বিছানোর দ্বারা খানা নির্বাচন/তৈরি করা উদ্দেশ্য হয় আর টেবিল বা দস্তরখানে বসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খাওয়ার জন্য বসা। অনুরূপভাবে তৎকালে মসনদে বালিশ স্থাপন করা দ্বারা খানা খাওয়ার জন্য বসা উদ্দেশ্য হতো। جَمِيْل-এর কবিতাটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

فَظَلَلْنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا ٭ وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ

অর্থ আমরা আনন্দে আহলাদে দিনাতিপাত করেছি এবং খাদ্য গ্রহণ করেছি এবং মটকা থেকে বের করে শারাব পান করেছি।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) مُتَّكَأً-এর তাফসীর করেছেন طَعَامًا يُقْطَعُ بِالسِّكِّيْنِ দ্বারা। এটা ইমাম রাযী (র.)-এরও অভিমত। কিন্তু এরপর وَهُوَ الْاُتْرُجُّ বাক্যটি লিখে দেওয়া হয়েছে। আল্লাম সুয়ূতী (র.) وَهَبْ-এর অনুসরণে এরূপ করেছেন। আবূ ওবায়দা ও অন্যান্য ভাষা পণ্ডিতগণ এটাকে অস্বীকার করেছেন। কেননা কমলা লেবুকে مُتَّكَأٌ বা مُتْكٌ বলা হয়। ضِرَارُ بْنُ نَهْشَلْ ও مُتَّكَأٌ অর্থ কমলা লেবু করেছেন فَاَهْدَتْ مُتَّكَةً لِبَنِىْ اَبِيْهَا [সে তার চাচাতো ভাইদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ কমলা লেবু প্রেরণ করেছেন। [লোগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ لِلْاِتِّكَاءِ : এর মাধ্যমে খাবার কে مُتَّكَأً বলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আরবগণ খাওয়ার সময় হেলান দিত এই মুনাসাবাতের কারণেই اِسْتِعَارَهْ-এর ভিত্তিতে খাবার কে مُتَّكَأً বলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ حَاشَ لِلّٰهِ : এখানে حَاشَا হলো حَرْفُ تَنْزِيْهٍ এই সময় এটা اِسْم হবে। আর এর ব্যবহার اِسْتِثْنَاءْ-এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ঐ সময় حَرْف হবে।

قَوْلُهُ بَيَانٌ لِعُذْرِهَا : এটা হলো তার জবাব যে, মিশরীয় নারীদের তো এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েই গিয়েছিল যে, আজীজের স্ত্রী তার ভৃত্যের উপর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন। তদুপরি فَذَالِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ এটাই তো সেই বস্তু যার ব্যাপারে তোমরা আমার তিরস্কার করছ।

উত্তর. জবাবের সারকথা হলো এই যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য খবর দেওয়া নয়; বরং স্বীয় অপারগতা ও অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করা যে, যাকে তোমরা এক পলক দেখেই হতবাক হয়ে গেলে এবং হস্ত কর্তন করে ফেলেছ, তাহলে এখন তোমরা বল যে, সে যখন সর্বদা আমার সাথে আমার ঘরেই অবস্থান করে তবে আমার অবস্থা কিরূপ হবে? কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে অক্ষম মনে কর।

قَوْلُهُ بِهٖ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, اٰمُرُهٗ-এর যমীর প্রকাশ্যত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। যদি ব্যাপারটি এরূপই হয় তবে مَائِے مَوْصُوْلَهْ টা عَائِدْ বিহীন থেকে যাবে।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো اٰمُرُهٗ-এর যমীর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দিকে ফিরেনি; বরং مَائِے مَوْصُوْلَهْ-এর দিকে ফিরেছে। আর মূলে ছিল اٰمُرُ بِهٖ اٰمُرُهٗ এখানে بَاءْ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ মূলে ছল اَمَرْتُكَ بِالْخَيْرِ

قَوْلُهُ لَهُمْ : অর্থাৎ لِلْعَزِيْزِ وَاَهْلِهٖ

قَوْلُهُ اَنْ يَسْجُنُوْهُ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন হলো এই যে, بَدَا হলো ফে'ল এর فَاعِلْ হলো لَيَسْجُنُنَّهُ অথচ ফে'ল ফায়েল হতে পারে না? কাজেই ফে'লটা فَاعِلْ বিহীন থেকে গেল, যা জায়েজ নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, بَدَا-এর ফায়েল لَيَسْجُنُنَّهُ নয়; বরং فَاعِلْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَنْ يَسْجُنُوْهُ আর اَنْ يَسْجُنُوْهُ টা اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ -এর সাথে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হয়ে بَدَا -এর فَاعِلْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো بَدَا تَسْجِيْنُهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ : অর্থাৎ যখন জুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল। এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে জুলায়খা مَكْر অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যত তারা কোনো চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً : অর্থাৎ তাদের জন্য তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا : অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হলো, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হলো। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হলো। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ : অর্থাৎ এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জুলায়খা বলল, একটু বের হয়ে এসো। হযরত ইউসুফ (আ.) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

قَوْلُهُ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ .... اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ : অর্থাৎ সমাগত মহিলারা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হলো, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল হায় আল্লাহ, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়! সে তো মহানুভব ফেরেশতা! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ জুলায়খা বলল, দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

জুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে , তখন সে তাদের সামনেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে লাগল, তুমি জুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোনো শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় যেমন يَدْعُوْنَنِيْ এবং كَيْدَهُنَّ এগুলোতে বহুবচনে কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও জুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোনো উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরজ করলেন— رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানা আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে

পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। "আমি জেলখানা পছন্দ করি" হযরত ইউসুফ (আ.) -এর এ উক্তি বন্দি জীবন প্রার্থনা বা কামনা নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যখন হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ আপনি বলেছিলেন اَلسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَیَّ অর্থাৎ এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোনো বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়া 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভালো মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। –[তাফসীরে তিরমিযী]

একবার হযরত ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করলেন, আমাকে কোনো একটি দোয়া শিক্ষা দেন। তিনি বললেন, পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

"যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবত আমি ওদের দিকে "ঝুঁকে পড়ব" হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরি, তার পরিপন্থি নয়। কারণ এ পবিত্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গুনাহের কাজ মূর্খতাবশত হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهٗ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখে আজীজে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানাঘুষার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হলো যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ : অর্থাৎ এর পর আজীজ ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন।

অনুবাদ :

٣٦. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ط غُلَامَانِ لِلْمَلِكِ اَحَدُهُمَا سَاقِيْهِ وَالْاٰخَرُ صَاحِبُ طَعَامِهِ فَرَاٰيَاهُ يُعَبِّرُ الرُّؤْيَا فَقَالَ لَنَخْتَبِرَنَّهُ قَالَ اَحَدُهُمَا السَّاقِيْ اِنِّيْٓ اَرٰنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ج اَيْ عِنَبًا وَقَالَ الْاٰخَرُ صَاحِبُ الطَّعَامِ اِنِّيْٓ اَرٰنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط نَبِّئْنَا خَبِّرْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ج بِتَعْبِيْرِهٖ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

৩৬. তার সাথে দুইজন যুবক সম্রাটের সেবক কারারুদ্ধ হলো। এদের একজন সম্রাটের পানীয় সরবরাহে অপরজন আহার সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারা দেখল, হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। তাই তারা একদিন তাকে পরীক্ষা করার জন্য একজন অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন বলল, স্বপ্নে দেখলাম, 'আমি আঙ্গুর নিংড়িয়ে মদ বের করতেছি, অপরজন অর্থাৎ আহার সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন বলল, স্বপ্নে দেখলাম, মাথায় রুটি বহন করতেছি আর তা হতে পাখি খাচ্ছে। আমাদেরকে এটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও। আমরা তোমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের মধ্যে দেখতেছি। خَمْرًا -দ্বারা এই স্থানে আঙ্গুর বুঝানো হয়েছে। نَبِّئْنَا আমাদেরকে সংবাদ দাও।

٣٧. قَالَ لَهُمَا مُخْبِرًا اَنَّهُ عَالِمٌ بِتَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖ فِيْ مَنَامِكُمَا اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ فِي الْيَقْظَةِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا تَاْوِيْلُهُ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ط فِيْهِ حَثٌّ عَلٰى اِيْمَانِهِمَا ثُمَّ قَوَّاهُ بِقَوْلِهٖ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ دِيْنِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ تَاكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ.

৩৭. স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানেন এই কথা জানাতে গিয়ে সে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) বলল, স্বপ্নে তোমাদেরকে খাদ্য দেওয়া হলে তার বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্বেই আমি জাগরণে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারি এই বিষয়ে আমার প্রভু আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এটা তা হতেই। অতঃপর তিনি তাদেরকে ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং বক্তব্যটিকে এই কথা বলে আরও শক্তিশালী করলেন যে, আমি বর্জন করে এসেছি এমন এক সম্প্রদায়ের মতবাদ ধর্ম যারা আল্লাহে ঈমান রাখে না আর পরকাল সম্পর্কেও তারা অবিশ্বাসী। بِالْاٰخِرَةِ هُمْ -এই স্থানে هُمْ শব্দটি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٨. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ لِعِصْمَتِنَا ذٰلِكَ التَّوْحِيْدُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ فَيُشْرِكُوْنَ ثُمَّ صَرَّحَ بِدُعَائِهِمَا اِلَى الْاِيْمَانِ.

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং হযরত ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আমরা যেহেতু মা'সূম ও নিষ্পাপ সেহেতু আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করা আমাদের কাজ নয় উচিত নয়। এটা অর্থাৎ তাওহীদের বিশ্বাস আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অর্থাৎ কাফেরগণ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তাই তারা তাঁর সাথে শরিক করে। مِنْ شَيْءٍ এই স্থানে مِنْ-টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٣٩. فَقَالَ يَا صَاحِبَىِ سَاكِنَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَيْرٌ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ .

৩৯. হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে স্পষ্টভাবে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে কারাসঙ্গীদ্বয়! কারা বসবাসকারীদ্বয়! বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয় না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ শ্রেয়? أأرباب এই স্থানে تقرير অর্থাৎ বক্তব্যটি আরো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।

٤٠. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اَىْ غَيْرِهِ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَا سَمَّيْتُمْ بِهَا اَصْنَامًا اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا بِعِبَادَتِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ اِنْ مَا الْحُكْمُ الْقَضَاءُ اِلَّا لِلّٰهِ ط وَحْدَهُ اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ التَّوْحِيْدُ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا يُصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ .

৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতগুলো নামের উপাসনা করতেছ যেগুলোর তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রতিমারূপে নামকরণ করে নিয়েছে এইগুলোর উপাসনার কোনো প্রমাণ কোনো সনদ ও দলিল আল্লাহ পাঠান নি। হুকুম ফয়সালা ও বিধান একমাত্র আল্লাহরই, যিনি এক। তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত না করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন। এটাই অর্থাৎ তাওহীদই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ জানে না যে, তারা কি শাস্তির দিকে এগিয়ে চলছে। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে। اِنِ الْحُكْمُ এই স্থানে اِنْ -টি নাবোধক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤١. يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا اَىِ السَّاقِىْ فَيُخْرَجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَيَسْقِىْ رَبَّهُ سَيِّدَهُ خَمْرًا ج عَلٰى عَادَتِهِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُخْرَجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهِ ط هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاهُ فَقَالَا مَا رَاَيْنَا شَيْئًا فَقَالَ قُضِىَ تَمَّ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ سَاَلْتُمَا عَنْهُ صَدَقْتُمَا اَمْ كَذَبْتُمَا .

৪১. হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন তিন দিন পর খালাস পাবে। আর [সে] পূর্ব দায়িত্ব অনুসারে তার প্রভুকে তার মালিককে মদ্যপান করাবে। এটা হলো এই জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর অপরজন-কেও তিন দিন পর এই স্থান হতে বের করা হবে অনন্তর তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে। এবং পাখি তার মস্তক হতে আহার করবে। এটা হলো এই জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এই সময় তারা দুইজন বলল, আমরা আসলে কিছুই দেখিনি। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন যে বিষয় সম্পর্কে তোমরা জানতে চেয়েছিলে প্রশ্ন করেছিলে সত্য বলে থাক বা মিথ্যা বলে থাক সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। তা শেষ হয়ে গিয়েছে।

٤٢. وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَيْقَنَ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وَهُوَ السَّاقِي اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ج سَيِّدِكَ فَقُلْ لَهُ اِنَّ فِي السِّجْنِ غُلَامًا مَحْبُوْسًا ظُلْمًا فَخَرَجَ فَاَنْسَاهُ اَيِ السَّاقِيَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ يُوْسُفَ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَبِثَ مَكَثَ يُوْسُفُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ قِيْلَ سَبْعًا وَقِيْلَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ

৪২. এদের মধ্যে যে জন মুক্তি পাবে বলে তাঁর ধারণা ছিল বিশ্বাস হয়েছিল, অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে যে ছিল তাকে বলল, তোমার প্রভু অর্থাৎ তোমার মালিকের নিকট আমার কথা বলিও যে, কারাগারে অন্যায়ভাবে এক গোলাম আটকা পড়ে রয়েছে। যা হোক, সে খালাস পেল কিন্তু শয়তান তাকে অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত সেই লোকটিকে তার প্রভুর নিকট তার কথা অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে কয়েক বৎসর বলা হয়, সাত বৎসর, অপর কেউ কেউ বলেন, বার বৎসর পড়ে রইলেন। لَبِثَ-অর্থ- পড়ে রইল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَسُجِنَ : এই উহ্য করণের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَاوْ-টি হলো عَاطِفَة আর উহ্যের উপর دَخَلَ-এর عَطْف হয়েছে। আর سُجِنَ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَلِكُ : এই বাদশাহর নাম ছিল রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ।

قَوْلُهُ اَيْ عِنَبًا : এটা مَايَؤُلُ اِلَيْهِ-এর হিসেবে مَجَازْ হয়েছে। কাজেই এই সংশয় শেষ হয়ে গেল যে, মদ নিংড়ানোর বস্তু নয়।

قَوْلُهُ مُخْبِرًا اَنَّهُ عَالِمٌ بِتَعْبِيْرِ الرُّؤْيَاءِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর জবাব প্রশ্ন অনুপাতে হয়নি।

قَوْلُهُ فِيْ مَنَامِكُمَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই তাফসীরকে রদ করা। যা কতিপয়, মুফাসসির طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ-এর তাফসীর, এমন খাবার দ্বারা করেছেন যা বন্দীদেরকে প্রদান করা হয়। কেননা এই তাফসীর অনুপাতে উভয় বন্দীদের প্রশ্ন এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা অবশিষ্ট থাকে না। কেননা প্রশ্ন স্বপ্নে খানার বস্তুর ব্যাপারে ছিল। আর উত্তর জাগ্রত অবস্থায় খাওয়ার ব্যাপারে হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَالِكُمَا : এটা ইসমে ইশারা দূরবর্তীর জন্য হয়েছে এবং উদ্দেশ্য হলো স্বপ্নের তা'বীরের জ্ঞান।

قَوْلُهُ ذَالِكَ التَّوْحِيْدُ : اِسْم اِشَارَه قَرِيْب-এর স্থানে اِسْم اِشَارَه بَعِيْد নেওয়া উচ্চ মর্যাদা ও তাওহীদের বড়ত্বকে প্রকাশ করার জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ صَرَّحَ بِدُعَائِهِمَا اِلَى الْاِيْمَانِ : অর্থাৎ কেনায়া ইঙ্গিত রূপে তাওহীদের দাওয়াত ছিল, আর এখানে সুস্পষ্ট রূপে। কাজেই تَكْرَارْ হওয়ার প্রশ্ন রহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ صَاحِبَيْ : এটা صَاحِبٌ-এর দ্বিবচন। মূলে ছিল صَاحِبَيْنِ এটা مُنَادٰى مُضَافٌ হওয়ার কারণে শেষের نُوْن-টি পড়ে গেছে।

قَوْلُهُ بِعِصْمَتِنَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এটা বলা যে, আমাদের জন্য কাউকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা কিছুতেই উচিত নয়। এই অনুচিত ব্যাপার টি শুধু হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার পিতৃপুরুষের জন্য অনুচিত ও কদর্য নয়; বরং এটাতো সমস্ত মানুষের জন্যই অনুচিত। তদুপরি ব্যাপারটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে নির্দিষ্টকরণ কিভাবে সহীহ হতে পারে?

উত্তর. لِيَعْصِمَنَا -এর বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া হয়েছে জবাবের সারকথা হলো এই যে, কুফর ও শিরকের অনুচিত হওয়া আমাদের জন্য এ জন্য নয় যে, তা হারাম, বরং এজন্য অনুচিত যে, আমাদেরকে তাহতে পবিত্র ও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে নবী না যারা তাদের বিপরীত। কেননা তাদেরকে কুফর থেকে পবিত্র ও সংরক্ষিত রাখা হয়নি। যদিও কুফর ও শিরককে তাদের উপরও হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ سَمَّيْتُمْ بِهَا : سَمَّيْتُمُوهَا-এর তাফসীর سَمَّيْتُمْ بِهَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, هَا. যমীরের مَرْجِعْ হলো أَسْمَاء কাজেই তখন অনুবাদ হবে সেই কতিপয় নাম যার তোমরা নাম রেখে দিয়েছ এমনিভাবে أَسْمَاء -এর জন্য أَسْمَاء হওয়া আবশ্যক হয়। যা বৈধ নয়।

জবাবের সারকথা হলো এই যে, ضَمِيْر مَنْصُوْب -এর পূর্বে حَرْف جَار উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো سَمَّيْتُمْ بِهَا এটা এরূপ যেমন বলা হয়েছে যে, سَمَّيْتُهُ زَيْدًا অর্থাৎ سَمَّيْتُ زَيْدًا

قَوْلُهُ مَا يَصِيْرُوْنَ : এটা يَعْلَمُوْنَ-এর মাফউল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কুরআন পাক ঐতিহাসিক ও কিস্সা কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কুরআন এবং অসংখ্য পয়গাম্বরের ঘটনাবলির মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটিই কুরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মতো ফুটে উঠা সত্ত্বেও আজীজে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা আজীজে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে কাসীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মকদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গাম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমতো তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হলো এবং বলল আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনোরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীর মধ্যে কেউ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বলল, আমরা আপনাকে খুব মহব্বত করি। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আল্লাহর কসম আমাকে মহব্বত করো না।

কারণ যখনই কেউ আমাকে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোনো না কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। শৈশবে ফুফু আমাকে মহব্বত করতেন। ফলে আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হয়। এরপর আমার পিতা আমাকে মহব্বত করেন। ফলে ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত অতঃপর গোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি। সর্বশেষ বেগম আজীজের মহব্বতের পরিণামে এ কারাগারে পৌঁছেছি। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী।]

হযরত ইউসুফ (আ.) -এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল, আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন, তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল, আমি স্বপ্ন দেখি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল, আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশে একটি মোজেজা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই।

বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ এটা কোনো ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মোজেজাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবত মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহর গুণাবলিতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়! এ সত্য ধর্মের তাওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন; কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহর দাস হওয়া ভালো, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছে। এরা শুধু নামসর্বস্বই অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। ওদের মধ্যে এমন কোনো সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপাস্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাজিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের আল্লাহ স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোনো নির্দেশও নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোনো প্রমাণ কিংবা সনদও নাজিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না।

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর হযরত ইউসুফ (আ.) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপরজনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শুলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত : ইবনে কাছীর বলেন, উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাতো, সে মুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত হয়ে না পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

সর্বশেষে বলেছেন, আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান ভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহর অটল ফয়সালা। যেসব তাফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বনোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল আমরা কোনো স্বপ্নই দেখিনি; বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এমন বাস্তবে তাই হবে যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরি করার যে গুনাহ করেছ, এখন তার শাস্তি তাই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়ও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারের কাটাতে হলো। আয়াতে بِضْعَ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায় কোনো কোনা তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বিধি-বিধান ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, মাস'আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।

মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুণ্ডা, বদমায়েশ ও অপরাধীদের আড্ডা। কিন্তু তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের সাথে দয়া ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয়ত্তাধীন রাখা প্রত্যেক সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

মাসআলা : আয়াতের اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ বাক্য থেকে জানা গেল যে, যাদেরকে পুণ্যবান, সৎকর্মী ও সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত।

মাসআলা : যারা সত্যের দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিত্রমাধুর্য এবং জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে; যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয় যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) এক্ষেত্রে স্বীয় মোজেজাও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ কচ্ছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ যদি জনসংস্কারের উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা কুরআনের নিষিদ্ধ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআনে বলা হয়েছে فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করো না।

মাসআলা : প্রচারক ও সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃত্তিকে সব কাজের অগ্রে রাখা। প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তাঁর কাছে কোনো কার্যোপলক্ষে আগমন করলে তাঁর

আসল কর্তব্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে কয়েদীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি উত্তরদানের পূর্বে দাওয়াত এবং প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত উপহার দিলেন। এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্রচার জনসভা, মিম্বর অথবা মঞ্চেই হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যমেই বরং এ কাজ আরও বেশি কার্যকর হয়ে থাকে।

মাসআলা : পথপ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এমন কথা বলা উচিত, যা সম্বোধিত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করতে পারে যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরি ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করারই ফলশ্রুতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের অনিষ্টকারিতা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

মাসআলা : এ থেকে প্রমাণিত হলো যে ব্যাপারে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরি, তা তার সামনে যতদূর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়; যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তা অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরূপ নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাকে শূলীতে চড়ানো হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী]

মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে বললেন, যখন বাদশার কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা করবে যে, সে নিরপরাধ কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্কৃত লাভের জন্য কোনো ব্যক্তিকে চেষ্টা তদ্‌বীরের মাধ্যমে স্থির করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়।

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলা মনোনীত পয়গাম্বরগণের জন্য সকল বৈধ প্রচেষ্টাও পছন্দ করেন না। যেমন, তাঁরা মুক্তির জন্য কোনো মানুষকে মধ্যস্থতাকারী স্থির করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতা না থাকাই পয়গাম্বরগণের আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদী হযরত ইউসুফ (আ.) -এর কথা ভুলে যায় এবং তাঁকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

অনুবাদ :

٤٣. وَقَالَ الْمَلِكُ مَلِكُ مِصْرَ الرَّيَّانُ بْنُ الْوَلِيْدِ إِنِّىْ أَرٰى أَىْ رَأَيْتُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ يَبْتَلِعُهُنَّ سَبْعٌ مِنَ الْبَقَرِ عِجَافٌ جَمْعُ عَجْفَاءَ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ أَىْ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ قَدِ الْتَوَتْ عَلَى الْخُضْرِ وَعَلَتْ عَلَيْهَا يٰاَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَاىَ بَيِّنُوْا لِىْ تَعْبِيْرَهَا إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ فَاعْبُرُوْهَا .

৪৩. সম্রাট অর্থাৎ মিসরের তৎকালীন সম্রাট আর-রায়্যান ইবনে আল ওলীদ বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করতেছে। গিলে ফেলতেছে, আর সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ। শুষ্ক শীষগুলো সবুজ শীষগুলোকে লেপটিয়ে রয়েছে এবং তাদের উপর প্রবল হয়ে রয়েছে। হে প্রধানগণ! আমার এই স্বপ্ন সম্পর্কে সমাধান দাও, আমাকে উহার ব্যাখ্যা বলে দাও। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার। তবে তার ব্যাখ্যা দাও। أَرٰى-এটা এই স্থানে مُضَارِعْ হলেও مَاضِىْ অর্থে ব্যবহৃত। তাই এটার তাফসীর رَأَيْتُ উল্লেখ করা হয়েছে। عِجَافٌ-এটা عَجْفَاءُ-এর বহুবচন, অর্থ শীর্ণকায়।

٤٤. قَالُوْآ هٰذِهٖ أَضْغَاثُ أَخْلَاطُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ

৪৪. তারা বলল, এটা অর্থহীন স্বপ্ন। আর আমরা অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। أَضْغَاثُ -অর্থ আবোল তাবোল।

٤٥. وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا أَىْ مِنَ الْفَتَيَيْنِ وَهُوَ السَّاقِىْ وَادَّكَرَ فِيْهِ إِبْدَالُ التَّاءِ فِى الْأَصْلِ دَالًا وَإِدْغَامُهَا فِى الدَّالِ أَىْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ حِيْنَ حَالِ يُوْسُفَ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ فَأَرْسِلُوْنِ فَأَرْسَلُوْهُ إِلَيْهِ فَأَتٰى يُوْسُفَ .

৪৫. এরা দুইজনের মধ্যে অর্থাৎ ঐ দুইজন সেবকের মধ্যে যে জন মুক্তি পেয়েছিল অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন এবং দীর্ঘকাল পরে যার হযরত ইউসুফের কথা স্মরণ হলো সে বলল, আমি এটার তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। اِدَّكَرَ -এতে মূলত ت টিকে د-এ পরিবর্তন করে পরবর্তী د-টিতে اِدْغَامْ করা হয়েছে। অর্থ স্মরণ করল। أُمَّةٍ -এই স্থানে অর্থ বহুকাল।

٤٦. فَقَالَ يَا يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ الْكَثِيْرُ الصِّدْقِ أَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَعَلِّىْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ أَىِ الْمَلِكِ وَأَصْحَابِهٖ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ تَعْبِيْرَهَا .

৪৬. অনন্তর তারা তাকে প্রেরণ করল। সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আসল। বলল, হে ইউসুফ হে অতি সত্যবাদী, সাতটি স্থূলকায় গাভী। তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে সমাধান দাও যাতে আমি লোকদের নিকট রাজা ও সভাসদদের নিকট ফিরে যেতে পারি আর যাতে তারা এর তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। اَلصِّدِّيْقُ -অর্থ অতি সত্যবাদী।

٤٧. قَالَ تَزْرَعُوْنَ أَيِ ازْرَعُوْا سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَبًا ج بِسُكُوْنِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا مُتَتَابِعَةً وَهِيَ تَأْوِيْلُ السَّبْعِ السِّمَانِ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ اُتْرُكُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهٖ لِئَلَّا يَفْسُدَ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ فَدُوْسُوْهُ.

৪৭. সে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) বলল, তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করবে। এটা হলো স্থূলকায় সাতটির তাৎপর্য। তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে এতে আর তা নষ্ট হবে না। আর যে পরিমাণ ভক্ষণ করবে সেই পরিমাণ শস্য কেবল মাড়িয়ে নিবে। تَزْرَعُوْنَ-এটা خَبَرِيَّة হলেও এই স্থানে اَمْر বা নির্দেশাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ চাষ কর। তাফসীরে اَمْر বা নির্দেশাত্মক শব্দ اِزْرَعُوْا উল্লেখ করে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। دَأَبًا-এটার মাঝের হামযা অক্ষরটি সাকিন ও ফাতাহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ একাদিক্রমে। ذَرُوْهُ-এই স্থানে অর্থ রেখে দাও।

٤٨. ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اَيِ السَّبْعُ الْمُخْصِبَاتُ سَبْعٌ شِدَادٌ مُجْدِبَاتٌ صِعَابٌ وَهِيَ تَأْوِيْلُ السَّبْعِ الْعِجَافِ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ مِنَ الْحَبِّ الْمَزْرُوْعِ فِي السِّنِيْنَ الْمُخْصِبَاتِ اَيْ تَأْكُلُوْنَهُ فِيْهِنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ تَدَّخِرُوْنَ.

৪৮. এটার পর প্রাচুর্যের সাত বৎসরের পর আসবে কঠিন সাত বৎসর খরা ও বিপদের সাত বৎসর। এটা হলো সাতটি শীর্ণকায় গাভীর তাৎপর্য। প্রাচুর্যের সাত বৎসর উৎপাদিত শস্য হতে যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে তা এই সময় খাবে তবে সামান্য কিছু যা তোমরা হেফাজত করবে সঞ্চয় করে রাখবে তা ব্যতীত।

٤٩. ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اَيِ السَّبْعِ الْمُجْدِبَاتِ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ بِالْمَطَرِ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ الْاَعْنَابَ وَغَيْرَهَا لِخِصْبِهٖ.

৪৯. এটার পর অর্থাৎ খরার সাত বৎসরের পর আসবে এমন বৎসর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তারা স্বচ্ছলতার ফলে আঙ্গুর ইত্যাদির রস নিংড়িয়ে বের করবে।

٥٠. وَقَالَ الْمَلِكُ لَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ وَاَخْبَرَهُ بِتَاْوِيْلِهَا ائْتُوْنِيْ بِهٖ اَيْ بِالَّذِيْ عَبَّرَهَا فَلَمَّا جَاءَهُ اَيْ يُوْسُفَ الرَّسُوْلُ وَطَلَبَهُ لِلْخُرُوْجِ قَالَ قَاصِدًا اِظْهَارَ بَرَاءَتِهٖ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ اَنْ يَسْأَلَ مَا بَالُ حَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ط اِنَّ رَبِّيْ سَيِّدِيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ.

৫০. ঐ প্রেরিত ব্যক্তিটি যখন ফিরে আসল এবং স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে খবর দিল তখন সম্রাট বলল, তোমরা তাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছে তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। যখন দূত তার নিকট হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আসল এবং বের হতে বলল, তখন সে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় নির্দোষিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের কী ব্যাপার হয়েছিল তা জিজ্ঞাসা করতে। নিশ্চয় আমার প্রভু আমার মালিক আজীজ-মিসর তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। بَالُ-অর্থ অবস্থা।

٥١. فَرَجَعَ فَاَخْبَرَ الْمَلِكَ فَجَمَعَهُنَّ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ شَاْنُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ ط هَلْ وَجَدْتُّنَّ مِنْهُ مَيْلًا اِلَيْكُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ اَلْئٰنَ حَصْحَصَ وَضَحَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِهِ هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَفْسِىْ فَاَخْبَرَ يُوْسُفَ بِذٰلِكَ .

৫১. অনন্তর ঐ দূত ফিরে আসল এবং সম্রাটকে ঐ কথা জানাল। তখন সম্রাট ঐ নারীদেরকে একত্রিত করে বলল, তোমরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কুকর্মে প্ররোচিত করেছিলে তখন তোমাদের কী বিষয় হয়েছিল। তার মধ্যে কি তোমাদের প্রতি কোনো আসক্তি দর্শন করেছিলে? তারা বলল, আল্লাহর অদ্ভুত মাহাত্ম্য! আমরা তার কোনো দোষ আছে বলে জানিনা। আজীজ অর্থাৎ সভাসদের স্ত্রী বলল, সত্য প্রকাশ পেল। উদঘাটিত হলো। আমিই তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করেছিলাম। 'নারীটি আমাকে প্ররোচিত করেছিল' তার এই কথায় সে তো সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٢. فَقَالَ ذٰلِكَ اَىْ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ لِيَعْلَمَ الْعَزِيْزُ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ فِىْ اَهْلِهِ بِالْغَيْبِ حَالٌ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ .

৫২. হযরত ইউসুফকে এই বিষয়ে সংবাদ জানানো হলো বললেন, এটা অর্থাৎ আমার তরফ হতে এই যে, নির্দোষিতা প্রমাণের দাবি এই জন্য যে, যাতে আজীজ জানতে পারে যে, আমি অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের বিষয় কোনো খেয়ানত করিনি। আর নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসহন্তাদিগের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। بِالْغَيْبِ এটা মূলত حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদরূপে এই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رَاَيْتُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُضَارِعٌ টা مَاضِىٌ-এর অর্থে হয়েছে। অতীত কালের দৃশ্য টেনে আনার ভিত্তিতে مُضَارِعٌ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ عِجَافٌ جَمْعُ عَجْفَاء : عِجَافٌ শব্দটি عَجْفَاءُ এর বহুবচন عَجِيْفٌ-এর বহুবচন; নয়। কেননা এটা بَقَرَةٌ-এর صِفَتْ হয়েছে।

প্রশ্ন. اَفْعَلُ এবং فَعْلَاءُ- এর বহুবচন فِعَالٌ ওযনে আসেনা, কিয়াস অনুযায়ী عُجْفٌ হওয়া উচিত ছিল। যেমন حَمْرَاءُ-এর বহুবচন حُمْرٌ আসে।

উত্তর. এটা حَمْلُ النَّقِيْضِ عَلَى النَّقِيْضِ-এর অন্তর্গত। عِجَافٌ যেহেতু سِمَانٌ- এর বিপরীত, এ কারণেই عِجَافٌ-কে سِمَانٌ-এর উপর কিয়াস করে عِجَافٌ বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ سَبْعُ سُنْبُلَاتٍ : একে سَبْعُ بَقَرَاتٍ-এর উপর কেয়াস করে سُنْبُلَاتٌ-এর মধ্যে سَبْعٌ-এক হযফ করে দিয়েছে। মুফাসসির (র.) যা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন. গাভীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, সাতটি দুর্বল গাভী সাতটি মোটাতাজা সবল গাভীকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু سُنْبُلَاتٌ-এর অবস্থা বর্ণনা করেননি। যাকে মুফাসসির (র.) اِلْتَوَتْ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

উত্তর. بَقَرَاتٌ-এর অবস্থার উপর কেয়াস করে سُنْبُلَاتٌ-এর অবস্থা বর্ণনা করাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَاعْبُرُوْهَا : এতে جَزَاءٌ উহ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَضْغَاثٌ উহ্য মুবতাদার খবর। কাজেই বাক্যটি غَيْرُ مُفِيْد হওয়ার সংশয় কেটে গেল। اَضْغَاثٌ এটা ضِغْثٌ-এর বহুবচন; অর্থ হলো ঘাসের আঁটি যাতে তাজা ও শুষ্ক সবধরনের ঘাসই থাকে। এখানে পেরেশানিমূলক স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাতে ওয়াসওয়াসা এবং حَدِيْثُ النَّفْسِ -এর দখল থাকে।

قَوْلُهُ اَحْلَامٌ : এটা حُلْمٌ -এর বহুবচন; স্বপ্নকে বলা হয়।

قَوْلُهُ اُمَّةٌ : اُمَّةٌ দ্বারা এখানে মানুষের জামাত উদ্দেশ্য নয়; বরং সুদীর্ঘকাল উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) اُمَّةٌ-এর তাফসীর حِيْنٌ দ্বারা করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ حَالَ يُوْسُفَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَادَّكَرَ -এর মধ্যে وَاوْ -টি حَالِيَهْ কাজেই قَالَ আমেল ও اَنَا اُنَبِّئُكُمْ মা'মূলের মধ্যে فَصْل -এর প্রশ্ন রহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ يُوْسُفُ : এটা اُذْكُرْ-এর মাফঊল হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْمَطَرِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يُغَاثُ শব্দটি غَيْثٌ থেকে এসেছে; غَوْثٌ থেকে নয়।

قَوْلُهُ سَيِّدِيْ : رَبِّيْ-এর তাফসীর سَيِّدِيْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَبِّيْ দ্বারা সর্দার আজীজ উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উদ্দেশ্য নন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হলো না। তাই সবাই উত্তর দিল اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِيْنَ এখানে اَضْغَاثٌ শব্দটি ضِغْثٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলি, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল, আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। কুরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ فَاَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নামোল্লেখ, সরকারি মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি; বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর صِدِّيْقٌ অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

قَوْلُهُ لَعَلِّىْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তারা আপনার জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে মিছাল' তথা প্রত্যাকৃতি জগতে ঘটনাবলি যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরোপুরিই এ সব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলন সম্পন্ন সাত বছর। কেননা মৃত্তিকা

চাষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে; শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভালো ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি হযরত ইউসুফ (আ.) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীর্ষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীর্ষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

قَوْلُهٗ ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ : অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে, যদিও বছর এমন কোনো বস্তু নয়, যা কোনো কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহকে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কুরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ অর্থাৎ বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো। অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

হযরত ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। তিনি দূতকে উত্তর দিলেন قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) দূতকে বললেন, তুমি বাদশার কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কিনা এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আজীজ-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা হযরত ইউসুফ (আ.) আজীজের গৃহে লালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদের তেমন কোনো অপমান ছিল না তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আজীজ-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাঁকে ঘিরেই তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হতো। ফলে তার অপমান বেশি হতো। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে সাথে আরও বললেন, اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমার পালনকর্তাতো তাদের মিথ্যা ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বুখারী ও তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর আমাকে মুক্তিদানের জন্য ডাকা হতো, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম।

ইমাম তাবারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য, সহনশীলাতা ও সচ্চরিত্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কারাগারে যখন তাঁকে বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত কর, এরপর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয়বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাড়াতাম। –[তাফসীরে কুরতুবী]

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের কর্মপন্থা বর্ণিত হয়েছে, যা আমি থাকলে দেরি করতাম না এর অর্থ কি? যদি এর অর্থ এই হয় যে, তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কর্মপন্থাকে উত্তম এবং নিজের কর্মপন্থাকে অনুত্তম বলেছেন; তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পয়গাম্বরের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রেষ্ঠতম পয়গাম্বর। কিন্তু কোনো আংশিক কাজে অন্য পয়গাম্বরও শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন।

এ ছাড়া তাফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে– এরূপ অর্থ হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কর্মপন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিত্রের অনন্যাসাধারণ প্রমাণ রয়েছে, তা যথাস্থানে প্রশংসনীয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করেছেন, উম্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে তাই উপযুক্ত ও উত্তম। কেননা বাদশাহদের মেজাজের কোনো স্থিরতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা দেরি করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ বাদশাহর মত পাল্টে যেতে পারে। ফলে কারাবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে পারে। হযরত ইউসুফ (আ.) তো পয়গাম্বর হওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের কারণে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু সাধারণ লোক তো এ স্তরে উন্নীত নয়! রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ -এর মেজাজ ও অভিরুচিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তার গুরুত্ব ছিল অধিক। তাই তিনি বলেছেন, আমি এরূপ সুযোগ পেলে দেরি করতাম না।

قَوْلُهُ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ الخ : হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তির পয়গাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে ঐ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরদেরকে যেমন পূর্ণ ধার্মিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন ব্যাপারাদি সম্পর্কে পূর্ণ দূরদৃষ্টিও দান করেছিলেন। রাজকীয় পয়গাম পেয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ তাঁকে কোনো সম্মানে ভূষিত করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ ও অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনোরূপ সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এই যে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জনসাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোনো সময় এ জাতীয় ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহরও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে তিনি জরুরি মনে করলেন। উল্লিখিত দু আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.) এর কর্ম ও মুক্তি বিলম্বিত করার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন।

প্রথম কারণ : ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ -এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, যাতে আজীজে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

তাঁকে নিশ্চয়তা দানের জন্য উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আজীজে-মিসরের মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে কিছু বলতে না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আমার রাজকীয় সম্মানও তার কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তার জন্য আরও কষ্টকর হবে । যে ব্যক্তি কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তার মনে কষ্ট দেওয়া হযরত ইউসুফ (আ.) পছন্দ করেননি। এ ছাড়া আজীজে-মিসর তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত।

তৃতীয় কারণ : وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ অর্থাৎ এসব তদন্তের কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা এগুতে দেন না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সমস্ত চেষ্টা করবে। দুই. যদি এ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বিশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। ফলে তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইউসুফ (আ.) মুক্তির পয়গাম পাওয়া মাত্রই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি; বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবি করেছেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ অর্থাৎ বাদশাহ হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন : কি ব্যাপারে ঘটেছে যখন তোমরা হযরত ইউসুফের কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহর এ প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, স্বস্থানে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দোষ হযরত ইউসুফের নয় মহিলাদেরই। তাই তিনি বলেছেন: তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে। এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ـ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ সবাই বলল, আল্লাহ মহান! আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কোনো কিছু জানি না। আজীজ-পত্নী বলল, এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে! আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের কামনা করেছিলাম। সে নিশ্চিতই সত্যবাদী।

হযরত ইউসুফ (আ.) তদন্তের দাবিতে আজীজ-পত্নীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে ইজ্জত দান করেন, তখন তার সততা ও সাফাই প্রকাশ মানুষের মুখ আপনা থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেত্রে আজীজ-পত্নী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলিতে অনেক উপকারিতা, মাস'আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে ইতিপূর্বে আটটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও কিছু মাস'আলা ও পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হলো।

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা কোনো সৃষ্ট জীবের কাছে ঋণী হোন এটা তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়দিকে বললেন, বাদশাহর কাছে আমার কথা বলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত করে রাখেন এবং অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে হযরত ইউসুফ (আ.) কারও কাছে ঋণী না হন এবং পূর্ণ মান-সম্ভ্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়।

এ ব্যবস্থা ছিল এই যে, মিসরের বাদশাহকে একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখানো হলো, যার ব্যাখ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে যেতে হলো।

মাসআলা : এতে সচ্চরিত্রতার শিক্ষা রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাদশাহর কাছে বলে দেওয়ার মতো কাজটাও না করার দরুন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অতিরিক্ত সাত বছর পর্যন্ত বন্দী জীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হয়। সাত বছর পর যখন সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেওয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি স্বভাবতই তাকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন এবং বলতে পারতেন যে, তোমার দ্বারা আমার এতটুকু কাজও হলো না! কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তা করেন নি। তিনি পয়গাম্বরসুলভ চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, কুরতুবী]

মাসআলা : সাধারণ লোকদের পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে পরকালে ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গাম্বর ও আলেমদের কর্তব্য, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। হযরত ইউসুফ (আ.) এ ক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ও হিতাকাঙ্ক্ষার পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন গম শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকীর পরিমাণে বের করবে যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়।

মাসআলা : অনুসরণযোগ্য আলেম সমাজের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেন কোনো মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়। কেননা কু-ধারণা মূর্খতাপ্রসূত হলেও তা দাওয়াত ও প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জনগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কথার ওজন থাকে না। –[তাফসীরে কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলেম শ্রেণিকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ রকম যত্নবান ছিলেন। একবার তাঁর একজন স্ত্রী তাঁর সাথে মদীনার এক গলিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবীকে সম্মুখ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক স্ত্রী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনাত্মীয়া কোনো মহিলার সাথে পথ অতিক্রম করেছেন বলে কেউ সন্দেহ না করে। এ ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ (আ.) ও কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও মুক্তির পূর্বে জনগণের মন থেকে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

মাসআলা : অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও সাধ্যানুযায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি। হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আজীজ ও তাঁর পত্নীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলেছিলেন। [কুরতুবী] কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত।

মাসআলা : এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের উপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দেওয়াও পছন্দ করেন নি, যেমন لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আয়াতে এ বিষয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

٥٣. فَقَالَ وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ج مِنَ الزَّلَلِ اِنَّ
النَّفْسَ الْجِنْسَ لَاَمَّارَةٌ كَثِيْرَةُ الْاَمْرِ
بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا بِمَعْنٰى مَنْ رَحِمَ رَبِّىْ ط
فَعَصَمَهُ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

٥٤. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِىْ ج اَجْعَلْهُ خَالِصًا لِىْ دُوْنَ شَرِيْكٍ
فَجَاءَهُ الرَّسُوْلُ وَقَالَ اَجِبِ الْمَلِكَ فَقَامَ
وَوَدَّعَ اَهْلَ السِّجْنِ وَدَعَا لَهُمْ ثُمَّ اغْتَسَلَ
وَلَبِسَ ثِيَابًا حِسَانًا وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا
كَلَّمَهُ قَالَ لَهُ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ
اَمِيْنٌ ذُوْ مَكَانَةٍ وَاَمَانَةٍ عَلٰى اَمْرِنَا فَمَاذَا
تَرٰى اَنْ نَفْعَلَ قَالَ اِجْمَعِ الطَّعَامَ وَازْرَعْ
زَرْعًا كَثِيْرًا فِىْ هٰذِهِ السِّنِيْنَ الْمُخْصِبَةِ
وَادَّخِرِ الطَّعَامَ فِىْ سُنْبُلِهٖ فَيَاْتِىْ اِلَيْكَ
الْخَلْقُ لِيَمْتَارُوْا مِنْكَ فَقَالَ مَنْ لِىْ بِهٰذَا .

٥٥. قَالَ يُوْسُفُ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ج
اَرْضِ مِصْرَ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ذُوْ حِفْظٍ
وَعِلْمٍ بِاَمْرِهَا وَقِيْلَ كَاتِبٌ وَحَاسِبٌ .

অনুবাদ :

৫৩. হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয় প্রকাশ করত বললেন, পদস্খলন হতে আমি নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দের নির্দেশ দেয়, তবে যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেছেন, সে ব্যতীত। অর্থাৎ তাকে তিনি রক্ষা করেন। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। اَلنَّفْسَ এ স্থানে جِنْس বা জাতি অর্থ বুঝানো হয়েছে। اَمَّارَةٌ খুব নির্দেশ দানকারী। مَا رَحِمَ এই স্থানে مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৪. সম্রাট বলল, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে আমার একান্ত সভাসদ করে নিব। তাকে এককভাবে আমারই করে নিব। অন্য কেউ আর তাতে শরিক থাকবে না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট সম্রাটের দূত আসল। বলল, সম্রাট আপনাকে ডেকেছেন। তখন তিনি উঠলেন, কারাবাসীদেরকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানালেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর গোসল করলেন, সুন্দর ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করলেন। পরে রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। সম্রাট তার সাথে কথা বলাকালে তাকে বলল, 'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে। অর্থাৎ আমাদের বিষয়াদিতে আস্থাভাজন ও আমাদের নিকট মর্যাদার অধিকারী হলে, এখন আমাদের কি করা কর্তব্য বলে মনে কর? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, খাদ্য মওজুদ করতে থাকুন, প্রাচুর্যের বৎসরগুলোতে অধিক হারে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিন এবং শীষ সমেত খাদ্য মওজুদ করুন। অচিরেই বহু লোক খাদ্যের তালাশে আপনার নিকট ধন্না দিবে। সম্রাট বললেন, এই বিরাট দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য কাকে পাবো।

৫৫. হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমাকে এই দেশের মিসর ভূমির কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দিন। আমি সংরক্ষণকারী ও অভিজ্ঞ। এই বিষয়ে আমার জ্ঞানও আছে এবং আমি সংরক্ষণে পারদর্শী। কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ হলো আমি লিখক ও হিসাব রক্ষক

٥٦. وَكَذٰلِكَ كَانْعَامِنَا عَلَيْهِ بِالْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ج اَرْضَ مِصْرَ يَتَبَوَّءُ يَنْزِلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ط بَعْدَ الضِّيْقِ وَالْحَبْسِ وَفِي الْقِصَّةِ اَنَّ الْمَلِكَ تَوَّجَهُ وَخَتَمَهُ وَ وَلَّاهُ مَكَانَ الْعَزِيْزِ وَعَزَلَهُ وَمَاتَ بَعْدُ فَزَوَّجَهُ اِمْرَاَتَهُ زُلَيْخَا فَوَجَدَهَا عَذْرَاءَ وَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ وَاَقَامَ الْعَدْلَ بِمِصْرَ وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

৫৬. এভাবে অর্থাৎ যেভাবে কারাগার হতে মুক্ত করে আমি তাকে পুরস্কৃত করেছি সেভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে অর্থাৎ মিশরে প্রতিষ্ঠিত করলাম। বন্দিত্ব ও কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হওয়ার পর এখন সে এই দেশের যে স্থানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারত। যাকে ইচ্ছা আমি দয়া করি এবং সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করি না। يَتَبَوَّأُ বসবাস করা, অবতরণ করা। বিবরণে পাওয়া যায় যে, মিসর সম্রাট তাকে স্বীয় তাজ ও নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে দেন। উক্ত আজীজে মিসরকে পদচ্যুত করত তদস্থলে তাকে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর আজীজে মিসর মারা যায়। তখন তার স্ত্রী জুলায়খার সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি তাকে কুমারী ও সতীচ্ছেদ ছিন্নহীন অবস্থায় পেলেন। পরে তার দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি মিসরের সর্বস্তরে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। সকল লোক তার প্রতি অনুগত ছিল।

٥٧. وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ اَجْرِ الدُّنْيَا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

৫৭. যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য দুনিয়া হতে পরকালের পুরস্কারই উত্তম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ : এই বাক্যটি ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ ذٰلِكَ -এর উহ্য আমেল তথা طَلَبُ الْبَرَاءَةِ লِيَعْلَمَ থেকে حَالٌ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, طَلَبُ الْبَرَاءَةِ থেকে যেই নফসের পবিত্রতা বুঝা যায় তার দ্বারা আজীজে মিসর -এর স্ত্রীর ব্যাপারে পবিত্রতা ও নিষ্পাপতা উদ্দেশ্য হয়েছে। মুতলাক পদস্খলন ও বিচ্যুতিসমূহ থেকে নয়। মোটকথা হলো এই যে, পূর্বে আমি طَلَبَ بَرَاءَةً করেছি এর দ্বারা নফসের পবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَلْجِنْسَ : অর্থাৎ اَلَّذِيْ فِيْ ضِمْنِ جَمِيْعِ الْاَفْرَادِ যদি মুফাসসির (র.) جِنْس -এর পরিবর্তে اِسْتِغْرَاقٌ দ্বারা ব্যক্ত করতেন তবে উত্তম হতো।

قَوْلُهُ مَا بِمَعْنَى مَنْ : কেননা نَفْس দ্বারা ذَوِي الْعُقُوْلِ উদ্দেশ্য হয়েছে। আবার এটাও বৈধ যে, مَا رَحِمَ টা অর্থের ক্ষেত্রে زَمَانٌ হয় তবে সেই সুরতে مَا কে مَنْ -এর অর্থে নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না অর্থাৎ اِلَّا وَقْتَ رَحْمَةِ رَبِّيْ উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- اِنَّهَا اِمَارَةٌ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ اِلَّا وَقْتَ الْعِصْمَةِ

قَوْلُهُ اَجْعَلْهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَسْتَخْلِصْهُ এটা تَصْيِيْر -এর অর্থে হয়েছে। কেননা طَلَبٌ -এর অর্থ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ فَقَالَ مَنْ لِيْ بِهٰذَا : অর্থাৎ مَنْ يَضْمَنُ هٰذَا لِاَجْلِيْ

قَوْلُهُ وَمَاتَ بَعْدَهُ : অর্থাৎ بَعْدَ الْعَزْلِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দুরস্ত নয়, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না। যাতে আজীজ ও বাদশাহর মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যত নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সংবলিত একটি আয়াত রয়েছে– فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَهُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবি করো না। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের আল্লাহভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা– অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এমন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গাম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কুরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িন্নাহ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটকথা এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোনো সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না, বরং আল্লাহ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মতো কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোনো কোনো হাদীসে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তার মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার : আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষে যে, এতে প্রত্যেক মানবমনকেই أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ [মন্দ কাজের আদেশদাতা] বলা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এর চেয়ে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোনো কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী। –[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়।

মোটকথা উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব মনকেই 'লাউওয়ামা' উপাধি দিয়ে এটাকে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন– لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এবং সূরা আল ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে– يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلٰى رَبِّكِ এভাবে মানব মনকে এক জায়গায় أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ দ্বিতীয় জায়গায় لَوَّامَةٌ এবং তৃতীয় জায়গায় مُطْمَئِنَّةٌ বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব মন আপন সত্তার দিক দিয়ে أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَةٌ হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী। যেমন সাধারণ সাধু -সজ্জনদের মন এবং যখন কোনো মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোনো স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে, কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গাম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা আপনা আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তারা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُوْرٌ শব্দের ইঙ্গিত আছে যে, নফসে আম্মারা যখন স্বীয় গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَحِيْمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ الخ অর্থাৎ বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দাবি অনুযায়ী মহিলার কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং জুলায়খাও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হলো। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ফলে তার যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বাদশাহ বললেন, আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে পৌছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌছাল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহর দরবারে পৌছে এ দোয়া করলেন—

حَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ خَلْقِهٖ عَزَّ جَارُهٗ وَجَلَّ ثَنَاؤُهٗ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ

অর্থাৎ আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্ট জীবের মোকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তার আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

দরবারে পৌছে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবি ভাষায় সালাম করেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবি ও হিব্রু ভাষা তার জানা ছিল না। হযরত ইউসুফ (আ.) বলে দেন যে, সালাম আরবি ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবি ও হিব্রু এদুটি অতিরিক্ত ভাষায় শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহর মনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ বললেন, আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন।

বাদশাহ বললন, আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন, অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, প্রথমে সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এসময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্তি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষের সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন, এ বিষয়টি পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাপ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। –[কুরতুবী]

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরিউক্ত দুটি শব্দের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া; বরং পূর্ণ হেফাজত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরি, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোনো কমবেশি না করা। حَفِيْظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عَلِيْمٌ শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যারান্টি।

বাদশাহ যদিও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলিতে মুগ্ধ ও তার ধর্মপরায়ণা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং যাবতীয় সরকারি দায়িত্ব ও তাকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না। যেমন শেখ সাদী (র.) বলেন–

چو یوسف کسے در صلاح وتمیز

بیک سال باید کہ گردد عزیز

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সমতুল্য যোগ্যতা ও শিষ্টাচার থাকে, তার পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাভ সম্ভব।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ লিখেছেন, এ সময়েই জুলায়খার স্বামী কিতফীর মৃত্যুবরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে জুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) জুলায়খাকে বললেন, তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চেয়ে উত্তম নয়? জুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা সসম্মানে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ আহলাদে তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাদের দুজন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে জুলায়খার প্রতি এ গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা জুলায়খার অন্তরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ছিল না। এমন কি একবার হযরত ইউসুফ (আ.) জুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন, এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালোবাস না? জুলায়খা আরজ করল, আপনার অসিলায় আমি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করেছি। এ ভালোবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তাভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরো কিছু বর্ণনাসহ তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরিবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কি গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এ পদ দান করেন। আজও যদি কেউ সরকারি এমন কোনো পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মতো অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েজ তো বটেই বরং ওয়াজিব। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত। -[কুরতুবী]

খোলাফায়ে রাশেদীন স্বেচ্ছায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তারা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী (রা.), হযরত মু'আবিয়া (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খেলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারো মূল লক্ষ্য ছিল না।

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদ মর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা এতে আমন্ত্রিত হন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়– যাবতীয় রাজকার্যই কার্যত হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। -[কুরতুবী, মাযহারী]

হযরত ইউসুফ (আ.) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কোনোরূপ বাধাপিবত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান জারি করা এবং তার দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোনো সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তার অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলমান হয়ে যান।

قَوْلُهُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ : অর্থাৎ পরকালের প্রতিদান ও ছওয়াব দুনিয়ার নিয়ামতের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হযরত ইউসুফ (আ.) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল, মিসর সম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা! তিনি বললেন, সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন, দিনে মাত্র একবার দ্বিপ্রহরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজ পরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

অনুবাদ :

٥٨. وَدَخَلَتْ سِنُو الْقَحْطِ وَاَصَابَ اَرْضَ كِنْعَانَ وَالشَّامَ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ اِلَّا بِنْيَامِيْنَ لِيَمْتَارُوْا لِمَا بَلَغَهُمْ اَنَّ عَزِيْزَ مِصْرَ يُعْطِى الطَّعَامَ بِثَمَنِهِ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ اَنَّهُمْ اِخْوَتُهُ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ لَا يَعْرِفُوْنَهُ لِبُعْدِ عَهْدِهِمْ بِهِ وَظَنِّهِمْ هَلَاكَهُ فَكَلَّمُوْهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَقَالَ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِمْ مَا اَقْدَمَكُمْ بِلَادِىْ فَقَالُوْا لِلْمِيْرَةِ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ عُيُوْنٌ قَالُوْا مَعَاذَ اللّٰهِ قَالَ فَمِنْ اَيْنَ اَنْتُمْ قَالُوْا مِنْ بِلَادِ كِنْعَانَ وَاَبُوْنَا يَعْقُوْبُ نَبِيُّ اللّٰهِ قَالَ وَلَهُ اَوْلَادٌ غَيْرُكُمْ قَالُوْا نَعَمْ كُنَّا اِثْنَىْ عَشَرَ فَذَهَبَ اَصْغَرُنَا هَلَكَ فِى الْبَرِيَّةِ وَكَانَ اَحَبَّنَا اِلَيْهِ وَبَقِىَ شَقِيْقُهُ فَاحْتَبَسَهُ لِيَتَسَلّٰى بِهِ عَنْهُ فَاَمَرَ بِاِنْزَالِهِمْ وَاِكْرَامِهِمْ.

৫৮. যা হোক, পরে সেই ভীষণ খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শাম ও কিনআন অঞ্চলও তার কবল থেকে রক্ষা পেল না। বিনয়ামীন ব্যতীত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্যান্য ভ্রাতাগণ যখন জানতে পারল আজীজ মিসর মূল্যের বিনিময়ে খাদ্য দেন তখন তারা খাদ্যলাভের আশায় আসল ও তার নিকট উপস্থিত হলো। সে তাদেরকে চিনল যে, তারা তার ভাই কিন্তু তাদের নিকট সে অপরিচিত রয়ে গেল। তাদের ধারণা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.) মারা গেছে। অনেক কাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা তাকে চিনতে পারেনি। তারা তার সাথে হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বলল। তিনি অপরিচিত ভাব রেখেই বললেন, কি উদ্দেশ্যে আমার দেশে তোমাদের আগমন? তারা বলল, খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, তোমাদেরকে গুপ্তচর বলে অনুমিত হয়। তারা বলল, আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই ধরনের কাজ হতে রক্ষা করুন। তিনি বললেন, কোন দেশ হতে তোমরা এসেছ? তারা বলল, কেনআন হতে, আমাদের পিতা হলেন আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)। তিনি বললেন, তোমরা ব্যতীত তার আরো সন্তান আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ! আমরা বারজন ছিলাম। কনিষ্ঠ জন বনে হারিয়ে যায়। সে পিতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তার সহোদর ভাইটিকে পিতা সান্ত্বনা লাভের জন্য কাছে রেখে দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে উত্তমভাবে মেহমানদারি করতে ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে অধীনস্তদেরকে হুকুম দিলেন।

٥٩. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وَفّٰى لَهُمْ كَيْلَهُمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ج اَىْ بِنْيَامِيْنَ لِاَعْلَمَ صِدْقَكُمْ فِيْمَا قُلْتُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِى الْكَيْلَ اُتِمُّهُ مِنْ غَيْرِ بَخْسٍ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

৫৯. এবং সে যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তাদেরকে মাপে পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিল তখন সে বলল, তোমরা আমার নিকট তোমাদেরকে বৈমাত্রীয় ভ্রাতা বিনয়ামীনকে নিয়ে এসো যাতে আমি তোমাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জানিতে পারি। তোমরা কি দেখ না যে, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই। অর্থাৎ কোনো রূপ ক্ষতি বা হ্রাস না করে তা পরিপূর্ণভাবে দেই। আর আমি উত্তম অতিথি সেবক।

٦٠. فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ اَىْ مِيْرَةَ وَلَا تَقْرَبُوْنِ نَهْىٌ اَوْ عَطْفٌ عَلٰى مَحَلِّ فَلَا كَيْلَ اَىْ تُحْرَمُوْا وَلَا تَقْرَبُوْا .

৬০. কিন্তু তোমরা যদি আমার নিকট তাকে নিতে না আস তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোনো ওজন করা হবে না। অর্থাৎ কোনো খাদ্য তোমরা পাবে না। এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীও হবে না। وَلَا تَقْرَبُوْنَ তা نَهْىٌ বাচক শব্দ। পূর্বোল্লিখিত فَلَا كَيْلَ -এর مَحَلّ সাথে তার عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ تُحْرَمُوْا وَلَا تَقْرَبُوْا তোমরা খাদ্য হতে বঞ্চিত হবে এবং আমার নিকটবর্তীও হতে পারবে না।

٦١. قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ سَنَجْتَهِدُ فِىْ طَلَبِهٖ مِنْهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ذٰلِكَ .

৬১. তারা বলল, তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে প্ররোচিত করব। তার নিকট হতে তাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই তা করব।

٦٢. وَقَالَ لِفِتْيَتِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِفِتْيَانِهٖ غِلْمَانِهٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمُ الَّتِىْ اَتَوْا بِهَا ثَمَنَ الْمِيْرَةِ وَكَانَتْ دَرَاهِمَ فِىْ رِحَالِهِمْ اَوْعِيَتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمْ وَفَرَّغُوْا اَوْعِيَتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْنَا لِاَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّوْنَ اِمْسَاكَهَا .

৬২. ভৃত্যগণকে বলল, তাদের পুঁজি অর্থাৎ তারা খাদ্যের বিনিময়ে যে মূল্য নিয়ে এসেছে তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও। আর তা ছিল কতিপয় দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা। যাতে তারা স্বজনগণের নিকট যখন প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাদের পাত্রসমূহ খালি করবে তখন তা বুঝতে পারে। ফলে তারা পুনরায় আমাদের নিকট আসতে পারে। কেননা তারা তা নিজেদের নিকট রেখে দেওয়া হালাল বলে মনে করবে না। لِفِتْيَتِهٖ অপর এক কেরাতে لِفِتْيَانِهٖ রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থ– ভৃত্যগণ। فِىْ رِحَالِهِمْ এস্থানে তার অর্থ তাদের পাত্রসমূহ।

٦٣. فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ اِنْ لَّمْ تُرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا اِلَيْهِ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ .

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে আসল তখন বলল, হে পিতা যদি আমাদের সাথে আমাদের ভাই [বিনয়ামীন]-কে না পাঠান তবে আমাদের জন্য রসদ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে আমরা রসদ পুরা মেপে নিতে পারি। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। نَكْتَلْ তা ن [উত্তম পুরুষ বহুবচন] ও ى [নাম পুরুষ একবচন পুংলিঙ্গ] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

٦٤. قَالَ هَلْ مَا اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ يُوْسُفَ مِنْ قَبْلُ ط وَقَدْ فَعَلْتُمْ بِهٖ مَا فَعَلْتُمْ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حِفْظًا ص وَفِىْ قِرَاءَةٍ حٰفِظًا تَمْيِيْزٌ كَقَوْلِهِمْ لِلّٰهِ دَرُّهٗ فَارِسًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ فَاَرْجُوْ اَنْ يَّمُنَّ بِحِفْظِهٖ .

৬৪. বলল, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ আস্থাভাজন মনে করব, যেরূপ আস্থা পূর্বে তার ভ্রাতা ইউসুফ সম্বন্ধে তোমাদের উপর করেছিলাম। আর তার সাথে তোমরা যা করার করেছিলে। আল্লাহ তা'আলাই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ আর তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। সুতরাং তার নিকটই আশা করবে। তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তিনিই অনুগ্রহ করবেন। هَلْ اٰمَنُكُمْ - এস্থানে প্রশ্নবোধক শব্দ هَلْ না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। حِفْظًا এটা অপর এক কেরাতে حَافِظًا রূপে পঠিত রয়েছে। আরবদের প্রবচন لِلّٰهِ دَرُّهٗ فَارِسًا -এর মধ্যে فَارِسًا শব্দটি اِسْم مُشْتَقّ হওয়া সত্ত্বেও تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি এই স্থানেও তা اِسْم مُشْتَقّ হওয়া সত্ত্বেও تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে

٦٥. وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ط قَالُوْا يٰاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ط مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اَىْ اَيَّ شَىْءٍ نَطْلُبُ مِنْ اِكْرَامِ الْمَلِكِ اَعْظَمَ مِنْ هٰذَا اَوْ قُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ خِطَابًا لِيَعْقُوْبَ وَكَانُوْا ذَكَرُوْا لَهُ اِكْرَامَهُ لَهُمْ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا نَاْتِىْ بِالْمِيْرَةِ لَهُمْ وَهِىَ الطَّعَامُ وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ط لِاَخِيْنَا ذٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيْرٌ سَهْلٌ عَلَى الْمَلِكِ لِسَخَائِهٖ.

৬৫. যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল তাদের পুঁজি তাদেরকে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে। তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এই আমাদের পুঁজি, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গের খাদ্য আনব। আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং এই ভ্রাতার মাধ্যমে আরো এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য অতিরিক্ত নিয়ে আসব। এটা তো সামান্য পরিমাণই। অর্থাৎ সম্রাটের দানশীলতার পক্ষে তা তার জন্য অতি সহজ। مَا نَبْغِىْ এ স্থানে مَا শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবোধক; অর্থাৎ সম্রাটের নিকট হতে তা হতে অধিক বড় আর কি অনুগ্রহ ও সম্মান আমরা আশা করতে পারি? অপর এক কেরাতে তা ت সহ [দ্বিতীয় পুরুষ تَبْغِىْ অর্থ, তুমি আর কি আশা করতে পার?] পঠিত রয়েছে, এমতাবস্থায় এস্থানে তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে। তারা ইতিপূর্বে তার নিকট তাদের প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ ও মর্যাদাদানের কথা উল্লেখ করেছিল। نَمِيْرُ اَهْلَنَا অর্থ– আমরা আমাদের পরিবারের জন্য مِيْرَة অর্থাৎ খাদ্য নিয়ে আসব।

٦٦. قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا عَهْدًا مِّنَ اللّٰهِ بِاَنْ تَحْلِفُوْا لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ج بِاَنْ تَمُوْتُوْا اَوْ تُغْلَبُوْا فَلَا تُطِيْقُوا الْاِتْيَانَ بِهٖ فَاَجَابُوْهُ اِلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ نَحْنُ وَاَنْتُمْ وَكِيْلٌ شَهِيْدٌ وَاَرْسَلَهٗ مَعَهُمْ.

৬৬. বলল, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দাও যে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে, তবে তোমরা যদি অসহায় হয়ে পড় অর্থাৎ তোমরা মারা যাও বা পরাজিত হয়ে যাও, ফলে তাকে নিয়ে আসার যদি সমর্থ্য না থাকে তবে অন্য কথা। তারা এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করল। অতঃপর যখন তারা তার নিকট উক্ত প্রতিশ্রুতি দিল তখন সে বলল, আমরা অর্থাৎ আমি এবং তোমরা যে বিষয়ে কথা বলতেছি সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই তত্ত্বাবধায়ক সাক্ষী। مَوْثِقًا অর্থ– প্রতিশ্রুতি।

٦٧. وَقَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِصْرَ مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط لِئَلَّا تُصِيْبَكُمُ الْعَيْنُ.

৬৭. অনন্তর তিনি তাকে তাদের সাথে পাঠালেন। বলল, হে আমার পুত্রগণ, তোমরা মিসরে এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করিও না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে। কারণ তোমাদের উপর যেন কারো নজর না লাগে।

وَمَا أُغْنِي أَدْفَعُ عَنْكُمْ بِقَوْلِي ذٰلِكَ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ ط قَدَّرَهُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا ذٰلِكَ شَفَقَةٌ إِنِ مَا الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ط وَحْدَهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بِهِ وَثِقْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

আমার এই কথার মাধ্যমে আল্লাহর তরফ হতে কিছু হলে আমি তোমদের জন্য কিছু করতে পারি না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে নির্ধারিত তাকদীর আমি প্রতিহত করতে পারব না। তবে এই কথা তোমাদের প্রতি আপত্য স্নেহ বশত বললাম। কোনো বিধান হতে পারে না এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত। আমি তার উপরই নির্ভর করি আস্থা রাখি। আর নির্ভরকারীরা তার উপরই নির্ভর করুক। مِنْ شَيْءٍ এই স্থানে مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। إِنِ الْحُكْمُ এই স্থানে إِنْ শব্দটি না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٨. قَالَ تَعَالٰى وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ ط أَيْ مُتَفَرِّقِيْنَ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ أَيْ قَضَائِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لٰكِنْ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا وَهِيَ إِرَادَةُ دَفْعِ الْعَيْنِ شَفَقَةً وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ لِتَعْلِيْمِنَا إِيَّاهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُوْنَ إِلْهَامَ اللّٰهِ لِأَوْلِيَائِهِ.

৬৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাদের পিতা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারা যখন প্রবেশ করল তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাইরে ফয়সালার বাইরে তা তাদের কোনো কাজে আসল না তবে তা ইয়াকৃবের মনের একটা কামনা ছিল যা সে পূরণ করেছে। আর তা হলো আপত্য স্নেহবশত কু নজর হতে তাদেরকে রক্ষা করার অভিপ্রায়। অবশ্যই সে জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ আল্লাহ তা'আলার ওলীগণের প্রতি তার ইলহাম প্রদানের কথা জানে না। إِلَّا حَاجَةً এস্থানে إِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত। لِمَا عَلَّمْنٰهُ এস্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّة বা ক্রিয়ার উৎস ব্যঞ্জক এই দিকে ইঙ্গিত করণার্থে তাফসীরে لِتَعْلِيْمِنَا إِيَّاهُ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ : وَاوْ টি হলো عَاطِفَة -এর عَطْف উহ্য রয়েছে। যাকে مُفَسِّر (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রফুল্লতা ও সুখকর বছর শেষ হয়ে যখন দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের বছর শুরু হলো এবং এর প্রভাব কেনান, শাম প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুভূত হলো। হযরত ইয়াকূব (আ.) এবং তার পরিবারেও এর প্রভাব পড়ল। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বীয় সন্তানদেরকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, মিশরের ন্যায়নীতিবান বাদশাহ ন্যায্যমূল্যে শষ্য বিক্রি করেছেন। তোমরাও সেখানে যাও এবং তোমাদের প্রয়োজন অনুপাতে শষ্য নিয়ে আস। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই আসলেন, অর্থাৎ (وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ)

قَوْلُهُ يَمْتَارُوْا : অর্থাৎ لِيَشْتَرُوا الْمِيْرَةَ ; مِيْرَه বলা হয় সেই শষ্যদানাকে যাকে এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা হয়।

قَوْلُهُ لَا تَقْرَبُوْنِ : হয়তো نَهْى হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হবে। আর এর নূন হলো نُوْن وِقَايَة অথবা فَلَا كَيْلَ -এর উপর আতফ হয়েছে। এই সুরতে جَزَاء -এর مَحَلّ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হবে।

قَوْلُهُ تُحْرَمُوْا : প্রশ্ন. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ -এর তাফসীর تُحْرَمُوْا দ্বারা কেন করেছেন?

উত্তর. এজন্য যে, لَا تَقْرَبُوْا -এর আতফ لَا كَيْلَ لَكُمْ -এর উপর হয়েছে। আর এটা عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْاِسْمِ -এর অন্তর্গত। যা জায়েজ নয়। কাজেই لَا كَيْلَ لَكُمْ কে تُحْرَمُوْا -এর তাবীলের মধ্যে করে দিয়েছেন। যাতে করে فِعْل -এর আতফ فِعْل -এর উপর হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لِتَعْلِيْمِنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِمَا -এর مَا টা مَصْدَرِيَة হয়েছে। مَا ـــَٔ مَوْصُوْلَه হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কুরআন বর্ণনা করে নি। কারণ তা আপনা আপনি বুঝা যায়।

ইবনে কাছীর সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণযোগ্য। কারণ কুরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁরা বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। হযরত ইউসুফ (আ.) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্যভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জন-সাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। হযরত ইউসুফ (আ.) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ ষাট বা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে তা একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কানে এ সংবাদ পৌছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন, তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

একথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামিন ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর। হযরত ইউসুফ (আ.) নিখোজ হওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর স্নেহ ও ভালোবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশভাই কেনান থেকে মিসর পৌছল। হযরত ইউসুফ (আ.) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল কিন্তু এখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। -[কুরতুবী ও মাযহারী]

বলাবাহুল্য এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অঙ্গাবয়ব পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌছে যায়। তাদের ধারণাও এ কথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রয় করেছিল, সে কোনো দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে চিনল না, কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনে ফেললেন, فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবি ভাষায় اِنْكَارٌ শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنْكِرُوْنَ-এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমনিভাবে সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়, যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয়। প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল, আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন, তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা কোনো শত্রুর চর নও একথা কিরূপে বিশ্বাস করব? তারা বলল, আল্লাহর পানাহ। আমাদের দ্বারা এরূপ কখনো হতে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ও তার পরিবারের বর্তমান হাল অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক। তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতার আরো কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল, আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। এ সান্ত্বনার জন্য তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠান নি।

এসব কথা শুনে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বণ্টনের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোনো এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তার মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তারা পুনর্বার আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন–

اِئْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

অর্থাৎ তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন– فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ অর্থাৎ তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। [কেননা আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।] এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলঙ্কার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়িতে পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলঙ্কার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য মিসরে পুনঃ ইবনে কাসীর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কাজের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করেছেন, এক. হযরত ইউসুফ (আ.) মনে করলেন যে, তাদের কাছে এ নগদ অর্থ ও অলঙ্কার ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই নেই। ফলে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। দুই. তিনি পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। তাই শাহী ভাণ্ডারে নিজের কাছ থেকে পণ্যমূল্য জমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। তিন. তিনি জানতেন যে, তাদের অর্থ যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা তা জানতে পারবেন, তখন তিনি আল্লাহর নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজভাণ্ডারের আমানত মনে করে অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন। ফলে ভাইদের পুনর্বার আসা আরো নিশ্চিত হয়ে যাবে। মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তার সাক্ষাৎ ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রবসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্য সামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহ তা'আলার আদেশের কারণে ছিল : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে পিতা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বিরহ-ব্যাথায় অশ্রু বির্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বয়ং নবী ও রাসূল, পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালোবাসা ব্যতীত তার অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোনো উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনো অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আজীজে মিসরের গৃহে তার সব রকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছাতে পারে তা কে না জানে। বিশেষত আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তার হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়ার তার সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোনো কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তার জন্য নেহায়েত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা তো দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, তখনো আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। এ অবস্থা কোনো সামান্যতম মানুষের কাছ থেকে কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গাম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন।

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে নিজের সম্পর্কে কোনো সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা কিরূপে সম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাঘে খায়নি; বরং এটা তার ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌছে সরেজমিনে তদন্ত করা তার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তার মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল, আজীজে মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনোরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন, আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গাম্বরসূলভ তাওয়াক্কুলে ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনোটাই বান্দার ক্ষমতাধীন নয় যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্ট জীবনের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন। তাই বললেন, فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا অর্থাৎ তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের উপরই ভরসা করি।

وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য, বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা হযরত ইয়াকূব (আ.) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ তা'আলার ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ . অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হলো এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত পণ্যমূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারলো যে, এ কাজ ভুলবশত হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ اِلَيْنَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল مَا نَبْغِيْ অর্থাৎ আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্য ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজীজে মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজত রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে

مَا نَبْغِي বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হলো। এ বাক্যের مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ নিলে বাক্যের আয়াতটির অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে : আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না, শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন– لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ অর্থাৎ আমি বিনয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কসম এবং সাথে এরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোনো সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহর শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) এ অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন– إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা কোনো বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ এই যে, তেমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদার মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, বিনয়ামিনের হেফাজতের জন্য হরফ নেওয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারো হেফাজত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোনো কিছু নয়।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশও মাসআলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার।

সন্তান ভুলত্রুটি করলে সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত বিধেয় :

মাসআলা : ১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘন্য গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক. মিথ্যা কথা বলে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা। তিন. কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। চার. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রুক্ষেপ না করা। পাঁচ. একটি নিরাপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয়. একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর-জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেওয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। হযরত ইয়াকূব (আ.) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কোথাও রেখে এসেছে। তখন বাহ্যত এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করার কিংবা এদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি; বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোনো গুনাহ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং গুনাহের জন্য তওবা করেছে। হ্যাঁ, যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে ধর্মীয় [illegible], তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই অধিকতর সমীচীন।

মাসআলা : ২. এখানে হযরত ইয়াকুব (আ.) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছেন।

মাসআলা : ৩. এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথমে বলে দিয়েছিলেন যে, বিনয়ামীনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাসআলা : ৪. কোনো মানুষের ওয়াদা ও হেফাজতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ তা'আলার উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়া শক্তিদান করার ক্ষমতা তারই। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন- فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا কা'বে আহবার বলেন, এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেন নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা : ৫. যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোনো বস্তু আসবাব পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা পূর্বক আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েজ। হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি; বরং ইচ্ছাপূর্বক তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন নি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা : ৬. কোনো ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, হযরত ইয়াকূব (আ.) বিনয়ামীনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করব।

মাসআলা : ৭. হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বিনয়ামীনকে ফিরিয়ে আনবে এ থেকে বুঝা যায় যে, [ব্যক্তির জামানত] বৈধ। অর্থাৎ কোনো মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাজির করার জামানত নেওয়া জায়েজ।

এ মাস'আলায় ইমাম মালেক (র.) দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু আর্থিক জামানতকে বৈধ মনে করেন এবং ব্যক্তির জামানতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন।

قَوْلُهُ قَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীনের ব্যাপারে তার বৈমাত্রেয় ভাইদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমাদের একথার উপর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী। এমন অবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাদের সঙ্গে বিনয়ামীনকে প্রেরণ করা হবে। যখন তারা সকলে মিশরের দিকে রওয়ানা হলো তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর পুত্রদেরকে মিশর প্রবেশের সময় একটা পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। আলোচ্য আয়াতে সেই নির্দেশের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ.

অর্থাৎ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সকলে একই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইতিপূর্বেও তার নিকট হাজির হয়েছিল। কিন্তু এবারের উপস্থিতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এবার তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উদারতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার নিকট গমন করেছিল।

দ্বিতীয়ত এবার তাদের সঙ্গে রয়েছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীন। এভাবে একই পিতার এগারোজন সুশ্রী, সুদর্শন, বলিষ্ঠ যুবকদের এই দল অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, একথা চিন্তা করা অস্বাভাবিক নয়। এতদ্ব্যতীত মিসরের বাদশাহের দরবারে তাদের বিশেষ মর্যাদা ও মরতবা রয়েছে, এমনি অবস্থায় তাদের প্রতি কোনো প্রকার বদনজর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ জন্যে হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে বদনজর থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি তদবীর হিসেবে বলেছেন, তোমরা একই দ্বার দিয়ে সকলে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রবেশ কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর প্রতিটি পুত্রই ছিল সুন্দর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং প্রত্যেকেই ছিল আকর্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত মিশরের বাদশাহর দরবারে তাদের যে উচ্চ মর্যাদা ছিল এরই মধ্যে তার প্রচারও হয়েছিল অনেক বেশি। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) মনে করলেন, এভাবে তারা যদি একত্রিত হয়ে প্রবেশ করে তবে কারো বদনজর তাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন হাদীস শরীফে বদনজরের সত্যতার কথা ঘোষিত হয়েছে- اَلْعَيْنُ حَقٌّ অর্থাৎ নজর ধ্রুব সত্য। আর এজন্যই বদনজর থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তার সন্তানদেরকে নির্দেশ দেন। তোমরা এক সঙ্গে একই দ্বারে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর। যাতে করে বদনজর থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

তদবীর ও তকদীর :

একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এটি একটি তদবীর মাত্র তথা আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা। কিন্তু যদি অদৃষ্টের লিখন কিছু থাকে তবে তার ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহ তা'আলা যা স্থির করে রাখেন তাই হয়। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে; বরং চেষ্টা তাদের অবশ্যই করতে হবে। চেষ্টা তদবীরে কসুর করা সঠিক পন্থা নয়। এর পাশাপাশি নিজের চেষ্টা তদবীরের উপর ভরসা রাখাও সঠিক পন্থা নয়; বরং ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি। কেননা তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছা এবং মর্জিই কার্যকর হয় সর্বত্র। মোটকথা একদিকে উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা তদবীর করতে হবে। অন্যদিকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রাখতে হবে। চেষ্টা তদবীর না করা যেমন ভুল, তেমনিভাবে আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে শুধু চেষ্টা তদবীরের উপর নির্ভর করে থাকাও ভুল। এজন্যই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- وَمَآ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার কোনো কিছু থেকেই আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

এতে মানব জাতির জন্য রয়েছে এক পরম শিক্ষা। নিজেদের হেফাজত বা নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা যেমন কর্তব্য ঠিক তেমনিভাবে এ উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রখাও একান্ত কর্তব্য।

-[ফাওয়ায়েদে উসমানী, পৃ. ৩১৫]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, মানুষের নজর যে সত্য এর প্রতিক্রিয়া যে হয়ে থাকে আলোচ্য আয়াতে রয়েছে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এজন্যই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইমাম হাসান হুসাইন (রা.)-এর হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন- اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.)-এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হাদীস শরীফে এই পর্যায়ে আরো কিছু বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। ইমাম রাযী (র.) এসব বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

-[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৮, পৃ. ১৭২]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, যা আল্লাহ তা'আলার হুকুম তা কার্যকর হবেই, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তকদীরের লিখনকে খণ্ডাতে পারে না।

-[হাকেম, আহমদ]

এ হাদীস হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ : অর্থাৎ হুকুম তো শুধু আল্লাহ তা'আলারই। অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হয়েছে তা অবশ্যই তোমার নিকট পৌঁছবে। আর এজন্যই হযরত ইয়াকূব (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করার কথা ঘোষণা করেছেন যা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতিই আমি ভরসা করেছি আর ভরসাকারীদের এক আল্লাহ তা'আলার প্রতিই ভরসা করা উচিত।

قَوْلُهُ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ : অর্থাৎ আর তাদের পিতা যেখান থেকে তাদেরকে প্রবেশ করার জন্য বলেছিলেন, তারা সেখান থেকে প্রবেশ করে, পিতার নির্দেশ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কোনো কিছু থেকেই বাঁচাতে পারতো না, শুধু হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মনের বাসনা ছিল তা পূর্ণ করেছেন মাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন বর্ণিত আছে যে, শহরের চারটি ফটক ছিল। প্রত্যেকটি ফটক দিয়েই তারা প্রবেশ করে এবং এ তদবীরের মাধ্যমে তারা বদনজর থেকে রক্ষা পায় সত্য; কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে করবে খণ্ডন তাই দেখা যায় বিনয়ামীন চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলো, আর সকল ভাই এজন্য অপমানিত অপদস্ত হলো।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ : আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম, তাই তিনি ছিলেন অবগত, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরভ ইয়াকূব (আ.)-কে এসব বিষয় অবগত করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে যে ইলম দান করেছেন তার উপর তিনি আমল করেছেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলম দান করেছেন তাই তিনি এসব বিষয়ে ছিলেন অভিজ্ঞ। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, যে আলেম তার ইলমের উপর আমল করে না সে প্রকৃত আলেম নয়।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) জানতেন। অথবা এর অর্থ হলো হযরত ইয়াকূব (আ.) এসব বিষয় যে অবগত ছিলেন অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ লোক বলতে মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা জানতো না আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কিতাবে এমন ইলম দান করেন যা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের জন্য হয় উপকারী।

-[তাফসীরে কাবীর- খ. ১৬, পৃ. ১৭৭]

٦٩. وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى ضَمَّ اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْحَسَدِ لَنَا وَاَمَرَهُ اَنْ لَا يُخْبِرَهُمْ وَتَوَاطَأَ مَعَهُ عَلٰى اَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلٰى اَنْ يُبْقِيَهُ عِنْدَهُ .

٧٠. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ هِيَ صَاعٌ مِنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعٍ بِالْجَوَاهِرِ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ بِنْيَامِيْنَ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ نَادٰى مُنَادٍ بَعْدَ اِنْفِصَالِهِمْ عَنْ مَجْلِسِ يُوْسُفَ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ الْقَافِلَةُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ .

٧١. قَالُوْا وَ قَدْ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا مَا الَّذِيْ تَفْقِدُوْنَ .

٧٢. قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ صَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ مِنَ الطَّعَامِ وَّاَنَا بِهٖ بِالْحِمْلِ زَعِيْمٌ كَفِيْلٌ .

٧٣. قَالُوْا تَاللّٰهِ قَسَمٌ فِيْهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ مَا سَرَقْنَا قَطُّ .

٧٤. قَالُوْا اَيِ الْمُؤَذِّنُ وَاَصْحَابُهُ فَمَا جَزَاۤؤُهٗ اَيِ السَّارِقِ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ وَوُجِدَ فِيْكُمْ .

অনুবাদ :

৬৯. অতঃপর যখন তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলো তখন হযরত ইউসুফ (আ.) তার সহোদরকে নিজের কাছে রেখে দিলেন নিজের নিকট নিয়ে আসলেন, বললেন, আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং তারা যা করত অর্থাৎ আমাদের প্রতি ঈর্ষা করে যা করত তজ্জন্য তুমি দুঃখ করিও না। তিনি তাকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, এই কথা তাদেরকে অপর ভ্রাতাদিগকে জানাইও না। আর তাকে তিনি নিজের নিকট রেখে দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করবেন বলে জানালে তাও সে সমর্থন করল। لَا تَبْتَئِسْ অর্থ– দুঃখিত হয়ো না।

৭০. অতঃপর সে যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার সহোদর বিনয়ামীনের মাল-পত্রে রাজার পানপাত্র রেখে দিল। এটা ছিল মূল্যবান পাথর অলংকৃত একটি স্বর্ণের পিয়ালা অতঃপর অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দরবার হতে তাদের নির্গমনের পর এক আহবায়ক চিৎকার করে বলল এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলল, হে যাত্রীদল হে কাফেলাযাত্রী। নিশ্চয়ই তোমরা চোর।

৭১. তারা তাদের দিকে এগিয়ে বলল, তোমরা কি হারিয়েছ? ذَا এটা সংযোজক শব্দ -اَلَّذِيْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তার তাফসীরে -اَلَّذِيْ-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৭২. তারা বলল, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দিবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল খাদ্য পাবে। আর আমি তার অর্থাৎ উষ্ট্র বোঝাই খাদ্য দানের ব্যাপারে জামিন জামানতদার। صُوَاعُ অর্থ– صَاعٌ বা পেয়ালা।

৭৩. তারা বলল, আল্লাহর কসম, তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। কখনো আমরা চুরিতে লিপ্ত হয়নি। تَاللّٰهِ এটা কসম বাচক শব্দ। তবে এখানে তাতে বিস্ময়ের অর্থ বিদ্যমান।

৭৪. তারা অর্থাৎ উক্ত ঘোষক ও তার সঙ্গীগণ বলল, তোমরা যদি 'আমরা চুরি করিনি' তোমাদের এই কথায় মিথ্যাবাদী হও তোমাদের কাছে তা পাওয়া যায় তবে তার অর্থাৎ চোরের শাস্তি কি?

٧٥. قَالُوْا جَزَاءُهُ مُبْتَدأٌ خَبَرُهُ مَنْ وُجِدَ فِيْ رَحْلِهِ يَسْتَرِقُ ثُمَّ اَكَّدَ بِقَوْلِهِ فَهُوَ اَيِ السَّارِقُ جَزَاؤُهُ ط اَيِ الْمَسْرُوْقِ لَا غَيْرُ وَكَانَتْ سُنَّةُ اٰلِ يَعْقُوْبَ كَذٰلِكَ الْجَزَاءُ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ بِالسَّرَقَةِ فَصَرَفُوْا اِلٰى يُوْسُفَ لِتَفْتِيْشِ اَوْعِيَتِهِمْ .

৭৫. তারা বলল, যার মাল পত্রে পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে চুরি করেছে সেই চোরই তার অর্থাৎ চুরিকৃত দ্রব্যের প্রতিদান হবে। আর অন্য কিছু নয়। এরূপই অর্থাৎ এরূপ শাস্তিই আমরা চুরি করত সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দিয়ে থাকি। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারের মধ্যে চোরের শাস্তির বিধান ছিল এরূপই। جَزَاءُهُ এটা مُبْتَدأٌ বা উদ্দেশ্য। مَنْ وُجِدَ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। فَهُوَ এটা تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٦. فَبَدَأَ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَفَتَّشَهَا قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ لِئَلَّا يُتَّهَمَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا اَيِ السِّقَايَةَ مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ ط قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ الْكَيْدُ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ط عَلَّمْنَاهُ الْاِحْتِيَالَ فِيْ اَخْذِ اَخِيْهِ مَا كَانَ يوسف لِيَأْخُذَ اَخَاهُ رَقِيْقًا عَنِ السَّرَقَةِ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ حُكْمِ مَلِكِ مِصْرَ لِاَنَّ جَزَاءَهُ عِنْدَهُ الضَّرْبُ وَتَغْرِيْمُ مِثْلَيِ الْمَسْرُوْقِ لَا الْاِسْتِرْقَاقُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط اَخْذَهُ بِحُكْمِ اَبِيْهِ اَيْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اَخْذِهِ اِلَّا بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاِلْهَامِهِ سُؤَالَ اِخْوَتِهِ وَجَوَابَهُمْ بِسُنَّتِهِمْ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط بِالْاِضَافَةِ وَالتَّنْوِيْنِ فِى الْعِلْمِ كَيُوْسُفَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ عَلِيْمٌ اَعْلَمُ مِنْهُ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى .

৭৬. অনন্তর তাদের মাল পত্রের তল্লাশি নেওয়ার জন্য তাদেরকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। অতঃপর তারা সহোদরের মাল পত্রের তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে শুরু করল। যাতে কোনোরূপ সন্দেহ না করতে পারে, পরে তার সহোদরের মালপত্র হতে তা অর্থাৎ পানপাত্রটি বের করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে অর্থাৎ এই কৌশলের মতো আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম। অর্থাৎ তার সহোদরকে রাখতে তাকে কৌশল গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সম্রাটের ধর্ম অর্থাৎ মিসর সম্রাটের বিধানানুসারে হযরত ইউসুফ (আ.) তার সহোদরকে চুরির কারণে দাস বানিয়ে রাখতে পারত না। কেননা তার আইনে চুরির শাস্তি ছিল প্রহার করা এবং চুরিকৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ জরিমানা করা। দাসরূপে পরিগণিত করা তার আইন ছিল না। যদি না আল্লাহ তার পিতার বিধানানুযায়ী তাকে রাখার ইচ্ছা করতেন অর্থাৎ তাকে তার ভ্রাতাগণকে এতদৃশ প্রশ্ন করার ইলহাম করত ও তার ভ্রাতাগণ কর্তৃক নিজেদের আইন অনুসারে জবাব দান যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইচ্ছা না হতো তবে তাকে রাখতে তার সামর্থ্য হতো না। আমি যাকে ইচ্ছা জ্ঞানের ক্ষেত্রে মর্যাদায় উন্নত করি। যেমন ইউসুফকে করেছি। সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে আরো জ্ঞানীজন। আরো অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী এর ত আল্লাহ পর্যন্ত যেয়ে শেষ হয়। دَرَجَاتٌ তা اِضَافَةٌ অর্থাৎ পরবর্তী শব্দটির প্রতি সম্বন্ধ বাচক রূপে ব তার শেষে তানভীনসহ পঠিত রয়েছে।

٧٧. قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ط اَىْ يُوْسُفُ وَكَانَ سَرَقَ لِاَبِىْ اُمِّهٖ صَنَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَسَّرَهٗ لِئَلَّا يَعْبُدَهٗ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا يُظْهِرْهَا لَهُمْ ج وَالضَّمِيْرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِىْ فِىْ قَوْلِهٖ قَالَ فِىْ نَفْسِهٖ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ج مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ لِسَرِقَتِكُمْ اَخَاكُمْ مِنْ اَبِيْكُمْ وَظُلْمِكُمْ لَهٗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَالِمٌ بِمَا تَصِفُوْنَ تَذْكُرُوْنَ فِىْ اَمْرِهٖ .

৭৭. তারা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদর হযরত ইউসুফ (আ.) তো পূর্বে চুরি করেছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতামহের একটি মূর্তি ছিল। যাতে তার আর উপাসনা হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি তা লুকিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না। মনে মনে বলল পিতার নিকট হতে ভাইকে অভিসন্ধিমূলকভাবে এনে ও উক্ত ভ্রাতার উপর নিপীড়ন করার কারণে হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার সহোদর হতে তোমাদের অবস্থা হীনতর এবং তোমরা যে বিবরণ দিতেছ অর্থাৎ তার বিষয়ের যা উল্লেখ করেছ সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবহিত। لَمْ يُبْدِهَا অর্থ তা প্রকাশ করল। এর مَفْعُوْل বা কর্মবাচক ضَمِيْر বা সর্বনাম هَا দ্বারা পরবর্তী বাক্য قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا তে যে كَلِمَة বা বক্তব্য রয়েছে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَعْلَمُ শব্দটি যদিও اِسْم تَفْضِيْل অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক তারতম্য সূচক বিশেষ্য হলেও এই স্থানে সাধারণ اِسْم فَاعِل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হেতুই তার তাফসীরে عَالِمٌ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

٧٨. قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا يُحِبُّهٗ اَكْثَرَ مِنَّا وَيَتَسَلّٰى بِهٖ عَنْ وَلَدِهِ الْهَالِكِ وَيَحْزُنُهٗ فِرَاقُهٗ فَخُذْ اَحَدَنَا اسْتَعْبِدْهُ مَكَانَهٗ ج بَدَلًا مِنْهُ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ فِىْ اَفْعَالِكَ .

৭৮. তারা বলল, হে আজীজ, অতিশয় বৃদ্ধ তার পিতা। তাকে তিনি আমদের অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন। হারানো পুত্রের শোকে তাকে নিয়ে সান্ত্বনা লাভ করেন। তার বিচ্ছেদ তাকে দুঃখ দেয়। সুতরাং তার স্থলে তার পরিবর্তে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। একজনকে দাস করে রাখুন। আপনাকে আমরা আপনার কাজে কর্মে সত্যপরায়ণদের একজন দেখতেছি।

٧٩. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ حُذِفَ فِعْلُهٗ وَاُضِيْفَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ اَىْ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ من اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ لَمْ يَقُلْ مَنْ سَرَقَ تَحَرُّزًا مِنَ الْكِذْبِ اِنَّآ اِذًا اِنْ اَخَذْنَا غَيْرَهٗ لَظٰلِمُوْنَ .

৭৯. সে বলল, যার নিকট আমরা মাল পেয়েছি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও পাকড়াও করার কাজ হতে আমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ নিতেছি। এরূপ করলে অর্থাৎ অন্য কাউকেও ধরলে আমরা অবশ্যই সীমালজ্ঘনকারী হবো। مَعَاذَ اللّٰهِ এস্থানে مَعَاذَ শব্দটি مَصْدَرْ বা সমধাতুজ কর্ম পদরূপে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং مَفْعُوْل বা কর্ম পদের প্রতি তার اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হলো نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ نَّاْخُذَ আমরা অন্যকে ধরা হতে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ নিতেছি। مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ সে চুরি করেছে বললে মিথ্যায় লিপ্ত হওয়া হতো। তা হতে বাঁচতে যেয়ে 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি' এই ধরনের বাক্যভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَوَاطَا مَعَهُ : تَوَاطَا অর্থাৎ تَوَافَقَ তথা উভয়ে একমত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ السِّقَايَةَ : পনি পান করানোর পাত্র, পানি পান করানোর স্থান, পানি পান করানো। এখানে পানির পাত্র উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে ঐ পাত্রকে كَيْل বা পরিমাপক পাত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করে দেয়। صَاعٌ এতে এক লোগাতে صُوَاعٌ ও রয়েছে।

قَوْلُهُ لِئَلَّا يُتَّهَمَ : যাতে করে ষড়যন্ত্রের অপবাদ আরোপিত না হয়।

قَوْلُهُ عَلَّمْنَاهُ الْاِحْتِيَالَ : এটা كِدْنَا لِيُوْسُفَ -এর তাফসীর। এই তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ তা'আলার দিকে كَيْد -এর নিসবতের نَفِيْ করা। كِدْنَا টা عَلَّمْنَا الْكَيْدَ তথা আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাহানা শিখিয়েছি।

قَوْلُهُ بِحُكْمِ اَبِيْهِ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়ত অনুযায়ী। তার শরিয়তে চুরির শাস্তি ছিল গোলাম বানিয়ে ফেলা।

قَوْلُهُ بِاِلْهَامِهِ سُؤَالَ اِخْوَتِهِ وَجَوَابَهُمْ بِسُنَنِهِمْ : মিসরীয় নীতিমালার ভিত্তিতে বিনয়ামিনকে গোলাম বানিয়ে আটক রাখতে পারতেন না। কেননা মিসরী আইনে চুরির শাস্তি ছিল শাস্তি দেওয়া ও চোরাই মালের দ্বিগুণ আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা ইলহামের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হৃদয়ে একথা ঢেলে দিলেন যে, স্বয়ং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর যে, চুরির শাস্তি কি হতে পারে? যাতে করে তারা স্বীয় নীতিমালার আলোকে জবাব দেয়। কেনানী আইনে চুরির শাস্তি হলো গোলাম বানিয়ে রাখা। এভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেরাই বিনয়ামিনের শাস্তি গোলাম বানিয়ে নেওয়া নির্ধারণ করল।

قَوْلُهُ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ : কেউ কেউ যাদের মধ্যে فَلَاسِفَة এবং মো'তাযিলাও রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ দ্বারা اِسْتِدْلَالْ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা عَالِمٌ بِالذَّاتِ ; عَالِمٌ بِالصِّفَاتِ নন। কেননা যদি আল্লাহ তা'আলা عَالِمٌ بِالصِّفَاتِ হন তবে প্রত্যেক ذِىْ عِلْمٍ -এর উপর ও اعلم রয়েছে। এর দ্বারা আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলার চেয়েও বড় কোনো اَعْلَمُ হবে, অথচ এটা বাতিল।

উত্তর. মুফাসসির (র.) مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যার সারমর্ম হলো প্রত্যেক ذِىْ عِلْمٍ -এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব مَخْلُوْقٌ -এর হিসেবে خَالِقٌ -এর হিসেবে নয়। مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ -এর قَيْد -এর পরে حَتّٰى يَنْتَهِىْ -এর قَيْد -এর প্রয়োজন থাকে না।

قَوْلُهُ وَالضَّمِيْرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِىْ فِىْ قَوْلِهِ الخ : এতে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাফসীরে খাযেনে রয়েছে যে, فَاسَرَّهَا -এর মাফউলের যমীরে তিনটি উক্তি রয়েছে–

১. যমীরটা পরবর্তী বাক্য অর্থাৎ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا -এর দিকে ফিরেছে।

২. فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ -এর দিকে ফিরেছে।

৩. যমীরটি حُجَّةٌ -এর দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ঐ اِحْتِجَاجٌ -কে পরিত্যাগ করেছেন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ মিসরে পৌছার পর যখন সব ভাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তার সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) ছোট ভাই বিনয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তাফসীরবিদ কাতাদাহ (র.) বলেন, সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে হযরত ইউসুফ (আ.) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামিন একা থেকে যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন, যখন উভয়ে একান্তে গেলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, আমি তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ! এখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্য মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা : আলোচ্য আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়–

১. চোখ লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরিয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

২. প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

৩. ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গাম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থি নয়।

৪. যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখে কষ্টে পতিত হবে তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) করেছিলেন।

৫. যদি অন্য কারো কোনো গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং চোখ লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে তা দেখে بَارَكَ اللّٰهُ অথবা مَا شَاءَ اللّٰهُ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

৬. চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোনো সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েজ। তন্মধ্যে দোয়া তাবীর ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৭. বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ তা'আলার উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রুমী বলেন– بر توکل زانوئے اشتر بہ بند এটাই পয়গাম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল ও রাসূল ﷺ -এর সুন্নত।

৮. এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু পিতাকে আনার জন্য কোনো চিন্তাও করেননি এবং তাঁকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত করানোর কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেননি। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাকে স্বীয় অবস্থা ও কুশল সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্তু যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীর ও ওহীর ইঙ্গিতেই হয়েছে। হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ তখনও প্রিয় পুত্র বিনয়ামিনের বিচ্ছেদের মাধ্যমে পিতার আরো একটি পরীক্ষা বাকি ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বিনয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হলো, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো।

বিনয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে চাপানো হলো, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হলো। কুরআন পাক ও পাত্রটিকে এক জায়গায় سِقَايَةَ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। سِقَايَةَ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعَ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে مَلِكْ তথা বাদশাহর দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরো জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বিনয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ : অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকজন তোমরা চোর। এখানে ثُمَّ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর হয়েছে, যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَوْلُهُ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা আমাদের চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদেরকে বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ অর্থাৎ ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বিনয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তার বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরো একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরাপরাধ ভাইয়ের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা গোপনে তাদের আসবাব পত্রের মধ্যে কোনো বস্তু রেখে দেওয়ার মতো জালিয়াতি করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন, বিনয়ামিন যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে রাখা হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা। বিনয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বিনয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন, ভ্রাতাগণ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে

এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তাই যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন : তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে তা বিনয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহর নির্দেশে তারই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোনো মানে নেই। এগুলো হযরত মূসা ও খিজির (আ.)-এর ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতোই। এগুলো বাহ্যত গুনাহের কাজ ছিল বলেই হযরত মূসা (আ.) তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু হযরত খিজির (আ.) সব কাজ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গুনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ .

অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল, সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَاۤؤُهٗ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ রাজকর্মচারীরা বলল, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوْا جَزَاۤؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاۤؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ . অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল, যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে নিজেই তার শাস্তি। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই। উদ্দেশ্য হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকূবী শরিয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

قَوْلُهٗ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ : অর্থাৎ সরকারি তল্লাশিকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমে অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করলো। প্রথমেই বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ অর্থাৎ সব শেষে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলো তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এলো। তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বিনয়ামিনকে গালমন্দ দিয়ে বলল, তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করা এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূবী শরিয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বিনয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদা তার ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরো অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ قَالُوْا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهُ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাই বিনয়ামিনের রসদপত্রের মধ্যে একটি শাহী পাত্র লুকিয়ে রেখে অতঃপর কৌশলে তা বের করে তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ভাইদের সামনে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলো এবং লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলো– اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয় বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সেও চুরি করেছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা এখন স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বিনয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে তখন হুবহু তেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বিনয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশত সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যে বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) ও বিনয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অবস্থাও এর চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোনো মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরি বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাছ থেকে একটি হাসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হতো। ফুফু এই হাঁসুলিটিই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে তা বের হলো। ইয়াকুবী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। হযরত ইয়াকূব (আ.) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, হযরত ইউসুফ (আ.) তার কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে হযরত ইউসুফ (আ.) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মতো ফুটে উঠেছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কোনো চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

قَوْلُهُ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্দারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَوْلُهُ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) মনে মনে বললেন, তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনে শুনে ভাইয়ের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরো বললেন, তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবত জোরেই বলেছেন।

قَالُوا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোনো চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বিনয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ.

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন, যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই; বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। কারণ তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

٨٠. فَلَمَّا اسْتَيْاَسُوْا يَئِسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا اِعْتَزَلُوْا نَجِيًّا ط مَصْدَرٌ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ اَىْ يُنَاجِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ كَبِيْرُهُمْ سِنًّا رُوْبِيْل اَوْ رَأْيًا يَهُوْدَا اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا عَهْدًا مِّنَ اللّٰهِ فِىْ اَخِيْكُمْ وَمِنْ قَبْلُ مَا زَائِدَةٌ فَرَّطْتُّمْ فِىْ يُوْسُفَ ج وَقِيْلَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مِنْ قَبْلُ فَلَنْ اَبْرَحَ اُفَارِقَ الْاَرْضَ اَرْضَ مِصْرَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ بِالْعُوْدِ اِلَيْهِ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ ج بِخَلَاصِ اَخِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ . اَعْدَلُهُمْ .

অনুবাদ :

৮০. যখন তারা তার নিকট হতে নিরাশ হয়ে পড়ল তখন তারা পরামর্শ করতে একান্তে গেল। একজন অপরজনের সাথে পরামর্শ করতে আলাদা হয়ে গেল। তাদের জ্যেষ্ঠ জন বয়োজ্যেষ্ঠ জন অর্থাৎ রুবায়ল অথবা এর অর্থ বুদ্ধি বিবেচনায় যে বড় অর্থাৎ ইয়াহুদা বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে তোমাদের ভ্রাতা সম্পর্কে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন আর পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ অর্থাৎ মিশর ভূমি ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তার নিকট ফিরে যেতে অনুমতি প্রদান করেন অথবা আমার ভ্রাতাকে মুক্তিদান করতো আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দেন। আর তিনিই ফয়সালাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ইনসাফ বিধানকারী। اِسْتَيْاَسُوْا অর্থ– তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। نَجِيًّا এটা مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস বাচক শব্দ। তা একবচন বা অন্যান্য বচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। مَا فَرَّطْتُّمْ এস্থানে مَا শব্দটি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। কেউ কেউ বলেন, এটা এই স্থানে مُبْتَدَأ বা ক্রিয়ার উৎস অর্থব্যঞ্জকরূপে مَصْدَرْ উদ্দেশ্য। আর তার خَبَرْ বা বিধেয় হলো مِنْ قَبْلُ। لَنْ اَبْرَحَ অর্থ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হবো না।

٨١. اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ج وَمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا تَيَقَّنَّا مِنْ مُشَاهَدَةِ الصَّاعِ فِىْ رَحْلِهِ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ لِمَا غَابَ عَنَّا حِيْنَ اِعْطَاءِ الْمَوْثِقِ حٰفِظِيْنَ وَلَوْ عَلِمْنَا اَنَّهُ يَسْرِقُ لَمْ نَأْخُذْهُ .

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বলিও হে পিতা! তোমার পুত্র চুরি করে ফেলেছে। তার মাল পত্রে পানপাত্র চাক্ষুষ দেখে আমরা যা জানি যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রত্যয় হয়েছে তারই চাক্ষুষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্য বিষয়ে অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময় যা আমাদের হতে গায়েব ছিল সে বিষয়ে আমরা রক্ষাকর্তা নই সে চুরি করবে বলে যদি পূর্বেই জানতাম তবে আর তাকে নিয়ে যেতাম না।

٨٢. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا هِىَ مِصْرُ اَىْ اَرْسِلْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاسْأَلْهُمْ وَالْعِيْرَ اَىْ اَصْحَابَ الْعِيْرِ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ط وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ كِنْعَانَ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ فِىْ قَوْلِنَا فَرَجَعُوْا اِلَيْهِ وَقَالُوْا لَهُ ذٰلِكَ .

৮২. যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে অর্থাৎ মিসরকে জিজ্ঞাসা করুন অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীদের নিকট লোক প্রেরণ করত জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও অর্থাৎ সেই কাফেলা সঙ্গীদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন। তারা ছিল কিনআন অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। আমরা অবশ্যই আমাদের কথায় সত্যবাদী।

٨٣. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَفَعَلْتُمُوْهُ اِتَّهَمَهُمْ لِمَا سَبَقَ مِنْهُمْ فِىْ اَمْرِ يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط صَبْرِىْ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِيَنِىْ بِهِمْ بِيُوْسُفَ وَاَخَوَيْهِ جَمِيْعًا ط اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ بِحَالِىْ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ .

৮৩. তারা ফিরে এসে তাদের পিতাকে এ কথা বলল সে বলল, না; বরং তোমাদের মন একটি বিষয় তোমাদের চোখে শোভন করে ধরেছে আর তাই তোমরা করে এসেছ। পূর্বে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে যেহেতু তারা বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছিল সেহেতু এই বারেও তিনি তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছিলেন। সুতরাং আমার ধৈর্যধারণই হলো উত্তম ধৈর্যধারণ হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের অর্থাৎ ইউসুফ ও তার ভ্রাতাগণ সকলকেই আমার নিকট এনে দিবেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, তার কাজে কর্মে প্রজ্ঞাময়। سَوَّلَتْ অর্থ শোভন করে ধরেছে।

٨٤. وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ تَارِكًا خِطَابَهُمْ وَقَالَ يَا اَسَفٰى اَلْاَلِفُ بَدَلٌ مِنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ اَىْ يَا حُزْنِىْ عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ اِنْمَحَقَ سَوَادُهُمَا وَبُدِلَ بَيَاضًا مِنْ بُكَائِهِ مِنَ الْحُزْنِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَظِيْمٌ . مَغْمُوْمٌ مَكْرُوْبٌ لَا يُظْهِرُ كَرْبَهُ .

৮৪. সে তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। অর্থাৎ তাদের সম্বোধন করা পরিত্যাগ করল, বলল হায়! ইউসুফ। তার উভয় চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ অত্যাধিক ক্রন্দনের কারণে তার চোখের পুতলির কালো রং বিনষ্ট হয়ে সাদায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর সে ছিল মনস্তাপে ক্লিষ্ট, অতি শোকাহত, চিন্তিত। তার কষ্ট কারো নিকট প্রকাশ হতে দিতেন না। اَسَفٰى তার শেষের আলিফ অক্ষরটি اِضَافَةٌ বাচক শব্দ ى হতে পরিবর্তিত হয়ে এস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল يَا اَسَفِىْ 'হায় আমার দুঃখ ও আফসোস।'

٨٥. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَا تَفْتَؤُا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ لِطُوْلِ مَرَضِكَ وَهُوَ مَصْدَرٌ يَسْتَوِىْ فِيْهِ الْوَاحِدُ وَغَيْرُهُ اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ الْمَوْتٰى .

৮৫. তারা বলল, আল্লাহর কসম! তুমি সব সময়ই ইউসুফের কথা স্মরণ কর। শেষে সুদীর্ঘ অসুস্থতার দরুন মুমূর্ষ হয়ে পড়বে মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়ে যাবে বা ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যে অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে। لَا تَفْتَؤُا অর্থ সব সময়। حَرَضًا এটা مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস ব্যঞ্জক শব্দ। একবচন ও অন্যান্য বচন সকল কিছুই তাতে সমভাবে প্রযোজ্য।

٨٦. قَالَ لَهُمْ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ هُوَ عَظِيْمُ الْحُزْنِ الَّذِىْ لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ حَتّٰى يَبُثُّ اِلَى النَّاسِ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ لَا اِلٰى غَيْرِهِ فَهُوَ الَّذِىْ تَنْفَعُ الشَّكْوٰى اِلَيْهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مِنْ اَنَّ رُؤْيَا يُوْسُفَ صَدَقَ وَهُوَ حَىٌّ .

৮৬. সে বলল, আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকট নিবেদন করতেছি। আর কারো নিকট নয়। তার নিকট নিবেদন করা দ্বারাই উপকার লাভ হবে। এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে তা জানি যা তোমরা জান না যে, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য। সে এখনো জীবিত। بَثٌّ এমন ভীষণ শোক যাতে ধৈর্যধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে ফলে মানুষের সামনে তা প্রকাশ হয়ে যায়।

٨٧. ثُمَّ قَالَ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اُطْلُبُوْا خَبَرَهُمَا وَلَا تَايْئَسُوْا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ رَحْمَتِهٖ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ فَانْطَلَقُوْا نَحْوَ مِصْرَ لِيُوْسُفَ ـ

৮৭. অতঃপর বলল হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না। تَحَسَّسُوْا অর্থ তোমরা খবর অনুসন্ধান কর। رَوْح অর্থ– রহমত।

٨٨. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ الْجُوْعُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ مَدْفُوْعَةٍ يَدْفَعُهَا كُلُّ مَنْ رَاٰهَا لِرَدَاءَتِهَا وَكَانَتْ دَرَاهِمَ زُيُوْفًا اَوْ غَيْرَهَا فَاَوْفِ اَتِمَّ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ط بِالْمُسَامَحَةِ عَنْ رَدَاءَةِ بِضَاعَتِنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ يُثِيْبُهُمْ ـ

৮৮. অনন্তর তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য মিশরের দিকে যাত্রা করল। যখন তারা তার নিকট গেল তখন বলল, হে আজীজ! আমরা ও আমাদের পরিবারে কষ্ট অর্থাৎ অনাহার দেখা দিয়েছে এবং আমরা বহু পণ্য নিয়ে এসেছি। مُّزْجٰةٍ অর্থাৎ এমন জিনিস যা এত নিকৃষ্ট যে, যে কেউ তা দেখে সেই তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয়। তাদের সাথে কিছু অচল দিরহাম ইত্যাদি ছিল। আপনি আমাদের রসদের মাপ পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের পণ্যের নিকৃষ্টতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে আমাদেরকে দান স্বরূপ দিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। অর্থাৎ তাদেরকে পুণ্যফল দান করেন।

٨٩. فَرَقَّ عَلَيْهِمْ وَاَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَةُ وَرَفَعَ الْحِجَابَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ تَوْبِيْخًا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ مِنَ الضَّرْبِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَخِيْهِ مِنْ هَضْمِكُمْ لَهٗ بَعْدَ فِرَاقِ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ـ مَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ اَمْرُ يُوْسُفَ ـ

৮৯. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মন আর্দ্র হয়ে গেল। করুণা তাকে গ্রাস করে ফেলল। তিনি নিজের ও তাদের মধ্যে অপরিচয়ের আবরণ উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিরস্কার করে তাদেরকে বললেন, ইউসুফ ও তার সহোদরের সাথে তোমরা কি আচরণ করেছিলে তা অর্থাৎ ইউসুফকে তো ভীষণ প্রহার ও বিক্রয় ইত্যাদি করা ও তার বিচ্ছেদের পর তার সহোদরের উপর ভীষণ জুলুম করার কথা কি তোমরা জান? যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতে ইউসুফ কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে সম্পর্কে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।

٩٠. قَالُوْا بَعْدَ اَنْ عَرَفُوْهُ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ شَمَائِلِهِ مُتَثَبِّتِيْنَ ءَاِنَّكَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ قَدْ مَنَّ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط بِالْاِجْتِمَاعِ اِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ يَخَفِ اللّٰهَ وَيَصْبِرْ عَلٰى مَا يَنَالُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ ـ

৯০. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করে তারা তাকে চিনতে পেরে বিষয়টিকে সত্যায়িত করার উদ্দেশ্যে বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদেরকে মিলিত করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি সাবধানী অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, বিপদে কষ্টে ধৈর্যধারণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ءَاِنَّكَ এই হামযাদ্বয়কে আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে। দ্বিতীয়টিকে তাসহীল করত বা উভয় অবস্থায় এতদুভয়ের মাঝে একটি اَلِفٌ [আলিফ] বৃদ্ধি করত পাঠ করা যায়। مَنَّ অর্থ তিনি অনুগ্রহ করেছেন। اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ এস্থানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনামের (هُمْ) স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্যের (الْمُحْسِنِيْنَ) ব্যবহার হয়েছে।

٩١. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ فَضَّلَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا بِالْمُلْكِ وَغَيْرِهِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اِنَّا كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ اٰثِمِيْنَ فِيْ اَمْرِكَ فَاَذَلَّنَا لَكَ ـ

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাকে সাম্রাজ্য ইত্যাদি দান করত আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মর্যাদা দিয়েছেন। আর তোমার বিষয়ে নিশ্চয় আমরা ভ্রষ্ট ছিলাম। অপরাধী ছিলাম। সুতরাং তোমার সামনে তিনি আমাদেরকে অবনত করে দিয়েছেন। اِنْ এটা এই স্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত [তাশদীদহীন] রূপে পঠিত। মূলত ছিল اِنَّا নিশ্চয়ই আমরা।

٩٢. قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَتْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّثْرِيْبِ فَغَيْرُهُ اَوْلٰى يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

৯২. আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ভর্ৎসনা নেই বিশেষ করে আজকের দিন উল্লেখ করার কারণ এই যে, মূলত আজকের দিনই ছিল তিরস্কার ও ভর্ৎসনার বেশি সম্ভাবনা, সুতরাং আজকের দিন যখন তিরস্কার নয় তখন অন্যান্য দিনগুলো তো কিছুতেই তিরস্কারের হবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٩٣. وَسَاَلَهُمْ عَنْ اَبِيْهِ فَقَالُوْا ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا اَوْ هُوَ قَمِيْصُ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ لَبِسَهُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ كَانَ فِيْ عُنُقِهِ فِي الْجُبِّ وَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ اَمَرَهُ جِبْرَئِيْلُ بِاِرْسَالِهِ لَهُ وَقَالَ اِنَّ فِيْهِ رِيْحَهَا وَلَا يُلْقٰى عَلٰى مُبْتَلًى اِلَّا عُوْفِيَ فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ يَصِرْ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

৯৩. পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, তার চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে, তিনি বললেন, তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও। এই জামাটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় এটা তার পরিধানে ছিল। কূপের ভিতর এটা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গলায় ছিল। আসলে এটা জান্নাতের ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তার পিতার জন্য এটা প্রেরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটাতে জান্নাতের গন্ধ বিদ্যমান। যে কোনো অসুস্থকে ছোয়ালে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো। يَاْتِ এই স্থানে এটার অর্থ يَصِرْ হয়ে যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِسْتَيْاَسُوْا : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর اِسْتِيْئَاسٌ মাসদার হতে مَاضِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থ– তারা নিরাশ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ يَئِسُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتِفْعَالٌ টা فِعْل -এর অর্থে হয়েছে। আর سِيْن এবং تَاءْ মুবালাগার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ يَئِسُوْا يَاْسًا كَامِلًا

قَوْلُهُ مَصْدَرُ صَالِحْ الخ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, خَلَصُوْا হলো বহুবচন, আর نَجِيًّا হলো একবচন। আর একবচনের حَمْل বহুবচনের উপর বৈধ নয়।

উত্তরের সার হলো– نَجِيًّا হলো মাসদার। আর একবচন বহুবচন সকলের উপরই মাসাদরের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَىْ يُنَاجِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَجِيًّا টা حَالْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে خَلَصُوْا مُتَنَاجِيْنَ

قَوْلُهُ صَبْرِىْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ টা صَبْرِىْ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। কেউ কেউ صَبْرِىْ -এর পরিবর্তে اَمْرِىْ উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ اِنْمَحَقَ : এটা اِنْفِعَالٌ হতে مُحِقٌ হতে নির্গত। অর্থ– মিটিয়ে দেওয়া, বাতিল করা।

قَوْلُهُ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَفْتَؤُ -এর পূর্বে لَا حَرْف نَفِىْ উহ্য রয়েছে। অন্যথায় অনুবাদ হবে যে, তোমরা ভুলে যাও এবং স্মরণ করতে থাক। অথচ এর কোনো অর্থই হয় না। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, تَفْتَؤُ জবাবে কসম। আর جَوَابْ قَسَمْ যখন مَاضِىْ مُثْبَتْ হয়। তখন তাতে لَامْ এবং نُوْنْ নেওয়া আবশ্যক হয়। এখানে এই উভয়টিই নেই।

قَوْلُهُ مُزْجَاةٌ : এটা اَزْجِيْهِ থেকে নির্গত اَزْجَيْتُهُ অর্থ دَفَعْتُهُ

قَوْلُهُ مُسْتَثْبِتِيْنَ : কোনো কোনো নুসখায় مُتَثَبِّتِيْنَ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, هَلْ عَلِمْتُمْ এবং مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ -এর মধ্যে مَا টা اِسْتِفْهَامْ تَقْرِيْرِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَذْلَلْنَاكَ : অর্থাৎ جَعَلْنَا ذَلِيْلًا (تَرْوِيْعُ الْاَرْوَاحِ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ الخ :পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। –[তাফসীরে মারেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৪২, পৃ. ৫৭]

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যখন বিনয়ামিনের মালপত্রে শাহী পান পাত্র পাওয়া গেল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শরিয়ত মোতাবেক বিনয়ামিনকে মিসরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, তখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একটি প্রস্তাব দিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ অর্থাৎ বিনয়ামিনের স্থলে আমাদের একজনকে ধরে রাখুন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যার কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে শুধু তাকেই আটক রাখা হবে, অন্য কাউকে নয়। যদি অন্য কাউকে তার স্থলে আটক রাখা হয় তবে তা হবে জুলুম, আর আমরা জুলুম করতে পারি না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ জবাব শ্রবণ করে বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হলো এ অবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হলো

قَوْلُهُ قَالَ كَبِيْرُهُمْ الخ : তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল, তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিশর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারো মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

قَوْلُهُ اِرْجِعُوْٓا اِلٰى اَبِيْكُمْ : অর্থাৎ বড় ভাই বললেন, আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ : অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাজত করেছি যাতে সে কোনো অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে আমাদের জানা ছিল না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল, আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম [অর্থাৎ মিশরে] তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিশর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এক্ষেত্রে তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে, কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– اِنَّهٗ عَمِلَ ذٰلِكَ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِيَزِيْدَ فِىْ بَلَاءِ يَعْقُوْبَ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করেছিলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

বিধান ও মাসআলা : وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারো সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পিতার সাথে বিনয়ামিনের হেফাজত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিনয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরো একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে– এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনো ভাবে হোক, তদানুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোনো ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না। বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিকহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে? কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গুনাহে লিপ্ত না হয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বিনয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিশরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাধ্যমে দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে 'সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই' রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ শয়তান মানুষের শিরা উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়। -[বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী]

قَوْلُهُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ الخ : হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছোট ছেলে বিনয়ামিন মিশরে গ্রেফতার হওয়ার পর তার ভ্রাতারা দেশে ফিরে এলো এবং হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিশরবাসীদের কাছে কিংবা মিশর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বিনয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও হযরত ইয়াকূব (আ.) বিশ্বাস করতে পারলেন না। যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী (র.) বলেন, মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি পয়গাম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন এ ব্যাপারে হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে যে, 'মনগড়া কথা' বলে হযরত ইয়াকূব (আ.) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিশরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বিনয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ আশা করা যায় যে, সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দিবেন।

মোটকথা হযরত ইয়াকূব (আ.) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য এই ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো চুরিও হয়নি এবং বিনয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল তাও ভ্রান্ত ছিল না। وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا اَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে তার চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ অতঃপর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كَظْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তার মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারো কাছে তিনি দুঃখেই কথা বর্ণনা করতেন না

একারণেই كَظْمٌ শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোনো কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে- وَمَنْ يَكْظِمُ الْغَيْظَ يَاْجُرُهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন, জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জারীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মুহূর্তে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তাঁর দুঃখ ও আঘাতের সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) এ বাক্যটির পরিবর্তে يَا أَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ বলেছেন। বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমানে'ও এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর গভীর মহব্বতের কারণ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তার দৃষ্টি শক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গাম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কুরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফিতনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কুরআন পাকের ভাষায় পয়গাম্বরগণের শান হচ্ছে এই إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি পয়গাম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনানের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখেরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোনো বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরো কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)-এর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণ গরিমা শুধু দৈহিক রূপ সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং পয়গাম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তার মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না; বরং প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যই এটা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এতো গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হলো। ফলে মিশরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চেয়ে বেশি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার মতো ঘটনাবলি তখন ঘটেছে,

যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা বার বার মিশর গমন করতে থাকে। তিনি তখনো ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টাও করেননি; বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো একজন মনোনীত পয়গাম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ তা'আলার ওহীর ফলশ্রুতিতে সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনের كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ : অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল। আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি তো সদা-সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। [প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতোই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।]

হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের কথা শুনে বললেন- اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারো কাছে করি না; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে একথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

قَوْلُهُ يَا بَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ : অর্থাৎ বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফের ছাড়া কেউ তার রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

হযরত ইয়াকূব (আ.) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোনো কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হলো। এটা বিনয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যত কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদের আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন, আজীজে মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথমবার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আজীজে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তার হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাসআলা : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোনো বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং হযরত ইয়াকূব (আ.) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের অনুসরণ করা।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দুটি ঢোকই আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়। এক বিপদে সবর ও দুই. ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে সবরের কারণে শহীদের ছওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী (র.) হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদিন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। আর তার সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তার মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, দেখ আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম! আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দেব, যদ্দারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোনো কোনো রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (আ.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, নামাজে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন, এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামাজ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ الخ : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার ভাইদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে আদেশ করেন যে, যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। এ আদেশ পেয়ে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বিনয়ামিন যে সেখানে আছে তা জানাই ছিল। তাই তার মুক্তি জন্য প্রথমে চেষ্টা করা দরকার ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোনো কাজের সময় এসে যায়, তখন মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অজ্ঞান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে। এক হাদীসে রয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি আপনা-আপনি উপস্থিত করে দেন। তাই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তালাশ করার জন্যও অজ্ঞান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্যশস্য চাওয়ার বাহানায় আজীজে মিসরের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং তার কাছে বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদন করা যাবে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا (الاية) : অর্থাৎ ইউসুফ ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আজীজে মিশরের সাথে সাক্ষাৎ করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল। হে আজীজ! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসে অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য আমাদের কোনো অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন, কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُزْجَاةٍ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের এহেন মিসকিনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দূরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিধি নিষেধ ছিল এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) আজীজে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ–

ইয়াকূব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আজীজে মিসর সমীপে

বিনীত আরজ!

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পরিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা হযরত ইসহাক (আ.)-এরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গাম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনো চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্‌সালাম।

পত্র পাঠ করে হযরত ইউসুফ (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের স্মরণ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে? যখন তোমাদের মুর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভালো মন্দের বিচার করতে পারতে না?

এ প্রশ্ন শুনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আজীজে মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে হযরত ইউসুফ (আ.) একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোনো উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আজীযে মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরো চিন্তা ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরো তথ্য জানার জন্য বলল– أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইদের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরো কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দুজনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দুটি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয়ই যারা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ তা'আলা এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল– تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন। উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন– لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন– يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন– اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো যাতে সবাই দেখা সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে পারি। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গাম্বগণের আওলাদ। তাদের জন্য সদকা খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গাম্বর না হলেও হযরত ইউসুফ (আ.) তো পয়গাম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুঁশিয়ার করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে সদকা শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের ছওয়াল করেনি; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গাম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদের উক্তি তাই। –[বয়ানুল কুরআন]

اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সদকা-খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আজীজে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনো পর্যন্ত জানতো না যে, তিনি ঈমানদার না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালই বোঝা যায়।

–[বয়ানুল কুরআন]

এছাড়া এখানে বাহ্যত আজীজে মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আজীজে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ প্রতিদান দিয়ে থাকেন এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। –[কুরতুবী]

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোনো পিবদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কুরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞাকে বলা হয়েছে (اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ - كَنُوْدٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার : اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কুরআন পাক অনেক জায়গায় এদুটি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে– اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) দাবি করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী তার তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উক্ত মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কুরআন পাকে এরূপ দাবি করা নিষিদ্ধ হয়েছে- فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না। আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন কে মুত্তাকী। কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবি করা হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ : অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।

قَوْلُهٗ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি; বরং অতীত ঘটনাবলির জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেননি। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদকালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন- اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারো জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না; বরং এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি মোজেজা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তার জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহ্‌হাক ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ এ জামাটি সাধারণ কাপরের মতো ছিল না; বরং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য এটি জান্নাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূপদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকূব (আ.) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গলায় তাবিজ হিসেবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তার জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পরামর্শ দেন যে, এটি জান্নাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটাই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যদ্দারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপসৌন্দর্য এবং তার সত্তাই ছিল জান্নাতী বস্তু। তাই তা দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। –[মাযহারী]

قَوْلُهٗ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ : অর্থাৎ তোমরা সব ভাই আপন পরিবারবর্গকে আমার কাছে মিশরে নিয়ে এসো। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে, পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে, যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোনো বাধা থাকবে না। তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল, এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

অনুবাদ :

٩٤. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ خَرَجَتْ مِنْ عَرِيْشِ مِصْرَ قَالَ اَبُوْهُمْ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ بَنِيْهِ وَاَوْلَادِهِمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ اَوْصَلَتْهُ اِلَيْهِ الصَّبَا بِاِذْنِهٖ تَعَالٰى مِنْ مَسِيْرَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ ثَمَانِيَةٍ اَوْ اَكْثَرَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ تُسَفِّهُوْنِىْ لَصَدَّقْتُمُوْنِىْ .

৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন অতিক্রম করল অর্থাৎ মিসরের সীমান্তবর্তী শহর আরীশ হতে বের হলো তখন তাদের পিতা পুত্র-সন্তানদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তাদেরকে বলল, আমি অবশ্যই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি না তোমরা আমাকে অপ্রকৃতস্থ মনে কর। বেওকুফ বলে না ঠাওরাও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পূর্বদিকে প্রবাহিত বাতাশ তিন দিন বা আটদিন বা ততোধিক দিনের দূরত্ব হতে এই গন্ধ তার নিকট নিয়ে এসেছিল।

٩٥. قَالُوْا لَهٗ تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ خَطَائِكَ الْقَدِيْمِ مِنْ اِفْرَاطِكَ فِىْ مُحَبَّتِهٖ وَرَجَاءِ لِقَائِهٖ عَلٰى بُعْدِ الْعَهْدِ .

৯৫. তারা তাকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি তোমার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই অর্থাৎ তার প্রতি সীমাতিরিক্ত ভালোবাসা এবং এতদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার মিলনের আশা করার মতো ভুলেই রয়েছ।

٩٦. فَلَمَّآ اَنْ زَائِدَةٌ جَآءَ الْبَشِيْرُ يَهُوْدَا بِالْقَمِيْصِ وَكَانَ قَدْ حَمَلَ قَمِيْصَ الدَّمِ فَاَحَبَّ اَنْ يُّفْرِحَهٗ كَمَا اَحْزَنَهٗ اَلْقٰهُ طَرَحَ الْقَمِيْصَ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ رَجَعَ بَصِيْرًا ج قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো পুত্র ইয়াহুদা উক্ত জামাসহ আসল। পূর্বে সে-ই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মিথ্যা রক্ত মাখা জামাটি নিয়ে এসেছিল। তাই সে চাইতেছিল পূর্বে যেমন পিতাকে দুঃখ দিয়েছিল এখন সুসংবাদসহ এই জামাটি দেখিয়ে তাকে আনন্দিত করবে। এবং তার মুখমণ্ডলে তা রাখল অর্থাৎ জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল। বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তা জানি তোমরা যা জান না। اَنْ جَآءَ এই স্থানে اَنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। فَارْتَدَّ অর্থ ফিরল।

٩٧. قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ .

৯৭. তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের কারণে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।

٩٨. قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَخَّرَ ذٰلِكَ اِلَى السَّحَرِ لِيَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَى الْاِجَابَةِ وَقِيْلَ اِلٰى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ .

৯৮. বলল, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রাত্রের শেষ প্রহর পর্যন্ত তিনি তা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ ঐ সময়টি দোয়া কবুল হওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। কেউ কেউ বলেন, তিনি জুমার রাত পর্যন্ত তা পিছিয়ে দিলেন।

৯৯. ثُمَّ تَوَجَّهُوْا اِلٰى مِصْرَ وَخَرَجَ يُوْسُفُ وَالْاَكَابِرُ لِتَلَقِّيْهِمْ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ فِىْ مَضْرِبِهٖ اٰوٰى ضَمَّ اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ اَبَاهُ وَاُمَّهٗ اَوْ خَالَتَهٗ وَ قَالَ لَهُمُ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ قَدْ خَلُوْا وَجَلَسَ يُوْسُفُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ -

৯৯. অতঃপর তারা সকলে মিশরের দিকে যাত্রা করেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যর্থনার জন্য আসেন। অনন্তর তারা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট রাজ তাঁবুতে প্রবেশ করল, তখন সে তার পিতা মাতাকে পিতা ও মাতা বা তার খালাকে স্থান দিল ও জড়িয়ে ধরল। এবং তাদেরকে বলল, আপনারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। অনন্তর তারা সেই দেশে প্রবেশ করল। হযরত ইউসুফ (আ.) সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

১০০. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ اَجْلَسَهُمَا مَعَهٗ عَلَى الْعَرْشِ السَّرِيْرِ وَخَرُّوْا اَىْ اَبَوَاهُ وَاِخْوَتُهٗ لَهٗ سُجَّدًا سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ لَا وَضْعِ جَبْهَةٍ وَكَانَ تَحِيَّتُهُمْ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَقَالَ يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْ اِلَىَّ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ لَمْ يَقُلْ مِنَ الْجُبِّ تَكَرُّمًا لِئَلَّا يَخْجَلَ اِخْوَتُهٗ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ الْبَادِيَةِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ اَفْسَدَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ ط اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ بِخَلْقِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ -

১০০. এবং তিনি স্বীয় পিতা মাতাকে আরশের উপর উঠালেন। অর্থাৎ তার সাথে সিংহাসনে বসালেন এবং তার পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ সকলে সেজদায় লুটে পড়ল। অর্থাৎ আনত হয়ে অভিবাদন করল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নয়। তৎকালে এটাই ছিল অভিবাদনের রীতি। আর সে বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করলেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের মধ্যে আঘাত সৃষ্টি করার পরও ভাঙ্গন সৃষ্টির করার পর আমাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এনে দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এই স্থানে কারাগার হতে মুক্তির কথা উল্লেখ করলেন, কূপ হতে মুক্তির কথা তার ভ্রাতাগণের সম্মানার্থে উল্লেখ করলেন না। কারণ তাতে তাদের লজ্জা হতো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি নিশ্চয়ই তার সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তার কর্মে তিনি প্রজ্ঞাময়। اَحْسَنَ بِىْ এ স্থানে بِىْ-এর ب টি اِلٰى [প্রতি] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْبَدْوِ অর্থ মরু জনপদ।

১০১. وَاَقَامَ عِنْدَهٗ اَبَوَاهُ اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ مُدَّةُ فِرَاقِهٖ ثَمَانِىْ عَشَرَةَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اَوْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَصّٰى يُوْسُفُ اَنْ يَّحْمِلَهٗ وَيَدْفِنَهٗ عِنْدَ اَبِيْهِ -

১০১. এটার পর তার পিতা তার নিকট চব্বিশ ভিন্ন মতে সতের বৎসরকাল ছিলেন। তাদের বিচ্ছেদকাল ছিল আঠার বা চল্লিশ মতান্তরে আশি বৎসর। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতার পার্শ্বে দাফন করার অসিয়ত করে যান।

فَمَضٰى بِنَفْسِهٖ وَدَفَنَهٗ ثَمَّهٗ ثُمَّ عَادَ اِلٰى مِصْرَ وَاَقَامَ بَعْدَهٗ ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَلَمَّا تَمَّ اَمْرُهٗ وَعَلِمَ اَنَّهٗ لَا يَدُوْمُ تَاقَتْ نَفْسُهٗ اِلَى الْمُلْكِ الدَّائِمِ فَقَالَ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا فَاطِرَ خَالِقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نف اَنْتَ وَلِيّٖ مُتَوَلِّيْ مَصَالِحِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ مِنْ اٰبَائِيْ فَعَاشَ بَعْدَهٗ لَكَ اُسْبُوْعًا اَوْ اَكْثَرَ وَمَاتَ وَلَهٗ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ سَنَةً وَتَشَاحَّ الْمِصْرِيُّوْنَ فِيْ قَبْرِهٖ فَجَعَلُوْهُ فِيْ صُنْدُوْقِ مَرْمَرٍ وَدَفَنُوْهُ فِيْ اَعْلَى النِّيْلِ لِتَعُمَّ الْبَرَكَةُ جَانِبَيْهِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَا اِنْقِضَاءَ لِمُلْكِهٖ ـ

সে মতে হযরত ইউসুফ (আ.) নিজে তাকে নিয়ে যান এবং দাফন করার পর মিশরে ফিরে আসেন। এটার পরও তিনি তেইশ বৎসর অবস্থান করেন। জীবন যখন তার ঘনিয়ে আসল এবং বুঝতে পারলেন যে বেশি দিন আর নেই তখন চিরস্থায়ী ভুবনের প্রতি তার মন উদগ্রীব হয়ে উঠে। সুতরাং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দিয়েছে। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। আমার সকল কল্যাণ বিধানের তত্ত্বাবধায়ক। তুমি আমাকে মুসলিম আত্মসমর্পণকারী রূপে মৃত্যু দাও এবং আমাকে আমার পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত কর। এটার পর তিনি মাত্র এক সপ্তাহ বা কিছু বেশি কাল জীবিত ছিলেন। একশত বিশ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার কবরের স্থান নিয়ে মিসরবাসীদের বিবাদ হয়। সকলেই কামনা করছিল যে আমার নিজের মহল্লায় যেন তার দাফন হয়। শেষে তারা একটি মর্মর পাথরের সিন্দুকে তার শব রেখে নীলনদের উভয়কূলে বরকত বিস্তারের উদ্দেশ্যে তার উজানে তারা দাফন করে। আল্লাহ পবিত্র তাঁর রাজত্বের কোনো অন্ত নেই। تَاْوِيْلُ الْاَحَادِيْثِ অর্থ এই স্থানে স্বপ্ন ব্যাখ্যা। فَاطِرٌ অর্থ সৃষ্টিকর্তা।

১০২. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ يُوْسُفَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ اَخْبَارِهَا غَابَ عَنْكَ يَا مُحَمَّدُ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ لَدٰى اِخْوَةِ يُوْسُفَ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ فِيْ كَيْدِهٖ اَيْ عَزَمُوْا عَلَيْهِ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ بِهٖ اَيْ لَمْ تَحْضُرْهُمْ فَتَعْرِفَ قِصَّتَهُمْ فَتُخْبِرَ بِهَا وَاِنَّمَا حَصَلَ لَكَ عِلْمُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ ـ

১০২. এটা অর্থাৎ ইউসুফ সম্পর্কিত উল্লিখিত বিষয়সমূহ হে মুহাম্মদ ﷺ! অদৃশ্যলোকের সংবাদ অর্থাৎ যা তোমার সমক্ষে নেই সে কালের সংবাদ তোমার নিকট আমি এটা ওহীরূপে প্রেরণ করেছি। তুমি তাদের নিকট ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের নিকট ছিলে না, যখন তারা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছেছিল। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। আর তারা তার সম্পর্কে চক্রান্ত চালাচ্ছিল অর্থাৎ তুমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলে না যে এটা জেনেশুনে সংবাদ দিতেছ। একমাত্র ওহীর মারফতেই তুমি এটার জ্ঞান লাভ করেছ।

١٠٣. وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ وَلَوْ حَرَصْتَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

১০৩. তুমি যতই তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে উদগ্রীব হও না কেন, অধিকাংশ লোক মক্কাবাসীগণ ঈমান আনার নয়।

١٠٤. وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ اَىْ الْقُرْاٰنِ مِنْ اَجْرٍ ط تَاْخُذُهُ اِنْ مَا هُوَ اَىْ الْقُرْاٰنُ اِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

১০৪. তুমি তো তাদের নিকট এটার আল কুরআনের কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছ না যে এটা গ্রহণ করবে। এটা আল কুরআনের বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়। اِنْ هُوَ এস্থানে اِنْ টি না অর্থবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ذِكْرٌ অর্থ উপদেশ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَرَجَتْ مِنْ عَرِيْشِ مِصْرَ : একমত অনুযায়ী عَرِيْش হলো মিসর ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। অন্য মতানুসারে আবাদীকে عَرِيْش বলে। উদ্দেশ্য হলো মিসরের আবাদী তথা চাষাবাদ ও জনবসতি পূর্ণ এলাকা।

قَوْلُهُ مِنْ بَنِيْهِ وَاَوْلَادِهِمْ : এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য হতে কয়েকজন স্বীয় পিতার নিকট রয়ে গিয়েছিলেন। অথচ পূর্বে জানা গেছে যে, সকল ভ্রাতাগণই মিশর চলে গিয়েছিলেন। তাফসীরে খাযেনে রয়েছে- مِنْ اَوْلَادِ بَنِيْهِ আর শায়খ যাদাহ -এর ইবারত হলো- مِنْ وُلْدِ وَلَدِهٖ

قَوْلُهُ اَوْصَلَتْهُ اِلَيْهِ الصَّبَا : অর্থাৎ رِيْحُ الصَّبَا মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بَادْصَبَا এখানে একটি সুদৃঢ় সন্দেহ এই যে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিচরণশীল বায়ুকে صَبَا বলা হয়। আর পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে চলাচলকারী বায়ুকে دَبُوْر বলে। আর শাম মিসর হতে পূর্ব দিকে অবস্থিত। কাজেই সিরিয়া থেকে আগত বায়ুকে صَبَا বলা হবে। কাজেই صَبَا সিরিয়া [কেনান] থেকে মিসরের দিকে সুঘ্রাণ আনতে পারে; কিন্তু নিয়ে যেতে পারে না। তবে دَبُوْر মিসর থেকে সিরিয়ার দিকে সুঘ্রাণ নিয়ে যেতে পারে। উচিত ছিল/উত্তম হতো যদি মুফাসসির (র.) صَبَا -এর পরিবর্তে دَبُوْر বলতেন।

قَوْلُهُ تُفَنِّدُوْنِ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর تَفْنِيْدٌ মাসদার হতে جَمْعُ مُذَكَّرٍ حَاضِرٌ -এর সীগাহ এর অর্থ হলো- সুদীর্ঘ হায়াতের কারণে জ্ঞানের দুর্বল হয়ে যাওয়া, স্মৃতি শক্তিতে ত্রুটি এসে যাওয়া, বার্ধক্য জনিত কারণে জ্ঞান লোপ পাওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَصَدَّقْتُمُوْنِىْ : এটা لَوْلَا -এর জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ مَضْرَبَةٍ : এর অর্থ হলো বড় ছাউনী, ক্যাম্প, তাবু।

প্রশ্ন. مَضْرَبَةٌ উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. কেননা دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ বলার পর اُدْخُلُوْا مِصْرَ বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু دُخُوْل -এর পরে دُخُوْل -এর কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ কারণেই فِىْ مَضْرَبَةٍ উহ্য মেনেছেন। যাতে করে প্রথম دُخُوْل দ্বারা তাবুতে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়, যা স্বাগত জানানোর জন্য শহরের বাইরে নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় دُخُوْل দ্বারা মিসর শহরে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়েছে।

قَوْلُهُ أُمَّهُ أَوْ خَالَتَهُ : এতে সেই মতবিরোধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা রাহীল সে সময় জীবিত ছিলেন কি না? কেউ কেউ বলেন যে, জীবিত ছিলেন। কিন্তু জমহুর মুফাসসিরগণের অভিমত হলো যে, বিনয়ামিনের জন্মের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন রাহীলের ইন্তেকালের পর হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বোন লাইয়া কে বিবাহ করেন। আর রূপকভাবে খালাকে মা বলে দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে চাচাকে আব্বা বলা হয়ে থাকে। ইবরানী ভাষায় بِنْيَا বলা হয় প্রসব বেদনাকে, এই মুনাসাবাতের কারণেই তার নাম বিনয়ামিন রাখা হয়েছিল। এটাও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মায়ের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

قَوْلُهُ اٰمِنِيْنَ : অর্থাৎ اٰمِنِيْنَ مِنَ الْقَحْطِ وَسَائِرِ الْمَكَارِهِ

قَوْلُهُ اِلَيَّ : এতে ইঙ্গিত ও রয়েছে যে, بِيْ টা اِلَيَّ অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ الخ : অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে হযরত ইয়াকূব (আ.) নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তা'আলা এতদূর থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মস্তিষ্কে পৌছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিনদিন পড়ে রইলেন, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মোজেজা পয়গাম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মোজেজা পয়গাম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়। সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মোজেজা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তু ও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَوْلُهُ تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ : অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি তো সেই পুরোনো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌছল এবং ইউসুফের জামা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَوْلُهُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি যা তোমরা জান না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

قَوْلُهُ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ : বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَوْلُهُ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ : হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, আমি সত্বরই তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। হযরত ইয়াকূব (আ.) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন। কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি ক্ষমা করব?

قَوْلُهُ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ : কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্তু ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিশরে আসার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তার আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিশর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত ইউসুফ (আ.) ও শহরের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হলো। সবাই যখন মিশরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে أَبَوَيْهِ [পিতামাতা] উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা তার শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর হযরত ইয়াকূব (আ.) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতোই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

কারণটি ঐ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিনয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তেকালের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত নেই। যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এগুলোও পরস্পর বিরোধী। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লেখেন, বিনয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তেকাল ইহুদিরা স্বীকার করে না। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোনো প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আপন মাতাই বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীরের মতে এ রেওয়ায়েতই অগ্রগণ্য। ইবনে জারীর বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতার ইন্তেকালের কোনো প্রমাণ নেই। কুরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যত তাই বুঝা যায়।

–[মোঃ তকী ওসমানী]

قَوْلُهُ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ : হযরত ইউসুফ (আ.) পরিবারের সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে অবাধে মিশরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

قَوْلُهُ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) পিতামাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

قَوْلُهُ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا : অর্থাৎ পিতামাতা ও ভ্রাতারা সবাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে সেজদা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য নয় আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরিয়তে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো জন্য বৈধ ছিল না। কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরিয়তের বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামি শরিয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَقَالَ يَا اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে যখন পিতামাতা ও এগারো ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল। তিনি বললেন, পিতা! এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা; যাতে দেখেছিলেন যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহ তা'আলার শুকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতামাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এলো, তখন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন- رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পরিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গাম্বরগণই হতে পারেন। তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র। -[মাযহারী]

এ দোয়ায় 'খাতেমা বিলখায়র' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মরতবাই লাভ করুন এবং যতো প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদ মর্যাদাই তাদের পদচুম্বন করুক। তারা কখনো গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তারা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; বরং সেগুলো আরো যেন বৃদ্ধি পায়।

এ পর্যন্ত কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিস্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হলো। এর পরবর্তী কাহিনী কুরআন পাক অথবা কোনো মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ ঐতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর ইবনে কাছীরে হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কূপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তার বয়স ছিল [১৭] সতের বছর। এরপর পিতার কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, কিতাবী সম্প্রদায়ের রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। এরপর হযরত ইয়াকূব (আ.) মিশরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

তাফসীরে কুরতুবীতে ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিশরে চব্বিশ বছর অবস্থান করার পর হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পূর্বে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অসিয়ত করেন যেন তার মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক (আ.)-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণেই সাধারণ ইহুদিদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে যায় যে, তারা মৃত্যদেহ দূর দূরান্ত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে এনে দাফন করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বয়স ছিল একশত সাতচল্লিশ বছর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) পরিবারবর্গসহ যখন মিশরে প্রবেশ করেন, তখন তাদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবর্তীকালে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আওলাদ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে মিশর থেকে বের হয়, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সত্তর হাজার। -[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আজীজে মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহর উদ্যোগে হযরত ইউসুফ (আ.) জুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন।

তওরাত ও কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আছে, তার গর্ভে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুই ছেলে ইফরায়ীম ও মানশা এবং এক কন্যা 'রহমত বিনতে ইউসুফ' জন্মগ্রহণ করেন। রহমতের বিয়ে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরায়ীমের বংশধরের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর ইবনে নূন জন্মগ্রহণ করেন। -[মাযহারী]

হযরত ইউসুফ (আ.) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তাকে নীলনদের কিনারায় সমাহিত করা হয়।

ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আ.)-কে যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিশর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মৃতদেহ মিশরে রেখে যাবেন না; বরং সাথে নিয়ে সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে হযরত মূসা (আ.) খোঁজাখুঁজি করে তার কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পাশে দাফন করেন। -[মাযহারী]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পর মিশর দেশ 'আমালিক' গোত্রের ফেরাউনের করতলগত হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, কিন্তু বিদেশী হওয়ার অজুহাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন।

-[মাযহারী]

নির্দেশ ও বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পিতামাতার প্রতি সম্মানসূচক সেজদা তখন জায়েজ ছিল বলেই তার পিতামাতা ও ভ্রাতারা সেজদা করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়তের সেজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামাত। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করা হারাম। কুরআনে বলা হয়েছে- لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করো না। হাদীসে আছে হযরত মুআজ (রা.) সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খ্রিস্টানরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সেজদা করে, তখন ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সেজদা করতে উদ্যত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিষেধ করে বলেন, যদি আমি কাউকে সেজদা করা জায়েজ মনে করতাম, তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সেজদা করে। এমনিভাবে হযরত সালমান ফারিসী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সেজদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করে বলেছিলেন- لَا تَسْجُدْ لِيْ يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ অর্থাৎ সালমান আমাকে সেজদা করো না, বরং ঐ চিরজীবীকে সেজদা কর, যার ক্ষয় নেই। -[ইবনে কাসীর]

এতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন সম্মানসূচক সেজদা করা জায়েজ নয়, তখন আর কোনো বুজুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েজ হতে পারে?

هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন পরেও প্রকাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে। -[ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর]

قَدْ أَحْسَنَ بِيْ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদ পতিত হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পয়গাম্বরগণের সুন্নত এবং রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুন্নত।

إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সূক্ষ্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন। যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا বাক্যে হযরত ইউসুফ (আ.) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সংসারে দুঃখ কষ্টে পেরেশান ও অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা দুরস্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করেন ইয়া আল্লাহ, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং যখন মৃত্যু শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর।

قَوْلُهُ ذَالِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ الخ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (রা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ অর্থাৎ এই কাহিনী ঐ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

কুরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, [আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না।] অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। কারণ সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারো কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরো জানা ছিল যে, তার সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। তবে কুরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে– مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ কুরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানতো না।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, ইহুদি ও কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করল, আপনি যদি সত্য নবী হন তবে বলুন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরি ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় আপনি যতো চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হলো প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছে– وَمَا تَسْئَلُهُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছেন সেজন্য আপনার পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শুনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব লাভ নয়; বরং পরকালের ছওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

অনুবাদ :

١٠٥. وَكَاَيِّنْ وَكَمْ مِنْ اٰيَةٍ دَالَّةٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا يُشَاهِدُوْنَهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا .

১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রমাণবহ কত নিদর্শন রয়েছে তারা এই সব অতিক্রম করে যায়। এইসব প্রত্যক্ষ করে কিন্তু এগুলো সম্পর্কে তারা উদাসীন। এই গুলোতে তারা কোনো রূপ চিন্তা করে না। كَاَيِّنْ অর্থ– كَمْ বা কত।

١٠٦. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ حَيْثُ يُقِرُّوْنَ بِاَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّزَّاقُ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ بِهٖ بِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَلِذَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ فِىْ تَلْبِيَتِهِمْ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ يَعْنُوْنَهَا .

১০৬. তাদের অধিকাংশ জন আল্লাহ বিশ্বাস করে বটে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা এবং রিজিকদাতা তা স্বীকার করে বটে কিন্তু তারা প্রতিমার উপাসনা করতো তার সাথে শরিক করে। তাই তারা তাদের হজের তালবিয়া পাঠকালে তাতে বলত لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا لَكَ تَمْلِكُهٗ অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই কেবল ঐ শরিক ব্যতীত যার মালিক তুমিই। এই বলে তারা প্রতিমাসমূহের দিকেই ইঙ্গিত করতো।

١٠٧. اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ نِقْمَةٌ تَغْشَاهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فُجَاءَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ اِتْيَانِهَا قَبْلَهٗ .

১০৭. তবে কি তারা এটা হতে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলার সর্বগ্রাসী শাস্তি তাদের উপর এসে পড়বে অথবা কিয়ামত এসে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হবে অথচ তারা পূর্বে তার আগমনের সময় টের পাবে না। غَاشِيَةٌ অর্থাৎ এমন শাস্তি যা তাদেরকে গ্রাস করে নিবে। بَغْتَةً অর্থ আকস্মিকভাবে।

١٠٨. قُلْ لَهُمْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهٖ اَدْعُوْا اِلَى دِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ حُجَّةٍ وَاضِحَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط اٰمَنَ بِىْ عَطْفٌ عَلٰى اَنَا الْمُبْتَدَأُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهٗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جُمْلَةِ سَبِيْلِهٖ اَيْضًا .

১০৮. তাদেরকে বল, এটাই আমার পথ। পরবর্তী বাক্যটিতে এটার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি অর্থাৎ তাঁর দীন ও ধর্ম পথের আহ্বান করি সজ্ঞানে অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আমি ও আমার অনুসারীগণ অর্থাৎ আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ। আল্লাহ মহিমান্বিত অংশী হওয়া হতে পবিত্রতা তাঁরই। আমি মুশরিকদেরকে অন্তর্ভুক্ত নই। এটাও তার পথেরই শামিল। وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ পূর্বোল্লিখিত اَنَا -এর সাথে এটার عَطْف হয়েছে। আর اَنَا হলো مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। এটা خَبَر বা বিধেয় হলো তৎপূর্ববর্তী শব্দ عَلٰى بَصِيْرَةٍ

١٠٩. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ اِلَيْهِمْ لَا مَلَائِكَةً مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط الْاَمْصَارِ لِاَنَّهُمْ اَعْلَمُ وَاَحْلَمُ بِخِلَافِ اَهْلِ الْبَوَادِ لِجَفَائِهِمْ وَجَهْلِهِمْ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط اَىْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِنْ اِهْلَاكِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اللّٰهَ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَا اَهْلَ مَكَّةَ هٰذَا فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

১০৯. তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের হতে শহরবাসীদের হতে, কারণ শহরবাসীরা অধিক জ্ঞানী ও সহিষ্ণু হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মরুবাসীরা সাধারণত অজ্ঞ ও গোয়ার। বহু পুরুষের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করেছি ফেরেশতাগণকে নয়। তারা কি অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? অনন্তর তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার করার ফলে শেষে তাদের কেমন ধ্বংস কর পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখে না? যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালই অর্থাৎ জান্নাতই শ্রেয়। হে মক্কাবাসীগণ, তোমরা কি তা বুঝ না? এবং ঈমান আনয়ন কর না? يُوْحِىْ এটা অপর এক কেরাতে প্রথমে نُوْنٌ [উত্তমপুরুষ বহুবচনরূপে] ও ح -এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। تَعْقِلُوْنَ এটা اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ক্রিয়াটি ت দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [নাম পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

١١٠. حَتّٰى غَايَةٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا اَىْ فَتَرَاخٰى نَصْرُهُمْ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ يَئِسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَيْقَنَ الرُّسُلُ اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا بِالتَّشْدِيْدِ تَكْذِيْبًا لَا اِيْمَانَ بَعْدَهُ وَالتَّخْفِيْفِ اَىْ ظَنَّ الْاُمَمُ اَنَّ الرُّسُلَ اَخْلَفُوْا مَا وَعَدُوْا بِهِ مِنَ النَّصْرِ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ بِنُوْنَيْنِ مُشَدَّدًا وَ مُخَفَّفًا وَبِنُوْنٍ مُشَدَّدٍ مَاضٍ مَنْ نَّشَآءُ ط وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَذَابُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১১০. অনন্তর তাদের প্রতি রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসতে বিলম্ব হলো। অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তারা ভাবলেন রাসূলগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে যে এটার পর আর কাফেরদের ঈমান আনয়ন হতে পারে না তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল। حَتّٰى এটা এস্থানে وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا -এর মধ্যে নিহিত বক্তব্যটির غَايَة বা সীমা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْتَيْئَسَ অর্থ নিরাশ হলো। كُذِّبُوْا এটার ذ -এ তাশদীদসহ (بَابُ تَفْعِيْل) পঠিত হলে অর্থ হবে এমনভাবে তাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে যে এটার পর আর কাফেরদের তরফ হতে ঈমান আনয়নের আশা নেই। এটার ذ টি تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে যে, উম্মতদের ধারণা হলো যে, নবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সাহায্য আসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটার বিপরীত হয়েছে। অনন্তর আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে উদ্ধার করি। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে অর্থাৎ মুশরিক সম্প্রদায় হতে আমার প্রচণ্ডতা অর্থাৎ আমার শাস্তি রদ করা হয় না। نُنَجِّىْ এটাতে দুটি ن সহ এবং ج এ তাশদীদ ব্যতিরেকেও পাঠ করা যায়। অপর এক কেরাতে مَاضِىْ অর্থাৎ অতীতকাল রূপে একটি ن ও ج এ তাশদীদসহও পঠিত রয়েছে।

١١١. لَقَدْ كَانَ فِىْ قِصَصِهِمْ اَىِ الرُّسُلِ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ط اَصْحَابِ الْعُقُوْلِ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى يُخْتَلَقُ وَلٰكِنْ كَانَ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ مِنَ الْكُتُبِ وَتَفْصِيْلَ تَبْيِيْنَ كُلِّ شَىْءٍ يُحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِانْتِفَاعِهِمْ بِهٖ دُوْنَ غَيْرِهِمْ.

১১১. তাদের অর্থাৎ রাসূলগণের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এই কুরআন মিথ্যা রচিত বাণী নয়। তবে এটা তার সমক্ষে যা রয়েছে তার অর্থাৎ তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং দীনের বিষয়ে যা কিছুর প্রয়োজন সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, গুমরাহী হতে বাঁচার পথ নির্দেশ ও রহমত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। বিশ্বাসীরাই যেহেতু এটার মাধ্যমে উপকৃত হয় অন্যরা নয়; সেহেতু এস্থানে বিশেষ করে কেবল তাদেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। أُولِى الْاَلْبَابِ অর্থ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ। يُفْتَرٰى অর্থ যা মিথ্যা রচিত। تَصْدِيْقَ الَّذِىْ এটার পূর্বে একটি ক্রিয়া كَانَ উহ্য রয়েছে। تَفْصِيْل অর্থ বিশদ বিবরণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَاَيِّنْ : এটা মূলত كَاَيٍّ ছিল। তানভীনকে نُوْنْ দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে كَاَيِّنْ হয়ে গেছে। এটা كَافْ تَشْبِيْه এবং اَىٌّ দ্বারা مُرَكَّبْ হয়েছে। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই كَمْ خَبَرِيَّةْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা تَكْثِيْرْ তথা আধিক্যতার অর্থ দেয়। যেমন كَاَيِّ مِنْ رَجُلٍ رَاَيْتُ [আমি অনেক লোক দেখেছি।] আবার কখনো اِسْتِفْهَامْ -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, كَاَيِّ تَقْرَأُ سُوْرَةَ الْاَحْزَابِ [আপনি কতবার সূরায়ে আহযাব পড়েছেন?] كَاَيِّنْ হলো মুবতাদা আর مِنْ اٰيَةٍ হলো تَمْيِيْزْ যা مِنْ -এর কারণে مَجْرُوْرْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এটা اٰيَةٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا : এটা জুমলা হয়ে كَاَيِّنْ -এর খবর হয়েছে। আর وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ বাক্য হয়ে يَمُرُّوْنَ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ الْمُخْبَرُ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهٗ : اَنَا এবং مَنْ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর عَلٰى بَصِيْرَةٍ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ যেমনটি মুফাসসির (র.) সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ بِخِلَافِ اَهْلِ الْبَوَادِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَهْلُ الْقُرٰى দ্বারা শহরের মোকাবিল উদ্দেশ্য। কাজেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, নবীগণ বেশির ভাগ শহরেই প্রেরিত হয়েছেন।

قَوْلُهٗ يَئِسَ : اِسْتَيْئَسَ -এর মধ্যে [س এবং ت] طَلَبْ -এর জন্য হয়নি।

قَوْلُهٗ تَكْذِيْبًا لَا اِيْمَانَ بَعْدَهٗ : এতে এই সংশয়ের উত্তর রয়েছে যে, تَكْذِيْب তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ এখন এমন تكذيب করেছে যে, এরপরে ঈমানের আশাও শেষ হয়ে গেছে। আর ظَنُّوْا -এর অর্থ اَيْقَنَ الرُّسُلُ হবে তাশদীদের সুরতে। আর تَخْفِيْف -এর সুরতে ظَنُّوْا টা স্বীয় অর্থের উপরই বলবৎ থাকবে।

قَوْلُهُ فَنُنَجِّىْ : جِيْم -এর তাশদীদসহ تَنْجِيَةٌ মাসদার বাবে تَفْعِيْل হতে অর্থ– আমরা উদ্ধার করি। نُنْجِىْ তথা তাখফীফের সাথে বাবে اِنْعَال হতে مُضَارِعْ -এর جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। نُجِّىَ মাজী মাজহূলের وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। বাবে تَفْعِيْل -এর تَنْجِيَةٌ মাসদার থেকে অর্থ হলো– তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। مُشَدَّدًا -এর সম্পর্ক প্রত্যেক কেরাতেই جِيْم -এর সাথে রয়েছে। আর مَاضِىْ مَجْهُوْل -এর সুরতে مَنْ نَّشَاءُ টা নায়েবে ফায়েল হবে। আর প্রথম দুই সুরতে مَفْعُوْلٌ بِهٖ হবে। কেউ কেউ مُشَدَّدًا কে نُوْن -এর صِفَتْ বলেছেন যা ভুল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَاَيِّنْ مِنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ : অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশত কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হলো এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। এটুকুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপর শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আজাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরিউক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাসী, কিন্তু তার সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে- وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্জাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ছোট শিরক কি? সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, রিয়া [লোক দেখানো ইবাদত] হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেওয়াও ফিকহবিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর কোনো আজাব এসে যাবে কিনা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা মান অথবা না মান আমার তরিকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব। আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোনো চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ তা'আলার সিপাহী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাদের মধ্যে লৌকিকতার নাম গন্ধও নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা তারা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কালবী ও ইবনে যায়েদ বলেন, এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণের দাবি করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ তা'আলার 'বান্দা' এবং মানুষকেও তার দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতো যে, আল্লাহ তা'আলার রাসূল ও দূত মানুষ নয়। বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ তা'আলার রাসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার রাসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য এই যে, তার প্রতি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারো প্রচেষ্টাও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দাতার ও রাসূলের নির্দেশাবলি অমান্য করে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে– اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. অর্থাৎ তারা কি দেশ ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহেজগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভালো, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভালো?

বিধান ও নির্দেশ : অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য : ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩ আয়াতে মরিয়মের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হুদের ৪৮ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে– تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গাম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গাম্বর মুহাম্মদ ﷺ কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের তুলনায় বেশি। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সংবলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস গ্রন্থসমূহে বিস্তর মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনোরূপ অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বুঝে। এগুণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলিমুল গায়েব' [অদৃশ্যে জ্ঞানী] ছিলেন; কিন্তু কুরআনে পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ এতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গায়েব হতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো রাসূল অথবা ফেরেশতাকে শরিক মনে করা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খ্রিস্টানদের অপকর্ম। তারা রাসূলকে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সত্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল গায়েব' একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গাম্বরগণকে অবহিত করেন। কুরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কুরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ এর বেশি নয় যে–

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چوں بمعنی رفت آرام اوفتاد

অর্থাৎ জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাৎপর্যে পৌছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেকে গেছে।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

এ আয়াত পয়গাম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গাম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রাসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাছীর (র.) ব্যাপক সংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো নারীকে নবী কিংবা রাসূল নিযুক্ত করেননি। কোনো কোনো আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিবি হযরত সারা, হযরত মূসা (আ.)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কুরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোনো বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত তিনজন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বুঝা যায়। এই ভাষা নবুয়ত ও রিসালাত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই اَهْلِ الْقُرٰى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সাধারণত শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন। অজ্ঞ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হয়নি। কারণ সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী প্রমুখ]

قَوْلُهُ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ পয়গাম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গাম্বরদের সম্পর্কে কোনো কোনো সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গাম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করতো এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করতো, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারতো যে, পয়গাম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে আদ ও কওমে ছামূদকে নানাবিধ আজাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আজাব আরো কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থাই চিরস্থায়ী এবং সুখ দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরিয়তের যাবতীয় বিধি বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোনো আজাব আসতে দেখেনি। এতে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আজাব যদি আসবারই হতো, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এতো দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায় এবং পয়গাম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে- حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا مِنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আজাব না আসার কারণে পয়গাম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আজাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আজাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গাম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো কোনো নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আজাব এসে যায়। অতঃপর এ আজাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের অনুসারী মু'মিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং অপসৃত করা হয় না; বরং আজাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আজাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوْا শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তাফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ كُذِبُوْا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গাম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গাম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গাম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না; বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্য মুজতাহিদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে খানায়ে কাবার তওয়াফ করেছেন। পয়গাম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোনো বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হলো না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوْا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আজাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গাম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আজাব আসেনি। ফলে তারা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তাফসীরটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ সহীহ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি যাল এর তাশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوْا ও পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوْا ক্রিয়াপদটি تَكْذِيْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গাম্বরদের অনুমতি সময়ে আজাব না আসার কারণে তারা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান তারাও বুঝি তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তার যা কিছু বলেছিলেন, তা পূর্ণ হলো না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আজাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। ফলে পয়গাম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে; এর অর্থ সব পয়গাম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

قَوْلُهُ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ : অর্থাৎ এ কাহিনী কোনো মনগড়া কথা নয়; বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলেও এ কহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, যতগুলো আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী থেকে কোনোটিই খালি নয়। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ এ কুরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ কুরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ে বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরি। ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরো বলা হয়েছে এ কুরআন ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফেরদের জন্যও কুরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবূ মনসূর (র.) বলেন, সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করেছেন, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আর-রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْاٰيَةَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا اَلْاٰيَةَ اَوْ مَدَنِيَّةٌ اِلَّا وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا اَلْاٰيَتَيْنِ ثَلَاثٌ اَوْ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ وَاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً

তবে يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই আয়াতগুলো ব্যতীত সূরাটি মক্কী।
মতান্তরে وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا হতে দুটি আয়াত ব্যতীত সূরাটি মাদানী। আয়াত ৪৩/৪৪/৪৫ বা ৪৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. الٓمّٓرٰ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اَيِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْحَقُّ لَا شَكَّ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاَنَّهٗ مِنْ عِنْدِهٖ تَعَالٰى .

১. আলীম, লাম, মীম, রা এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত, এগুলো এ আয়াতগুলো কিতাবের অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত। اٰيٰتُ এ স্থানে اَلْكِتٰبِ শব্দটির প্রতি اٰيٰتُ الْكِتٰبِ শব্দটির اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধ مِنْ [হতে] অর্থব্যঞ্জক। আর যা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা অর্থাৎ আল কুরআন وَالَّذِيْٓ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَلْحَقُّ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। সত্য তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে এটা প্রেরিত হয়েছে।

২. اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اَيِ الْعَمَدُ جَمْعُ عِمَادٍ وَهُوَ الْاُسْطُوَانَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَا عَمَدَ اَصْلًا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ وَسَخَّرَ ذَلَّلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَجْرِيْ فِيْ فَلَكِهٖ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يَقْضِيْ اَمْرَ مُلْكِهٖ يُفَصِّلُ يُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ دَلَالَاتِ قُدْرَتِهٖ لَعَلَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ بِالْبَعْثِ تُوْقِنُوْنَ .

২. আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ উঁচিয়ে ধরেছেন স্তম্ভ ব্যতীত যা তোমরা দেখতেছ عَمَدٌ এটা عِمَادٌ-এর বহুবচন। অর্থ স্তম্ভ। এ কথাটি একটি বাস্তব সত্য। কেননা আসলেই কোনো স্তম্ভ নেই। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন যেভাবে সমাসীন হওয়া তার শানযোগ্য সেভাবে। সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে দিলেন আজ্ঞাবহ করলেন। তাদের প্রত্যেকটিই স্ব-স্ব কক্ষে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্তের জন্য আবর্তন করছে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন স্বীয় সাম্রাজ্যের সকল কিছুর ফয়সালা করেন। এবং নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ তাঁর কুদরত ও অপার ক্ষমতার প্রমাণসমূহ স্ববিস্তারে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন। যাতে হে মক্কাবাসীগণ তোমরা পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

٣. وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ بَسَطَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ خَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ خَلَقَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ يُغْشِي يُغَطِّي الَّيْلَ بِظُلْمَتِهِ النَّهَارَ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِيْ صُنْعِ اللّٰهِ.

৩. তিনিই ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক ফল অর্থাৎ ফলের প্রত্যেক রকম সৃষ্টি করেছেন দু প্রকারের। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা অর্থাৎ এটার তমসা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয়ই তাতে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে নিহিত নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ও তাঁর কুদরতের প্রমাণ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। مَدَّ অর্থ বিছিয়েছেন। جَعَلَ অর্থ সৃষ্টি করেছেন। رَوَاسِيَ অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ। يُغْشِي অর্থ আচ্ছাদিত করেন।

٤. وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ بِقَاعٌ مُّخْتَلِفَةٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ مُتَلَاصِقَاتٌ فَمِنْهَا طَيِّبٌ وَسَبْخٌ وَقَلِيْلُ الرَّيْعِ وَكَثِيْرُهُ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰى وَّجَنّٰتٌ بَسَاتِيْنُ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى جَنّٰتٍ وَالْجَرِّ عَلٰى اَعْنَابٍ وَكَذَا قَوْلُهُ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ جَمْعُ صِنْوٍ وَهِيَ النَّخَلَاتُ يَجْمَعُهَا اَصْلٌ وَاحِدٌ وَتَتَشَعَّبُ فُرُوْعُهَا وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ مُنْفَرِدَةٍ يُّسْقٰى بِالتَّاءِ اَيِ الْجَنّٰتُ وَمَا فِيْهَا وَالْيَاءِ اَيِ الْمَذْكُوْرُ بِمَاۤءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ط بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا فَمِنْ حُلْوٍ وَحَامِضٍ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

৪. পৃথিবীতে বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ এটার বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পর সংলগ্ন। এটার কতক অংশ উর্বর, কতক অংশ লবণাক্ত। কতক অংশ কম উপকারী আর কতক অংশ বেশ উপকারী। এটাও তাঁর কুদরতের নির্দশন। আছে বহু দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র। একাধিক শিরবিশিষ্ট ও এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ, তাদেরকে দেওয়া হয় একই পানি। আর স্বাদে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। কিছু তো রয়েছে সুমিষ্ট, আর কিছু রয়েছে তিক্ত। এগুলোও হলো আল্লাহ তা'আলা কুদরতের প্রমাণ। অবশ্যই বোধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতো অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহে রয়েছে নিদর্শন। مُتَجٰوِرٰتٌ অর্থ– পরস্পর সংলগ্ন। جَنّٰتٌ অর্থ উদ্যানসমূহ। زَرْعٌ এটাকে جَنّٰتٌ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয়রূপে رَفْع আর اَعْنَابٍ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয়রূপে جَرّ সহ পাঠ করা যায়। পরবর্তী শব্দ نَخِيْلٌ ও তেমনি উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। صِنْوَانٌ এটা صِنْوٌ -এর বহুবচন। এমন খর্জুর বৃক্ষ যার কাণ্ড একটি কিন্তু মাথা একাধিক। غَيْرُ صِنْوَانٍ এক মাথাবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। يُسْقٰى এটা ت সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে ঐ جنات [উদ্যানে] এবং ঐগুলোতে যা আছে তাতে পানি দেওয়া হয়। আর ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গরূপে গঠিত হলে অর্থ হবে উল্লিখিত বস্তুসমূহে পানি দেওয়া হয়। يُفَضِّلُ এটা ن অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন ও ى নাম পুরুষ একবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اُلْاُكُلُ এটার ك অক্ষরটিতে পেশ ও সাকিন উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়।

٥. وَاِنْ تَعْجَبْ يَا مُحَمَّدُ مِنْ تَكْذِيْبِ الْكُفَّارِ لَكَ فَعَجَبٌ حَقِيْقٌ بِالْعُجْبِ قَوْلُهُمْ مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ لِاَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى اِنْشَاءِ الْخَلْقِ وَمَا تَقَدَّمَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ قَادِرٌ عَلٰى اَعَادَتِهِمْ وَفِي الْهَمْزَتَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَحْقِيْقُ الْاُوْلٰى وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكِهَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْاِسْتِفْهَامِ فِي الْاَوَّلِ وَالْخَبَرُ فِي الثَّانِيْ وَاُخْرٰى عَكْسُهُ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ ج وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

৫. হে মুহাম্মদ ﷺ ! কাফেরগণ কর্তৃক অস্বীকার করার দরুন যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের কারণ হলো মূলত অধিক বিস্ময়যোগ্য হলো তাদের অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের কথা: মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? কারণ যিনি কোনোরূপ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে সকল সৃষ্টি ও উল্লিখিত বিষয়সমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি এগুলো পুনর্বার সৃষ্টি করতে নিশ্চয়ই আরো অধিক সক্ষম। أَاِذَا এবং أَاِنَّا এ উভয় স্থানেই হামযাদ্বয়কে আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে বা প্রথমটি স্পষ্ট ও দ্বিতীয়টিকে তাসহীল করত উভয় অবস্থায়ই এতদুভয়ের মধ্যে একটি আলিফ বৃদ্ধি করত বা তা পরিত্যাগ করত পাঠ করা যায়। এক কেরাতে প্রথমাংশের [অর্থাৎ أَاِذَا] হামযাটি اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবাচক ও দ্বিতীয় অংশটিতে [অর্থাৎ أَاِنَّا] হামযাটি خَبَرِيَّة [অর্থাৎ বিবরণমূলকরূপে]] গণ্য করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে এটার বিপরীত পাঠ [অর্থাৎ প্রথমটিতে خَبَرِيَّة বা বিবরণমূলক ও দ্বিতীয়টিতে اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবোধকরূপে] রয়েছে। তারাই তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং তাদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ শৃঙ্খল। তারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٦. وَنَزَلَ فِي اسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ اِسْتِهْزَاءً وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ الْعَذَابِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ الرَّحْمَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ط جَمْعُ الْمَثُلَةِ بِوَزْنِ السَّمُرَةِ اَيْ عُقُوْبَاتُ اَمْثَالِهِمْ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ اَفَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهَا وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى مَعَ ظُلْمِهِمْ ج وَاِلَّا لَمْ يَتْرُكْ عَلٰى ظَهْرِهَا دَابَّةً وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ ـ

৬. তারা বিদ্রূপ করত শীঘ্র আজাব আসার দাবি করত। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। মঙ্গলের পরিবর্তে অর্থাৎ রহমত ও করুণার পরিবর্তে তারা তোমাকে মন্দ অর্থাৎ শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে তার বহু দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তাদের মতো অস্বীকারকারীদের উপর শাস্তি নিপতিত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে; কিন্তু তারা তা হতে কোনোরূপ শিক্ষাগ্রহণ করতেছে না। اَلْمَثُلَاتُ এটা سَمُرَةٌ ঢঙ্গে উচ্চারিত শব্দ مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। নতুবা তিনি পৃথিবীতে বিচরণশীল কোনো প্রাণী আস্ত ছাড়তেন না। আর তোমার প্রতিপালক যারা তার প্রতি অবাধ্যাচরণ করে তাদেরকে শাস্তিদানেও কঠোর। عَلٰى ظُلْمِهِمْ এ স্থানে عَلٰى [অর্থাৎ উপর] শব্দটি مَعَ [অর্থাৎ সাথে, সত্ত্বেও] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧. وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا هَلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ قَالَ تَعَالٰى إِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ مُخَوِّفُ الْكَافِرِيْنَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِتْيَانُ الْاٰيَاتِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ نَبِيٌّ يَدْعُوْهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ بِمَا يُعْطِيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ بِمَا يَقْتَرِحُوْنَ.

৭. আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, তার নিকট অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন যেমন– লাঠি, হাত হতে জ্যোতি বিকিরণ, পাথর হতে উষ্ট্র নির্গমন ইত্যাদি অবতীর্ণ হয় না কেন? لَوْلَا এটা এস্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি তো একজন সতর্ককারী কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী বই কিছুই নও। নিদর্শন আনয়ন তোমার কর্তব্য নয়। আর প্রত্যেক সম্প্রদয়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ নবী। যিনি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিদর্শনের সাহায্যে তাদের প্রতিপালকের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানান। তাদের দাবি অনুসারে তিনি নিদর্শন প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ : এখানে سُوْرَةُ الرَّعْدِ হলো মুবতাদা আর مَكِّيَّةٌ হলো خَبَرِ اَوَّل আর تِلْكَ الخ হলো خَبَر ثَانِى এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি উক্তি রয়েছে– ১. وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (اَلْاٰيَة) ব্যতীত পূর্ণ সূরাটাই মাক্কী। ২. وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا الخ .৩ হতে لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ পর্যন্ত ব্যতীত পূর্ণ সূরাটাই মাক্কী। ৩. هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ দুটি আয়াত ব্যতীত পূর্ণ সূরাটাই মাদানী। ৪. বলা হয়েছে যে, পূর্ণ সূরাটাই মাদানী। ৫. বলা হয়েছে যে, পূর্ণ সূরাটাই মাক্কী।

قَوْلُهُ الْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, اٰيَاتُ الْكِتَابِ -এর মধ্যে اِضَافَةُ الشَّىْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ আবশ্যক হচ্ছে। কেননা আয়াত এবং কিতাব একই বস্তু?

উত্তরের সারকথা হলো– اِضَافَةُ الشَّىْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ সে সময় আবশ্যক হয় যখন اِضَافَةُ بِمَعْنَى اللَّامِ হয়। আর এখানে اِضَافَةٌ بِمَعْنٰى مِنْ হয়েছে, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُ مِنْ عِنْدِهٖ : এ বাক্যটি يُؤْمِنُوْنَ -এর مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে।

প্রশ্ন. يُؤْمِنُ টা مُتَعَدِّى بِاِلٰى ব্যবহার হয় مُتَعَدِّى بِالْبَاءِ ব্যবহার হয় না।

উত্তর. এখানে يُؤْمِنُوْنَ টি يُقِرُّوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে تَعْدِيَةٌ بِالْبَاءِ বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ الخ : এখানে اَللّٰهُ হলো মুবতাদা আর اَلَّذِىْ الخ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ وَهُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَا عَمَدَ اَصْلًا : এটা একটা সংশয়ের নিরসন যে, বহুবচনের نَفِىْ করা দ্বারা مَفْهُوْم হিসেবে ثُبُوْت وَاحِدْ -এর উপর বুঝায়। অর্থাৎ একটা স্তম্ভ রয়েছে। উত্তর হলো এই যে, مُقَيَّدْ -এর نَفِىْ করা مُطْلَقْ -এর نَفِىْ -কে বুঝায়। এখানে نَفِىْ টা مَوْصُوْف এবং صِفَتْ উভয়ের দিকেই ফিরেছে।

قَوْلُهُ جَعَلَ : এটা একটি সংশয়ের জবাব যে, جَعَلَ টা مُتَعَدِّى بِدُوْ مَفْعُوْل হয়ে থাকে। অথচ এখানে দুই মাফউল হয়নি।

উত্তর. جَعَلَ এখানে خَلَقَ অর্থে হয়েছে, صَيَّرَ অর্থে হয়নি।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ : এর মধ্যে مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ -এর তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ : এটা হলো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ আর পূর্বে উল্লিখিত اِفْعَالٌ-এর فَاعِلٌ এর حَالٌ ও হতে পারে يُغْشِي-এর فَاعِلٌ উহ্য যমীর هُمْ যা আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরেছে। اَللَّيْلَ হলো প্রথম মাফউল আর اَلنَّهَارَ হলো দ্বিতীয় মাফউল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাতের মাধ্যমে দিনকে ঢেকে দেন।

قَوْلُهُ صِنْوَانٌ : এ শব্দটি صَادٌ বর্ণে তিন ধরনের হরকতই হতে পারে। অর্থ হলো- نَخْلَةٌ لَهَا رَأْسَانِ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ তথা এমন খর্জুর বৃক্ষ যার মূল একটি কিন্তু মাথা দুটি।

قَوْلُهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تُسْقَى : مُؤَنَّثٌ-এর সুরতে তার নায়েবে ফায়েল اَلْجَنَّاتُ হবে এবং يُسْقَى টা مُذَكَّرٌ-এর সুরতে তার ফায়েল উল্লেখ হবে।

قَوْلُهُ بِالْيَاءِ : অর্থাৎ نُفَصِّلُ-এর মধ্যে نُوْن এবং يَاء উভয়টি বৈধ হবে। مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সুরতে يُدَبِّرُ-এর সাথে مُطَابَقَتٌ হবে।

قَوْلُهُ حَقِيْقٌ بِالْعَجَبِ : প্রশ্ন. কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে تَعْجَبُ-এর তাফসীর حَقِيْقٌ দ্বারা করেছেন? উত্তর. এর উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্নটি হলো عَجَبٌ হচ্ছে خَبَر مُقَدَّمٌ আর قَوْلُهُمْ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর عَجَبًا হলো মাসদার। আর قَوْلُهُمْ-এর উপর মাসদারের حَمْل বৈধ নয়। তাই حَقِيْق-কে উহ্য মেনেছেন যাতে করে حَمْل বৈধ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে : এ সূরাটি সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.), হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত ইকরিমা (র.), হযরত আতা (র.) এবং হযরত জাবের ইবনে জায়েদ (র.) এ মতই পোষণ করেছেন। এদিকে আবুশ শেখ এবং ইবনে মারদুবিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। ইবনে জোবায়ের (র.), কালবী (র.) এবং মোকাতেল (র.) এ মতই পোষণ করেছেন।

তৃতীয় আর একটি মত হলো, দুটি আয়াত ব্যতীত আর সবই মদীনা তৈয়্যবায় নাজিল হয়েছে, শুধুমাত্র দুটি আয়াতই মক্কায়ে মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। আয়াত দুটি হলো এই-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ (اَلْاٰيَةَ) .

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا (اَلْاٰيَةَ) .

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কাতাদা (র.) এ মত পোষণ করতেন।

ইবনে আবি শায়বা থেকে জাবের ইবনে জায়েদের কথা বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির নিকট তারা সূরায়ে রা'দ পাঠ করতেন। কেননা এর বরকতে মৃত ব্যক্তির রূহ কবজ করা সহজ হয়। -[তাফসীরে ফতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৬৩]

এ সূরায় ৪৩টি আয়াত, ৮৬৫৫ টি বাক্য এবং ৩৫০৬টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরায় দীন ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত, ওহী, কর্মফল এবং হক ও বাতিলের তাৎপর্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাই সূরার শুরু থেকেই হকের বিবরণ রয়েছে এবং এত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম একথা ধ্রুব সত্য। হক বা সত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা বিজয়ী এবং স্থায়ী হয়। আর যা বাতিল তা বিদায় নিতে বাধ্য হয়। পবিত্র কুরআনের সত্যতা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরার শুরুতে কুরআনে হাকীমের সত্যতার বিবরণ ছিল এবং সূরার শেষেও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরপর বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ এবং তার বিস্ময়কর কুদরত হিকমতের আলোচনা রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যারা নবুয়তকে অস্বীকার করে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ, প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং আখেরাতের সত্যতার কথা সুস্পষ্টভাবে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

এটা কারো বানানো কথা নয়, বরং এ হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত। ঠিক এমনিভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

الٓمّٓرٰ . تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

এগুলো কিতাবেরই আয়াতসমূহ। হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি ঈমান আনে না। এমন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহকে তারা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ الٓمّٓرٰ : এগুলোকে **حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ** বা খণ্ড বর্ণ বলা হয়। এসবের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কুরআনের মতো আল্লাহ তা'আলার ওহী : প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং সত্য। কিতাব অর্থ কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কুরআন বুঝানো যেতে পারে। কিন্তু عَطْف এবং وَاوْ অক্ষরটি বাহ্যত বুঝায় যে, কিতাব এবং اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ দুটি পৃথক পৃথক বস্তু। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কুরআন এবং اَلَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ -এর অর্থ ঐ ওহী হবে, যা কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসেছে। কেননা এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কোনো কিছু বলেন না, বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধিবিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কুরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কুরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কুরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধিবিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এজন্যই নামাজে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, এ কুরআন এবং যেসব বিধিবিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর মুঠোর মধ্যে।

বলা হয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজির আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়। যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কুরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে اِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থি নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোনো রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হবে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কুরআন পাকে যেখানে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রাকৃত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ আকাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তা যেন চাক্ষুষ দেখার মতোই। -[রূহুল মা'আনী]

এরপর বলা হয়েছে- ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারো বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তার পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা সর্বদা তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো সময় তাদের গতি চুল পরিমাণ কমবেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোনো সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে।

এসব গ্রহের এক একটির আয়তন পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দূরের কথা, হাজারো ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এ ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু ঊর্ধ্বে।

প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা; মানবীয় পরিচালনা নামে মাত্র : يُدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। জাগতিক বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলার শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা-আপনি এসে জুড়ে হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের শারীরিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহাব্যবস্থাপক আল্লাহ তা'আলারই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

قَوْلُهُ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ : অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কুরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো নাজিল করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলিও হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, জমিন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ : অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করে পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাসী হও। কেননা এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তা'আলার শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বুঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোনো দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا : অর্থাৎ তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারি পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থি নয়। কেননা গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতোই দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারি পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোনো চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এক একটি ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক ফল্গুধারার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারায় সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

قَوْلُهُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল উৎপন্ন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু দু প্রকার সৃষ্টি করেছেন। লাল-সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ -এর অর্থ দু না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ -এর অর্থ নর ও মাদি হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদি হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে। যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

قَوْلُهُ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন। যেমন কোনো উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ : নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاۤءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ.

অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন রূপ। কোনোটি উর্বর জমি ও কোনোটি অনুর্বর, কোনোটি নরম ও কোনোটি শক্ত এবং কোনোটি শস্যের উপযোগী এবং কোনোটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ। তন্মধ্যে কোনো বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌছে দু কাণ্ড হয়ে যায়; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনোটিতে এক কাণ্ডই থাকে; যেমন খেজুর বৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়।

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোনো একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে– শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়; যেমন এ শ্রেণির অজ্ঞলোক তাই মনে করে। কেননা নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হতো। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

قَوْلُهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ : নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি, মাহাত্ম্য ও এককত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয় যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ الخ : আলোচ্য প্রথম তিন আয়াতে কাফেরদের নবুয়ত সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব রয়েছে এবং এর সাথে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। এক. তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গাম্বরগণকে অবিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁদের নবুয়ত অস্বীকার করত। কুরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে– هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গাম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত, এসো আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে– وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মোজেজা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে?

কিন্তু এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এ উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে? এটা কি সম্ভবপর? কুরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলা বাহুল্য যে সত্তা প্রথমবার কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোনো নতুন বস্তু তৈরি করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, কিন্তু পুনর্বার তৈরি করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হিকমতসহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবত অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে, একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একত্রিত নয় কি? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরেছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তার পক্ষে কেন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি, পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু তার ভিতরকার, পানি তার ভিতরকার এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি কাফেররা আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন।

خاك وباد واب وآتش زنده اند

بامن وتو مرده باحق زنده اند

মোটকথা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনর্জীবন ও হাশরের দিন অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোজখে বাস করবে।

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই– যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? দ্বিতীয় আয়াতে এর জবাব দেওয়া হয়েছে–
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থাৎ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনার কাছে বিপদ নাজিল হওয়ার তাগাদা করে [যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আজাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আজাব আসাকে খুবই অবান্তর অথবা অসম্ভব মনে করে]।

অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আজাব এসেছে। সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আজাব আসা অবান্তর হলো কিরূপে? এখানে مَثُلٰتُ শব্দটি مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে, নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গুনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনোরূপ ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর কোনো আজাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই, আমরা রাসূল ﷺ -এর অনেক মোজেজা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মোজেজা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে- يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ কাফেররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মোজেজা দেখতে চাই তা তাঁর উপর নাজিল করা হলো না কেন? এর উত্তর এই যে, মোজেজা জাহের করা পয়গাম্বরদের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মোজেজা প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারো দাবি ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এজন্যেই বলা হয়েছে- اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা-মোজেজা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গাম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মোজেজা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন যে ধরনের মোজেজা প্রকাশ করতে চান করেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দেশে পয়গাম্বর আসা কি জরুরি? আয়াতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না। যে কোনো পয়গাম্বর হোক কিংবা পয়গাম্বরের প্রতিনিধিরূপে তার দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণত সূরা ইয়াসীনে পয়গাম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দুব্যক্তিকে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরি হয় না যে, হিন্দুস্তানে কোনো নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রাসূলের দাওয়াত পৌছানোর জন্য এ দেশে প্রচুর সংখ্যক আলেমের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

অনুবাদ :

٨. اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّوَاحِدٍ وَّمُتَعَدِّدٍ وَّغَيْرِ ذٰلِكَ وَمَا تَغِيْضُ تَنْقُصُ الْاَرْحَامُ مِنْ مُّدَّةِ الْحَمْلِ وَمَا تَزْدَادُ ط مِنْهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ بِقَدْرٍ وَّحَدٍّ لَا يَتَجَاوَزُهٗ.

৮. আল্লাহ তা জানেন যা প্রত্যেক স্ত্রীজাতি গর্ভে বহন করে অর্থাৎ এটা পুত্র কি কন্যা, এক বা একাধিক ইত্যাদি আর গর্ভধারণের মেয়াদ হতে জরায়ুতে যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় مَا تَغِيْضُ যা হ্রাস পায়। এবং তা হতে যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর তার নিকট প্রতিটি বস্তুই নির্দিষ্ট পরিমাপে নির্দিষ্ট এক সীমা ও পরিমাণানুসারে রয়েছে। কেউই এটা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

٩. عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ الْكَبِيْرُ الْعَظِيْمُ الْمُتَعَالِ عَلٰى خَلْقِهٖ بِالْقَهْرِ بِيَاءٍ وَّدُوْنِهَا.

৯. দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি বড় সুমহান, তার সৃষ্টির উপর তিনি ক্ষমতাধিকারে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। اَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থ যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান। اَلْمُتَعَالِ শেষে ى সহ বা এটা ব্যতিরেকেও এটা পঠিত রয়েছে।

١٠. سَوَاءٌ مِّنْكُمْ فِيْ عِلْمِهٖ تَعَالٰى مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ مُسْتَتِرٍ بِالَّيْلِ بِظَلَامِهٖ وَسَارِبٌ ظَاهِرٌ بِذَهَابِهٖ فِيْ سَرْبِهٖ اَيْ طَرِيْقِهٖ بِالنَّهَارِ.

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে বা যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাত্রিতে অর্থাৎ তার অন্ধকারে আত্মগোপন করে ও দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তা সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এক সমান। مُسْتَخْفٍ অর্থ আত্মগোপনকারী। سَارِبٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথে প্রকাশ্যে বিচরণ করে। سَرْبٌ অর্থ পথ।

١١. لَهٗ لِلْاِنْسَانِ مُعَقِّبٰتٌ مَلٰٓئِكَةٌ تَعْتَقِبُهٗ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قُدَّامِهٖ وَمِنْ خَلْفِهٖ وَرَائِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط اَيْ بِاَمْرِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَغَيْرِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ لَا يَسْلُبُهُمْ نِعْمَتَهٗ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ مِنَ الْحَالَةِ الْجَمِيْلَةِ بِالْمَعْصِيَةِ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا عَذَابًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ج مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ وَلَا غَيْرِهَا.

১১. তার জন্য অর্থাৎ মানুষের জন্য সম্মুখে ও পশ্চাতে بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থ তার সম্মুখে। خَلْفِهٖ অর্থাৎ তার পিছনে। একের পর এক প্রহরী বিদ্যমান। অর্থাৎ হেফাজতকারী ফেরেশতা বিদ্যমান যারা একের পর এক তার প্রতি নেগাহবানী করে। তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে তাকে জিন ইত্যাদি হতে রক্ষা করে। আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না অর্থাৎ তাদের প্রদত্ত তাঁর নিয়ামত তিনি ছিনিয়ে নেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা অর্থাৎ নিজেদের উত্তম অবস্থা অবাধ্যাচারের মাধ্যমে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ তা'আলা মন্দ করার অর্থাৎ শাস্তিদানের ইচ্ছা করেন তবে তা এই রক্ষণাবেক্ষণকারী বা অন্য কেউই রদ করবার নেই। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এ স্থানে مِنْ শব্দটি بِ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেহেতু এটার তাফসীরে بِاَمْرِهٖ উল্লেখ করা হয়েছে। مِنْ وَالٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

وَمَا لَهُمْ لِمَنْ أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِمْ سُوْءً مِنْ دُوْنِهِ أَيْ غَيْرِ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ وَّالٍ يَمْنَعُهُ عَنْهُمْ .

তিনি ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তাদের অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মন্দ করার ইচ্ছা করেন তাদের কোনো অভিভাবক নেই। যে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে তাদের তরফ হতে প্রতিহত করবে।

১২. هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الصَّوَاعِقِ وَّطَمَعًا لِلْمُقِيْمِ فِي الْمَطَرِ وَيُنْشِئُ يَخْلُقُ السَّحَابَ الثِّقَالَ بِالْمَطَرِ .

১২. তিনিই তোমাদেরকে বিজলী দেখান যা পথিকদের জন্য বজ্র পতনের ভয় প্রদানকারী এবং স্বগৃহে অবস্থানকারীদের জন্য বৃষ্টির ভরসা প্রদানকারী। আর তিনি সৃষ্টি করেন বৃষ্টির বোঝায় ভারি মেঘ। يُنْشِئُ অর্থ তিনি সৃষ্টি করেন।

১৩. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ هُوَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ يَسُوْقُهُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ أَيْ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَ تُسَبِّحُ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ ج أَيِ اللّٰهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَهِيَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ السَّحَابِ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ فَتُحْرِقُهُ نَزَلَ فِيْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَدْعُوْهُ فَقَالَ مَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ مِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ فَنَزَلَتْ بِهِ صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ بِقِحْفِ رَأْسِهِ وَهُمْ أَيِ الْكُفَّارُ يُجَادِلُوْنَ يُخَاصِمُوْنَ النَّبِيَّ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ الْقُوَّةِ وَالْأَخْذِ .

১৩. রা'দ অর্থাৎ মেঘের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। তিনি এটা একস্থান হতে অন্যস্থানে হাঁকিয়ে নেন। তাঁর সপ্রশংসা মহিমা কীর্তন করে বলে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে মহিমা কীর্তন করে। আর তিনি বজ্রপাত করেন اَلصَّوَاعِقُ মেঘ হতে যে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। اَلْمِحَالُ অর্থ শক্তি বা পাকড়াও। এবং যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা আঘাত করেন এবং তা তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। ইসলামের আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির নিকট দূত প্রেরণ করেন। তখন সে বলল, আল্লাহ তা'আলাই বা কে, আর তার রাসূলই বা কে? আল্লাহ কি রূপার? না সোনার? না পিতলের? এ সময় তার উপর এক বজ্র আপতিত হয় এবং তার মাথার খুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়। তারা অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে মহানবী ﷺ -এর সাথে বিবাদ করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। بِحَمْدِهِ এটা উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

১৪. لَهُ تَعَالٰى دَعْوَةُ الْحَقِّ ط أَيْ كَلِمَتُهُ وَهِيَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ أَيْ غَيْرِهِ وَهُمُ الْأَصْنَامُ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَطْلُبُوْنَهُ .

১৪. তাঁর আহ্বানই আল্লাহ তা'আলার কালিমাই সত্য। তা হলো কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। তারা তাঁকে ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করে يَدْعُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ রূপেই পঠিত রয়েছে। যাদের উপাসনা করে। অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ তারা তাদের কিছুরই অর্থাৎ তাদের কাম্য কিছু সম্পর্কেই সাড়া দেয় না,

اِلَّا اِسْتِجَابَةً كَبَاسِطٍ اَىْ كَاسْتِجَابَةِ بَاسِط كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ عَلٰى شَفِيْرِ الْبِئْرِ يَدْعُوْهُ لِيَبْلُغَ فَاهُ بِارْتِفَاعِهِ مِنَ الْبِئْرِ اِلَيْهِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ط اَىْ فَاهُ اَبَدًا فَكَذٰلِكَ مَا هُمْ بِمُسْتَجِيْبِيْنَ لَهُمْ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ عِبَادَتُهُمُ الْاَصْنَامَ اَوْ حَقِيْقَةُ الدُّعَاءِ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ضَيَاعٍ ـ

তবে তাদের সাড়া প্রদান তেমনই যেমন কূপের কিনারে বসে পানির দিকে হাত প্রসারিতকারী কোনো ব্যক্তি কূপ হতে পানি তার দিকে উথলিয়ে উঠে তার মুখে তা পৌছতে দোয়া করে অথচ তা কখনো তার মুখে পৌছবে না। তদ্রূপ এরাও তাদের ডাকে কোনো দিন সাড়া দেবে না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান অর্থাৎ তাদের প্রতিমা উপাসনা বা তার অর্থ হলো তাদের প্রার্থনা নিষ্ফল। ضَلٰلٍ এ স্থানে অর্থ নিষ্ফল।

١٥. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا كَالْمُؤْمِنِيْنَ وَّكَرْهًا كَالْمُنَافِقِيْنَ وَمَنْ اُكْرِهَ بِالسَّيْفِ وَيَسْجُدُ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْبُكَرِ وَالْاٰصَالِ الْعَشَايَا ـ

১৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু ইচ্ছায় যেমন মু'মিনগণ বা অনিচ্ছায় যেমন মুনাফিকগণ ও যাদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে বাধ্য করা হয়েছে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সেজদাবনত থাকে। আর তাদের ছায়াসমূহও সকাল ও সন্ধ্যায়। সেজদাবনত থাকে। اَلْغُدُوُّ অর্থ সকাল। اَلْاٰصَالُ অর্থ সন্ধ্যা।

١٦. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهٗ قُلْ لَهُمْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ اَوْلِيَاءَ اَصْنَامًا تَعْبُدُوْنَهَا لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا وَتَرَكْتُمْ مَالِكَهُمَا اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ لا الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ الْكُفْرُ وَالنُّوْرُ ج الْاِيْمَانُ لَا ـ

১৬. হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমার সম্প্রদায়কে বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? তারা যদি উত্তর না দেয় তবে তুমিই বল, তিনি আল্লাহ কারণ এটা ব্যতীত তার কোনো উত্তর নেই। তাদেরকে বল, তিনি ব্যতীত তোমরা কি এমন কিছুকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ? অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? আর তাদের যিনি অধীশ্বর তাকে তোমরা পরিত্যাগ করেছ? اَفَاتَّخَذْتُمْ এ স্থানে প্রশ্নবোধকটি تَوْبِيْخ বা তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বল অন্ধ ও চক্ষুষ্মান অর্থাৎ কাফের ও মু'মিন কি সমান? বা অন্ধকার কুফরি ও আলো অর্থাৎ ঈমান সমান? না, সমান নয়।

أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ أَيْ خَلْقُ الشُّرَكَاءِ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ط فَاعْتَقَدُوْا اِسْتِحْقَاقَ عِبَادَتِهِمْ بِخَلْقِهِمْ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ أَيْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ اِلَّا الْخَالِقُ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِيْهِ فَلَا شَرِيْكَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِعِبَادِهِ ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لِلْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَقَالَ ـ

তবে কি তাঁরা আল্লাহ তা'আলার এমন ধরনের শরিক করেছে যারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে। ফলে তাদের নিকট এ সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে শরিকদের সৃষ্টির জট লেগে গেছে। যদ্দরুন তারা এ সৃষ্টি-কার্যের জন্য এ শরিকদেরকেও উপাসনাযোগ্য বলে বিশ্বাস করে। أَمْ جَعَلُوْا এ স্থানে প্রশ্নবোধকটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। না মূলত ব্যাপার এরূপ নয়। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত আর কেউই উপাসনার অধিকার রাখে না। বল আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর স্রষ্টা এ বিষয়ে তাঁর কোনো শরিক নেই। সুতরাং ইবাদতের বেলায়ও তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি এক তাঁর বান্দাদের উপর তিনি মহাপরাক্রমশালী।

١٧. أَنْزَلَ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَطَرًا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا بِمِقْدَارِ مِلْئِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ط عَالِيًا عَلَيْهِ هُوَ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عَلَيْهِ فِي النَّارِ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ ابْتِغَاءَ طَلَبَ حِلْيَةٍ زِيْنَةٍ أَوْ مَتَاعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْأَوَانِيْ اِذَا أُذِيْبَتْ زَبَدٌ مِّثْلُهُ أَيْ مِثْلُ زَبَدِ السَّيْلِ وَهُوَ خُبْثُهُ الَّذِيْ يُنْفِيْهِ الْكِيْرُ كَذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط أَيْ مِثْلَهُمَا فَأَمَّا الزَّبَدُ مِنَ السَّيْلِ وَمَا أُوْقِدَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج بَاطِلًا مَرْمِيًّا بِهِ ـ

১৭. হক ও বাতিলের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে পানি অর্থাৎ সৃষ্টি পাত করেন। ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী তার ভরাটের আন্দাজ অনুসারে প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। زَبَدٌ অর্থ প্লাবনের পানির উপরস্থিত আবর্জনা ইত্যাদি। رَابِيًا অর্থ যা উপরিভাগে রয়েছে। অলঙ্কার বা তৈজসপত্র যদ্দ্বারা সে উপকার লাভ করে যেমন থালা-বাসন ইত্যাদি নির্মাণ উদ্দেশ্যে ভূমির খনিজ ধাতু যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল ইত্যাদি যা তারা আগুনে প্রজ্বলিত করে يُوْقِدُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নামপুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। حِلْيَةٌ অর্থ অলংকার। যখন তা গলে যায় তখন তা হতে তদ্রূপ অর্থাৎ প্লাবনের আবর্জনার মতো আবর্জনা হয়। এটা হলো ভাটায় উত্তপ্ত করা হলে যে ময়লা ফেনা বের হয় তা। এভাবে উল্লিখিতভাবে আল্লাহ তা'আলা সত্য ও অসত্যের এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। অনন্তর যা আবর্জনা প্লাবনের আবর্জনা ও অগ্নিতে প্রজ্বলিত করার পর খনিজ ধাতু-নির্গলিত আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয়।

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ الْمَاءِ وَالْجَوَاهِرِ فَيَمْكُثُ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ ط زَمَانًا كَذٰلِكَ الْبَاطِلُ يَضْمَحِلُّ وَيَنْمَحِقُ وَإِنْ عَلَا عَلَى الْحَقِّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَالْحَقُّ ثَابِتٌ بَاقٍ كَذٰلِكَ الْمَذْكُورِ يَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ .

এবং যা মানুষের উপকার আসে পানি ও ধাতু তা দীর্ঘকাল জমিতে থেকে যায়। جُفَاءً অর্থ যা ছুড়ে ফেলা হয়। فَيَمْكُثُ অর্থ যা বাকি থাকে। স্থির থাকে। তেমনি বাতিল ও অসত্য কোনো কোনো সময় হক ও সত্যের উপর জয়ী হয়ে পড়লেও পরিণামে তা বিলীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে হক ও সত্য সবসময় কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিতভাবে আল্লাহ তা'আলা উপমা দিয়ে থাকেন। উদাহরণ বর্ণনা করে থাকেন।

১৮. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ أَجَابُوهُ بِالطَّاعَةِ الْحُسْنٰى الْجَنَّةُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ط مِنَ الْعَذَابِ أُولٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ لا وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ بِكُلِّ مَا عَمِلُوهُ وَلَا يُغْفَرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ .

১৮. যারা আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল জান্নাত আর যারা সাড়া দেয় না অর্থাৎ কাফেরগণ তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্ত থাকত ও তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকত তবে তারা আযাব ও শাস্তি হতে বাঁচতে মুক্তিপণস্বরূপ তা সবকিছু দিত। তাদের জন্যই হবে মন্দ হিসাব। অর্থাৎ তাদের কৃত সকল দুষ্কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে। সামান্য কিছুও তাদের ক্ষমা করা হবে না। আর জাহান্নাম হবে তাদের আবাস। কত নিকৃষ্ট শয্যা তা। اَلْمِهَادُ অর্থ শয্যা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُتَعَالِ : এটা বাবে تَفَاعُلٌ এর- تَعَالِيٌ মাসদার হতে اِسْم فَاعِلْ এর- وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। মূলে ছিল اَلْمُتَعَالِيُ শেষের يَاء টি পড়ে গেছে। মূলবর্ণ হলো عَلْوٌ এখানে ثُلَاثِى مُجَرَّدْ-কে- مَزِيْد فِيْه-এর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো অর্থের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততাকে বর্ণনা করা। এর অর্থ হলো– উচ্চতর, উৎকৃষ্ট, মহান, সম্মানিত। اَلْمُتَعَالِ-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে- ১. يَاء-এর সাথে অর্থাৎ اَلْمُتَعَالِى ২. يَاء বিহীন রূপে اَلْمُتَعَالِ

قَوْلُهُ سَوَاءٌ مِنْكُمْ الخ : এতে দুটি কেরাত রয়েছে- ১. سَوَاءٌ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর اَسَرَّ الْقَوْلَ الخ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

প্রশ্ন. মুবতাদা হলো দুটি, কাজেই خَبَرْ ও দ্বিবচন নেওয়া উচিত ছিল? অর্থাৎ سَوَاءَانِ বলা উচিত ছিল।

উত্তর. سَوَاءٌ যেহেতু মাসদার যা مُسْتَوِى অর্থে হয়েছে কাজেই তাতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সবই সমান।

২. سَوَاءٌ হলো মুবতাদা আর اَسَرَّ الْقَوْلَ الخ হলো তার খবর।

প্রশ্ন. سَوَاءٌ হলো نَكِرَة কাজেই এটা মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. যেহেতু سَوَاء -এর সিফত مِنْكُمْ বিদ্যমান রয়েছে কাজেই তাতে تَخْصِيْص সৃষ্টি হয়ে গেছে। যার কারণে سَوَاءٌ -এর মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ سَارِبٌ : এটা سَرْبٌ হতে اِسْم فَاعِلْ অর্থ হলো রাস্তায় চলাচলকারী পথিক, অলিতে-গলিতে ঘুরাফেরাকারী। سَارِبٌ -এর বহুবচন سُرُبٌ যেমন رَاكِبٌ -এর বহুবচন رُكُبٌ আসে। سَارِبٌ -এর আতফ হয়েছে مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ -এর উপর; শুধু مُسْتَخْفٍ -এর উপর নয়।

قَوْلُهُ مُعَقِّبَاتٌ : এটা اِسْم فَاعِلْ -এর সীগাহ এবং مُعَقِّبَةٌ -এর বহুবচন, বাবে تَفْعِيْل হতে, মাসদার تَعْقِيْبٌ অর্থ বারি বারি করে দিন রাতে ক্রমান্বয়ে আগমনকারী ফেরেশতাগণ। –[বায়যাবী, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعْتَقِبُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُعَقِّبَاتٌ টা اِعْتَقَبَ হতে এসেছে। মূলে ছিল مُتَعَقِّبَاتٌ এরপর تَاء -কে قَافٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে। অর্থ– ঐ ফেরেশতাগণ যারা আসা-যাওয়ার মধ্যে একজন অপরজনের অনুসরণ করে। উদ্দেশ্য হলো সেই ফেরেশতাগণ যারা দিবা-নিশিতে ডিউটির পরিবর্তন করে।

قَوْلُهُ مَرَدٌّ : এটা اِسْم ظَرْف অর্থ হলো– মুলতবি রাখা, দূর করা, পরিহার করা, দেরি করা, ফিরিয়ে আনা।

قَوْلُهُ مِنْ وَالٍ : এখানে مِنْ টা অতিরিক্ত وَالٍ হলো اِسْم فَاعِلْ -এর সীগাহ। মূলে ছিল وَالِيٌ [বাবে ضَرَبَ হতে] يَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– সাহায্যকারী, সহযোগী।

قَوْلُهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا : কেউ কেউ বলেছেন যে, উভয়টি মাসদার হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, لِتَخَافُوْا خَوْفًا وَلِتَطْمَعُوْا طَمَعًا এবং বলা হয়েছে যে, এ উভয়টি يُرِيْكُمْ -এর كُمْ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِكُمْ خَائِفِيْنَ وَطَامِعِيْنَ আবুল বাকা (র.) বলেছেন, এই উভয়টি নিজ নিজ ফে'লের مَفْعُوْل ও হতে পারে। [তবে আল্লামা যমখশারী (র.) এটাকে অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ اَلْبَرْقُ থেকে ও حَالٌ বলেছেন।

(اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِيْ)

قَوْلُهُ تُسَبِّحُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْمَلَائِكَةُ -এর আতফ اَلرَّعْدُ -এর উপর হয়েছে رَبِّكَ -এর উপর হয়নি।

قَوْلُهُ بِقِحْفٍ : قِحْفٌ অর্থ মাথার খুলি। বহুবচনে اَقْحَافٌ . قُحُوْفٌ

قَوْلُهُ اَىْ كَلِمَةُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, دُعَاءٌ টা دَعْوَةٌ -এর অর্থে নয় এবং اَلدَّعْوَةُ الْمُسْتَجَابَةُ অর্থেও নয়।

قَوْلُهُ اِسْتِجَابَةً : প্রশ্ন. اِسْتِجَابَةً উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. দুটি কারণে, ১. প্রথম হলো এই যে, مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর জিনস হয়ে যাবে। কেননা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ -ই হলো মূল। আর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো اِسْتِجَابَةً যা يَسْتَجِيْبُوْنَ হতে বুঝা যায়। কেননা ফে'লটা মাসদারকে বুঝিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় হলো এই যে, যদি اِسْتِجَابَةً -কে উহ্য মনে করা না হয় তাহলে تَشْبِيْهُ الْعَرْضِ بِالذَّاتِ আবশ্যক হবে, যা অবৈধ। কেননা اِسْتِجَابَةٌ হলো عَرَضٌ আর بَاسِطِ الْكَفَّيْهِ হলো ذَاتٌ আর মূর্তিগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রার্থনাকারীকে এমন ব্যক্তির সাথে তাশবীহ দেওয়া যে ব্যক্তি পানিকে বলতেছে যে, হে পানি! তুমি আমার মুখে এসে পড়। এটা সুস্পষ্ট যে, এটা অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা পানি হলো جَمَادٌ তথা নির্জীব তার পক্ষে কারো আবেদন শ্রবণ করার যোগ্যতা নেই। এমনিভাবে সেই ব্যক্তি যে মূর্তিদের থেকে উদ্দেশ্য কামনা করে থাকে, সেও মূর্খ ও বেকুফ কেননা মূর্তিও তো جَمَادٌ তথা নির্জীব, অনুভূতিহীন।

قَوْلُهُ غُدُوٌّ : এটা غَدَاةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- সকাল বেলা।

قَوْلُهُ الْآصَالُ : এটা أَصِيْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ- সন্ধ্যা বেলা।

قَوْلُهُ جُفَاءً : এটা غُرَابٌ-এর ওজনে। অর্থ- বাতিল, অহেতুক। বলা হয়- جُفَاءُ الْوَادِىْ وَالْقَدْرِ অর্থাৎ নদী এবং ডেগ্চি ফেনা বাইরে ফেলে দিয়েছে।

قَوْلُهُ أَجَابُوْهُ بِالطَّاعَةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتَجَابُوْا এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর হলেও اِفْعَالٌ-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনোই অবকাশ থাকল না যে, এখানে طَلَبٌ-এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ الْجَنَّةُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْحُسْنٰى হলো উহ্য اَلْجَنَّةُ-এর সিফত অর্থাৎ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হলো لِلَّذِيْنَ الخ আর مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ হলো اَلْجَنَّةُ الْحُسْنٰى।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ الخ : আলোচ্য আয়াতে আবার তাওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ.

অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎ না অসৎ তা সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয় যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোনো সময় এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোনো সময় দ্রুত কোনো সময় দেরিতে- তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলিমুল গায়েব।' সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু পরমাণু ও সে সবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না, শুধু পানি অথবা শুধু বায়ু রয়েছে- এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোনো হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চেয়ে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই জানেন যা কিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবি ভাষায় تَغِيْضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া, শুষ্ক হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزْدَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ বলে এই হ্রাস বুঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের দ্বারা সবগুলোতেই পরিব্যাপ্ত। কাজেই কোনো বিরোধ নেই।

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নির্দিষ্ট রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিজিক পাবে- এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুপম জ্ঞান তাঁর তাওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছিল। সেগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের প্রমাণ। এ আয়াতে বলা হয়েছে- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ এখানে غَيْبٌ শব্দ দ্বারা ঐ বস্তু বুঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহবা দ্বারা স্বাদ বুঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شَهَادَةٌ হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

اَلْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং مُتَعَالِ -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলির উর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহ তা'আলাকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করত, যেগুলো তার মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তার জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলি থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বারবার বলেছে- سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -এর তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى বাক্যে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে-

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ـ

اَسَرَّ শব্দটি اَسْرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলা এবং جَهْرٌ শব্দের অর্থ- জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয় তাকে جَهْرٌ বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে سِرٌّ বলে مُسْتَخْفٍ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سَارِبٌ -এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরো ব্যক্ত করে বলা হয়েছে-

لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

مُعَقِّبَاتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ -এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে مُعَقِّبَةٌ অথবা مُتَعَقِّبَةٌ বলা হয়। مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ -এর শাব্দিক অর্থ উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ -এর অর্থ পশ্চাৎদিক। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بِاَمْرِ اللّٰهِ কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি بِاَمْرِ اللّٰهِ বর্ণিতও আছে। -[রূহুল মা'আনী]

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখ ও পশ্চাৎদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মানুষের হেফাজত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে– ফেরেশতাদের দুটি দল হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাজের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাজের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাজের পর তারা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোনো প্রাচীর ধসে না পড়ে কিংবা সে কোনো গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোনো জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাজত করেন। তবে কোনো মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হেফাজতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত উসমান গনী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে জারীরের এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, হেফাজতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট থেকে হেফাজত করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহভীতির প্রেরণা করেন যাতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনোরূপেই হুঁশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গুনাহ লিখে দেয়।

মোটকথা, হেফাজতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাজত করে। হযরত কা'ব আহবার (র.) বলেন, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের এ পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তাকদীরে ইলাহী মানুষের হেফাজতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ তা'আলাই কোনো বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারা নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। [তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহুল্য] যখন আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আজাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাজতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার গজব ও আজাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আজাব থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোনো সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাজতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোনো জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। এ অর্থেই নিম্নোক্ত কবিতাটি সুবিদিত–

خدا نے اج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেননি যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে।

এ বিষয়বস্তুটি যদিও কিছুটা নির্ভুল; কিন্তু আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরূপ নয়। কবিতার বিষয়বস্তুটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নির্ভুল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাকে সাহায্য করার ওয়াদা নেই। সাহায্য করার ওয়াদা তখনই কার্যকর হয় যখন কেউ স্বয়ং সংশোধনের চেষ্টা করে। যেমন এক আয়াতে وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও হেদায়েতের পথ তখনই উন্মুক্ত হয়, যখন কারো মধ্যে হেদায়েতের অন্বেষণ থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত দান এ আইনের অধীনে নয়। অনেক সময় অন্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়।

داد حق را قابلیت شرط نیست
بلکہ شرط قابلیت داد اوست

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দানের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তাঁর দান এসে পতিত হয়।

স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। আমরা কোনো সময় এরূপ দোয়াও করিনি যে, আমাদেরকে এমন সত্তা দান করা হোক যার চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত হয়। এসব নিয়ামত চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে।

ما نبوديم وتقاضا ما نبود
لطف تو انا گفته ما مى شنود

অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোনো প্রার্থনাও ছিল না, তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা শ্রবণ করেছে।

তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং কোনো জাতির পক্ষে চেষ্টা ও কর্ম ব্যতীত নিয়ামত দানের অপেক্ষায় থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়। আবার এটাও আশা সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনের অবলম্বন এবং আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারি মেঘমালাকে মৌসুমি বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

قَوْلُهُ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ : অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তাসবীহ, যে সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোনো বস্তু নেই, যে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ তাসবীহ শুনতে সক্ষম হয় না।

কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তাসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ : এখানে صَوَاعِقُ শব্দটি صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

قَوْلُهُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ : এখানে مِحَالٌ শব্দটি মীমের যেরযোগ কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

قَوْلُهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্ধ এবং মুসলমানদেরকে চক্ষুষ্মান বলা হয়েছে। কুফর এবং নাফরমানিতে অন্ধকার আর ইসলামকে নূর বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে হক ও বাতিলের দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। একটি পানির আর একটি অগ্নির। আসমান থেকে আল্লাহ তা'আলা পানি বর্ষণ করেন, বৃষ্টিপাত হয় তার নির্দেশক্রমে। নদী-নালা ভরে যায় এ পানিতে। পানি একই পরিমাণে নাজিল হয় তবে প্রত্যেক নদীনালা তার প্রশস্ততা, গভীরতা এবং পরিমাণ মোতাবেক ঐ পানি গ্রহণ করে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। আর মানুষের অন্তরভূমি তার যোগ্যতা অনুসারে এই আসমানি রহমতকে গ্রহণ করে এবং ফয়েজ লাভ করে। যেমন– নদী-নালা বা উপত্যকা তার প্রশস্ততা এবং যোগ্যতা মোতাবেক আসমান থেকে অবতীর্ণ বৃষ্টির পানি ধারণ করে। আর ঐ পানির উপরে ফেনা এমনভাবে ফুলে উঠে মনে হয় সবই সেখানে ফেনা, পানির অস্তিত্ব সেখানে নেই। কিন্তু পানি থাকে তার নিচে। ঠিক এভাবে বাতিল বা অসত্য ফেনার ন্যায় সত্যের উপর থাকে, আর সত্য পানির ন্যায় নিচে থাকে। যখন ক্ষণিকের মধ্যে বাতিল দূরীভূত হয় ফেনার মতো, তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তখন সত্য উদ্ভাসিত হয় আর বাতিলের নাম-নিশানাও থাকে না।

মক্কা মুয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী ﷺ সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দিলেন, পবিত্র কুরআন নাজিল হলো বাতিল বা অসত্য তখন চরম শক্তিশালী ছিল। বাতিলপন্থিরা ইসলামের মহাসত্যকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করল। প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হলো সুদীর্ঘ তেরোটি বছর। বাতিলের ঢেউ সবকিছু যেন গ্রাস করে ফেলবে। ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হলো মদীনায়ে মুনাওয়ারায়। এরপর সুদীর্ঘ আটটি বছর যাবৎ হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অব্যাহত রইল। বদর, ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক রণাঙ্গনগুলো হক ও বাতিলের তথা সত্য-অসত্যের সশস্ত্র সংগ্রামের জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে আল্লাহ তা'আলা মহা বিজয় দান করলেন। বাতিল বা অসত্য শুধু ভূলুণ্ঠিত হলো না; বরং নিশ্চিহ্ন হলো এবং হক বা সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তিনশত ষাটটি মূর্তি স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেলার সময় প্রিয়নবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করেছিলেন– وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি ঘোষণা করুন,

নিশ্চয়ই সত্য এসেছে মিথ্যা বিদায় নিয়েছে আর মিথ্যা তো বিদায় নেওয়ারই যোগ্য। যেভাবে পানির উপরের ফেনা কিছুক্ষণ পরেই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ঠিক এমনিভাবে বাতিল সত্যের অব্যাহত আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে হক ও বাতিলের আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অলংকার বা কোনো তৈজষপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে স্বর্ণ-রৌপ্যকে যখন অগ্নিতে পোড়ানো হয় তখন তাতে আবর্জনা বা ফেনা ভেসে উঠে। ঐ আবর্জনা বা ফেনাই দৃষ্টিগোচর হয়, মূল্যবান ধাতু পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা যায় ফেনা আপনা-আপনি উধাও হয়ে গেছে, তার চিহ্নও শুষ্ক হয়ে যায়। আর এভাবে নিশ্চিহ্ন হয় যা আসল যা মানুষের প্রয়োজনের শুধু তাই থেকে যায়। ঠিক এভাবে কখনো অন্যায়-অনাচারের, অসত্যের প্রভাব এত বেড়ে যায়, মিথ্যা এবং বাতিল এত শক্তিশালী হয়ে উঠে যে তাদেরই জয় জয়কার মনে হয়। এমনি অবস্থায় দুর্বল চিত্ত মানুষ বাতিলের অনুসারী হয়ে পড়ে। কিছু কিছু দিনের মধ্যেই সত্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অসত্য বা বাতিল, মিথ্যা অধর্ম ফেনার ন্যায় উধাও হয়ে যায়।

সত্য ও অসত্যের তথা হক ও বাতিলের সংঘর্ষ পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরেই আছে তবে সত্যের জয় এবং বাতিল বা অসত্যের পরাজয় অনিবার্য, অবধারিত। যদি কোনো সময় বাতিল শক্তিশালী হয়ে যায় সত্যকে আপাত দৃষ্টিতে দুর্বলও মনে হয় তবুও প্রকৃত মুমিন ভীত হয় না। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ আর তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না-চিন্তিতও হয়ো না, তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

এ আয়াত নাজিল হয়েছিল তৃতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল সেই বিপদজনক মুহূর্তে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বাতিলের সাময়িক প্রভাবে ভীত না হওয়ার আদেশ দিয়েছেন অবশেষে বিজয় সত্য ও ন্যায়ের তথা ইসলামের। আলোচ্য আয়াতের দুটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এভাবে হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং তার পূর্বে অন্যান্য আসমানি কিতাবও তিনি নাজিল করেছেন। মানুষ তার যোগ্যতা অনুসারে এ আসমানি গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয় এবং এর মহান শিক্ষার আলোকে নিজেকে আলোকিত করে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ এ পবিত্র কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে। যতদিন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখা পছন্দ করবেন ততদিন পর্যন্ত মানুষের অন্তর আলোকিত করার জন্য তাকেও পৃথিবীতে রাখবেন। এর দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির পানি যা আসমান থেকে নাজিল হয়। নদী-নালা উপত্যকা সবই ঐ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। প্রত্যেকটি নদী-নালার প্রশস্ততা এবং গভীরতা অনুযায়ী সে ঐ পানি ধারণ করে। আর মানুষও তার অন্তরের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন থেকে ফয়েজ হাসিল করে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ইরশাদ হয়েছে, যে কোনো ধাতু যথা স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা অলংকার বা তৈজষপত্র তৈরি করতে হলে তাকে আগুনে পোড়ানো হয় যে কারণে তার ভিতরের আবর্জনা উপরে ভেসে উঠে কিছুক্ষণ পর তা শুকিয়ে যায়, যা মানুষের প্রয়োজনীয় তা থেকে যায়। আর ফেনা বা আবর্জনা উধাও হয়ে যায়। এভাবে সত্য-অসত্যের তথা হক ও বাতিলের মোকাবিলায় প্রথমে বাতিলের আবর্জনা দেখতে পাওয়া যায়।

অনুবাদ :

١٩. وَنَزَلَ فِى حَمْزَةَ وَأَبِى جَهْلٍ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ فَآمَنَ بِهِ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ط لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ لَا إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

১৯. হযরত হামযা ও আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয় যে, তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে অনন্তর তারা বিশ্বাস করে সে কি তার মতো যে ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ তৎসম্পর্কে জ্ঞানও রাখে না এবং বিশ্বাসও রাখে না শুধু বোধশক্তি সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। تَذَكَّرَ অর্থ উপদেশ গ্রহণ করে। أُولُو الْأَلْبَابِ অর্থ বোধশক্তির অধিকারী।

٢٠. اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْمَاخُوْذِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِىْ عَالَمِ الذَّرِّ أَوْ كُلِّ عَهْدٍ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ بِتَرْكِ الْإِيْمَانِ أَوْ الْفَرَائِضِ.

২০. যারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার অর্থাৎ আলমে যার -এ তাদের নিকট হতে যে সমস্ত অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে বা অন্যান্য সকল অঙ্গীকার পূরণ করে এবং ঈমান আনয়ন পরিত্যাগ করত বা ফরজ কাজসমূহ পরিত্যাগ করত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

٢١. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُّوْصَلَ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالرَّحِمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أَىْ وَعِيْدَهُ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

২১. এবং আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন ঈমান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি তারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাদের প্রতিপালককে অর্থাৎ তার হুমকিসমূহকে ভয় করে। আর আশঙ্কা রাখে মন্দ হিসেবের– এ ধরনের বাক্য পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

٢٢. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ ابْتِغَآءَ طَلَبَ وَجْهِ رَبِّهِمْ لَا غَيْرِهِ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا فِى الطَّاعَةِ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَّيَدْرَؤُوْنَ يَدْفَعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ كَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْأَذٰى بِالصَّبْرِ أُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ أَىِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْآخِرَةِ.

২২. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যই অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে নয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, বিপদ-আপদে এবং অবাধ্যতার কাজ হতে বিরত থাকার বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো দ্বারা মন্দের যেমন– সহিষ্ণুতা দ্বারা মূর্খ আচরণকে, ধৈর্যধারণের মাধ্যমে উৎপীড়নের মোকাবিলা করে তা প্রতিহত করে। তাদের জন্যই রয়েছে শেষ পরিণাম অর্থাৎ পরকালের শুভ পরিণাম। اِبْتِغَآءَ অর্থ তালাশ করা।

٢٣. جَنّٰتُ عَدْنٍ إِقَامَةٍ يَدْخُلُوْنَهَا هُمْ وَمَنْ صَلَحَ أٰمَنَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ج وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوْا بِعَمَلِهِمْ يَكُوْنُوْنَ فِيْ دَرَجَاتِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَوِ الْقُصُوْرِ أَوَّلَ دُخُوْلِهِمْ لِلتَّهْنِئَةِ ـ

২৩. সেই পরিণাম হলো জান্নাত 'আদন স্থায়ীভাবে বসবাসের জান্নাত তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নি ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও। তারা তাদের পর্যায়ের সৎকাজ করতে না পারলেও তাদের সম্মানার্থে এদেরও তাদেরই মর্যাদা ও স্থান প্রদান করা হবে। আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া তারা যখন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন জান্নাতের বা তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাসাদের দ্বার দিয়ে খোশ আমদেদ জানাবার জন্য ফেরেশতা হাজির হবে।

٢٤. يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هٰذَا الثَّوَابُ بِمَا صَبَرْتُمْ بِصَبْرِكُمْ فِى الدُّنْيَا فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ عُقْبَاكُمْ ـ

২৪. তারা বলবে 'সালামু আলাইকুম' তোমাদের উপর শান্তি দুনিয়ায় তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে বলে এই প্রতিদান। কত ভালো পরকালের পরিণাম। অর্থাৎ তোমাদের এ পরিণাম। مَا صَبَرْتُمْ এ স্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসবোধক অর্থব্যঞ্জক।

٢٥. وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ ج بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ الْبُعْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ أَىِ الْعَاقِبَةُ السَّيِّئَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ وَهِىَ جَهَنَّمُ ـ

২৫. যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে। যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং কুফরি ও অবাধ্যতা করত পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে বিদূরিত হওয়া এবং তাদেরই আছে মন্দ আবাস। পরকালে মন্দ পরিণাম। তা হলো জাহান্নাম।

٢٦. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَفَرِحُوْا أَىْ أَهْلُ مَكَّةَ فَرَحَ بَطَرٍ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط أَىْ بِمَا نَالُوْهُ فِيْهَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِىْ جَنْبِ حَيٰوةِ الْاٰخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ شَىْءٌ قَلِيْلٌ يُتَمَتَّعُ بِهٖ وَيَذْهَبُ ـ

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবনোপকরণ স্ফীত করেন বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন সংকীর্ণ করেন। [কিন্তু তারা] মক্কাবাসীরা পার্থিব জীবনে অর্থাৎ তাতে যা পেয়েছে তা নিয়েই উল্লসিত গর্বে উৎফুল্ল; অথচ পরকালের জীবনের পার্শ্বে পার্থিব জীবন তো সামান্য ভোগ্যবস্তু বৈ কিছুই নয়। অর্থাৎ এটা এত ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তু যা ভোগ করা হয়, লয়প্রাপ্ত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ : হামযাটা উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে। আর فَاءٌ হলো عَاطِفَةٌ উহ্য ইবারত এরূপ হবে- اَيَسْتَوِىْ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ فَمَنْ يَّعْلَمُ

قَوْلُهُ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَفِىْ টা اِسْتِفْهَامْ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ : এ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ هِىَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جَنّٰتُ عَدْنٍ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে عُقْبَى الدَّارِ থেকে بَدَلْ হয়নি, যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন।

قَوْلُهُ يَدْخُلُوْنَهَا هُمْ : প্রশ্ন : هُمْ উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. যাতে করে مَنْ صَلَحَ -এর আতফ يَدْخُلُوْنَهَا -এর যমীরের উপর বৈধ হতে পারে। কেননা ضَمِيْر مَرْفُوْعْ مُتَّصِلْ -এর উপর আতফ করতে হলে ضَمِيْر مُنْفَصِلْ দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি হয়।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : يَقُوْلُوْنَ -কে উহ্য মেনেছেন যাতে করে বাক্যটি مَرْبُوْطْ এবং مُنْتَظَمْ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِمَا نَالُوْا فِيْهَا : পার্থিব জীবন তো প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্জন করেছে نَفْس زندگى -এর উপর গর্ব-অহংকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং পার্থিব জীবনে যা কিছু অর্জন হয়েছে এর উপর গর্ব-অহংকার করা এবং বে জায়গায় দম্ভ করা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اِنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ : এ আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান' দ্বারা দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে- اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গুনাহ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা এত বড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

দ্বিতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পালনকারীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল- بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধিবিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরজ কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে- وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ অর্থাৎ তারা কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দাদের মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গাম্বরদের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে।

আবূ দাউদ আওফ ইবনে মালেক (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাঞ্জেগানা নামাজ পাবন্দি সহকারে আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণির আনুগত্য করবেন এবং কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছু যাচনা করবেন না।

যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা হয় না। অশ্বারোহণের সময় তাদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তারা কোনো মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন না; বরং স্বয়ং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।

এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালোবাসা, মাহাত্ম্য ও আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচনা নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একবার মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে 'বসে যাও' কথাটি বের হয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তাফসীর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই– وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خَوْف শব্দের পরিবর্তে خَشْيَةٌ শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মতো নয়; বরং তা পিতামাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মতো। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার কারণে বান্দা এরূপ আশঙ্কা করে যে, আমাদের কোনো কর্ম অথবা কথা যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই خَشْيَةٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার কারণ থেকে উদ্ভূত ভয়কে خَشْيَةٌ বলা হয়। এ কারণেই পরবর্তী বাক্যে হিসাব-কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে خَشْيَةٌ -এর পরিবর্তে خَوْف শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে– وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা এমন ব্যক্তি কে আছে যে জীবনে কখনো কোনো গুনাহ বা ত্রুটি করেনিনি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠগুণ এই– وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে।

প্রচলিত কথায় কোনো বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় কিন্তু আরবি ভাষায় এর অর্থ আরো ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া। বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এ দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। ১. صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং ২. صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা কোনো না কোনো সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেন না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোনো কোনো সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর; তা হোক কোনো ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা কিংবা হারাম ও মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোনো গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোনো প্রশংসনীয় ও ছওয়াবের কাজ নয়। ছওয়াব তখনই হবে, যখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণে হয়।

সপ্তম গুণ হচ্ছে- اَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ নামাজ কায়েম করা। অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামাজ আদায় করা শুধু নামাজ পড়া নয়। এ জন্যই কুরআনে নামাজের নির্দেশ সাধারণত اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে- وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু আল্লাহ তা'আলার নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেওয়া রিজিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মতো সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়।

অর্থসম্পদ আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এজন্যেই আলেমগণ বলেন যে, জাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়, যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে- يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভালো দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জবাবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, পাপকে পুণ্য দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোনো সময় কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গুনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে বলেন- পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দেবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোনো পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - دار শব্দের অর্থ এখানে دَارِ اٰخِرَتْ অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে دَارْ বলে دَارِ دُنْيَا অর্থাৎ ইহকাল বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কষ্টেরও সম্মুখীন হয়। কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عَدْنٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনো তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন, জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তাদের ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরো একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখকষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ الخ : রুকুর শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু-শ্রেণিতে বিভক্ত করে বলা হয়েছিল যে, তাদের একদল আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও একদল অবাধ্য। অতঃপর অনুগত বান্দাদের কতিপয় গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলামত ও গুণাবলি এবং তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে। এতে অবাধ্য বান্দাদের একটি স্বভাব বর্ণনা করা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ তা'আলার পালনকর্তা ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফের ও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরি করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত বিধিবিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোনো মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলা অথবা রাসূলের কোনো আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে- وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ অর্থাৎ তারা এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধিবিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার নাফরমান বান্দারা এসব হক ও সম্পর্কও ছিন্ন করে। উদাহরণত পিতামাতা, ভাইবোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়দের যেসব অধিকার আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না।

তৃতীয় স্বভাব এই- يُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু-স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরোয়া করে না এবং কারো অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কার্যকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফ্যাসাদ।

অবাধ্য বান্দাদের এ তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে- أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ অর্থাৎ তাদের জন্য লানত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লানতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলা বাহুল্য আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আজাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায়- কিছু স্পষ্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে। উদাহরণত উল্লেখ্য-

১. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো সাথে কোনো চুক্তি করা হলে তা পালন করা ফরজ এবং লঙ্ঘন করা হারাম। চুক্তিটি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের সাথে হোক, যেমন ঈমানের চুক্তি। কিংবা সৃষ্টজগতের মধ্যে কোনো মুসলমান অথবা কাফেরের সাথে হোক- চুক্তি লঙ্ঘন করা সর্বাবস্থায় হারাম।

২. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ থেকে জানা যায় যে, ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় না; বরং সম্পর্কিতদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকার, সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও ভাইবোনদের অধিকার এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ করা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন। এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত অথবা কোনো ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে এগুলো ভুলে যাওয়া কিরূপে জায়েজ হবে?

কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে দেখাশোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে রিজিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ আত্মীয়দের দেখাশুনা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, আমাকে বলুন ঐ আমল কোনটি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দেবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর; তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। -[বগভী]

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আত্মীয়স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে না; বরং কোনো আত্মীয় যদি তোমার অধিকার প্রদানে ত্রুটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে; এরপরও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজেদের বংশ-তালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে। তিনি আরো বলেছেন, সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ুতে বরকত হয়। -[তিরমিযী]

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে তেমনি সম্পর্ক বজায় রাখবে, যেমন তার জীবদ্দশায় রাখা হতো।

৩. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কুরআন ও হাদীসে সবরের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত সবরকারী আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ ও সাহায্য লাভ করে এবং অগণিত ছওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরিউক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, এসব ফজিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবর এখতিয়ার করা হয়।

সবরের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণিভেদ আছে। ১. কষ্ট ও বিপদে সবর অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি রেখে আশাবাদী হওয়া। ২. ইবাদতে সবর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পালন করা কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। ৩. গুনাহ ও মন্দকাজ থেকে সবর অর্থাৎ মন মন্দকাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া।

৪. وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে ব্যয় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন– জাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫. يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ প্রত্যেক মন্দকে প্রতিহত করা একটি যুক্তিগত ও স্বভাবগত দাবি। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ইসলামের নীতি নয়; বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। কেউ তোমার সাথে জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ কর। যে তোমার সম্পর্কের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর। কেউ রাগ করলেও তুমি তার জবাব সহনশীলতার মাধ্যমে দাও। এর অনির্বায পরিণতি হবে এই যে, শত্রুও মিত্রে পরিণত হবে এবং দুষ্টও তোমার সামনে শিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বাক্যের আরো একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যদি কোনো সময় কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গুনাহ ও মাফ হয়ে যাবে।

হযরত আবূযর গিফারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তোমার দ্বারা যখন কোনো মন্দ কাজ অথবা গুনাহ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কোনো সৎকাজ করে নাও। এতে গুনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শর্ত এই যে, বিগত গুনাহ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে। –[আহমদ, মাযহারী]

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ নিজেরা তো জান্নাতে স্থান পাবেই, তাদের খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য অর্থাৎ মুমিন মুসলমান হতে হবে কাফের হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দার সমান না হলেও আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জান্নাতে তার স্থানে পৌছিয়ে দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি সৎ বান্দাদের বংশধর ও সন্তানসন্তুতিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব।

এতে জানা যায় যে, বুজুর্গদের সাথে বংশ আত্মীয়তার অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে।

৬. سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ থেকে জানা যায় যে, পরকালীন মুক্তি, উচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবর করার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য করতে হবে।

اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি; তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ

অনুবাদ :

٢٧. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ قُلْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ اِضْلَالَهٗ فَلَا تُغْنِى الْاٰيَاتُ عَنْهُ شَيْئًا وَيَهْدِيْ يُرْشِدُ اِلَيْهِ اِلٰى دِيْنِهٖ مَنْ اَنَابَ ج رَجَعَ اِلَيْهِ وَيُبْدَلُ مِنْ مَنْ.

২৭. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, তার নিকট অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? لَوْلَا এটা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– লাঠি, হস্ত, উষ্ট্রী ইত্যাদি। তাদেরকে বল, আল্লাহ তা'আলা যাকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করেন তাকে বিভ্রান্ত করেন সুতরাং নিদর্শনসমূহ তাঁর কোনো কাজে আসে না। এবং যারা তাঁর অভিমুখী তাঁর প্রতি মুখ ফিরায় তাদেরকে তিনি তাঁর দিকে অর্থাৎ তাঁর দীনের দিকে হেদায়েত করেন পথ প্রদর্শন করেন।

٢٨. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ تَسْكُنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَىْ وَعْدِهٖ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ اَىْ قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

২৮. যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অর্থাৎ তৎপ্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ স্মরণ করে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। শুনে রাখ! আল্লাহ তা'আলার স্মরণেই হৃদয় অর্থাৎ মুমিনদের হৃদয় প্রশান্তি পায়। اَلَّذِيْنَ এটা পূর্বোক্ত আয়াতটির مَنْ শব্দটির بَدْل বা স্থলাতিষিক্ত বাক্য। تَطْمَئِنُّ অর্থ প্রশান্ত হয়।

٢٩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ طُوْبٰى مَصْدَرٌ مِنَ الطِّيْبِ اَوْ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ مَرْجِعٍ.

২৯. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্যই হলো কল্যাণ ও শুভ প্রত্যাবর্তন স্থল। اَلَّذِيْنَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। طُوْبٰى এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। এ শব্দটি طَيِّبٌ-এর مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎসবোধক শব্দ, অর্থ– ভালো, উত্তম। কিংবা এটা হলো, জান্নাতের এক বৃক্ষ। এত বিরাট যে, কোনো আরোহী যদি শত বৎসর এটার ছায়ায় চলে তবুও তা শেষ করতে পারবে না। مَاٰبٌ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

٣٠. كَذٰلِكَ كَمَا اَرْسَلْنَا الْاَنْبِيَاۤءَ قَبْلَكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِّتَتْلُوَ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الَّذِىْ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَىِ الْقُرْاٰنَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط حَيْثُ قَالُوْا لَمَّا اُمِرُوْا بِالسُّجُوْدِ لَهٗ وَمَا الرَّحْمٰنُ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ هُوَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ.

৩০. এভাবে আমি অর্থাৎ তোমার পূর্বে যেভাবে নবীগণকে প্রেরণ করেছিলোম সেভাবে আমি এমন এক জাতির প্রতি যাদের পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে তোমাকে পাঠিয়েছি তাদের নিকট তেলাওয়াত করার জন্য পাঠ করার জন্য তা যা আমি তোমার প্রতি ওহী নাজিল করেছি। অর্থাৎ আল কুরআন। কিন্তু তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। তাদেরকে যখন দয়াময়কে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? হে মুহাম্মদ ﷺ ! তাদেরকে বল, তিনিই আমার প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

٣١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا لَهُ اِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَيِّرْ
عَنَّا جِبَالَ مَكَّةَ وَاجْعَلْ لَنَا فِيْهَا اَنْهَارًا
وَ عُيُوْنًا لِنَغْرِسَ وَنَزْرَعَ وَابْعَثْ لَنَا اٰبَاۤءَنَا
الْمَوْتٰى يُكَلِّمُوْنَا اَنَّكَ نَبِيٌّ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا
سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ نُقِلَتْ عَنْ اَمَاكِنِهَا اَوْ
قُطِّعَتْ شُقِّقَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتٰى ط بِاَنْ يُحْيَوْا لَمَّا اٰمَنُوْا بَلْ لِلّٰهِ
الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط لَا لِغَيْرِهِ فَلَا يُؤْمِنُ اِلَّا مَنْ
يَّشَاۤءُ اللّٰهُ اِيْمَانَهُ دُوْنَ غَيْرِهِ وَاِنْ اُوْتُوْا مَا
اقْتَرَحُوْا وَنَزَلَ لَمَّا اَرَادَ الصَّحَابَةُ اِظْهَارَ
مَا اقْتَرَحُوْا طَمْعًا فِيْ اِيْمَانِهِمْ اَفَلَمْ
يَيْئَسِ يَعْلَمِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ
اَنَّهُ لَوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا
اِلَى الْاِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ اٰيَةٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ تُصِيْبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوْا يَصْنَعُهُمْ اَيْ بِكُفْرِهِمْ قَارِعَةٌ
دَاهِيَةٌ تَقْرَعُهُمْ بِصُنُوْفِ الْبَلَاءِ مِنَ الْقَتْلِ
وَالْاَسْرِ وَالْحَرْبِ وَالْجَدْبِ اَوْ تَحُلُّ يَا
مُحَمَّدُ بِجَيْشِكَ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ مَكَّةَ
حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ط بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَقَدْ حَلَّ
بِالْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى اَتٰى فَتْحُ مَكَّةَ .

৩১. কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল- আপনি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকেন তবে মক্কার এ পাহাড়সমূহ সরিয়ে দিন এবং আমরা যাতে বৃক্ষ রোপণ করতে পারি ও শস্য উৎপাদন করতে পারি তজ্জন্য তাতে নদীনালা বানিয়ে দিন। আর আমাদের মৃত পিতৃপুরুষগণকে পুনর্জীবিত করে দিন যাতে তারা আমাদেরকে বলে দেয় যে, 'আপনি নবী।' এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, যদি কুরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হতো স্বস্থান হতে সরিয়ে নেওয়া হতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হতো, قُطِّعَتْ অর্থ বিদীর্ণ হলো অথবা মৃতের সাথে তাদেরকে জীবিত করে কথা বলা যেতো তবুও তারা বিশ্বাস করত না। বরং সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত অন্য কারো এখতিয়ারে নয়। তারা যা দাবি করে তা প্রদর্শন করলেও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত অন্য কেউ বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আগ্রহাতিশয্যের দরুন সাহাবীগণও তাদের দাবি অনুসারে মোজেজা প্রদর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, مَا صَنَعُوْا এ স্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকেই নিদর্শন ব্যতিরেকেই ঈমানের দিকে হেদায়েত করতে পারতেন। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত সাহায্য না আসা পর্যন্ত মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কর্মফলের জন্য اَفَلَمْ يَيْئَسِ এ স্থানে অর্থ তারা কি জানে না? اَنْ এটা এস্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন রূপে লঘুকৃত। মূলত ছিল اَنَّهُ অর্থাৎ কুফরির জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে। অর্থাৎ হত্যা, বন্দিত্ব, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রলয়ঙ্করী বিপদ তাদের উপর আপতিত হতে থাকবেই অথবা হে মুহাম্মদ ﷺ ! তুমি তোমার সেনাদলসহ তাদের আবাস ভূমির অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী স্থানে এসে অবতীর্ণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত ওয়াদার বিপরীত করেন না। রাসূল ﷺ মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয়ও হয়েছিল।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ هَلَّا : لَوْلَا-এর তাফসীর هَلَّا দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لَوْلَا টা تَحْضِيْضِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْ مَنْ : অর্থাৎ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ জুমলা হয়ে مَنْ اَنَابَ হতে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে তারকীবের হিসেবে পাঁচটি সুরত হতে পারে-

১. الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হলো মুবতাদা, পরবর্তীতে আগত الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জুমলা হয়ে তার খবর। আর মধ্যবর্তী বাক্য وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

২. الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا টা مَنْ اَنَابَ হতে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে।

৩. الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا টা مَنْ-এর عَطْفُ بَيَانْ হয়েছে।

৪. উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৫. উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হবে অর্থাৎ اَمْدَحُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

قَوْلُهُ اَىْ وَعْدَهُ : ذِكْرُ اللّٰهِ-এর তাফসীর وَعْدَهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَامْ বলে خَاصْ উদ্দেশ্য হয়েছে। অন্যথায় ذِكْرُ اللّٰهِ টা وَعْد এবং وَعِيْد উভয়কেই শামিল করত। আর وَعِيْد দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হওয়ার পরিবর্তে আরো পেরেশানিতে পড়ে যেত। মুফাসসির (র.) وَعْدَهُ দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ طُوْبٰى : এর অর্থ হলো– সৌন্দর্য, সুখকর অবস্থা, জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। আল্লামা আলূসী (র.) طُوْبٰى-কে طَابَ يَطِيْبُ তথা বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার বলেছেন। যেমন– زُلْفٰى . بُشْرٰى ; আর طُوْبٰى মূলে طِيْبٰى এরপর يَاءْ সাকিন এবং তার পূর্বাক্ষরে ضَمَّةٌ হওয়ার কারণে يَاءْ-কে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করায় طُوْبٰى হয়েছে।

قَوْلُهُ شُقِّقَتْ : অর্থাৎ আপনার কেরাতের কারণে জমিন বিদীর্ণ হয়ে তাতে ঝরনা ধারা ও নদী প্রবাহিত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, قُطِّعَتْ-এর অর্থ হলো কুরআনের মাধ্যমে طَيُّ الْاَرْضِ তথা দ্রুততার সাথে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَمَّا اٰمَنُوْا : এটা لَوْ-এর জবাব যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بِغَيْرِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا-এর মূল ছিল اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا لِلّٰهِ জার ও মাজরূরকে اِخْتِصَاصْ-এর জন্য مُقَدَّمْ করে দিয়েছেন, যাকে মুফাসসির (র.) لَا بِغَيْرِ বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَعْلَمْ : يَيْئَسْ-এর তাফসীর يَعْلَمْ দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ لَمْ يَيْئَسُوْا-এর তাফসীর لَمْ يَعْلَمُوْا দ্বারা بَنِىْ نَخْع বা هَوَازِنْ-এর ভাষা মতে হয়েছে। আর يَاسْ টা عِلْم-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি নিরাশ হয়ে যায় সে জানে যে, এ কাজটি হওয়ার নয়।

قَوْلُهُ بِصُنْعِهِمْ : مَا صَنَعُوْا-এর তাফসীর بِصُنْعِهِمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا টা হলো مَصْدَرْ মওসূলের مَا নয়। কাজেই عَدَمْ عَائِدْ-এর আপত্তি উঠবে না।

قَوْلُهُ الدَّاهِيَةُ : তথা اَلْاَمْرُ الْعَظِيْمُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ الخ : মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্য রাসূল হওয়ার নিদর্শনাবলি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মোজেজার মাধ্যমে দিবালোকের মতো ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবূ জাহল বলে দিয়েছিল যে, বনূ হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহর রাসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন? তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোনো অবস্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও অবান্তর ফরমায়েশের মাধ্যমে সর্বত্র এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসমূহও আবূ জাহল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে।

তাফসীরে বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হলো। তাদের মধ্যে আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল, আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রাসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবি আছে এগুলো কুরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবি ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মোজেজার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন, যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তাসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর চেয়ে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবি ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন, যাতে সিরিয়া ইয়েমেনের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবি ছিল এই যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চেয়ে কোনো অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন, যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি আপনার ধর্ম সত্য কিনা। -[মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ]

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবির উত্তরে বলা হয়েছে-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا .

এখানে سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ -এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ لَمَّا اٰمَنُوْا যেমন কুরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জবাবই উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْاۤ .

অর্থ এই যে, যদি কুরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা তারা এসব দাবির পূর্বে এমন এমন মোজেজা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মোজেজার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইশারায় চন্দ্রের দিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর। এমনিভাবে তার হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তাসবীহ পাঠ করা কোনো মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চেয়ে অধিকতর বিরাট মোজেজা। শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের আলৌকিকতার চেয়ে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবির পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা- কিন্তু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এসব দাবির লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবি পূরণ না করা হলে তারা বলবে- [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা'আলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রাসূলের কথা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে- بَلْ لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবিগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবি পূর্ণ করা উপযুক্ত মনে করেননি। কারণ দাবি উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তার জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবি পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا : ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের এসব দাবি শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মোজেজা হিসেবে দাবিগুলো পূরণ করে দিলে ভালোই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হননি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা আল্লাহর রহস্যের অনুকূলে নয়। আল্লাহ তা'আলার রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

قَوْلُهُ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবিদাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য। যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনো দুর্ভিক্ষের কখনো ইসলামি জিহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাজিল হয়েছে। কারো উপরও বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোনো বালামসিবতে আক্রান্ত হয়েছে। اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ অর্থাৎ আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা কোনো সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমনকি পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোনো সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আজাব অথবা বিপদ নাজিল হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আজাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আজাবে পতিত হবে।

নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোনো না কোনো সম্প্রদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংসলীলা, কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনো বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে। কুরআন পাকের উপরিউক্ত বক্তব্য অনুযায়ী এগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের জন্যও হুঁশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে। অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্তু মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যেত, আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করত তওবা করত এবং ইস্তেগফার ও দান-খয়রাতকে মুক্তির উপায় মনে করত। ফলে চাক্ষুষ দেখা যেত যে, তাদের বিপদ সহজেই দূর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ স্মরণে আসে না– বাকি সব কিছুই আমরা স্মরণ করি। দুনিয়ার তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তুগত কারণাদির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগের তাওফীক তখনো কম লোকেরই হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্যুপরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ : অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনো ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গাম্বরদের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফের ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

অনুবাদ :

৩২. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ كَمَا اسْتُهْزِئَ بِكَ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمْلَيْتُ أَمْهَلْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَيْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ فَكَذٰلِكَ أَفْعَلُ بِمَنْ اِسْتَهْزَأَ بِكَ ـ

৩২. তোমার সাথে যেরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে তেমনি তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অনন্তর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে কিছু অবকাশ বিরতি দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদেরকে শাস্তিতে পাকড়াও করেছিলাম। অনন্তর কেমন ছিল এই শাস্তি! অর্থাৎ যথাস্থানেই তা আপতিত হয়েছিল। তোমার সাথে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের বেলায়ও আমি তদ্রূপ আচরণ করব। এ আয়াতটি হলো রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ।

৩৩. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ رَقِيْبٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُوَ اللّٰهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ مِنَ الْأَصْنَامِ لَا دَلَّ عَلٰى هٰذَا وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ط قُلْ سَمُّوْهُمْ ط لَهُ مَنْ هُمْ أَمْ بَلْ أَتُنَبِّئُوْنَهُ تُخْبِرُوْنَ اللّٰهَ بِمَا أَيْ بِشَرِيْكٍ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ اِسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ أَيْ لَا شَرِيْكَ لَهُ إِذْ لَوْ كَانَ لَعَلِمَهُ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ أَمْ بَلْ أَتُسَمُّوْنَهُمْ شُرَكَاءَ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط بِظَنٍّ بَاطِلٍ لَا حَقِيْقَةَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ كُفْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ط طَرِيْقِ الْهُدٰى وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ـ

৩৩. প্রত্যেক মানুষ যা করে ভালো ও মন্দ যা কিছু করে তা যিনি লক্ষ্য করেন তার যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কি ঐ সমস্ত প্রতিমার সমান যারা এরূপ নয়। না কখনো সমান নন। পরবর্তী বাক্য এ বক্তব্যটির প্রতি ইঙ্গিতবহ। তা হলো অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার বহু শরিক করেছে। বল, তাঁকে তাদের নাম বল তারা কে? বরং أَمْ এটা এ স্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা কি তাঁকে আল্লাহ তা'আলাকে এমন কিছুর এমন শরিকের সংবাদ দিচ্ছ পৃথিবীতে যা আল্লাহ তা'আলা জানেন না। أَتُنَبِّئُوْنَ অর্থ তোমরা কি সংবাদ দিচ্ছ? এ স্থানে প্রশ্নবোধকটি إِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মূলত তাঁর কোনো শরিক নেই। কারণ শরিক থাকলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তা জানতেন। তা হতে আল্লাহ তা'আলা বহু ঊর্ধ্বে। না তার উক্তি হিসেবে তা করছ? ভিতরে যার কোনো তাৎপর্য বা ভিত্তি নেই সেই ধরনের বাতিল ও অবাস্তর ধারণারূপে তোমরা এগুলোকে শরিক নামকরণ করে নিয়েছ? না সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ছলনা অর্থাৎ তাদের কুফরিই তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পথ হতে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। أَمْ بِظَاهِرٍ এ স্থানে أَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৪. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْإِسْرِ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَقُّ ج أَشَدُّ مِنْهُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ أَيْ عَذَابِهِ مِنْ وَّاقٍ مَانِعٍ ـ

৩৪. তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে হত্যা ও বন্দিত্বের শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর। তা হতে আরো কঠিন। আল্লাহ তা'আলা হতে অর্থাৎ তাঁর শাস্তি হতে তাদের জন্য কোনো রক্ষাকারী নেই। কেউ তার প্রতিহতকারী নেই।

٣٥. مَثَلُ صِفَةُ الْجَنَّةِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط مُبْتَدأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوْفٌ اَىْ فِيْمَا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اُكُلُهَا مَا يُؤْكَلُ فِيْهَا دَآئِمٌ لَا يَفْنٰى وَظِلُّهَا ط دَائِمٌ لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ لِعَدَمِهَا فِيْهَا تِلْكَ اَىِ الْجَنَّةُ عُقْبٰى عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ـ

৩৫. সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা مَثَلُ الْجَنَّةِ এটা এ স্থানে مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। এটার خَبَرٌ বা বিধেয় এ স্থানে উহ্য। তা হলো فِيْمَا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ঐ জান্নাতের বিবরণ হলো যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ বিবরণ এরূপ– তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তার খাদ্য চিরস্থায়ী তা কখনো বিলুপ্ত হবে না। তার ছায়াও চিরস্থায়ী। সূর্যালোক তা নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। কারণ, সেখানে সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। এটা অর্থাৎ এই জান্নাত যারা শিরক হতে বেঁচে রয়েছে তাদের পরিণাম ফল। আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হলো জাহান্নাম। اُكُلُ অর্থ– যা আহার করা হয়। عُقْبٰى অর্থ– শেষ পরিণাম।

٣٦. وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهٖ مِنْ مُؤْمِنِى الْيَهُوْدِ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ لِمُوَافَقَتِهٖ مَا عِنْدَهُمْ وَمِنَ الْاَحْزَابِ الَّذِيْنَ تَحَزَّبُوْا عَلَيْكَ بِالْمُعَادَاةِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ط كَذِكْرِ الرَّحْمٰنِ وَمَا عَدَا الْقِصَصِ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ فِيْمَا اُنْزِلَ اِلَىَّ اَنْ اَىْ بِاَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ط اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ مَرْجِعِىْ ـ

৩৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং আরো যারা ইহুদিদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছিলেন তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দিত। কারণ তাদের নিকট যা আছে তা তার অনুরূপ। তবে কোনো কোনো দল অর্থাৎ মুশরিক ও ইহুদিদের যারা তোমার শত্রুতায় জোট বেঁধেছে তারা তার কতক অংশ 'আর-রাহমান' -এর উল্লেখ ও কুরআনের কাহিনীগুলো ব্যতীত তাতে যে সমস্ত বিধিবিধান রয়েছে তা অস্বীকার করে। বল, আমার নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমি তো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে ও তাঁর কোনো শরিক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন। اَنْ এটা এ স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَاٰبِ অর্থ আমার প্রত্যাবর্তনস্থল। শব্দটির শেষে اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধবাচক ى উহ্য রয়েছে।

٣٧. وَكَذٰلِكَ الْاِنْزَالُ اَنْزَلْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ حُكْمًا عَرَبِيًّا ط بِلُغَةِ الْعَرَبِ تَحْكُمُ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ فِيْمَا يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهِ مِنْ مِلَّتِهِمْ فَرْضًا بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِالتَّوْحِيْدِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٍ وَّلِىٍّ نَاصِرٍ وَّلَا وَاقٍ مَانِعٍ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

৩৭. আর এভাবে অর্থাৎ যেভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে সেভাবে আমি তা অর্থাৎ আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এক ফয়সালাকারীরূপে অর্থাৎ এটা আরবি ভাষায় নাজিল করেছে যার মাধ্যমে তুমি মানুষের সাথে ফয়সালা বিধান করবে। তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্তির পর ধরে নাও তুমি যদি তাদের কাফেরদের খেয়াল-খুশির অর্থাৎ তারা তোমাকে তাদের ধর্মের প্রতি যে আহ্বান করে তার অনুসরণ কর তবে আল্লাহ তা'আলার মোকাবিলায় তোমার কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী। অর্থাৎ তাঁর শাস্তি প্রতিহতকারী থাকবে না। مِنْ وَّلِىٍّ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ : অর্থাৎ عَلٰى اَىِّ حَالَةٍ كَانَ عِقَابِىْ اَهَلْ كَانَ ظُلْمًا اَوْ كَانَ عَدْلًا অর্থাৎ আমার শাস্তি কি [অ]ত্যাচারীসুলভ না ইনসাফ ভিত্তিক? এর উত্তর ব্যাখ্যার স্বীয় উক্তি هُوَ قَائِمٌ مُوْقِعَةٌ দ্বারা দিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ : এটা فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ মুবতাদার খবর হয়েছে। قَرِيْنَةٌ مُقَابَلَةٌ দ্বারা যেহেতু খবরের উহ্য [হ]ওয়া বুঝা যায়। এ কারণেই বাক্য উপকারবিহীন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

قَوْلُهُ دَلَّ عَلٰى هٰذَا : অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের উপর وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ দালালত করতেছে। আর উল্লিখিত দ্বারা [উ]দ্দেশ্য হচ্ছে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হওয়া এবং উহ্যের উপরে বুঝানো। অর্থাৎ اِجْعَلُوْا الخ এ উভয় বিষয়টিকে বুঝাচ্ছে।

قَوْلُهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ : এ বাক্যটি জুমলা হয়ে মুবতাদা আর তার খবর উহ্য রয়েছে। আর [এ]টা হলো فِيْ كَانَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ আর تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ টা উহ্য যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত এরূপ যে, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَهَا الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

قَوْلُهُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا دَائِمٌ : এ উভয় বাক্যই মুবতাদা ও খবর হয়ে حَالٌ হয়েছে। আর ظِلُّهَا মুবতাদার খবর [হ]লো دَائِمٌ যা قَرِيْنَة -এর কারণে উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مَا يُؤْكَلُ فِيْهَا : প্রশ্ন : কি কারণে اُكُلُهَا -এর তাফসীর مَا يُؤْكَلُ দ্বারা করা হয়েছে?

[উ]ত্তর. এর দ্বারা দুটি প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করা উদ্দেশ্য–

. যদি اُكُلُهَا -কে মাসদার মানা হয় তবে তার উপর دَائِمٌ -এর حَمْل বৈধ নয়। আর যদি اُكُلٌ টা مَاكُوْل অর্থে হয় ;তবে مَاكُوْ[ل] তো খাওয়ার পরে مَعْدُوْم হয়ে যায়। কাজেই دَوَامٌ -এর কোনো অর্থ হলো না।

[উ]ত্তর হলো, اُكُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مَا مِنْ شَانِهٖ اَنْ يُؤْكَلَ এ তাফসীর দ্বারা উভয় প্রশ্নেরই নিরসন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فِيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُكُلُهَا -এর ইযাফত হলো اِضَافَت فِىْ বা فِىْ অর্থে। এটা اِسْنَاد مَجَازِىْ- عَلَاقَة ظَرْفِيَّة

قَوْلُهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا : এ উভয়টি اَنْزَلْنَاهُ -এর যমীর তথা قُرْاٰن থেকে حَالٌ হয়েছে। অথচ حُكْمًا এবং عَرَبِيًّا -এর [ক]ুরআনের উপর حَمْل করা বৈধ নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, حُكْمًا হলো মাসদার যা مَفْعُوْل অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ مَا يُحْكَمُ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ الخ : **শানে নুযূল** : যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেজা দাবি করেছিল এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করছিল তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এ আয়াত নাজিল করেছেন। কেননা কাফেরদের আচরণ ছিল প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা আপনার প্রতি বিদ্রূপ করে আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছে এটি নতুন কিছু নয়; বরং ইতঃপূর্বেও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের সঙ্গে এমন অন্যায় আচরণই করা হয়েছে। তাদেরও বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাদেরকেও চরম কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাই তারা যেভাবে সবর করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আপনিও সবর করুন। আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো কাফেরদেরকে তিনি অবকাশ দান করে থাকেন। তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তাদের অন্যায়-অনাচারের ঘট পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন। আর সে পাকড়াও হয় অত্যন্ত শোচনীয় এবং ভয়াবহ। তাই ইরশাদ হয়েছে– ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ অর্থাৎ এরপরও যদি তাদেরকে পাকড়াও করি বল কেমন ছিল শাস্তি? –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৯, পৃ. ৫৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ﷺ ! আপনার পূর্বের নবী-রাসূলগণকেও এভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাই আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি এ কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছি। অবশেষে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন জালেম হতবাক হয়ে যায়। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন- وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ অর্থাৎ এভাবেই আপনার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে পাকড়াও করা হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, পারা ১৩, পৃ. ৪৭]

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাদের কঠিন কঠোর শাস্তির ইতিহাস সর্বজনবিদিত। আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন নমরূদ সহ সকল জালেম সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ এবং তাদের ধ্বংসের কথা ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জালেম সম্প্রদায়কে তাদের অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির বিধান করেন না; বরং তাদেরকে যথেষ্ট সময় অবকাশ দেওয়া হয়। একদিকে তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হতে থাকে অন্যদিকে তাদের সত্য গ্রহণের তথা হেদায়েতের পথ অবলম্বনের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু যখন তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে আরো ঔদ্ধত্য দেখায় তখন তাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে। পূর্বকালের বিভিন্ন পথভ্রষ্ট জাতির শিক্ষামূলক ঘটনা থেকে মক্কার কাফেরদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি। তাই অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। -[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৫২০]

ইমাম তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ﷺ ! এ মুশরিকরা যদিও আপনাকে বিদ্রূপ করে আপনার নিকট বারে বারে নতুন নতুন নিদর্শন প্রদর্শনের দাবি জানিয়েছে, এর দ্বারা আপনার প্রতি তাদের বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, অবশেষে তাদের এ অবকাশ শেষ হবে এবং তাদের কঠোর কঠিন শাস্তি হবে। -[তাফসীরে তাবারী, খ. ১৩, পৃ. ১০৬]

قَوْلُهُ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ : "বলতো যে সকলের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকের কীর্তিকলাপ নিয়ে তাঁর [আল্লাহ তা'আলার] কবল থেকে কে রক্ষা পেতে পারে?"

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা স্থান পেয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকের মাথার উপর দাঁড়িয়ে সকলের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং শাস্তির কথা স্থান পেয়েছে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১০৫]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের মাথার উপর দাঁড়িয়ে সকলের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন। সবই তার সম্মুখে। কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নেই। সবকিছু যদি সচক্ষে দেখেন। অতএব, কারো শাস্তি বিধানের সর্বময় ক্ষমতা তার রয়েছে, যারা দুরাত্মা তারা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারে না। তাই ইরশাদ হয়েছে- اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই। কোনো বৃক্ষের পাতা ঝড়ে গেলে তাও তিনি জানেন। প্রাণী মাত্ররই রিজিকের দায়িত্ব তাঁর উপরই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা তাঁর সাথে শরিক করে।

قَوْلُهُ قُلْ سَمُّوهُمْ : অর্থাৎ "[হে নবী!] আপনি বলুন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের নাম বল।" যারা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, যাদের কোনো ক্ষমতাই নেই, তাদের সম্মুখে মাথা নত করার ন্যায় বোকামি আর কিছুই হতে পারে না। তারা কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সমান হতে পারে? যাদেরকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমান বলে মনে কর তাদের নাম বলতো? এ সমস্ত অক্ষমদের অবস্থা বর্ণনা কর। সমস্ত সৃষ্টি জগতে আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক আছে বলে আল্লাহ তা'আলা জানেন না। যদি থাকত তবে তিনি অবশ্যই জানতেন। তাই ইরশাদ হয়েছে– أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ তবে কি তোমরা এমন কথা তাকে জানতে চাও যা তিনি জানেন না? বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী আবূ হাইয়ান এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হে কাফেররা! তোমরা কি সেসব দেব দেবতাকে মহান আল্লাহ তা'আলার সমান করতে চাও যারা পৃথিবীর কোনো খবরই রাখে না? অথবা তোমরা এ সম্পর্কে ভাসা ভাসা কথা বলছ। তোমাদের উক্তি অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলিমাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো প্রশ্ন উত্থিত হয় না। তোমরা কি তোমাদের হাতের বানানো মূর্তিগুলোর এমন কোনো গুণ বর্ণনা করতে পার যার কারণে তারা ইবাদতেরও যোগ্য হতে পারে? অথবা তোমরা ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন এমন কথাবার্তা বল বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই।

বস্তুত যদি পৌত্তলিকরা তাদের অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করে, প্রত্যেকেই তার বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করে তবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা তাদের নিকটই প্রমাণিত হবে। তারাই উপলব্ধি করবে যে, তাদের বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই, তাদের কথায় কোনো যুক্তি নেই।

قَوْلُهُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ : অর্থাৎ "আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি।" এ বাক্য দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা হলো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অথবা ইহুদি এবং ঈসায়ীদের মধ্যে সেসব লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (র.) এবং তাঁর সাথি এমনিভাবে আবিসিনিয়ার কিছু খ্রিস্টানও ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তথা মুসলমানগণ আর ইতঃপূর্বে যারা কিতাব পেয়েছিল যেমন ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা সকলেই হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতি আনন্দিত। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি। কেননা পবিত্র কুরআনকেই তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্যের একমাত্র উপকরণ মনে করে।

এতদ্ব্যতীত তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে প্রিয়নবী ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ ছিল। তারা তার আগমনের মধ্যে তাদের কিতাবের ঘোষণায় সত্যতা লক্ষ্য করে খুশি হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! যা আপনার নিকট নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত খুশি। وَمِنَ الْأَحْزَابِ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা এর সত্যতা স্বীকার করে না। قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন কে খুশি হলো বা কে দুঃখী হলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করি না। আর মানুষকে তাঁর দিকে আহ্বান করি কেননা, আমি আল্লাহরই রাসূল আর তাঁর দিকে আহ্বান করার জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। আর তাঁরই নিকট আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা এ ক্ষণস্থায়ী জগতে মানুষের অবস্থান একটি সীমিত সময়ের জন্যেই হয়ে থাকে। এ সময় শেষ হলে প্রত্যেকটি মানুষকে পাড়ি জমাতে হয় পরপারে। এটিই স্রষ্টার অমোঘ বিধান। আর কিয়ামত সত্য, অবশেষে সকলকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে কিতাব দেওয়ার কথা ইরশাদ হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তারা হলেন মুমিনগণ, যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাদের মধ্যে আহলে কিতাব যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব (রা.) এবং তাঁর সাথিগণ। আর নাসারাদের মধ্য হতে ৮০জন ইসলাম কবুল করেছিলেন। ৪০ জন নাজরানবাসী ৮ জন ইয়ামানবাসী এবং ১৩ জন আবিসিনিয়াবাসী। যেহেতু তারা পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাই পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

قَوْلُهُ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهُ : অর্থাৎ আর কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের কিছু অংশকে অস্বীকার করে।

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, এ বাক্য দ্বারা যেসব আহলে কিতাব ঈমান আনেনি তারা সহ সমস্ত কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا : ইতঃপূর্বে যেসব তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর বিভিন্ন যুগে নাজিল করেছি ঠিক এমনিভাবে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে হে রাসূল ﷺ ! আপনার নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করেছি। ইতঃপূর্বে আসমানি গ্রন্থসমূহ আম্বিয়ায়ে কেরামের জাতীয় ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে হে রাসূল ﷺ ! আপনার জাতীয় ভাষায় তথা আরবি ভাষায় পবিত্র কুরআন নাজিল করেছি। এতে রয়েছে জ্ঞানভাণ্ডার। আরবি ভাষাকে 'উম্মুল আলসেনা' বলা হয় তথা ভাষার জননী আর পবিত্র কুরআন হলো 'উম্মুল কিতাব' তথা কিতাব জননী। অতএব আরবি ভাষাই এ মহান গ্রন্থের জন্যে সমীচীন বিবেচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ : পবিত্র কুরআন সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। অতএব, আহলে কিতাবসহ সকলের এ কিতাবই মেনে চলা কর্তব্য। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর পূর্বের যাবতীয় বিধি-নিষেধ বাতিল। এখন সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র হেদায়েত পবিত্র কুরআনের হেদায়েত এবং একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহান আদর্শ।

অতএব পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর কে খুশি হলো আর কে খুশি হলো না সেদিকে লক্ষ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তার অনুসরণেই চলতে থাকুন। পবিত্র কুরআন আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি এ কাফেরদের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক আপনি চলতে চান তবে আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে, কিন্তু মূলত এ দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে মুশরিক এবং কাফেরদেরকে এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ ! আপনি আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন এবং কোনো অবস্থাতেই কাফেরদের কথা মেনে চলবেন না। কেননা এর পরিণতি হলো চরম বিপদ আর উম্মতের কর্তব্য হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর আদর্শকে পরিহার করা মুসলিম জাতির চরম ক্ষতির কারণ হয়। তাঁর অনুসরণেই রয়েছে মুসলিম জাতি তথা সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১০৯]

অনুবাদ :

٣٨. وَنَزَلَ لَمَّا عَيَّرُوْهُ بِكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط أَوْلَادًا وَأَنْتَ مِثْلُهُمْ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ مِنْهُمْ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط لِأَنَّهُمْ عَبِيْدٌ مَرْبُوْبُوْنَ لِكُلِّ أَجَلٍ مُدَّةٍ كِتَابٌ مَكْتُوْبٌ فِيْهِ تَحْدِيْدُهُ.

৩৮. রাসূলে কারীম ﷺ -এর অধিক বিবাহ সম্পর্কে কাফেরগণ নিন্দা করলে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমার পূর্বেও বহু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিও দিয়েছিলাম ذُرِّيَّةً অর্থ– সন্তানসন্ততি। তুমিও তাদের মতোই। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা তাদের মধ্য হতে কোনো রাসূলেরই কাজ নয়। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিপালিত দাস। প্রত্যেক নির্ধারিত বস্তুরই মুদ্দতেরই রয়েছে এক কিতাব লিপিবদ্ধ নামচা। তাতেই তার সকল কিছুর সীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে।

٣٩. يَمْحُوا اللّٰهُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ج بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فِيْهِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ أَصْلُهُ الَّذِيْ لَا يُغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ مَا كَتَبَهُ فِي الْأَزَلِ.

৩৯. তা হতে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা যে সমস্ত বিধিবিধান ইত্যাদি ইচ্ছা বহাল রাখেন। يُثْبِتُ এটা ب অক্ষরে তাশদীদ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আর তাঁর নিকট আছে উম্মুল কিতাব মূল কিতাব যার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না। তা হলো যা আদিকাল হতে তিনি লিবিবদ্ধ করে রেখেছেন।

٤٠. وَإِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الْمَزِيْدَةِ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِيْ حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ أَيْ فَذَاكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ لَا عَلَيْكَ إِلَّا التَّبْلِيْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ إِذَا صَارُوْا إِلَيْنَا فَنُجَازِيْهِمْ.

৪০. তাদেরকে যার তোমার জীবদ্দশায়ই যে শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি إِمَّا এতে শর্তবাচক শব্দ إِنْ-এর ن অক্ষরটি مَا مَزِيْدَة বা এ স্থানে অতিরিক্ত مَا-এর مِيْم -এ ইদগাম হয়েছে। তোমাকে দেখিয়ে দেই তবে তো ভালোই এ স্থানে উক্ত শর্তবাচক বাক্যটির জবাব উহ্য। তা হলো فَذَاكَ বা তাদেরকে শাস্তিদানের পূর্বেই তোমার মৃত্যু ঘটাই– তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা প্রচার ভিন্ন তোমার কোনো দায়িত্ব নেই আর যখন আমার নিকট ফিরে আসবে তখন হিসাব নেওয়া আমার কাজ। অনন্তর তাদেরকে আমি প্রতিফল দেব।

٤١. أَوَلَمْ يَرَوْا أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصِدُ أَرْضَهُمْ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا بِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ فِيْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ لَا مُعَقِّبَ رَادَّ لِحُكْمِهِ ط وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

৪১. তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কি দেখে না যে, আমি তাদেরকে ভূমিতে এসে অর্থাৎ তাদের দেশের ধ্বংসাভিপ্রায় নিয়ে চতুর্দিক হতে রাসূল ﷺ -কে বিজয় দানের মাধ্যমে তা সংকুচিত করে এনেছি? আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন। তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। আর তিনি হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। مُعَقِّبَ অর্থ এ স্থানে রদকারী।

٤٢. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ بِأَنْبِيَائِهِمْ كَمَا مَكَرُوْا بِكَ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ط وَلَيْسَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ لِأَنَّهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط فَيُعِدُّ لَهَا جَزَاءَهَا وَهٰذَا هُوَ الْمَكْرُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يَأْتِيْهِمْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّرُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ أَيِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِي الدَّارِ الْاٰخِرَةِ أَلَهُمْ أَمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ .

৪২. তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে যে সমস্ত জাতি অতীত হয়েছে তারাও তাদের নবীগণের সাথে চক্রান্ত করেছিল যেমন তারা তোমার সাথে চক্রান্তে লিপ্ত কিন্তু সমস্ত কৌশল আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে তাদের চক্রান্ত তাঁর কৌশলের মতো নয়। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তিনি তা জানেন। সুতরাং তার পরিপূর্ণ বদলা তিনি দেবেন। এটাই তাঁর কৌশল। কারণ, তিনি তাদের নিকট এমন স্থান হতে আজাব নিয়ে আসেন যে স্থান হতে তারা ধারণাও করতে পারে না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ শীঘ্রই জানবে اَلْكَافِرُ এ স্থানে জাতিবাচক অর্থে তার ব্যবহার হয়েছে। অপর এক কেরাতে اَلْكُفَّارُ [বহুবচন] রূপেও তা পঠিত রয়েছে। পরকালের পরিণাম কার? অর্থাৎ পরকালে কার জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম? তাদের জন্য, না রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য?

٤٣. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ لَهُمْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ عَلٰى صِدْقِيْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ مِنْ مُؤْمِنِي الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى .

৪৩. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা তোমাকে বলে, তুমি প্রেরিত পুরুষ নয়। তাদেরকে বল, আমার সত্যতার জন্য আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্য হতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَذَاكَ : এটা হলো মুবতাদা আর شَانِيكَ হলো তার উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে اَمَّا-এর جَوَابْ شَرْط হয়েছে।

قَوْلُهُ نَتَوَفَّيَنَّكَ : এটাও পূর্বের শর্তের উপর مَعْطُوف হওয়ার কারণে شَرْط হয়েছে। এর জবাবও উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَلَا تَقْصُرْ مِنْكَ আর فَاِنَّمَا عَلَيْكَ হলো সেই উহ্যের ইল্লত। সম্ভবত মুফাসসির (র.) شَرْط ثَانِيْ-এর جَوَابْ উহ্য হওয়ার প্রতি প্রথমটির উপর নির্ভর করে অথবা ইল্লতের উপর নির্ভর করে ইঙ্গিত করেননি। প্রথম شَرْط-এর جَوَابْ-এর বিপরীত যে, তার ইল্লত বর্ণনা করা হয়নি।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ : প্রশ্ন. এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, اَلْكَافِرُ-এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টা عَهْدِيْ মানার তো কোনো করীনা বিদ্যমান নেই। কেননা কোনো সুনির্দিষ্ট বিশেষ কাফের উদ্দেশ্য নয়। আর না সাধারণভাবে একজন কাফের উদ্দেশ্য হয়। এরপরও اَلْكَافِرُ-কে মুফরাদ নেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. اَلْكَافِرُ-এর اَلِفْ لَامْ টি জিনসের জন্য হয়েছে যা বহুবচনের অর্থকে বুঝায়। কাজেই কোনো আপত্তি আর থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ : নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিজীবন যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কুরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রেসালাতের স্বরূপ ও রহস্যই বোঝনি, ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা একটি আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর মতোই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ করতে পারে। স্বজাতীয় নয় এরূপ কোনো অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্রবৃত্তির সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গৃহেরও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে যেতো। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিই উত্থাপিত হলো। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ বেড়ে গেল। এর জবাব প্রথম আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থি মনে করে নিয়েছ? সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি পয়গাম্বরদেরকে পরিবার-পরিজনবিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গাম্বর অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুয়তের প্রবক্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক পত্নীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নবুয়ত, রিসালাত অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মূর্খতা বৈ নয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তো রোজাও রাখি এবং রোজা ছাড়াও থাকি। [অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোজা রাখব।] তিনি আরো বলেন, আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাজের জন্য দণ্ডায়মানও হই। [অর্থাৎ এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাজই পড়ব।] এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ : অর্থাৎ "কোনো রাসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে।" কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবি পয়গাম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবি করেছে, তন্মধ্যে দুটি দাবি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক–

১. আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধিবিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে, اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধিবিধান পরিবর্তন করে দিন– আজাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

২. পয়গাম্বরদের সুস্পষ্ট মোজেজা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে বলা যে, অমুক ধরনের মোজেজা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কুরআন পাকের উপরিউক্ত বাক্যে اٰيَةٌ শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মোজেজাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরবিদ কুরআনি আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো পয়গাম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত তৈরি করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মোজেজা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনো রাসূল ও নবীকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মোজেজা প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে– عُمُوْمِ مَجَازٌ -এর কায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তাফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার-বিষয়বস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনি আয়াত পরিবর্তন করার দাবি অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোনো রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোনো বিশেষ ধরনের মোজেজা দাবি করাও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচালক। কেননা কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মোজেজা প্রদর্শন করবেন।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ : এখানে اَجَلٍ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كِتَابٌ শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গাম্বরের প্রতি কি ওহি এবং কি কি বিধিবিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধিবিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরো লিখিত আছে যে, অমুক পয়গাম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এ মোজেজা প্রকাশ পাবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এরূপ দাবি করা যে, অমুক ধরনের বিধিবিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মোজেজা দেখান। এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবি, যা রিসালাত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ এখানে اُمُّ الْكِتَابِ -এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহফূজ বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারো কোনো ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

তাফসীরবিদদের মধ্যে সাঈদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও আহকাম ও বিধিবিধানের নসখ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গাম্বরের মাধ্যমে স্বীয় গ্রন্থ নাজিল করেন। এসব গ্রন্থে যেসব বিধিবিধান ও ফরায়েজ বর্ণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরি নয়; বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকি রাখতে চান সেগুলো বাকি রাখেন এবং মূল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। তাতে পূর্বেই লিখিত আছে যে, অমুক জাতির জন্য নাজিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্যকৃত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মূলগ্রন্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে সাথে একমাত্র লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোনো বিধান আনয়ন করা হবে।

এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার বিধান কোনো সময়ই রহিত না হওয়া উচিত। কারণ কোনো বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না, তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার শান এর অনেক উর্ধ্বে। কোনো বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যে নির্দেশটি রহিত করা হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মাত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছে। এরপর পরিবর্তন করা হবে। উদাহরণত রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার অথবা হাকীম তখনকার অবস্থার উপযোগী কোনো ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের এই ক্রিয়া হবে। এরপর এ ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতে 'মিটানো' ও 'বাকি রাখার' অর্থ বিধানাবলিকে রহিত করা ও অব্যাহত রাখা।

সুফিয়ান ছাওরী, ওয়াকী' প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিজিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিজিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অনেক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোনো কোনো কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিজিক বৃদ্ধি পায় এবং কোনো কোনো কর্মের দরুন হ্রাস পায়। সহীহ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গুনাহ করে, যার কারণে তাকে রিজিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্যের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোনো বস্তু তাকদীর খণ্ডন করতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কারো ভাগ্যলিপিতে যে বয়স রিজিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন যে, তা কোনো কোনো কর্মের দরুন কম অথবা বেশি হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিজিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোনো কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তিত হয় তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোনো সময় কোনো নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকি থাকে না। এ শর্তটি কোনো সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোনো সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' [ঝুলন্ত] বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও 'বাকি রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতে শেষ বাক্য وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' [চূড়ান্ত] ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জানার জন্যই। এতে এসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

قَوْلُهُ وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি এসব অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি, অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।
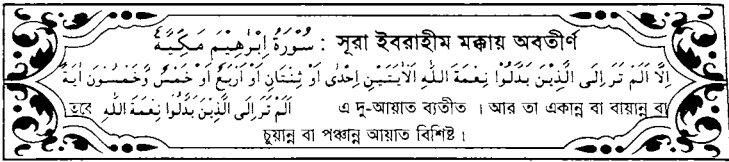
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. الٓرٰ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ بِاِذْنِ بِاَمْرِ رَبِّهِمْ وَيُبْدَلُ مِنْ اِلَى النُّوْرِ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْغَالِبِ الْحَمِيْدِ الْمَحْمُوْدِ ـ

১. আলীফ, লাম, রা এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত। এ কুরআন একটি কিতাব হে মুহাম্মদ ﷺ ! এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে নির্দেশে অন্ধকার হতে অর্থাৎ কুফরি হতে বের করে আলোর দিকে অর্থাৎ ঈমানের দিকে পরাক্রমশালী, প্রশংসাই সত্তার পথের দিকে আনতে পারে। اِلٰى صِرَاطٍ এটা اِلَى النُّوْرِ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত বাক্যাংশ। اَلْعَزِيْزُ অর্থ পরাক্রমশালী। اَلْحَمِيْدُ অর্থ مَحْمُوْدٌ বা প্রশংসিত।

٢. اللّٰهِ بِالْجَرِّ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ وَمَا بَعْدَهُ صِفَةٌ وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ـ

২. আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সবকিছু তাঁরই। আর কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যই। اَللّٰه এটা جَرّ সহ পঠিত হলে [পূর্ববর্তী আয়াতের اَلْعَزِيْزِ -এর] بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ বা তার عَطْفُ بَيَانٍ অর্থাৎ বিবরণমূলক অন্বয়। আর পরবর্তী বাক্যটি হবে এটার صِفَتٌ বা বিশ্লেষণ। رَفْع সহ পঠিত হলে এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য ও পরবর্তী শব্দ اَلَّذِىْ এটার خَبَرٌ বা বিধেয় বলে গণ্য হবে।

٣. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ يَسْتَحِبُّوْنَ يَخْتَارُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَيَبْغُوْنَهَا اَىِ السَّبِيْلَ عِوَجًا مُعْوَجَّةً اُولٰئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْحَقِّ ـ

৩. যারা ইহজীবনকে পরজীবনের পরিবর্তে ভালোবাসে ইহজন্মকেই গ্রহণ করে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ তা'আলার পথ অর্থাৎ দীন ইসলাম হতে এবং তা ঐ পথ বক্র করতে চায় তারাই সত্য হতে বহু দূর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। اَلَّذِيْنَ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কাফেরদের বিবরণ। عِوَجًا অর্থ مُعْوَجَّةً বা বক্রকৃত।

٤. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ بِلُغَةِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط لِيُفْهِمَهُمْ مَا أَتَى بِه فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِيْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهِ.

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি যাতে তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বিবৃত করতে পারে। অর্থাৎ তাদের নিকট যে ওহি নিয়ে এসেছে তা পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে। অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়। لِسَانِ অর্থ এ স্থানে ভাষা।

٥. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا التِّسْعِ وَقُلْنَا لَهُ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ إِلَى النُّوْرِ الْإِيْمَانِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰمِ اللّٰهِ بِنِعَمَتِهِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ التَّذْكِيْرِ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ عَلَى الطَّاعَةِ شَكُوْرٍ لِلنِّعَمِ.

৫. মূসাকে আমি আমার নয়টি নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম। এবং তাকে বলেছিলাম তোমার সম্প্রদায়কে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে অন্ধকার হতে কুফরি হতে আলোর দিকে ঈমানের দিকে বের করে আন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিনগুলোর অর্থাৎ তাঁর নিয়ামতসমূহের স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই তাতে অর্থাৎ স্মরণ করাবার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে আনুগত্য প্রদর্শনে পরম ধৈর্যশীল ও অনুগ্রহের প্রতি পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

٦. وَ اذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ أَبْنَاءَكُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَيَسْتَحْيُوْنَ يَسْتَبْقُوْنَ نِسَاءَكُمْ ط لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ أَنَّ مَوْلُوْدًا يُوْلَدُ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبُ ذَهَابِ مُلْكِ فِرْعَوْنَ وَفِيْ ذٰلِكُمْ الْإِنْجَاءِ وَالْعَذَابِ بَلَاءٌ إِنْعَامٌ أَوْ إِبْتِلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ.

৬. আর স্মরণ কর মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত। কোনো এক গণক বলেছিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক সন্তানের জন্ম হবে। সে ফেরাউনের সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ হবে। সেই কারণে তারা তোমাদের ভূমিষ্ঠ জীবিত পুত্রগণকে জবাই করত ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত ছেড়ে দিত। বাকি রেখে দিত। আর এতে অর্থাৎ ঐ মুক্তিদান বা শাস্তিদান ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা।' এক মহাপুরস্কার বা এক মহাবিপদ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ : এটাকে উহ্য মানার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। كِتَابٌ মুবতাদা আর اَنْزَلْنٰهُ তার খবর নয়। কেননা كِتَابٌ হলো نَكِرَة مُخَصَّصَه যা মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْ اِلَى النُّوْرِ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ : اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ টা اِلَى النُّوْرِ থেকে اِعَادَهٗ عَامِلْ -এর সাথে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ : অর্থাৎ اَللّٰهِ শব্দটি اَلْعَزِيْزِ থেকে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانٌ হয়েছে।

প্রশ্ন. اَللّٰهِ হলো عَلَمٌ আর اَلْعَزِيْزِ হলো সিফত। আর عَلَمٌ টা সিফত হতে بَدَل হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. اَلْعَزِيْزِ টা صِفَت مُخْتَصَّه হওয়ার কারণে عَلَمٌ -এর স্থানে হয়ে গেছে। কাজেই اَللّٰهِ শব্দটি তার থেকে بَدَل হওয়া বৈধ হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ নীতিমালা :

صِفَت مَعْرِفَة যদি مَوْصُوْف -এর উপর مُقَدَّمٌ হয়। তবে সিফতের اِعْرَابٌ আমেল অনুপাতে হয়ে থাকে এবং مَوْصُوْف টা بَدَل অথবা عَطْف بَيَانٌ হয়ে থাকে। মূল ইবারত এভাবে- اِلٰى صِرَاطِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الخ

اَللّٰهِ শব্দটির তিনটি সিফত রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি مُقَدَّمٌ আর একটি مُؤَخَّرٌ আর اَلْعَزِيْزِ এবং اَلْحَمِيْدِ হলো مُقَدَّمٌ আর اَلَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ হলো مُؤَخَّرٌ - এ নীতিমালার আলোকেই اَللّٰهِ শব্দটি اَلْعَزِيْزِ থেকে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانٌ হয়েছে।

اَلَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ শব্দের মধ্যে দ্বিতীয় সুরত হলো رَفَع -এর। তাতে اَللّٰهِ শব্দটি মুবতাদা এবং اَلَّذِىْ তার খবর হবে।

قَوْلُهُ نَعْتٌ : অর্থাৎ اَلَّذِيْ يَسْتَحِبُّوْنَ الخ জুমলা لِلْكٰفِرِيْنَ -এর সিফত হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ بِنِعْمَةٍ : এখানে بِاَيّٰمِ اللّٰهِ বলে এভাবে نِعْمَتٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, ظَرْف বলে مَظْرُوْف উদ্দেশ্য নেওয়ার অন্তর্গত। নিয়ামত ও অনুগ্রহ যেহেতু اَيَّام -এর মধ্যে অর্জিত হয় তাই اَيَّامٌ বলে اِنْعَامَاتٌ এবং اِحْسَانَاتٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَسْتَبِقُوْنَ : يَسْتَحِبُّوْنَ -এর তাফসীর يَسْتَبِقُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَسْتَحِبُّوْنَ -এর مَعْنٰى مَوْضُوْع لَهٗ উদ্দেশ্য নয়; বরং لَازِم مَعْنٰى উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কুরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা 'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদিনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম সূরা ইবরাহীম রাখা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় তৌহিদ, রেসালাত এবং কিয়ামতের আলোচনা ছিল। আর আলোচ্য সূরায়ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ বিষয়সমূহের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার ঘোষণা ছিল, আর এ সূরার শুরুতে কুরআনে কারীম নাজিল করার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো মানুষের গোমরাহির অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসা।

এমনিভাবে বিগত সূরার ন্যায় এ সূরায়ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের চক্রান্তের উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ الٓرٰ : এগুলো খণ্ড অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত পন্থাই হচ্ছে সবচেয়ে নির্মল ও স্বচ্ছ অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য। এগুলোর অর্থ কি, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ : ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে هٰذَا -এর خَبَرٌ সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে করার মধ্যে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়– ১. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে نَاسٌ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বুঝানো হয়েছে। ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظُلُمٰتٌ বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نُوْر বলে ঈমানের আলো বুঝানো হয়েছে। এজন্যই ظُلُمٰتٌ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। এমনিভাবে মন্দকর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نُوْر শব্দটি একবচন আনা হয়েছে। কেননা ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رَبّ শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গাম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া– আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবাণি, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় না কারো কোনো পাওনা আছে এবং না কারো জোর তাঁর উপর চলে।

হেদায়েত শুধু আল্লাহ তা'আলার কাজ : আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর দিকে আনয়ন করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ হেদায়েত দান করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই কাজ। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোনো প্রিয়জনকে হেদায়েত দিতে পারেন না; বরং আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে بِاِذْنِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয়াতের অর্থ এই হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপনি তা করতে পারেন।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিকে মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর দিকে আনয়ন করার একমাত্র উপায় এবং মানব ও মানবতাকে ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআন পাক। মানুষ যতই এর নিকটবর্তী হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরাপত্তা ও মনস্তুষ্টি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে তারা যতই এ থেকে দূরে সরে পড়বে, ততই উভয় জাহানের দুঃখ-ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও অস্থিরতার গহ্বরে পতিত হবে।

আয়াতের ভাষায় একথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের সাহায্য কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে

আলোর মধ্যে আনয়ন করবেন। কিন্তু এতটুকু অজানা নয় যে, কোনো গ্রন্থের সাহায্যে কোনো জাতিকে সংশোধন করার উপায় হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর অনুসারী করা।

কুরআন পাকের তেলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য : কিন্তু কুরআন পাকের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তেলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে শুধু শব্দাবলি পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দকাজ থেকে বিবৃত থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের মতো মনোমুগ্ধকর জালই হোক, কুরআন তেলাওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পারে না। হিন্দুদের শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাদের জালে এমন কিছু সংখ্যক মুসলমানই মাত্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কুরআন তেলাওয়াত অজ্ঞ ছিল। আজকাল খ্রিস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোভন ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের প্রভাব শুধুমাত্র এমন পরিবারের উপরই পড়ে যারা মূর্খতার কারণে অথবা নবশিক্ষার সুপ্রভাবে কুরআন তেলাওয়াত থেকে গাফেল।

সম্ভবত এ তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কুরআন পাকে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের পূর্বে তেলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ১. কুরআন পাকের তেলাওয়াত। বলা বাহুল্য তেলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বুঝা হয়– তেলাওয়াত করা হয় না। ২. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা। ৩. কুরআন পাকও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহর শিক্ষা দান করা।

মোটকথা কুরআন এমন একটি হেদায়েতনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুযায়ী কাজ করার মূল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিয়াশীল হওয়াও সুস্পষ্ট। এতদসঙ্গে এর শব্দাবলি তেলাওয়াত করাতেও অজ্ঞাতভাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব বিস্তার করে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার কাজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও হেদায়েত সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাজ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাই গ্রহণযোগ্য, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهٗ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ اَللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পথ। এ পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহ তা'আলার পথ বলে ঐ পথ বুঝানো হয়েছে, যে পথে চলে মানুষ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দুটি গুণবাচক নাম عَزِيْز ও حَمِيْد উল্লেখ করা হয়েছে। عَزِيْز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حَمِيْد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দুটি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলার এ দুটি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোনো অংশীদার নেই।

قَوْلُهٗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ : وَيْل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আজাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা : আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ তা'আলার পথের আলোতে আনার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কুরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আজাবে নিক্ষেপ করে। কুরআন যে আল্লাহ তা'আলা কালাম যারা এ বিষয়টি স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরিউক্ত সাবধান বাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কুরআনকে ত্যাগ করে বসেছে- তেলাওয়াতের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

اَلَّذِیْنَ یَسْتَحِبُّوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا عَلَی الْاٰخِرَةِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِیْ ضَلٰلٍۭ بَعِیْدٍ .

এ আয়াতে কুরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। **প্রথম অবস্থা** হলো, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কুরআনের সুস্পষ্ট মোজেজা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালোবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসতে কোনো আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই, তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পথে চলতে বাধা দান করে।

কুরআন বোঝার ব্যাপারে কোনো কোনো ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। ১. তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল ও সরল পথে কোনো বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাছীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

২. তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার পথে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের কোনো বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কিনা, পাওয়া গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে, তাফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনো ভ্রান্তিবশত এবং কখনো বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কুরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোনো শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কুরআনি প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপদ্ধতি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা মুমিনের কাজ হলো নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কুরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

قَوْلُـهُ أُولَـٰئِكَ فِـىْ ضَـلَالٍۭ بَـعِـيْـدٍ : উপরে যেসব কাফেরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এত দূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

বিধান ও মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে যদিও কাফেরদের এ তিনটি অবস্থা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে মুসলমানের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য। অবস্থানত্রয়ের সারমর্ম এই–

১. দুনিয়ার মহব্বতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা।

২. অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরিক রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলার পথে চলতে না দেওয়া।

৩. কুরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা।

قَوْلُـهُ وَلَـقَـدْ اَرْسَـلْـنَـا مُوْسٰـى بِـاٰيٰـتِـنَـا الـخ : এ আয়াতে বলা হয়েছে– আমি হযরত মূসা (আ.)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গুনাহের অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

اٰيَاتٌ আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাজিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মোজেজাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নয়টি মোজেজা বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার কথা কুরআনের একাধিক জায়গায় উল্লিখিত আছে। এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.)-কে সুস্পষ্ট মোজেজা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো দেখার পর কোনো ভদ্র ও সমঝদার ব্যক্তি অস্বীকার ও অবাধ্যতায় কায়েম থাকতে পারে না।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব : এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে نَاسٌ [মানবমণ্ডলী] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে– لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে– وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করান।

আইয়ামুল্লাহ : اَيَّامٌ শব্দটি يَوْمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। اَيَّامُ اللّٰهِ শব্দটি দু-অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন– বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলি অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাবলি। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলটপালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুঁশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহর অপর অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভালো মানুষকে যখন কোনো অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কুরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোনো কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াত শুনিয়ে অথবা মোজেজা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের দিকে অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু-উপায়ে সৎপথে আনা যায়। ১. শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং ২. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা। ذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ বাক্যে এ দুটি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি, তাদের আজাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার যেসব নিয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণত তীহ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : এখানে اٰيٰتٌ-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صَبَّارٌ শব্দটি صَبْرٌ থেকে مُبَالَغَةٌ-এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। شَكُوْرٌ শব্দটি شُكْرٌ থেকে مُبَالَغَةٌ-এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আজাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলিতে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারি এবং অধিক শোকরকারী।

উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদি যদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হেদায়েতের জন্য কিন্তু হতভাগ্য কাফেররা চিন্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে কোনো উপকারই লাভ করে না। উপকার তারাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকর উভয় গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ মু'মিন। কেননা বায়হাকী হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু-ভাবে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সবর এবং অর্ধাংশ শোকর। -[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত সোহায়ব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মুমিনের প্রত্যেক অবস্থাই সর্বোত্তম ও মহত্তম। এ বিষয়টি মুমিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। কারণ মু'মিন কোনো সুখ, নিয়ামত অথবা সম্মান পেলে তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। [ইহকালে তো আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত আরো বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ কৃতজ্ঞতার বিরাট প্রতিদান পায়।] পক্ষান্তরে মু'মিনের কষ্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে। সবরের কারণে তার বিপদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। [ইহকালে এভাবে যে, সবরকারীরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। কুরআন বলে- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ। আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গে থাকেন পরিণামে তার মসিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরকালে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে। কুরআন বলে-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

মোটকথা, মু'মিনের কোনো অবস্থা মন্দ হয় না, সর্বোত্তম হয়ে থাকে। সে পতিত হয়েও উত্থিত হয় এবং নষ্ট হয়েও গঠিত হয়।

نہ شوخی چل سکی باد صبا کی

بگڑنے میں بھی زلف اسکی بنا کی

ঈমান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কষ্টকেও নিয়ামত ও সুখে রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে বললেন, আমি আপনার পর এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করব, যদি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের ইচ্ছা মর্জির বিরুদ্ধে কোনো অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে তারা একে ছওয়াবের উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি ও সহ্যগুণের ফলশ্রুতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও সহনশীলতার একটি অংশ দান করব। -[তাফসীরে মাযহারী]

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকে তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ তা'আলার রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দেওয়া হয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো না। তাদের ছেলে-সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হতো এবং শুধু কন্যা সন্তানদেরকে খেদমতের জন্য লালন পালন করা হতো। হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিদান করেন।

অনুবাদ :

٧. وَإِذْ تَأَذَّنَ أَعْلَمَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي بِالتَّوْحِيْدِ وَالطَّاعَةِ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ جَحَدْتُمُ النِّعْمَةَ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ دَلَّ عَلَيْهِ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ .

৭. আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন, তোমরা তাওহীদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অর্থাৎ কুফরি ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করত তোমরা যদি নিয়ামতের অস্বীকার কর তবে অবশ্যই আমি তোমাদের শাস্তি দান করব। পরবর্তী এ বাক্যটি উক্ত বক্তব্যটির প্রতি ইঙ্গিতবহ। অবশ্যই আমার শাস্তি অতি কঠোর। تَأَذَّنَ অর্থ ঘোষণা করল।

٨. وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنْ تَكْفُرُوْا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ خَلْقِهِ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ فِي صُنْعِهِ بِهِمْ .

৮. এবং মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তবুও আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি হতে অনপেক্ষ, প্রশংসিত। তাদের সাথে তাঁর আচরণে তিনি প্রশংসিত।

٩. أَلَمْ يَأْتِكُمْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ وَثَمُوْدَ قَوْمِ صَالِحٍ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ لِكَثْرَتِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ عَلٰى صِدْقِهِمْ فَرَدُّوْا أَيِ الْأُمَمُ أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَفْوَاهِهِمْ أَيْ إِلَيْهَا لِيَعَضُّوْا عَلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ وَقَالُوْا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَلٰى زَعْمِكُمْ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ مُوْقِعٍ لِلرِّيْبَةِ .

৯. তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি أَلَمْ এ স্থানে تَقْرِيْرٌ অর্থাৎ বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের পূর্ববর্তী নূহ সম্প্রদায়, আদ হূদ সম্প্রদায় সামূদ সালেহ সম্প্রদায়ের এবং তাদের পরবর্তীদের? সংখ্যাধিক্যের দরুন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের বিষয় আর কেউ জানে না। তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ অর্থাৎ তাদের সত্যতার পরিষ্কার নিদর্শনসহ রাসূলগণ এসেছিল। তারা ঐ সম্প্রদায়সমূহের লোকের ভীষণ ক্রোধে নিজেদের হাত কামড়াবার জন্য মুখে তুলে নিত এবং বলত তোমাদের ধারণা মতো যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং যার প্রতি তোমরা আহ্বান করছ সেই বিষয়ে অবশ্যই আমরা বিভ্রান্তিকর সংশয়ের মধ্যে রয়েছি। مُرِيْبٌ অর্থ সংশয়কর।

١٠. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍاَىْ لاَشَكَّ فِىْ تَوْحِيْدِهِ لِلدَّلاَئِلِ الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِ فَاطِرِ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَدْعُوْكُمْ اِلٰى طَاعَتِهِ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ فَاِنَّ الْاِسْلاَمَ يُغْفَرُ بِهِ مَا قَبْلَهُ اَوْ تَبْعِيْضِيَّةٌ لِاِخْرَاجِ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَيُؤَخِّرَكُمْ بِلاَ عَذَابٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى ط اَجَلِ الْمَوْتِ قَالُوْآ اِنْ مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا مِنَ الْاَصْنَامِ فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ عَلٰى صِدْقِكُمْ.

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বিষয়ে সন্দেহ? أَفِى اللّٰهِ এ স্থানে اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও একত্বের বিষয়ে কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। فَاطِر অর্থ- সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করবার জন্য مِنْ ذُنُوْبِكُمْ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। ইসলাম গ্রহণ পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমার কারণ হয়। কিংবা مِنْ শব্দটি بَعْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। কেননা 'হককুল ইবাদ' বা বান্দার হক এই ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আজাব না দেওয়া তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলত, তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তাদের অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের উপাসনা হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট তোমাদের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ পরিষ্কার ও স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস।

١١. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ مَا نَحْنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا قُلْتُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ بِالنُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مَا يَنْبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاَمْرِهِ لِاَنَّا عَبِيْدٌ مَرْبُوْبُوْنَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ يَثِقُوْا بِهِ.

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ اِنْ نَحْنُ এ স্থানেও اِنْ শব্দটি না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তোমরা বল তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি তাঁর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয় উচিত নয়। কারণ আমরা তাঁর পালিত দাস। মু'মিনগণের আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা কর্তব্য। তাঁর উপরই আস্থা করা উচিত।

١٢. وَمَا لَنَآ اَنْ لاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ اَىْ لاَ مَانِعَ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا عَلٰى اَذَاكُمْ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

১২. আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করব না কেন? এ বিষয়ে তো আমাদের কোনো বাধা নেই। তিনিই তো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ তাতে তোমাদের নিপীড়নের মুখে অবশ্যই আমরা ধৈর্যধারণ করব। আর যারা নির্ভর করতে চায় আল্লাহ তা'আলারই উপর তারা নির্ভর করুক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَعْلَمَ : تَأَذَّنَ -এর তাফসীর اَعْلَمَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, تَأَذَّنَ টা বাবে تَفَعُّلٌ থেকে স্ত্রী خَاصِيَّتْ -এর হিসেবে تَكَلُّفْ -এর উপর বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলার শানে অনুচিত। কাজেই تَأَذَّنَ টা اَذِنَ অর্থে হবে।

قَوْلُهُ لَاُعَذِّبَنَّهُ : এটা شَرْط -এর جَزَاءُ হয়েছে যা উহ্য রয়েছে اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ নয়। কাজেই اِنَّ عَذَابِىْ -এর شَرْط -এর উপর عَدَمْ تَرَتُّبْ -এর আপত্তির নিরসন হয়ে গেল। আর اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ টা জবাব উহ্য হওয়ার উপর বুঝাচ্ছে।

قَوْلُهُ اَىْ اِلَيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ টা اِلٰى অর্থে হয়েছে। اَفْوَاهِهِمْ এবং اَيْدِيَهُمْ উভয়ের যমীরই كُفَّارٌ -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ কাফেররা স্বীয় হাত গোসসার কঠোরতার কারণে মুখে পুড়ে দেয়। এ তাফসীর عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -এর অনুযায়ী হয়েছে। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় هُمْ যমীরকে رُسُلٌ -এর দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, উম্মতের লোকেরা স্বীয় হাত রাসূলগণের মুখের উপর রেখে দিয়েছে, যেন তারা সত্য কথা বলতে না পারেন। এটা خِلَافْ ظَاهِرْ -

قَوْلُهُ بِزَعْمِكُمْ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর যে, بِمَا اُرْسِلْتُمْ দ্বারা জানা গেল যে, কাফেররা مَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ -এর প্রবক্তা ছিল। অথচ বাস্তবতা এরূপ নয়। জবাবের সারকথা হলো আমরা তোমার রাসূল হওয়া আমাদের নিকট স্বীকৃত নয়। কিন্তু তোমাদের কথা মতে আমরা মেনে নিতেও প্রস্তুত নই।

قَوْلُهُ لَا شَكَّ فِىْ تَوْحِيْدِهِ : এটা একটি সংশয়ের অপনোদন। সংশয় হলো এই যে, هَمْزَةُ اِنْكَارِىْ -এর দাবি হলো شَكٌّ - (مَظْرُوْفٌ) -এর প্রবিষ্ট হবে ظَرْفٌ -এর উপর নয়। আর এখানে اَللّٰهُ শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে যা ظَرْفٌ হয়েছে। জবাবেব সার হলো কথা হচ্ছে شَكٌّ -এর মধ্যে নয় বরং مَشْكُوْكٌ -এর মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম :

قَوْلُهُ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ : تَاَذَّنَ শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই– এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক প্রাপ্ত হয়, যে কোনো সময় নিয়ামতকে বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। –[তাফসীরে মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতার এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরজ ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে পরকালেও আজাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদের জন্য প্রতিদান, ছওয়াব ও নিয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন– لَاَزِيْدَنَّكُمْ কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে لَاُعَذِّبَنَّكُمْ [আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেব।] বলেননি, বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আজাবে পতিত হবে এটা জরুরি নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) স্বজাতিকে বললেন, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রাখ! এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

قَوْلُهُ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ : তারা তাদের হাতকে নিজেদের মুখে স্থাপন করে। এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন যে, নবী-রাসূলগণের আহ্বানে তারা রাগান্বিত হয়ে নিজেদের হাত নিজেদের দাঁত দ্বারা কর্তন করতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে এ মর্মটি লক্ষ্য করা যায়- عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব শ্রবণ করল তখন আশ্চর্যান্বিত হলো। তাই আশ্চর্য অথবা বিদ্রূপ করে নিজেদের হাত মুখে রেখে দিল। যেমন- কোনো কোনো লোক অট্টহাসি চালিয়ে রাখার জন্যে মুখে হাত রেখে দেয়।

আল্লামা কালবী (র.) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো তারা মুখের উপর নিজের হাত রেখে নবী-রাসূলগণকে ইঙ্গিত করেছে যে, আপনারা রসনা বন্ধ রাখুন, এসব কথা বলবেন না।

মোকাতেল (র.) বলেছেন, তারা নবী-রাসূলগণকে নীরব করার জন্যে নিজেদের হাত তাদের মুখের উপর স্থাপন করে এবং তাদেরকে নীরব করে রাখে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে اَيْدِىْ শব্দটির অর্থ হলো নিয়ামতসমূহ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের নসিহতসমূহ, শরিয়তের বিধানসমূহ এবং ওহি অর্থাৎ তারা নবী-রাসূলগণের বিধি-নিষেধ এবং তাদের শরিয়তকে তাদের মুখের উপর ফিরিয়ে দিয়েছে তথা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। মুজাহিদ এবং কাতাদা (র.) এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রবাদ বাক্য আছে যে, "আমি তার কথা তার মুখের উপর ফেরত দিয়েছি" অর্থাৎ তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছি। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা নিজেদের ভাষায় আম্বিয়ায়ে কেরামের বিধি-নিষেধকে অস্বীকার করেছে এবং নবী-রাসূলগণের নসিহত সমূহকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২৮৭-৮৮]

আলোচ্য বাক্য দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণের বক্তব্য শ্রবণ করে কাফেররা অত্যন্ত উত্তেজনায় নিজেদের মুখেই নিজের হাত কাটতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নবীর কথায় উত্তেজিত হয়ে নবী-রাসূলগণের মুখ বন্ধ করার জন্যে মুখের কাছে হাত নিয়ে তারা নীরব থাকতে সংকেত দেয়।

قَوْلُهُ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ : অর্থাৎ আর তারা বলে তোমরা যে বিধান নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।

যাহোক ভাগ্যাহত লোকেরা পয়গাম্বরগণের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তারা সে আহ্বানকে উপেক্ষা করে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বলে- وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান কর সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ রয়েছে তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণ বলেছেন- قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যাপারে সন্দেহ করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে কোনো প্রকার সন্দেহ হতেই পারে না। কোনো সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তথা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু তারা স্রষ্টার অস্তিত্বের ও একত্ববাদের জীবন্ত সাক্ষী।

قَوْلُهُ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আসমান জমিনের তিনিই স্রষ্টা। আকাশ-পাতালের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং যাবতীয় সুব্যবস্থার তিনিই প্রবর্তক। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদনদী এক কথায় সমগ্র বিশ্ব জগতের তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর অদৃশ্য মহাশক্তিই সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বত্র কার্যকর, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্ব গুণাকর। অতএব তাঁর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

قَوْلُهُ يَدْعُوْكُمْ : তিনিই আমাদেরকে প্রেরণ করে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তিনি পরম করুণাময়, তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়। তোমরা তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস কর, তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তিনি এজন্যে তোমাদেরকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতঃপূর্বে যা কিছু হয়েছে, যা কিছু তোমরা করেছ, এখনো যদি সেসব অন্যায়-অনাচার পরিত্যাগ করে তার দরবারে হাজির হও।

قَوْلُهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ : তিনি তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেবেন তথা তিনি তোমাদেরকে মাগফেরাতের দিকে ডাকেন। অথবা এর অর্থ হলো, তিনি তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করার জন্যে ডাকেন।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইসলাম সে সমস্ত গুনাহকে দূরীভূত করে যা মুসলমান হওয়ার পূর্বে কারো দ্বারা হয়ে থাকে। –[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের গুনাহসমূহ থেকে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো ইসলাম গ্রহণের কারণে সে গুনাহ মাফ হয়ে যায় যা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কীয় তথা হক্কুল্লাহ। কিন্তু হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক মাফ হয় না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন, কাফেরদেরকে মাগফেরাতের যে কথা বলা হয়েছে তা হলো ঈমানের শর্ত সাপেক্ষ তথা যদি ঈমান আনয়ন কর তবে পূর্বকৃত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى : আর তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়ে থাকেন। ঐ সময় আসা পর্যন্ত তোমাদের প্রতি আজাবকে ত্বরান্বিত করেন না।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, অতীত যুগে যেসব জাতিকে তাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণে ধ্বংস করা হয়েছে তা তাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণেই করা হয়েছে। যদি তারা ঈমান আনত তবে তাদের বয়স সুদীর্ঘ হতো এবং বয়স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করা হতো না।

قَوْلُهُ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا : অর্থাৎ কাফেররা নবী-রাসূলগণকে বলেছিল তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষই, তোমরা আসমানের ফেরেশতা নও, মানব জাতির ঊর্ধ্বে কিছু নও, বরং তোমরা আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের মানুষই, সৃষ্টিগত দিক থেকে, আকৃতিতে তোমরা আমাদেরই ন্যায়। এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করি? তোমাদের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ করার সিদ্ধান্তই করে থাকেন তবে এমন কাউকে প্রেরণ করতেন যে মানুষের চেয়ে উত্তম হতো।

قَوْلُهُ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا : মূলত তোমাদের উদ্দেশ্য হলো তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতামহের সনাতন ধর্ম থেকে বিরত রাখতে চাও। আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের পূজা করেছে তোমরা আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চাও। তোমরা তোমাদের দল বড় করতে চাও। যদি তবুও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী বলে দাবি কর তবে– فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ এমন কোনো প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণ ও প্রামাণ্য সনদ পেশ কর, যার দ্বারা তোমাদের নবুয়তের দাবি সত্য প্রমাণিত হয়। যাতে আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাসূল বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হই। কাফেররা নবীগণের সুস্পষ্ট মোজেজাকে অস্বীকার করে শুধু কলহ-দ্বন্দ্ব এবং জেদের বশবর্তী হয়ে ফরমায়েশী মোজেজা দাবি করে।

অনুবাদ :

١٣. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ لَتَصِيْرُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط دِيْنِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ .

১৩. সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শী হতে হবে। অতঃপর তাদেরকে [রাসূলগণকে] তাদের প্রতিপালক ওহি নাজিল করলেন। সীমালজ্ঘনকারীদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করব।

١٤. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ اَرْضَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ط بَعْدَ هَلَاكِهِمْ ذٰلِكَ النَّصْرُ وَاِيْرَاثُ الْاَرْضِ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ اَيْ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَخَافَ وَعِيْدِ بِالْعَذَابِ .

১৪. তাদের পর তাদের ধ্বংসের পর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই; তা অর্থাৎ সাহায্য ও পৃথিবীর উত্তরাধিকাররূপে নির্বাচিত করা তোমাদের জন্য যারা আমার অবস্থানকে অর্থাৎ আমার সম্মুখে তার অবস্থানকে ভয় করে এবং শাস্তি সম্পর্কিত আমার হুমকিরও ভয় রাখে।

١٥. وَاسْتَفْتَحُوْا اِسْتَنْصَرَ الرُّسُلُ بِاللّٰهِ عَلٰى قَوْمِهِمْ وَخَابَ خَسِرَ كُلُّ جَبَّارٍ مُتَكَبِّرٍ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَنِيْدٍ مُعَانِدٍ لِلْحَقِّ .

১৫. তারা বিজয় কামনা করল অর্থাৎ রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করলেন। প্রত্যেক উদ্ধত আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্যাপার অহংকারী বিরুদ্ধাচারী সত্যের মোকাবিলাকারী ব্যর্থ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

١٦. مِنْ وَّرَآئِهٖ اَيْ اَمَامِهٖ جَهَنَّمُ يَدْخُلُهَا وَيُسْقٰى فِيْهَا مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ هُوَ مَاءٌ يَسِيْلُ مِنْ جَوْفِ اَهْلِ النَّارِ مُخْتَلِطًا بِالْقَيْحِ وَالدَّمِ .

১৬. প্রত্যেকের সামনে রয়েছে وَرَاءَ এ স্থানে অর্থ তার সামনে। জাহান্নাম তাতে সে প্রবেশ করবে। এবং তাতে তাকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে। مَاءٌ صَدِيْد জাহান্নামির উপর হতে নির্গত পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত পানি।

١٧. يَتَجَرَّعُهُ يَبْتَلِعُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لِمَرَارَتِهٖ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ يَزْدَرِدُهُ لِقُبْحِهٖ وَكَرَاهَتِهٖ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ اَيْ اَسْبَابُهُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهُ مِنْ اَنْوَاعِ الْعَذَابِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهٖ بَعْدَ ذٰلِكَ الْعَذَابِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ قَوِيٌّ مُتَّصِلٌ .

১৭. এত তিক্ত হবে যে, এটা সে এক ঢোক এক ঢোক করে গিলবে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট হওয়ায় তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বদিক হতে তার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হবে অর্থাৎ নানা ধরনের শাস্তির দরুন মৃত্যুর সকল উপকরণ তার সমক্ষে হবে অথচ তারা মৃত্যু ঘটবে না। তার পিছনেও এ শাস্তির পরও রয়েছে কঠোর শাস্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠিন শাস্তি। يَتَجَرَّعُ অর্থ ঢোকে ঢোকে গলাধঃকরণ করবে। يُسِيْغُ অর্থ গিলবে।

١٨. مَثَلُ صِفَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ مُبْتَدَأٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ كَصِلَةٍ وَصَدَقَةٍ فِيْ عَدَمِ الْاِنْتِفَاعِ بِهَا كَرَمَادِ ن اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط شَدِيْدِ هُبُوْبِ الرِّيْحِ فَجَعَلَتْهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لَا يَقْدِرُوْنَ اَيْ الْكُفَّارُ مِمَّا كَسَبُوْا عَمِلُوْا فِي الدُّنْيَا عَلٰى شَيْءٍ ط اَيْ لَا يَجِدُوْنَ لَهُ ثَوَابًا لِعَدَمِ شَرْطِهِ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْهَلَاكُ الْبَعِيْدُ.

১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদেরকে উপমা বিবরণ হলো যে, তাদের সৎ কর্মসমূহ যেমন- আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, দান-সদকা ইত্যাদি কর্মসমূহ কোনো উপকারে না আসার ক্ষেত্রে ভস্মের মতো, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ডবেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়ে প্রক্ষিপ্ত বালুকণার ন্যায় হয়ে যায়। তা আর ধরতে পারে না কেউ। যা তারা অর্থাৎ কাফেররা অর্জন করে অর্থাৎ দুনিয়ায় যে আমল করে তারা কিছুই তাদের অধিকারে আসে না। অর্থাৎ আমল কবুল হওয়ার শর্ত ঈমান না থাকায় কোনো পুণ্যের ফল তারা পায় না। এটাই ভীষণ বিভ্রান্তি। বিরাট ধ্বংস। اَعْمَالُهُمْ এটা مَثَلُ বা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। كَرَمَادٍ এটা خَبَرٌ বা بَدَلٌ-এর বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مَثَلُ বা বিধেয়। يَوْمٌ عَاصِفٌ প্রচণ্ড গতির বাতাসের দিন।

١٩. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ يَا مُخَاطِبُ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ بَدَلَكُمْ.

১৯. হে উপস্থিত সম্বোধিতজন! তুমি কি দেখ না লক্ষ্য করা না تَقْرِيْر এ স্থানে اَلَمْ تَرَ অর্থাৎ বক্তব্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। যে, আল্লাহ যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? بِالْحَقِّ এটা خَلَقَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।

٢٠. وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ شَدِيْدٍ.

২০. আর এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য কঠিন নয়। عَزِيْز এ স্থানে অর্থ কঠিন।

٢١. وَبَرَزُوْا اَيْ الْخَلَائِقُ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ وَفِيْمَا بَعْدَهُ بِالْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهِ لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا الْاَتْبَاعُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا الْمَتْبُوْعِيْنَ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا جَمْعُ تَابِعٍ.

২১. তারা সকলে অর্থাৎ সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হবেই। بَرَزُوْا এ স্থানে ও পরবর্তী কতিপয় স্থানে বিষয়টির অবশ্যম্ভাব্যতা বুঝাতে مَاضِيْ বা অতীত কালবাচক ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হয়েছে। তখন যারা অহংকার করত তাদেরকে অর্থাৎ অনুসৃত নেতাদেরকে দুর্বলরা অনুসারীরা বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। تَبَعًا এটা تَابِعٌ-এর বহুবচন। অর্থ- অনুসারীবৃন্দ।

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ دَافِعُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط مِنَّ الْاُوْلٰى لِلتَّبْيِيْنِ وَالثَّانِيَةُ لِلتَّبْعِيْضِ قَالُوْا اَيِ الْمَتْبُوْعُوْنَ لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ط لَدَعَوْنَاكُمْ اِلَى الْهُدٰى سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ زَائِدَةٌ مَّحِيْصٍ مَلْجَاٍ .

তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে কিছুমাত্র উপকার করতে পারবে? আমাদের হতে তা প্রতিহত করতে পারবে? مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ এ مِنْ টি এ স্থানে بَيَانِيَةٌ বা বিবরণমূলক। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ مِنْ شَيْءٍ এ مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। তারা অর্থাৎ অনুসৃত নেতারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম হেদায়েতের দিকে আহ্বান করতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া বা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্পত্তি নেই। আশ্রয়স্থল নেই। مِنْ مَّحِيْصٍ এ স্থানে مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَتَصِيْرُنَّ : মুফাসসির (র.) لَتَعُوْدُنَّ -এর তাফসীর لَتَصِيْرُنَّ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এই যে, عَوْدٌ তথা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রথমে সেই অবস্থার উপর হওয়া জরুরি যার থেকে সে প্রত্যাবর্তন করবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নবীগণ প্রথমে স্বীয় উম্মতের দীনের উপর হয়ে থাকেন পরবর্তীতে তা থেকে ফিরে এসে সত্য দীনের উপর অবিচল থাকেন। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। নবীগণ প্রথম থেকেই সত্য দীনের উপর থাকেন।

উত্তর. উত্তরের সারমর্ম হলো এই যে, تَعُوْدُنَّ টা تَصِيْرُنَّ অর্থে হবে অর্থাৎ তোমরা আমাদের দীনের উপর হয়ে যাও।

قَوْلُهُ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ : এতে মুযাফ উহ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَدْخُلُهَا : يَدْخُلُهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, উহ্যের উপর يُسْقٰى -এর আতফ হয়েছে। যাতে করে فِعْل -এর উপর اِسْم -এর আতফ করা আবশ্যক না হয়ে যায় তথা عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْاِسْمِ।

قَوْلُهُ فِيْهَا : প্রশ্ন. فِيْهَا উহ্য মানার ফায়দা কি?

উত্তর. مَعْطُوْف যখন জুমলা হয়ে তখন তাতে একটি عَائِدٌ হওয়া আবশ্যক হয় যা مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর দিকে ফিরে।

قَوْلُهُ يَتَجَرَّعُهُ : অর্থাৎ يَتَكَلَّفُ

قَوْلُهُ يَزْدَرِدُهُ : اَلْاِزْدِرَادُ অর্থ হলো স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজতার সাথে কোনো বস্তু কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাওয়া।

قَوْلُهُ اَسْبَابُهُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْمَوْتِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাহান্নামের মৃত্যু হবে না। কেননা মৃত্যুর জন্য তো একটি কারণই যথেষ্ট হয়। এত গুলো কারণ বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন কি? এরপরও মৃত্যু আসবে না। এটা মৃত্যু না আসার দলিল।

قَوْلُهُ يُبْدَلُ مِنْهُ : এটা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর যে, মুবতাদা ও খবরের মধ্যে (اَعْمَالُهُمْ) দ্বারা فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ আবশ্যক হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

উত্তর. এটা فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ নয়; বরং সেটা مُبْتَدَأٌ হতে بَدَلٌ হয়েছে। আর بَدَلٌ টা مُبْدَلٌ مِنْهُ থেকে اَجْنَبِيٌّ হয় না।

قَوْلُهُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ : عَاصِفٌ-এর يَوْم-এর দিকে إِسْنَادٌ হওয়াটা مَجَازٌ রূপে হয়েছে। আর يَوْمٌ عَاصِفٌ টা نَهَارُهُ صَائِمٌ এবং لَيْلُهُ قَائِمٌ-এর অন্তর্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْأُوْلٰى لِلتَّبْيِيْنِ : অর্থাৎ مِنْ টা তার পরবর্তীতে আগত شَيْءٌ শব্দের বর্ণনার জন্য হয়েছে। বয়ান যা আল্লাহ তা'আলা শাস্তি مُبِيْنٌ অর্থাৎ شَيْءٌ-এর উপর مُقَدَّمٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ–

هَلْ اَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا بَعْضَ الشَّيْءِ هُوَ بَعْضُ عَذَابِ اللّٰهِ ـ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا অর্থাৎ কাফেররা তাদের রাসূলগণকে বলে, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব। অথবা তোমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে অবিচল থাক তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমরা তোমাদের সকলকে দেশান্তরিত করে ছাড়ব।

যখন কোনো সম্প্রদায় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং বিরোধীদের কাছে শক্তি-সামর্থ্য থাকে, এমন অবস্থায় দুশমনের হুমকি ধমকিতে প্রভাবান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে পরবর্তী বাক্যে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা যে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের নিকট ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দিলেন।

قَوْلُهُ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ : অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেব, এটি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী-রাসূলগণকে সান্ত্বনা যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক তারা কোনো দিনও তোমাদেরকেও বহিষ্কার করতে পারবে না, বরং তারাই দুনিয়া থেকে বহিষ্কৃত হবে।

قَوْلُهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ : অর্থাৎ আর কাফেরদেরকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ তা'আলার দুনিয়া শূন্য থাকবে না; বরং তোমাদেরকে তথা মু'মিনদেরকে আবাদ করা হবে। মূলত যারা শুধু আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে একথা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফেরদের ধ্বংস করা পর তোমাদেরকে সেখানে আবাদ করবেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ : অর্থাৎ আর আমার এ রহমত ও দান সে ব্যক্তির জন্যে যে আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজিরীকে ভয় করে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারকে যারা ভয় করে অথবা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে উচ্চারিত সতর্কবাণীকে ভয় করে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যখন কাফেরদের কোনো দলিল অবশিষ্ট রইল না তখন তারা নবীগণকে দেশ হতে বহিষ্কার করার ধমক দিতে লাগল। যেমন হযরত শুআইব (আ.)-এর জাতি বলেছিল যে, শহর থেকে তোমাদেরকে বের করে দেব। আর মক্কার পৌত্তলিকরাও প্রিয়নবী ﷺ -এর ব্যাপারে এ কুপরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিল। তারা বলেছিল, তাকে বন্দী কর অথবা হত্যা কর অথবা দেশত্যাগে বাধ্য কর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নিরাপদে রেখেছেন আর দুশমনদের সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, নবী-রাসূলগণের সম্মুখেই আল্লাহ তা'আলা তাদের দুশমনদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং মহা সাফল্য মু'মিনদেরকেই দান করেছেন।

قَوْلُهُ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ : অর্থাৎ যারা তাদের প্রতিপালকের নাফরমান হয় তাদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যেমন ভস্ম। ঝড়ের দিনে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবে আখেরাতের বাতাসেও তাদের আমলের ছাই-ভস্ম উড়ে যাবে। তাই আদের কোনো সৎকাজ আর থাকবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, তারা যেমন গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করেছে, গোলামের মুক্তিপণ আদায় করেছে কিন্তু এসব সৎকাজের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছিল না, তাই এর যে শুভ পরিণতি বা ছওয়াব তা তারা পাবে না। অথবা যেহেতু তারা তাদের দেবদেবীর নামে সৎকাজ করত আর তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিগুলো নিজেই অসহায় নিরুপায়, তারা পূজারীদেরকে কিছুই দিতে পারে না, তাই তাদের সৎকাজগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ছাই-ভস্মের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতএব, কাফেরদের সৎকাজের কোনো মূল্যই পরকালে তারা পাবে না। কেননা ঈমান ব্যতীত নেক আমল প্রাণহীন। তাই কোনো অবস্থাতেই তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কিয়ামতের দিন হবে নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব, এমনকি সর্বস্বান্ত। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে- لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা যা কিছুই করেছে কিয়ামতের দিন তার বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না তথা কোনো আমলেরই শুভ পরিণতি তারা পাবে না, কোনো নেক আমলের চিহ্নও তারা সেদিন দেখতে পাবে না।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : কোনো কাজকে সৎকাজ মনে করে করা এবং পরে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মূলত তা হলো- هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ অর্থাৎ সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়া।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ : অর্থাৎ হে রাসূল ! আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন ইচ্ছা আসমান-জমিন তৈরি করেছেন।

মূলত কাফেরদের ধারণা ছিল আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব। আবার জীবন কোথায়? আজাব ছওয়াব সবই কথার কথা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তার জবাব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজের ইচ্ছায়, নিজের শক্তিতে, নিজের পছন্দমতো আসমান-জমিনের ন্যায় বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা মানুষকেও তিনিই হাজির করা এবং তার ভালোমন্দ দিয়ে বিচার করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে আদৌ কঠিন নয়, এমনকি এর পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে নতুন জাতি সৃষ্টি করতে পারেন যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন তোমাদেরকে বিদায় করে নতুন মাখলুক আনতে পারেন তেমনি তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে হাজির করতে পারেন।

قَوْلُهُ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ : আর এ কাজ আল্লাহ তা'আলার জন্যে আদৌ কঠিন নয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

অতএব, শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করা উচিত এবং তার প্রতিই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তার নিকটই ছওয়াবের আশা করা এবং তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করা উচিত।

قَوْلُهُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গাম্বরগণকে অস্বীকার করার শাস্তির উল্লেখ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার ভয়াবহ আজাব দেখার পর কাফেরদের পরস্পরের মাঝে যে কথাবার্তা হবে তার উল্লেখ রয়েছে।

কিয়ামতের দিন কাফেরদের আস্ফালন : কিয়ামতের দিন কাফেররা তাদের প্রধান নেতাদেরকে বলবে, পৃথিবীতে তোমরাই নেতৃত্ব দিয়েছ। আমরা তোমাদের নিকট হাজির হয়েছি, তোমরা যেভাবে বলেছ আমরা সেভাবেই কাজ করেছি, তাই আজকের এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে তোমরা আমাদেরকে কি কোনো সাহায্য করতে পারবে না? তখন কাফেরদের নেতারা বলবে, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আজাবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছি। এখন ধৈর্যহারা হলে কোনো লাভ হবে না। সবর অবলম্বন করলেও আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অতএব, আজ ধৈর্যহারা হওয়া বা ধৈর্যধারণ করা একই কথা।

এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেন, দোজখিরা সেদিন বলবে, দেখ মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দুনিয়াতে কান্নাকাটি করত। এজন্যে তারা জান্নাতবাসী হয়েছে। চল আমরাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করি। তখন তারা চিৎকার করে আহাজারী করবে। কিন্তু তাদের আহাজারী কোনো কাজে আসবে না। তখন তারা বলবে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে গমনের একটি কারণ হলো সবর অবলম্বন। তাই আমরাও সবর অবলম্বন করি এবং নীরবতা পালন করি। তখন তারা এমন সবর অবলম্বন করবে যা কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু এ সবরও তাদের জন্যে উপকারী হবে না। তখন আক্ষেপ করে তারা বলবে, হায়! সবরও কোনো কাজে আসল না। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) একথাও বলেছেন, নেতা এবং অনুসারীদের এসব কথা জাহান্নামে প্রবেশের পরে হবে।

যেমন অন্য আয়াতেও ইরশাদ হয়েছে– وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ অর্থাৎ যখন জাহান্নামে তারা পরস্পর কলহ করবে। তখন দুর্বল লোকেরা অহংকারী নেতাদেরকে বলবে, আমরা তো ছিলাম তোমাদের তাঁবেদার। যা কিছু করেছি সবই তোমাদের নির্দেশেই করেছি। এখনকি তোমরা দোজখের অগ্নি থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? তখন অহংকারী লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই এখন দোজখে আছি, বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এরপর তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে একথা বলে ফরিয়াদ করবে, হে পরওয়ারদেগার! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

তখন জবাব দেওয়া হবে, প্রত্যেককেই দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তোমরা তা জান না।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা, ১৩, পৃ. ৬৬]

قَوْلُهُ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ : অর্থাৎ অহংকারী লোকেরা তাদের অনুসারীদেরকে একথা বলে জবাব দেবে, যদি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আমাদের ঈমান নসিব হতো তবে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম, তাই তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছি। নিজের জন্যে যা আমাদের পছন্দনীয় ছিল, তোমাদের জন্যেও আমরা তাই পছন্দ করেছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে আমরা তোমাদেরকে দোজখের পাড়ে নিয়ে এসেছি, এখন যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আত্মরক্ষার কোনো পথ বাতলিয়ে দিতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সে পথের সন্ধান দিতাম, কিন্তু নাজাতের পথ আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২৯৫]

قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ : যখন আমাদের ব্যাপারে আজাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় আমরা অস্থির, ব্যাকুল এবং ধৈর্যহারা হই, অথবা সবর অবলম্বন করি উভয় অবস্থাই সমান, কোনো পন্থাই এখন আর উপকারী হবে না। পলায়নের বা আত্মরক্ষার কোনো পথই নেই।

এ বাক্যটি কাফের সর্দারদের, অথবা উভয়ের।

মোকাতেল (র.) বলেছেন, কাফেররা দোজখে ৫০০ বছর ধরে নাজাতের জন্যে ফরিয়াদ করবে, কিন্তু কোনো কিছুই উপকারী হবে না। এরপর তারা ৫০০ বছর সবর করবে, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হবে না। তখন তারা আলোচ্য বাক্যটি উচ্চারণ করবে- سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا অর্থাৎ আমরা অস্থির হই অথবা সবর করি, আমাদের নাজাতের কোনো পথ নেই।

ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদওয়াইহ হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোজখিরা বলবে- আস, আমরা সবর করি। [হয়তো আল্লাহ তা'আলা রহম করবেন] তাই তারা ৫০০ বছর ধরে সবর করবে। যখন এ পন্থায় কোনো ফল দেখবে না তখন তারা আলোচ্য বাক্যটি উচ্চারণ করবে।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কারজী বর্ণনা করেন, আমার নিকট এ বর্ণনা পৌছেছে যে, দোজখিরা দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের বলবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ আপন প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য ফরিয়াদ কর যেন অন্তত একটি দিন আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে আগমন করেননি? তখন দোজখিরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন।

তখন ফেরেশতাগণ বলবেন- اُدْعُوْا وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ কর। আর কাফেরদের ফরিয়াদ ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না।

যখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে- يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

অর্থাৎ হে মালেক! [দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতার নাম] তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে দেন, যেন আমরা এ আজাব থেকে পরিত্রাণ পাই। মালেক আশি বছর পর্যন্ত তাদের কোনো জবাব দেবে না। আশি বছরের প্রত্যেক বছরেই ৩৬০ দিনের হবে। আর প্রত্যেক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান হবে। এমনি আশি বছর পর তাদেরকে জবাব দেওয়া হবে, "তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে।"

তখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে, তারা একে অন্যকে বলবে, তোমাদের উপর যে বিপদ আসন্ন ছিল তা এসে গেছে, এখন হাহাকার আর্তনাদ করা নিরর্থক আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। হয়তো এর দ্বারা কোনো উপকার হতেও পারে। যেভাবে দুনিয়াকে আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে যারা সবর করেছিল এবং সকল দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিল, আজ তারা তার শুভ পরিণতি লাভ করছে।

যাহোক এভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সবরের পথ অবলম্বন করবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না। এরপর হাহাকার আর্তনাদ করতে থাকবে, কিন্তু তাতেও কোনো উপকার হবে না। তখন তারা আলোচ্য বাক্য উচ্চারণ করবে- سَوَآءٌ عَلَيْنَا অর্থাৎ আমরা অধৈর্য হই অথবা সবর অবলম্বন করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্যে সমান। আমাদের আত্মরক্ষার কোনো পথ নেই।

অনুবাদ :

٢٢. وَقَالَ الشَّيْطٰنُ اِبْلِيْسُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ وَاُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَاجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ فَصَدَقَكُمْ وَوَعَدْتُّكُمْ اَنَّهُ غَيْرُ كَائِنٍ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَائِدَةٌ سُلْطٰنٍ قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ اُقْهِرُكُمْ عَلٰى مُتَابَعَتِىْ اِلَّآ لٰكِنْ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْآ اَنْفُسَكُمْ ط عَلٰى اِجَابَتِىْ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ بِمُغِيْثِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ط بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ بِاِشْرَاكِكُمْ اِيَّاىَ مَعَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ط فِى الدُّنْيَا قَالَ تَعَالٰى اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُّؤْلِمٌ.

২২. যখন সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে জান্নাতিরা জান্নাতে ও জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামিরা শয়তানের নিকট একত্র হবে তখন শয়তান অর্থাৎ ইবলীস বলবে, আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে পুনরুত্থান ও প্রতিফল দান সম্পর্কে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য রূপায়িত করেছেন আর আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা হবে না কিন্তু তা রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না। مِنْ سُلْطٰنٍ এ مِنْ টি এ স্থানে زَائِدَة বা অতিরিক্ত। তোমাদেরকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করার মতো শক্তি ও ক্ষমতা ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম। اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ এ স্থানে اِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা আমার প্রতি দোষারূপ করো না। আমার ডাকে সাড়া প্রদানের জন্য তোমরা নিজেদেরকেই দোষারূপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই مُصْرِخٌ অর্থ- উদ্ধারকারী। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। مُصْرِخِىَّ-এর শেষে ى অক্ষরটি ফাতহা ও কাসরা উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। তোমরা পূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় আমাকে যে শরিক করেছিলে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে যে তোমরা আমাকেও অংশী বানিয়েছিলে তা আমি অস্বীকার করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য অর্থাৎ কাফেরগণের জন্য অবশ্যই মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি রয়েছে।

٢٣. وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ط تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَفِيْمَا بَيْنَهُمْ سَلٰمٌ.

২৩. যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও পরস্পরের মধ্যে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। خَالِدِيْنَ এটা حَال مُقَدَّرَة অর্থাৎ তাদের এ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

٢٤. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً اَىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ هِىَ النَّخْلَةُ اَصْلُهَا ثَابِتٌ فِى الْاَرْضِ وَفَرْعُهَا غُصْنُهَا فِى السَّمَاءِ ـ

২৪. তুমি কি দেখ না লক্ষ্য কর না আল্লাহ তা'আলা কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের كَلِمَةً এটা مَثَلًا-এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। অর্থাৎ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ অর্থাৎ তা খর্জুর বৃক্ষের মতো তার মূল ভূমিতে সুদৃঢ় ও তার শাখা-প্রশাখা ডালপালা আকাশে বিস্তৃত।

٢٥. تُؤْتِىْ تُعْطِىْ اُكُلَهَا ثَمَرَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط بِاِرَادَتِهٖ كَذٰلِكَ كَلِمَةُ الْاِيْمَانِ ثَابِتَةٌ فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَعَمَلِهٖ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنَالُهُ بَرَكَتُهُ وَثَوَابُهُ كُلَّ وَقْتٍ وَيَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

২৫. প্রতি মৌসুমে তা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তাঁর অভিপ্রায়ে ফল দান করে। تُؤْتِىْ অর্থ প্রদান করে। اُكُلَ ফল। কালিমায়ে তাওহীদও তদ্রূপ। মু'মিনদের হৃদয়ে এটার মূল সুপ্রোথিত আর তাদের সৎকর্মসমূহ আকাশে উত্থিত হয়। প্রতি মুহূর্তে এটার বরকত ও ছওয়াব মুমিন পায়। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে উপদেশ লাভ করে। অনন্তর ঈমান আনয়ন করে। يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ আল্লাহ তা'আলা উপমা দেন।

٢٦. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ هِىَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ نِ هِىَ الْحَنْظَلُ اجْتُثَّتْ اُسْتُؤْصِلَتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ مُسْتَقَرٍّ وَثُبَاتٍ كَذٰلِكَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ لَا ثُبَاتَ لَهَا وَلَا فَرْعَ وَلَا بَرَكَةَ ـ

২৬. মন্দ বাক্যের অর্থাৎ কুফরি কথার তুলনা এক নিকৃষ্ট বৃক্ষ অর্থাৎ হানযালা বা মাকাল গাছের মতো ভূমির উপরে যার মূল। এটার কোনো স্থায়িত্ব নেই এটা সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কুফরি কালিমাও তদ্রূপ। এটার কোনো দৃঢ়তা নেই, কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। কোনো বরকত বা কল্যাণও নেই। اُجْتُثَّتْ মূল ধারণ করে।

٢٧. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ هُوَ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج اَىْ فِى الْقَبْرِ لَمَّا يَسْاَلُهُمُ الْمَلَكَانِ عَنْ رَبِّهِمْ وَدِيْنِهِمْ وَنَبِيِّهِمْ فَيُجِيْبُوْنَ بِالصَّوَابِ ـ

২৭. যারা মুমিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত কথায় অর্থাৎ কালিমা তাওহীদে অবিচলিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের জীবনেও। অর্থাৎ কবরেও। যখন দুই ফেরেশতা এসে প্রতিপালক, ধর্ম ও নবী সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা সঠিক জবাব প্রদান করতে পারবে।

كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الشَّيْخَيْنِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ الْكُفَّارَ فَلَا يَهْتَدُوْنَ لِلْجَوَابِ بِالصَّوَابِ بَلْ يَقُوْلُوْنَ لَا نَدْرِىْ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.

শায়খান অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভ্রান্তিতে রাখবেন। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, তারা সঠিক জবাবে প্রদান করতে পারবে না বরং বলবে আমরা কিছুই জানি না। আর আল্লাহ তা'আলা তা করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَعْدَ الْحَقِّ : অর্থাৎ وَعْدًا مَنْ حَقُّهُ اَنْ يُنْجَزَ অর্থাৎ এরূপ অঙ্গীকার যে, যার হক এই যে, তাকে পুরা করা হবে। এবং اِلَى الْوَعْدِ الْحَقِّ –ও বলা যেতে পারে اِضَافَةُ مَوْصُوْفٍ اِلَى الصِّفَةِ

قَوْلُهُ لٰكِنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ হলো مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ কেননা دُعَاء টা سُلْطَان -এর جِنْس -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ بِالْفَتْحِ : অর্থাৎ مُصْرِخِىَّ -এর মধ্যে يَاء তে যবর ও যের উভয় কেরাতই রয়েছে। যবর হলো تَخْفِيْف -এর জন্য, আর যের হলো আসলের অনুপাতে। مُصْرِخٌ হলো বাবে اِفْعَالٌ -এর اِصْرَاخٌ মাসদার হতে اِسْم فَاعِل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ অর্থ হলো– সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী, ফরিয়াদে সারা দানকারী। اِصْرَاخٌ -এর অর্থের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। তথা সাহায্যকারী ও সাহায্যপ্রার্থী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ : অর্থাৎ مُقَدَّرِيْنَ خُلُوْدُهُمْ এখানে خَالِدِيْنَ টা جَنّٰت থেকে حَالٌ হয়েছে। জান্নাতের অস্তিত্ব হলো ذُو الْحَالِ আর জান্নাতে প্রবেশ করা পরে হবে। বুঝা গেল যে, حَالٌ এবং ذُو الْحَالِ -এর যুগ এক নয়। অথচ حَالٌ এবং ذُو الْحَالِ মুকাদ্দাম -এর যুগ এক হওয়া জরুরি। উত্তর এই যে, এটা حَال مُقَدَّرَة হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدَّرِيْنَ خُلُوْدُهُمْ

قَوْلُهُ تُعْطِىْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تُؤْتِىْ টা اِيْتَاءٌ হতে এসেছে اِتْيَانٌ থেকে নয়।

قَوْلُهُ اُجْتُثَّتْ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِجْتِثَاثٌ মাসদার হতে مَاضِى مَجْهُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো– তাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ : অর্থাৎ যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকার করেছেন তা ছিল সত্য, আর আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা ছিল মিথ্যা। এতদ্ব্যতীত তোমাদের উপর আমার তো কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে [মন্দকাজের দিকে] আহ্বান করেছি, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। অতএব, আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরকেই তিরস্কার কর।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন সব বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে তথা বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখিরা দোজখে প্রবেশ করবে, তখন দোজখিরা ইবলিস শয়তানকে বলবে, তোর কারণেই আজকে আমাদের এই বিপদ, তোর অনুসরণ করেই আজ আমাদের এ সর্বনাশ হয়েছে। অতএব যদি সম্ভব হয় তবে কোনো ব্যবস্থা কর, যাতে করে আমরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। তখন শয়তান বলবে, তোমরা আমকে অযথাই দোষারূপ করছ, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তোমাদের নিকট বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, তাদের মাধ্যমে ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতি তথা চিরশান্তি লাভের কথা ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে কুফরি ও নাফরমানির শাস্তির ব্যাপারেও নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ঘোষণা করেছিলেন সবই সত্য, আর এ সত্যতার প্রমাণ আজ তোমরা স্বচক্ষে দেখছ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমিও আমার ভূমিকা পালন করতে কসুর করিনি, মন্দকাজের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেছি, আমার আহ্বানের সত্যতার কোনো প্রমাণও আমার কাছে ছিল না। তোমরা একটু চিন্তা করলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারতে। কিন্তু তোমরা তা করনি, বরং আমার কথায় তোমরা যাবতীয় অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়েছ, আমি তোমাদেরকে কোনো দিনও কুফরি ও নাফরমানিতে বাধ্য করিনি এবং তেমন ক্ষমতাও আমার ছিল না। তাই তোমরা যা কিছু করেছ, তা স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, স্বশক্তিতেই করেছ। আমি একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করব না যে, অন্যায়ের পথে তথা সর্বনাশের পথে তোমাদেরকে আমি আহ্বান করেছি, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ, তোমরা আমার আহ্বানের পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করনি, নিতান্ত ভক্ত অনুরক্তের ন্যায় তোমরা আমার অনুসরণ করেছ। তোমরা যদি ভেবে দেখতে তবে আমার তাবেদার হতে না। তোমাদের কুফরি ও নাফরমানির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

–[তাফসীরে তাবারী, খ. ১৩, পৃ. ১৩৩]

ইবলিসের এসব কথা দোজখিদের মনে নিজেদের উপরই ঘৃণা সৃষ্টি হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, আজ তোমাদের প্রতি তোমাদের যে ঘৃণা রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ছিল, তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের আহ্বান করা হচ্ছিল তখন তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দাওনি; বরং ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে।

এ ঘোষণা শুনে দোজখিরা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কথার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করেছি, এখন যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে পুনরায় ফেরত পাঠাও আমরা সৎকাজ করব। আমাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির প্রতিবাদে ইরশাদ করবেন– وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের প্রত্যেককে হেদায়েত করতাম।

দোজখিরা পুনরায় ফরিয়াদ করবে, আমরা বিধি-নিষেধ মেনে চলব, নবী-রাসূলগণকে মেনে চলব, আমাদেরকে সামান্য অবকাশ দান করুন।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়– رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়াদেগার! আমাদেরকে অল্প সময়ের জন্যে অবকাশ দিন।

আল্লাহ তা'আলা জবাবে ইরশাদ করবেন– أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ অর্থাৎ তোমরা কি ইতঃপূর্বে শপথ করে বলনি যে, আমাদের বিনাশ নেই।

অতঃপর পুনরায় তারা ফরিয়াদ করবে– رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা ইতঃপূর্বে যে কাজ করেছি, তেমন কাজ না, বরং অন্য প্রকার কাজ করব।

আল্লাহ তা'আলা প্রতি উত্তরে ইরশাদ করবেন- أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ অর্থাৎ তোমাদের কি আমি এমন জীবন দান করিনি যাতে কোনো উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শক পৌঁছেনি?

কিছুক্ষণ পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ অর্থাৎ আমার বিধানসমূহ কি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়নি? যা তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে। একথা শ্রবণ করে দোজখিরা বলবে, আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের প্রতি আর কখনো দয়া করবেন না? এরপর চিৎকার করে বলবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল, আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এবার আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন, যদি আমরা দ্বিতীয়বারও মন্দ কাজ করি তবে নিশ্চয়ই আমরা জালেম বলে বিবেচিত হবো।

قَوْلُهُ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ : অর্থাৎ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক, আমার সাথে কথা বলো না। তখন দোজখিরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে এবং ফরিয়াদ করার এ ব্যবস্থাও শেষ হয়ে যাবে। পরস্পর তারা কাঁদতে থাকবে এবং দোজখের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২৯৬-৯৭]

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদওয়াইহ, বগভী, তাবারানী, ইবনুল মোবারক (র.) হযরত আকাবা ইবনে আমের (রা.) -এর সূত্রে লিখেছেন, হুজুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আগের পরের সকলকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করবেন, তখন ঈমানদারগণ বলবেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন, এখন এমন কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের সুপারিশ করতেন, তখন লোকেরা বলবে, এ কাজ হযরত আদম (আ.) করতে পারবেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে তাঁকে তৈরি করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন। লোকেরা তখন হযরত আদম (আ.)-এর কাছে হাজির হয়ে সুপারিশের জন্যে তাঁকে অনুরোধ করবে। হযরত আদম (আ.) বলবেন, তোমরা হযরত নূহ (আ.)-এর নিকট যাও। লোকেরা তাঁর নিকট যাবে, কিন্তু হযরত নূহ (আ.) বলবেন, তোমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট যাও। লোকেরা যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট যাবে, তখন তিনি বলবেন, তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট যাও, আর হযরত মূসা (আ.) বলবেন, তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যাও, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যখন লোকেরা হাজির হবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে ঠিকানা দিচ্ছি, তোমরা উম্মী আরবি নবী তথা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর ﷺ -এর নিকট যাও, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অবশেষে লোকেরা আমার নিকট হাজির হবে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে দণ্ডায়মান হয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। এরপর আমার মজলিশ অসাধারণ সুগন্ধি দ্বারা মোহিত করা হবে যা ইতঃপূর্বে কোনোদিন কেউ পায়নি। এরপর আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হয়ে সুপারিশ করব। আল্লাহ তা'আলা আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং আমার মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের আঙুলের নখ পর্যন্ত নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন।

এ অবস্থা দেখে কাফেররা বলবে, মুসলমানগণ সুপারিশকারী পেয়ে গেছেন, আমাদের জন্য কে সুপারিশ করবে। তখন নিজেরাই বলবে, এখনো তা ইবলিসই রয়েছে যে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তখন তারা ইবলিসের নিকট গিয়ে বলবে, মু'মিনদের জন্যে তো সুপারিশকারী রয়েছে, এখন তুমি আমাদের জন্যে সুপারিশ কর, কেননা তুমিই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে। যখন ইবলিস দাঁড়াবে, তখন এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যা ইতঃপূর্বে কেউ কোনোদিন পায়নি। তখন ইবলিস তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাবে।

মূলত সে সময়ের কথাটিই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ইবলিস তখন কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল সত্য, আর আমি তোমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা ছিল মিথ্যা। আর তোমাদের উপর আমার তেমন কোনো ক্ষমতাও ছিল না। আমি শুধু তোমাদেরকে মন্দকাজের দিকে আহ্বান করেছিলাম, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে, অতএব, তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, বরং নিজেদেরকেই তিরস্কার কর।"

مَآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط

"এখন আমি তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করে তোমাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারব না, আর তোমরাও আমার পক্ষে সুপারিশ করে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

إِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ

"এতদ্ব্যতীত ইতঃপূর্বে তোমরা যে আমকে আল্লাহ তা'আলার শরিক করতে, আমি তাতে আমার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। তোমাদের এ অপকর্মে আমি সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট।"

إِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

"নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

যে কথা কিয়ামতের দিন হবে তার উল্লেখ করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বাবাসীকে পরিণামদর্শী হওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্যে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির জন্যে সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করছে। যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সবকিছু মনে করছে, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির সকল সংগ্রহ করছে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।

قَوْلُهُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাই-ভস্মের মতো, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্র করে কোনো কাজ নিতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়, তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মু'মিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায় এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়- সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীরে অভ্যন্তরে পৌঁছাও সুবিধিত। এর ফলও সবসময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাটনি আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়। এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তুসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এর আঁটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়- সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হানযল [মাকাল] বৃক্ষ।

–[তাফসীরে মাযহারী]

মুসনাদে আহমদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে মু'মিনের দৃষ্টান্ত। [বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এ স্থলে তিনি আরো বললেন যে, কোনো ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।] বল, এ কোন বৃক্ষ? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমার মনে চাইল যে, বলে দেই খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে হযরত আবূ বকর, ওমর (রা.) অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়েবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড়বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মু'মিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবিলায় জানমাল ও কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূপৃষ্ঠের ময়লা ও আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দুটি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চ ধাবমান, মু'মিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলে– إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ অর্থাৎ পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আল্লাহ তা'আলার যেসব জিকির, তাসবীহ, তাহলীল, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি করে সেগুলো সকাল-বিকাল আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌঁছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সবসময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, উঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ বাক্যে اُكُلٌ শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حِيْنٍ শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারো কারো অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত : এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালিমায়ে তাইয়েবার অর্থ যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালিমায়ে খবীসার অর্থ কুফরি বাক্য ও কুফরি কাজকর্ম। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে شَجَرَةٌ خَبِيْثَةٌ অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কুরআনে এ খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশি যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা এর আসল অর্থ কোনো বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরদের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি– ১. কাফেরের ধর্মবিশ্বাসের কোনো শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড় হয়ে যায়। ২. দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ৩. বৃক্ষের ফলমূল অর্থাৎ কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফলদায়ক নয়।

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া : এরপর মু'মিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়েবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ মু'মিনের কালেমায়ে তাইয়েবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ কবর জগৎ বুঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কবরে মু'মিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহ তা'আলা সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ' সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -এর উদ্দেশ্য তা-ই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুঞ্জিকা اَلتَّثْبِيْتُ عِنْدَ التَّبْيِيْتِ এবং شَرْحُ الصُّدُوْرِ -এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আজাব ও ছওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে ছওয়াব অথবা আজাব হওয়ার বিষয়টি কুরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এ ছওয়াব ও আজাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোনো বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জীন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতঃপূর্বে তা কারো দৃষ্টিগোচর হতো না, কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোনো বিপদে পতিত হয়ে বিষম কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রাসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌছার পর এ আজাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালেম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা একপ্রকার আজাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন। তার ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায় এরূপ কোনো শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) প্রমুখ সাহাবী বলেন, মু'মিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তারা আরো বলেন, যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

অনুবাদ :

٢٨. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اَىْ شُكْرَهَا كُفْرًا هُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَّاَحَلُّوْا اَنْزَلُوْا قَوْمَهُمْ بِاِضْلَالِهِمْ اِيَّاهُمْ دَارَ الْبَوَارِ الْهَلَاكِ ـ

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখ না লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে অর্থাৎ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অকৃতজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তিত করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করত ধ্বংসের ক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছে? তারা কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফেরগণ। اَحَلُّوْا নামিয়ে এনেছে اَلْبَوَارِ ধ্বংস।

٢٩. جَهَنَّمَ عَطْفُ بَيَانٍ يَصْلَوْنَهَا ط يَدْخُلُوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ الْمَقَرُّ هِىَ ـ

২৯. জাহান্নামে যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। جَهَنَّمَ এটা عَطْف بَيَان বা বিবরণমূলক অন্বয়। يَصْلَوْنَهَا অর্থ তাতে প্রবেশ করবে। اَلْقَرَارُ এ স্থানে অর্থ مَقَرٌّ বা অবস্থানস্থল।

٣٠. وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا شُرَكَاءَ لِيُضِلُّوْا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيْلِهِ ط دِيْنِ الْاِسْلَامِ قُلْ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا بِدُنْيَاكُمْ قَلِيْلًا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ مَرْجِعَكُمْ اِلَى النَّارِ ـ

৩০. তারা আল্লাহ তা'আলার শরিক اَنْدَادً অর্থ– শরিক। উদ্ভাবন করে তাঁর পথ অর্থাৎ দীন ইসলাম হতে বিভ্রান্ত করবার জন্য لِيُضِلُّوْا এটার ى-এ ফতাহ ও পেশ উভয় হরকতসহ পাঠ করা যায়। তাদেরকে বল, তোমরা দুনিয়ার সামান্য কিছু ভোগ করে নাও। কেননা অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। مَصِيْرَ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

٣١. قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِدَاءٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ مُخَالَةٌ اَىْ صَدَاقَةٌ تَنْفَعُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ـ

৩১. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে বল, সালাত কায়েম করবে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়বিক্রয় মুক্তিপণ ও বন্ধুত্ব অর্থাৎ এমন বন্ধুত্ব যা উপকারে আসবে তা থাকবে না। এটা হলো কিয়ামতের দিন। خِلَالٌ অর্থ বন্ধুত্ব।

٣٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ السُّفُنَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِالرُّكُوْبِ وَالْحَمْلِ بِاَمْرِهٖ بِاِذْنِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ـ

৩২. আল্লাহ তা'আলা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর তা দ্বারা তোমাদেরকে জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, আর নৌকাসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। اَلْفُلْكَ অর্থ– নৌযানসমূহ। সেগুলো তাঁর নির্দেশে তার অনুমতিক্রমে আরোহী ও মালপত্রসহ সমুদ্রে বিচরণ করে। আর তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন নদীসমূহ।

٣٣. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ج جَارِيَيْنِ فِيْ فَلَكِهِمَا لَا يَفْتَرَانِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوْا فِيْهِ مِنْ فَضْلِهِ.

৩৩. তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যা একই অবস্থায় চলেছে। অর্থাৎ স্ব-স্ব কক্ষপথে অবিরাম ক্লান্তিহীন একই রূপে ছুটে চলেছে। আর তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রিকে তাতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং দিবসকে তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অন্বেষণের জন্য।

٣٤. وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط عَلٰى حَسْبِ مَصَالِحِكُمْ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ بِمَعْنٰى اِنْعَامِهِ لَا تُحْصُوْهَا ط لَا تُطِيْقُوْا عَدَّهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ كَثِيْرُ الظُّلْمِ لِنَفْسِهِ بِالْمَعْصِيَةِ وَالْكُفْرِ لِنِعْمَةِ رَبِّهِ.

৩৪. এবং তোমাদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু তোমরা কামনা করেছ তিনি তোমাদেরকে তা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যদি গণনা কর তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। তা গণনা করতে সক্ষম হবে না। মানুষ অথাৎ কাফেরগণ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী, অর্থাৎ অবাধ্যাচার করত নিজের উপরই সে অন্যায় করে [অকৃতজ্ঞ] অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। نِعْمَتَ এটা এ স্থানে اِنْعَامٌ [অনুগ্রহ প্রদর্শন] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ شُكْرَهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই যে, بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ এটা كُفْرًا-এর অর্থে হয়েছে যে, সে সকল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে كُفْر দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। অথচ নিয়ামত হলো عَيْن আর কুফর হলো وَصْف আর عَيْن-কে وَصْف দ্বারা পরিবর্তনের কোনো অর্থ হয় না?

উত্তর. এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, নিয়ামতের শোকরকে নাশোকরি দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

قَوْلُهُ لِيُضِلُّوْا : প্রশ্ন. جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا-এর উদ্দেশ্য اِضْلَالٌ এবং ضَلَالٌ-কে বলেছেন। অথচ শরিক স্বীকৃতি দেওয়ার দ্বারা কাফেরদের উদ্দেশ্য اِضْلَالٌ এবং ضَلَالٌ ছিল না।

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, اِضْلَالٌ এবং ضَلَالٌ যদিও اَنْدَادٌ-এর উদ্দেশ্য নয় তবে নতিজা সুনিশ্চিত। এ কারণেই নতিজাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ : প্রশ্ন. يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ الخ-এর مَقُوْلَة হওয়া বৈধ নয়। কেননা اِقَامَتَ صَلٰوة বা নামাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্বোধিতগণের কর্ম বক্তার বক্তব্য নয়। অথচ مَقُوْلَة-এর জন্য বক্তার বক্তব্য হওয়াই জরুরি।

উত্তর. قُلْ-এর مَقُوْلَة উহ্য রয়েছে। আর جَوَاب اَمْر যা হলো يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ উহ্যের উপর বুঝাচ্ছে। উহ্য ইবারত এরূপ যে, قُلْ لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفِقُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا, مَقُوْلَه اَمْر হলো কেউ কেউ বলেন যে, উহ্য ইবারত হলো এই যে, قُلْ لَهُمْ لِيُقِيْمُوْا الخ আর قُلْ-এর দালালতের কারণে لَام-কে উহ্য করে দেওয়া হয়েছে, ফলে يُقِيْمُوْا হয়েছে। আর যদি শুরুতেই উহ্যের সাথে يُقِيْمُوْا-কে مَقُوْلَه বলা হয় তবে তা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً : উভয়টি اَنْفِقُوْا আমরের যমীর হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ يُنْفِقُوْنَ مُسِرِّيْنَ وَمُعْلِنِيْنَ

قَوْلُهُ السُّفُنَ : এ শব্দটি اُسُدٌ ওজনে বহুবচন এ কারণেই تَجْرِىْ ফে'লকে مُؤَنَّثْ নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ دَائِبَيْنِ : এক রীতির বিচরণকারী। এটা دَائِبٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ– অবস্থা, অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ, রীতি ইত্যাদি। বাবে فَتَحَ হতে মাসদার دَأْبٌ অর্থ হলো লাগাতারভাবে কোনো কাজে লেগে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ : শানে নুযূল : এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফের প্রধানদের সম্পর্কে। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! এ আয়াত নাজিল হয়েছে কুরাইশদের দলপতিদের সম্পর্কে। আরবদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব তখন তাদের হাতেই ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েতের জন্য, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য, তাদের এ জীবন ও পরজীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্য অনেক ব্যবস্থা করেছেন, যেমন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তাদেরকে পবিত্র কাবা শরীফের প্রতিবেশী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন, সারা আরবের নেতৃত্ব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন। তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামতসমূহের জন্যে শোকরগুজার হওয়া তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করা।

কিন্তু হতভাগা কাফের প্রধানরা আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত নিয়ামতের জন্যে শোকরগুজারির স্থলে তাঁর অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূলের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তা'আলার কুরআনকে অবিশ্বাস করে, তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি কি দেখেননি? যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে পরিবর্তন করেছে নাশোকরী ও নাফরমানি দ্বারা।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতার স্থলে তারা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাঁর নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা যেন নিয়ামতের স্থলে নাশোকরী ও অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে অকৃতজ্ঞ লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল মক্কার কুরাইশ। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত যাঁকে বলা হয়েছে তিনি হলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে মক্কার যেসব কুরাইশ সর্দার নিহত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র মক্কা মুয়াযযমায় অবস্থানের তৌফিক দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তাদেরকে দান করেন, তারা নিশ্চিন্ত মনে মক্কায় জীবনযাপন করেছিল। যখন আবরাহা বাদশাহ তার হস্তীবাহিনী

নিয়ে মক্কা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিশ্চহ্ন করে দিয়েছিলেন। মক্কাবাসীর রিজিকের দুয়ার তিনি খুলে দিয়েছিলেন। সিরিয়া এবং ইয়েমেনে শীত এবং গ্রীষ্মে সফর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা তাদের যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। কিন্তু তারা এ সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার স্থলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূলের পরম দুশমন হয়ে গেছে। মূলত তারা হেদায়েত ছেড়ে দিয়ে গোমরাহির পথ বেছে নিয়েছে। অবশেষে তারা সাত বছরের দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং বদরের দিন বন্দী হয়, নিহত হয়, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। আমৃত্যু আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

ইমাম রাজী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন,

প্রথমত কাফেররা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকরকে নাশোকরীতে পরিবর্তন করেছে, কেননা আল্লাহ তা'আলার অসীম নিয়ামতের কারণে তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল আল্লাহ তা'আলার শোকরগুজার হওয়া, কিন্তু তারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, নাফরমান হয়েছে, তাই তারা শোকরকে নাফরমানিতে পরিবর্তন করেছে।

দ্বিতীয়ত তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে কুফরি ও নাফরমানিতে পরিবর্তন করেছে। কেননা তারা যখন কুফরি করেছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাদের নিকট নিয়ামতের পরে কুফরই রয়ে গেছে।

তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি নিয়ামত স্বরূপ রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তার নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। কিন্তু এই হতভাগার দল ঈমানের বদলে কুফরিকে গ্রহণ করেছে। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৯, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوْا الخ : সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রেসালাত, নবুয়ত ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছিল। এরপর তাওহীদের ফজিলত, কালেমায়ে কুফর ও শিরকের নিন্দা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ধিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা ও কুফরির পথ বেছে নিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা : اَنْدَادٌ শব্দটি نِدٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ- সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে اَنْدَادٌ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تَمَتُّعٌ শব্দের অর্থ কোনো বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক। তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে, [মক্কার কাফেররা তো আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে কুফরি দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে। আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামাজ কায়েম করুক এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মানদানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামাজ কায়েম করুক। নামাজের সময়ে অলসতা এবং নামাজের সুষ্ঠু নিয়মাবলিতে ক্রটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেন, ফরজ জাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত যাতে অন্যরও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত, যাতে রিয়া বা নাম-যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়ামতের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফজিলত খতম হয়ে যায়। ফরজ হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরজ ও নফল উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ وَّلَا خِلَالٌ : এখানে خِلَالٌ শব্দটি خُلَّةٌ-এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে بَاب مُفَاعَلَة-এর ধাতুও বলা যায়। যেমন- قِتَالٌ ও دِفَاعٌ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু-ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামাজ ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ তা'আলা নামাজ পড়ার এবং গাফলতিবশত বিগত জমানার না পড়া নামাজের কাজা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকাপয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায়ত্তে রয়েছে। একে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন এ দুটি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামাজ পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোনো টাকা পয়সা থাকবে না, যা দ্বারা কারো পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোনো কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোনো কাজে আসবে না। কোনো প্রিয়জন কারো পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আজাব কোনোরূপে হটাতে পারবে না।

ঐদিন বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারো দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারো মালিকানায় টাকাপয়সাও থাকে না।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন কারো বন্ধুত্ব কারো কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না। কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনো উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে- اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা পরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পরে শত্রু হয়ে যাবে। তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলার সত্তাই হলো যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের উপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিজিক হতে পারে। ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ -এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثَمَرَةٌ বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ সবই ثَمَرَاتٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رِزْقٌ শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এক আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سَخَّرَ শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা, লক্কড়, নৌকা তৈরির হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কর্তার গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনোটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এ আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরি নয়।

এরপর বলা হয়েছে– আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে। دَائِبَيْنِ শব্দটি دَأْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দুটি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু-ঘণ্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ দিনের কাজ বেশি। তাই আল্লাহ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জির অধীন। এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ তা'আলার দান ও পুরস্কার কারো চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপার চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন–

ما نبوديم وتقاضا ما نبود

لطف تو نا گفته ما مى شنود

অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোনো তাকিদও ছিল না। তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা আকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করেছে।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাজি বায়যাভী (র.) এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ মানুষ সাধারণত যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোনো না কোনো উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত সূক্ষ্ম, নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদাই কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কূল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ প্রত্যেক কষ্ট, প্রত্যেক বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নিয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা কারো দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরি হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন– اَلْاٰنَ قَدْ شَكَرْتَ يَا دَاوٗدُ অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ অর্থাৎ মানুষ খুবই জালেম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা। একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মু'মিনের গুণ صَبَّارٌ ও شَكُوْرٌ [অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী] ব্যক্ত হয়েছে।

অনুবাদ :

٣٥. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ مَكَّةَ اٰمِنًا ذَا اَمْنٍ وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ تَعَالٰى دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفَكُ فِيْهِ دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهِ اَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ وَّاجْنُبْنِيْ بَعِّدْنِيْ وَبَنِيَّ عَنْ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ .

৩৫. আর স্মরণ কর ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে অর্থাৎ মক্কা নগরীকে নিরাপদ কর। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেছিলেন। এ নগরীকে তিনি 'হারাম' বলে নির্ধারণ করেছেন। কোনো মানুষের রক্ত সে স্থানে প্রবাহিত করা যায় না, কারো উপর জুলুম করাও বৈধ নয়। তাতে কোনো প্রাণী শিকার করা বা তার ঘাস উৎপাটন করারও অনুমোদন নেই। আরো বলেছিলেন, আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রেখ। اُجْنُبْنِيْ অর্থ আমকে দূরে রেখ। اَنْ نَّعْبُدَ এটার পূর্বে একটি عَنْ [হতে] শব্দ উহ্য রয়েছে।

٣٦. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَيِ الْاَصْنَامُ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ج بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا فَمَنْ تَبِعَنِيْ عَلَى التَّوْحِيْدِ فَاِنَّهُ مِنِّيْ مِنْ اَهْلِ دِيْنِيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ هٰذَا قَبْلَ عِلْمِهِ اَنَّهُ تَعَالٰى لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ .

৩৬. হে আমার প্রতিপালক! তারা অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ বহু মানুষকে তাদের উপাসনা করার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করেছে। তাওহীদ অবলম্বনের ক্ষেত্রে যে তার অনুসরণ করবে সে আমার অর্থাৎ আমার আদর্শভুক্ত আর কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ক্ষমা করবেন না, একথা জানবার পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দোয়া করেছিলেন।

٣٧. رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ اَيْ بَعْضَهَا وَهُوَ اِسْمٰعِيْلُ مَعَ اُمِّهِ هَاجَرَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ هُوَ مَكَّةُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الَّذِيْ كَانَ قَبْلَ الطُّوْفَانِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً قُلُوْبًا مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ تَمِيْلُ وَتَحِنُّ اِلَيْهِمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ قَالَ اَفْئِدَةَ النَّاسِ لَحَنَّتْ اِلَيْهِ فَارِسُ وَالرُّوْمُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ اِلَيْهِ .

৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে مِنْ ذُرِّيَّتِيْ এ مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে বসবাস করালাম এক অনুর্বর উপত্যকায় মক্কায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট যে গৃহ হযরত নূহের প্লাবনের পূর্বে ছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। তুমি কতক মানুষের হৃদয় اَفْئِدَةً হৃদয়সমূহ। তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও مِنَ النَّاسِ এ স্থানে مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, مِنَ না বলে যদি اَفْئِدَةُ النَّاسِ [সকল মানুষের হৃদয়] বলা হতো তবে পারস্য, রোম সকল দেশের মানুষই তার প্রতি অনুরাগী ও আগ্রহী হয়ে পড়ত। تَهْوِيْ অনুরক্ত ও আগ্রহী হওয়া। এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তায়েফ অঞ্চলটিকে এস্থানে স্থানান্তর করত এই কাজও তিনি করে দিয়েছিলেন।

٣٨. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى أَوْ كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ.

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি অবশ্যই জানেন যা আমরা গোপন করি আর যা আমরা প্রকাশ করি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন থাকে না। مَا نُخْفِي যা আমরা গোপন করি। وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ এ বক্তব্যটি আল্লাহরও হতে পারে বা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরও হতে পারে। مِنْ شَيْءٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٣٩. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي أَعْطَانِي عَلَى مَعَ الْكِبَرِ إِسْمٰعِيلَ وُلِدَ وَلَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سَنَةً وَإِسْحٰقَ وُلِدَ وَلَهُ مِائَةٌ وَثِنْتَا عَشَرَةَ سَنَةً إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল তাঁর জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল নিরানব্বই ও ইসহাককে তাঁর জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল একশত বারো বৎসর দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। وَهَبَ لِي আমাকে দান করেছেন। عَلَى الْكِبَرِ এ স্থানে عَلَى শব্দটি مَعَ [সত্ত্বেও] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٠. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِي مَنْ يُقِيمُهَا وَأَتَى بِمَا لِإِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالَى لَهُ أَنَّ مِنْهُمْ كُفَّارًا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ الْمَذْكُورَ.

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের কতককেও তা কায়েমকারী বানাও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার উক্ত প্রার্থনা কবুল কর। مِنْ ذُرِّيَّتِي আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কত কাফেরও হবে সেহেতু এ স্থানে তিনি দোয়ায় مِنْ تَبْعِيضِيَّة বা ঐকদেশিক مِنْ-এর ব্যবহার করেছেন।

٤١. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ هٰذَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ عَدَاوَتُهُمَا لِلّٰهِ وَقِيلَ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَقُرِئَ وَالِدِي مُفْرَدًا وَوَلَدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ يَثْبُتُ الْحِسَابُ.

৪১. হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব সংঘটিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা কর। তাঁর পিতামাতা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার দুশমন ছিলেন এ কথা জানার পূর্বে তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তার মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য এক কেরাতে وَالِدِي শব্দটি একবচন রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. সূরায়ে বাকারাতে بَلَدًا নাকেরাহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে اَلْبَلَدَ মারেফা। এতে কি হিকমত রয়েছে?

উত্তর. সূরা বাকারাতে নির্মাণের পূর্বে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ আপনি এখানে একটি শহর নির্মাণ করে দিন। আর এখানে যে দোয়া রয়েছে তা নির্মাণের পরে তা নিরাপদ শহরে পরিণত হওয়ার জন্য।

قَوْلُهُ ذَا أَمْنٍ : প্রশ্ন. أَمْنًا -এর তাফসীর ذَا أَمْنٍ দ্বারা করার মধ্যে কি উপকারিতা রয়েছে?

উত্তর. উত্তর এই যে, أَمْنٍ হলো নিসবতের সীগাহ اِسْم فَاعِل -এর সীগাহ নয়। যেমন– تَامِرٌ অর্থ হলো খেজুর বিক্রেতা أَمِنٌ অর্থ– নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নিরাপত্তাদাতা নয়। কেননা أَمِنٌ যা ইসমে ফায়েল নিরাপত্তাদাতা অর্থে বৈধ নয়। কেননা بَلَدٌ হলো প্রাণহীন নির্জিব এবং غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ কাজেই এতে নিরাপত্তা দেওয়ার যোগ্যতা নেই এবং أَمِنٌ -এর নিসবত بَلَدٌ -এর দিকে মুনাসিবও নয়। কেননা নিরাপত্তা দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাজ।

قَوْلُهُ يُخْتَلٰى : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اَلْاِخْتِلَاءُ মাসদার হতে। অর্থ হলো– সবুজ ঘাস ইত্যাদি উপড়ানো।

قَوْلُهُ اُجْنُبْنِىْ : এটা বাবে نَصَرَ হতে اَمْر -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرٌ -এর সীগাহ। মূলে ছিল اُجْنُبْ এর সাথে نُوْن رِقَايَة এবং يَائے مُتَكَلِّمْ সংযুক্ত হয়েছে। অর্থ– তুমি আমাকে বাঁচাও; তুমি আমাকে দূরে রাখ।

قَوْلُهُ عَنْ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ : এখানে عَنْ শব্দটি বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, اَنْ نَّعْبُدَ -এর মধ্যে اَنْ টা হলো مَصْدَرِيَة তাফসীরিয়্যাহ নয়। কেননা اَنْ تَفْسِيْرِيَّه -এর জন্য পূর্বে قَوْل বা তার সমার্থক শব্দ থাকা জরুরি, যা এখানে নেই।

قَوْلُهُ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا : اِضْلَالٌ -এর اِسْنَادٌ মূর্তিগুলোর দিকে مَجَازًا হয়েছে। এটা اِسْنَادُ الشَّئِ اِلٰى سَبَبِه -এর অন্তর্গত। যেহেতু এ মূর্তিগুলো মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণ, এজন্য ضَلَالٌ -এর নিসবত তারই দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَ الطُّوْفَانِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, عِنْدَ بَيْتِ الْمُحَرَّمِ বলা কিভাবে বৈধ হলো। যখন وَادِى غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ -এর মধ্যে কোনো ঘরই ছিল না।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো بَيْت বলা হয়তো مَا كَانَ -এর হিসেবে হয়েছে অথবা مَا يَكُوْنُ -এর হিসেবে অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনের পূর্বে তথায় ঘর ছিল ভবিষ্যতেও তা বিদ্যমান থাকবে।

قَوْلُهُ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ : ইসমাঈল এ কারণে নামকরণ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে দোয়া করতেন, তখন বলতেন اِسْمَعْ يَا اِيْلُ এখানে اِسْمَعْ হলো اَمْر অর্থ শ্রবণ কর আর اِيْل ইবরানী ভাষায় আল্লাহ তা'আলাকে বলা হয়। এখন اِسْمٰعِيْل অর্থ হলো– হে আল্লাহ শুন। আর যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া শুনে সন্তান দান করলেন তখন তিনি তার নাম اِسْمٰعِيْل রেখে দিলেন। আর اِسْحٰق ইবরানী ভাষায় اِضْحَاكٌ -কে বলা হয়।

قَوْلُهُ اِجْعَلْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ -এর আতফ اِجْعَلْنِىْ -এর ضَمِيْر مَنْصُوْب -এর উপর হয়েছে।

قوله من يقيمها : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِجْعَلْنِىْ -এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদের ব্যাপারে পয়গাম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আ.) করেছিলেন। এজন্যই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে হানীফ' বলা হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আরো একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ আয়াতে মক্কার ঐসব কাফেরদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানকে কুফরে এবং তাওহীদকে শিরকে রূপান্তরিক করেছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে তাদের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আকিদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফেররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত হয়। -[বাহরে মুহীত]

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষেই কুরআন পাকে পয়গাম্বরগণের কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি; বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্বর রাখার জন্য এসব ঘটনা বারবার কুরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুটি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া- رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এ [মক্কা] নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بَلَدُ শব্দটি لَامْ ও اَلِفْ ব্যতীত بَلَدًا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোনো গুনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তানসন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে মুহীত গ্রন্থে হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.)-এর বরাত দিয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি; বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হেরেম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হেরেমের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হেরেম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ [তওয়াফ] করত। এতে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনোরূপ ধারণা ছিল না; বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা যেমন আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এ পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পরিপন্থি মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে এ দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরি ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে– এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেননি। একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গাম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গাম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোনো কাফেরও যেন আজাবে পতিত না হয়। "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু" -একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ.)ও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন– وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ তা'আলার এ দুজন মনোনীত পয়গাম্বর কাফেরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেননি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থি। কিন্তু একথা বলেননি যে, কাফেরদের উপর আজাব নাজিল করুন; বরং আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

قَوْلُهٗ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতিমিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তাভাবনা বুঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং হযরত হাজেরা (আ.)-এর ঐসব বাক্য বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলার আদেশ শুনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরো বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোনো বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

قَوْلُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ : এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন। নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ.)-কে দান করেছেন।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান আপনিই তার হেফাজত করুন। অবশেষে إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান– رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য নামাজ কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতিমিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা! আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন– رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতাপিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কাফেরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে– وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার যথাবিহিত পদ্ধতি জানা গেল যে, বারবার কাকুতিমিনতি ও ক্রন্দন সহকারে দোয়া করা চাই এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে।

অনুবাদ :

٤٢. قَالَ تَعَالٰى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ط اَلْكَافِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ بِلَا عَذَابٍ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ لِهَوْلِ مَا تَرٰى يُقَالُ شَخَصَ بَصَرُ فُلَانٍ اَىْ فَتَحَهُ فَلَمْ يَغْمِضْهُ .

৪২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কখনো মনে করো না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা মক্কাবাসী কাফেররা যা করে আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে অনবধান। তবে তিনি তাদেরকে আজাব না দিয়ে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখবেন যেদিন এর বিভীষিকা দর্শনে চক্ষু হয়ে যাবে স্থির। تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ নির্নিমেষে চক্ষু খুলে রাখার ক্ষেত্রে বলা হয়– شَخَصَ بَصَرُ فُلَانٍ অর্থাৎ অমুক জনের চক্ষু বন্ধ না করে খুলে রেখেছে।

٤٣. مُهْطِعِيْنَ مُسْرِعِيْنَ حَالٌ مُقْنِعِىْ رَافِعِىْ رُؤُسِهِمْ اِلَى السَّمَآءِ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ بَصَرُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ قُلُوْبُهُمْ هَوَآءٌ خَالِيَةٌ مِنَ الْعَقْلِ لِفَزَعِهِمْ .

৪৩. আকাশের দিকে মাথা তুলে তারা ছুটাছুটি করবে তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরবে না আর তাদের অন্তর হবে বিকল। ভয়-বিহ্বলতার কারণে জ্ঞানশূন্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। مُهْطِعِيْنَ এটা حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদ। অর্থ– দ্রুত ছুটাছুটি করা। مُقْنِعِىْ তুলে। طَرْفٌ চক্ষু। اَفْئِدَةٌ হৃদয়সমূহ।

٤٤. وَاَنْذِرْ خَوِّفْ يَا مُحَمَّدُ النَّاسَ الْكُفَّارَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَا بِاَنْ تَرُدَّنَا اِلَى الدُّنْيَا اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ط فَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا اَوَلَمْ تَكُوْنُوْآ اَقْسَمْتُمْ حَلَفْتُمْ مِنْ قَبْلُ فِى الدُّنْيَا مَا لَكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ زَوَالٍ عَنْهَا اِلَى الْاٰخِرَةِ .

৪৪. হে মুহাম্মদ ﷺ ! যেদিন শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে মানুষকে কাফেরগণকে সতর্ক কর। তখন সীমালঙ্ঘনকারীরা অর্থাৎ কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও। অর্থাৎ দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও আমরা তাওহীদ সম্পর্কিত তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব। ধিক্কার ও ভর্ৎসনা করে তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি পূর্বে অর্থাৎ দুনিয়াতে শপথ করে বলতে না যে তোমাদের কোনো ধ্বংস নেই? দুনিয়া হতে আখেরাতের দিকে তোমাদের অপসৃতি নেই। اَقْسَمْتُمْ তোমরা কসম খেতে। مِنْ زَوَالٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٤٥. وَسَكَنْتُمْ فِيْهَا فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ مِنَ الْاُمَمِ السَّابِقَةِ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ مِنَ الْعُقُوْبَةِ فَلَمْ تَنْزَجِرُوْا وَضَرَبْنَا بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَمْثَالَ فِى الْقُرْاٰنِ فَلَمْ تَعْتَبِرُوْا .

৪৫. তোমরা বাস করেছ তাদের আবাসভূমিতে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে কুফরি করত যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং তাদের সাথে আমি কি করেছিলাম যে শাস্তি প্রদান করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল। কিন্তু তোমরা তাতেও ভীত ও সতর্ক হওনি এবং কুরআন কারীমে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্তও দিয়েছিলাম বিবৃত করেছিলাম কিন্তু তোমরা তাতেও শিক্ষা গ্রহণ করনি।

٤٦. وَقَدْ مَكَرُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ مَكْرَهُمْ حَيْثُ أَرَادُوْا قَتْلَهُ أَوْ تَقْيِيْدَهُ أَوْ إِخْرَاجَهُ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ط أَيْ عِلْمُهُ أَوْ جَزَاؤُهُ وَإِنْ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ عَظُمَ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ الْمَعْنٰى لَا يُعْبَأُ بِهِ وَلَا يَضُرُّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالْجِبَالِ هُنَا قِيْلَ حَقِيْقَتُهَا وَقِيْلَ شَرَائِعُ الْإِسْلَامِ الْمُشَبَّهَةُ بِهَا فِي الْقَرَارِ وَالثَّبَاتِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ لَامِ لَتَزُوْلُ وَرَفْعِ الْفِعْلِ فَإِنْ مُخَفَّفَةٌ وَالْمُرَادُ تَعْظِيْمُ مَكْرِهِمْ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْمَكْرِ كُفْرُهُمْ وَيُنَاسِبُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَعَلَى الْأُوْلٰى مَا قُرِئَ وَمَا كَانَ.

৪৬. তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভীষণ চক্রান্ত করেছিল তাঁকে হত্যা বা বন্দী বা বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করেছিল; তাদের চক্রান্ত অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জ্ঞান বা তার প্রতিফল আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। তাদের চক্রান্ত ভীষণ হলেও এমন ছিল না যাতে পর্বত টলে যেত। অর্থাৎ তা তেমন কোনো ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। আর তা দ্বারা তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কারো ক্ষতি করতেছিল না। إِنْ كَانَ এ স্থানে إِنْ শব্দটি না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ পর্বত টলে যেতো। কেউ কেউ বলেন, এ স্থানে اَلْجِبَالُ বা পর্বত বলতে আক্ষরিক অর্থেই পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তা দ্বারা ইসলামি শরিয়ত ও বিধিবিধান বুঝানো হয়েছে। দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব হিসেবে এ স্থানে তাকে পর্বতের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অপর এক কেরাতে لَتَزُوْلُ-এর প্রথম لَامٌ অক্ষরটিতে ফাতাহ ও তার শেষে رَفْعٌ সহ পঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় إِنْ كَانَ -এর إِنْ শব্দটি مُخَفَّفَةٌ বা তাশদীদবিহীনরূপে লঘুকৃত বলে গণ্য হবে। এ বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের চক্রান্তের ভীষণতা বুঝানো। অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত এত মারাত্মক ও ভীষণ যে তাতে অবশ্য পর্বত পর্যন্ত টলে যেতো। কেউ কেউ বলেন, اَلْمَكْرُ বলতে এ স্থানে তাদের কুফরিকেই বুঝানো হয়েছে– تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এ আয়াতটি উপরিউক্ত দ্বিতীয় কেরাতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর إِنْ كَانَ -এর স্থলে مَا كَانَ -এর কেরাত প্রথম কেরাত অর্থাৎ إِنْ শব্দটি مَا অর্থ বাচক হওয়ার কেরাতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

٤٧. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ط بِالنَّصْرِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ذُو انْتِقَامٍ مِمَّنْ عَصَاهُ.

৪৭. তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরাক্রমশালী কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। যারা তাঁর অবাধ্যাচরণ করে তাদের হতে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

٤٨. اُذْكُرْ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ كَمَا فِيْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَرَوٰى مُسْلِمٌ حَدِيْثَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ وَبَرَزُوْا خَرَجُوْا مِنَ الْقُبُوْرِ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

৪৮. স্মরণ কর যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, পরিষ্কার খালি এক ময়দানে মানুষকে ঐ দিন একত্র করা হবে। মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানুষ ঐ দিন কোথায় অবস্থান করবে। তিনি বলেছিলেন, পুলের উপরে। আর সকলেই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে জাহির হবে কবর হতে বের হবে।

৪৯. وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ تُبْصِرُ الْمُجْرِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِيْنَ مَشْدُوْدِيْنَ مَعَ شَيَاطِيْنِهِمْ فِى الْاَصْفَادِ الْقُيُوْدِ اَوِ الْاَغْلَالِ .

৪৯. হে মুহাম্মদ ﷺ ! সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে কাফেরদেরকে তাদের শয়তানের সাথে শৃঙ্খলে বাঁধা দেখবে। تَرَى তুমি দেখবে। مُقَرَّنِيْنَ শয়তানের সাথে বাঁধা। اَلْاَصْفَادُ পায়ের বা গলার বেড়ি।

৫০. سَرَابِيْلُهُمْ قُمُصُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ لِاَنَّهُ اَبْلَغُ لِاشْتِعَالِ النَّارِ وَتَغْشَى تَعْلُوْا وُجُوْهَهُمُ النَّارُ .

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার আগুনে তা অতিশীঘ্র ও অধিক উত্তপ্ত হয়। আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। سَرَابِيْلُهُمْ তাদের জামাসমূহ। تَغْشَى আচ্ছন্ন করে নেবে।

৫১. لِيَجْزِىَ مُتَعَلِّقٌ بِبَرَزُوْا اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ط مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ جَمِيْعَ الْخَلْقِ فِىْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ .

৫১. সকলেই উপস্থিত হবে এজন্য যে, ভালো বা মন্দ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। لِيَجْزِىَ তা ৪৮ নং আয়াতে উল্লিখিত بَرَزُوْا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শীঘ্র হিসাব গ্রহণকারী। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এ দুনিয়ার দিন অনুযায়ী অর্ধ দিনের ভিতর তিনি সকল সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করে নেবেন।

৫২. هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ اَىْ اُنْزِلَ لِتَبْلِيْغِهِمْ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا بِمَا فِيْهِ مِنَ الْحُجَجِ اِنَّمَا هُوَ اَىِ اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ يَتَّعِظَ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ .

৫২. তা এই আল কুরআন মানুষের জন্য এক বার্তা অর্থাৎ তা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার তাবলীগ ও বার্তা পৌঁছানোর জন্য আর তা দ্বারা যেন তারা সতর্ক হয় এবং তাতে যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ রয়েছে তা দ্বারা জানতে পারে যে, তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। لِيَذَّكَّرَ তাতে মূলত ذ অক্ষরটিতে ت -এর اِدْغَامٌ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে। অর্থ যেন সে উপদেশ গ্রহণ করে। اُولُوا الْاَلْبَابِ যারা বোধশক্তির অধিকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَشْخَصُ : এ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর شُخُوْصٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ হলো– দণ্ডের সাথে বেঁধে অপরাধীকে শাস্তি দিতে দেখা, চোখ খোলা থাকা, চোখ উঠা।

قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ : এটা হলো مُهْطِعٌ ইসমে ফায়েল -এর বহুবচন, বাবে اِفْعَالٌ হতে মাসদার اِهْطَاعٌ অর্থ– মাথানত করা, দ্রুত দৌড়ানো। এটা اَصْحَابٌ উহ্য মুযাফ থেকে حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– اَصْحَابُ الْاَبْصَارِ مُهْطِعِيْنَ

قَوْلُهُ مُقْنِعِىْ : এটা বাবে اِفْعَالٌ -এর اِقْنَاعٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلٍ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ع) মূলে ছিল مُقْنِعِيْنَ ইযাফতের কারণে نُوْن টি পড়ে গেছে। অর্থ– উত্থিত।

قَوْلُهُ اَفْئِدَتُهُمْ : اَفْئِدَةٌ হলো فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ- হৃদয়, অন্তর, দিল।

قَوْلُهُ هَوَاءٌ : এটা اِسْمٌ অর্থ শূন্য, খালি, ভয়ভীতির কারণে হৃদয় শূন্য হওয়া। প্রত্যেক কল্যাণকর বস্তু থেকে খালি। هَوَاءٌ সেই শূন্য প্রান্তরকে বলা হয় যা আকাশ ও পাতালের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। পরিভাষায় ভিতু হৃদয়ের صِفَتْ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ نُجِبْ : এটা اَخِّرْنَا আমরের জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُمْ : পূর্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটা উহ্য মানার প্রয়োজন হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبَيَّنَ : এর ফায়েল مُضْمَرٌ রয়েছে আর তা হলো حَالٌ উহ্য ইবারত হবে এই যে, دَلَالَتُ كَلَامٍ -এর কারণে تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ

قَوْلُهُ اِنْ مَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِنْ টা হলো نَافِيَةٌ আর لِتَزُوْلَ -এর মধ্যে لَامْ টি نَفِيْ تَاكِيْد -এর জন্য হয়েছে। وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ لَامِ الْاُوْلٰى وَرَفْعِ الْاٰخِيْرَةِ اَيْ لِتَزُوْلَ এ সুরতে اِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, এদের প্রতারণা এতই কঠোর ছিল যে, পাহাড়ও স্বীয় স্থানচ্যুত হতো। لِتَزُوْلَ -এর لَامْ টা مُخَفَّفَةٌ এবং نَافِيَةٌ -এর মাঝে فَارِقَةٌ হয়েছে।

সারকথা : দ্বিতীয় কেরাত অর্থাৎ اِنْ مُخَفَّفَةٌ -এর সুরতে (لِتَزُوْلَ) কাফেরদের প্রতারণাকে মহা এবং কঠিন হওয়াকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর প্রথম কেরাত অর্থাৎ اِنْ نَافِيَةٌ এবং لَامْ -এর যেরসহ (لِتَزُوْلَ) তাদের প্রতারণার দুর্বলতাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের প্রতারণা আল্লাহ তা'আলার তদবীরের মোকাবিলায় এতই দুর্বল যে, তা মনোযোগ দেওয়ারও যোগ্য নয়। না তোমাদের কোনো কিছু বিনষ্ট করতে সক্ষম। দ্বিতীয় কেরাত আল্লাহ তা'আলার বাণী- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ الخ -এর মুনাসিব। আর প্রথম কেরাত আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ -এর মুনাসিব।

قَوْلُهُ قَطِرَانٍ : قَطِرَانٌ হলো বহমান তরল বস্তু যা কালো ও ঘন হয় যাতে তীব্রতা হয়ে থাকে। যদি একে পাঁচড়াযুক্ত উটকে মালিশ করে দেওয়া হয় তবে পাঁচড়া ভালো হয়ে যায়। আগুন খুব দ্রুত এটাকে গ্রহণ করে এবং এটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে গন্ধক বলেছেন। আবার কেউ কেউ একে আলকাতরা বলেছেন।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِبَرَزُوْا : অর্থাৎ لِيَجْزِيَ টা بَرَزُوْا -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। তার মাঝখানের অংশটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اُنْزِلَ لِتَبْلِيْغِهِمْ : هٰذَا بَلٰغٌ -এর মধ্যে যেহেতু ذَاتٌ টা حَمْلٌ এর- وَصْفٌ -এর উপর আবশ্যক হচ্ছে। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারত উহ্য মেনেছে যাতে করে حَمْلٌ বৈধ হয়ে যায়। অর্থাৎ هٰذَا -এর খবর নয়; বরং খবর উহ্য রয়েছে। খবরের ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا الخ : সূরা ইবরাহীমে পয়গাম্বর ও তাদের সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরুদ্ধাচারণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণ করেন, তার সন্তানদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তারই সন্তানসন্ততি বনী ইসরাঈল পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বপ্রথম সম্বোধিত সম্প্রদায়।

সূরা ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকুতে সারসংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসীদেরকেই পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এখনো চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং জালেমকে কঠোর আজাবের সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালেম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত নন; বরং তারা যা কিছু করছে, সব আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন।

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যত ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয় তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরকে শুনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালেমদের উপর তাৎক্ষণিক আজাব না আসা তাদের জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের আজাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত পরকালের বিবরণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে। وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ অর্থাৎ তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আরো কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গাম্বরদের অনুসরণ করে এ আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাবে বলা হবে, এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতঃপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও শানশওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস বাসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগৎ অস্বীকার করেছিলে।

قَوْلُهٗ وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ ...... كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ : এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে وَاَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীতে জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্যের বিষয় তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হলো না।

قَوْلُهٗ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ الْجِبَالُ : অর্থাৎ তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরুদ, ফেরাউন, কওমে আদ, কওমে সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের إِنْ শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে; কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল। 'পাহাড়' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোনো চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ অর্থাৎ কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গাম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে, যেমন- কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোনো গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে- لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا أَمْتًا অর্থাৎ গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না; বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণ এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রং হবে রৌপ্যের মতো সাদা। এর উপর কোনো গুনাহ বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে আহমদে ও তাফসীরে ইবনে জারীরে উল্লিখিত হাদীসে এ বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মতো পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোনো বস্তুর চিহ্ন [গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি] থাকবে না। বায়হাকী এ আয়াতের তাফসীরে এ তথ্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এ পৃথিবীতে জমায়েত হবে। ভিড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সেজদায় নত হবো। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব-কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোনো পৃথিবী হবে। আয়াতে এ সত্তার পরিবর্তনই বুঝানো হয়েছে।

বয়ানুল কুরআন গ্রন্থে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পরবিরোধিতা নেই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুৎকারের পর পৃথিবীতে শুধুমাত্র গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়েদ থেকে হযরত ইকরিমা (র.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যা দ্বারা উপরিউক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই– এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত ছাওবান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ইহুদি এসে প্রশ্ন করল, যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নমের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এছাড়া বান্দার উপায় নেই যে,

زباں تازہ کردن باقرار تو

نینگیختن علت از کار تو

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে একসাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি দ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে– কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনো বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. الٓرٰ قف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ مُظْهِرٍ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ .

১. আলিফ, লাম, রা এগুলোর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত। এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের অর্থাৎ আল কুরআনের বিশদভাবে বর্ণনাকারী অর্থাৎ বাতিল হতে হকের স্পষ্টতা বিধানকারী [আল-কুরআনের] اٰيٰتُ الْكِتٰبِ এ স্থানে : اَلْكِتٰبُ -এর প্রতি اٰيٰتٌ শব্দটির اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধ مِنْ [হতে] অর্থব্যঞ্জক। এ- وَقُرْاٰنٌ স্থানে قُرْاٰنٌ -এর একটি صِفَتٌ বা গুণ مُبِيْنٍ [স্পষ্টতা বিধানকারী] বৃদ্ধিসহ এটাকে পূর্ববর্তী শব্দটির সাথে عَطْفٌ বা অন্বয় করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ : প্রশ্ন. تِلْكَ-এর তাফসীর هٰذِهٖ দ্বারা করাতে কি লাভ হয়েছে?

উত্তর. قُرْبٌ حِسِّيٌّ -কে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. তবে هٰذِهٖ কেন ব্যবহার করলেন না?

উত্তর. تِلْكَ দ্বারা عُلُوٌّ رُتْبِيٌّ -কে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। تِلْكَ -কে هٰذِهٖ -এর অর্থে নেওয়ার কারণে উভয় ফায়দাই অর্জিত হয়েছে قُرْبٌ حِسِّيٌّ এবং عُلُوٌّ رُتْبِيٌّ; যদি تِلْكَ -এর স্থানে هٰذِهٖ ব্যবহার হতো, তবে শুধুমাত্র قُرْبٌ حِسِّيٌّ -এরই ফায়দা অর্জিত হতো।

قَوْلُهٗ اِضَافَتْ : অর্থাৎ مِنْ اَيِّ اٰيَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ

قَوْلُهٗ مُظْهِرٌ لِلْحَقِّ : প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) সাধারণত مُبِيْنٌ -এর তাফসীর بَيِّنٌ দ্বারা করেছেন আর قَرِيْنٌ قِيَاسٌ ও এটাই, কিন্তু এখানে مُظْهِرٌ দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর. যেহেতু لَازِمٌ مُتَعَدِّيْ بِمَعْنٰى নেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে مُبِيْنٌ দ্বারা مُتَعَدِّيْ অর্থই উদ্দেশ্য لَازِمٌ উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই মুফাসসির (র.) مُبِيْنٌ-এর তাফসীর مُظْهِرٌ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهٗ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ الصِّفَتِ : প্রশ্ন. এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ফায়দা কি?

উত্তর. এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, قُرْاٰنٌ -এর আতফ كِتَابٌ-এর উপর হচ্ছে আর উভয়টির مِصْدَاقٌ একই। কাজেই এটা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ-এর অন্তর্গত হলো, অথচ আতফটা مُغَايَرَتٌ -কে কামনা করে থাকে।

উত্তর এই যে, كِتَابٌ যা মা'তূফ আলাইহি হয়েছে তা مُطْلَقٌ হয়েছে। আর قُرْاٰنٌ হলো صِفَتٌ مُبِيْنٌ -এর সাথে مُقَيَّدٌ কাজেই এটা عَطْفُ مُقَيَّدٍ عَلَى الْمُطْلَقِ -এর অন্তর্গত হলো। আর উভয়ের মধ্যে مُغَايَرَتٌ সুস্পষ্ট। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। মুফাসসির (র.) عَطْفٌ بِزِيَادَةِ الصِّفَتِ বলে এ প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হিজর প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৯৯, রুকূ' ৬। হিজর নামক স্থানটি সিরিয়া এবং মদীনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যখানে অবস্থিত। এ স্থানের অধিবাসীরা তাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ্ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে আর এজন্য এ নামেই আলোচ্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালতকে অস্বীকার করে তাদের মন্দ আচরণ এবং তার পরিণাম সম্পর্কে এ সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তৌহিদ এবং কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ : আলিফ-লাম-রা। [এটি হরফে মুকাত্তাআত], এ আয়াতসমূহ মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনেরই, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পবিত্র কুরআন কামেল, পরিপূর্ণ কিতাব, মহান গ্রন্থ, যার মোকাবিলায় অন্য কোনো কিতাবকে কিতাবই বলা যায় না। এ কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনো আড়ম্বরতা বা অস্পষ্টতা এতে নেই। এ মহান গ্রন্থের বর্ণনা শৈলী অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল, এই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণসমূহ অতি উজ্জ্বল, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত, তাই পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করা এবং তা অনুধাবনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা এতেই নিহিত রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। আলোচ্য আয়াত পবিত্র কুরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

১. এটি কামেলা বা পরিপূর্ণ।

২. এটি সুস্পষ্ট, হালাল ও হারাম, হক ও বাতিল এবং হেদায়েত ও গোমরাহীকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ মহান গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْجُزْءُ الرَّابِعُ عَشَرَ : চৌদ্দতম পারা

অনুবাদ :

٢. رُبَمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ يَوَدُّ يَتَمَنَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِذَا عَايَنُوْا حَالَهُمْ وَحَالَ الْمُسْلِمِيْنَ لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ وَرُبَّ لِلتَّكْثِيْرِ فَإِنَّهُ يُكْثِرُ مِنْهُمْ تَمَنِّيْ ذٰلِكَ وَقِيْلَ لِلتَّقْلِيْلِ فَإِنَّ الْاَهْوَالَ تُدْهِشُهُمْ فَلَا يُفِيْقُوْنَ حَتّٰى يَتَمَنَّوْا ذٰلِكَ إِلَّا فِيْ اَحْيَانٍ قَلِيْلَةٍ ـ

২. কখনও কখনও কাফেররা চাইবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা যখন নিজেদের ও মুসলমানদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা কখনও আশা করবে যে, আহা, যদি তারা মুসলিম হতো! رُبَمَا-এটার ب অক্ষরটিতে তাশদীদসহ বা তাশদীদ ব্যতিরেকে লঘু আকারেও পাঠ করা যায়। এ স্থানে رُبَّ শব্দটি تَكْثِيْر অর্থাৎ অধিক অর্থব্যঞ্জক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এদের হতে এ ধরনের আশা অতি অধিকবার প্রকাশ পাবে। কেউ কেউ বলেন, এটা এ স্থানে تَقْلِيْل বা অল্প অর্থব্যঞ্জক। কেননা কিয়ামতের বিভিষীকা তাদেরকে ভীত বিহ্বল করে রাখবে। ফলে খুব অল্পবারই তাদের এ ধরনের আশা করতে হুঁশ হবে।

٣. ذَرْهُمْ اُتْرُكِ الْكُفَّارَ يَا مُحَمَّدُ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا بِدُنْيَاهُمْ وَيُلْهِهِمُ يُشْغِلْهُمُ الْاَمَلُ بِطُوْلِ الْعُمْرِ وَغَيْرِهٖ عَنِ الْاِيْمَانِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ اَمْرِهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

৩. এদেরকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, এ কাফেরদেরকে নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিন এরা খেতে থাকুক আর তাদের দুনিয়া উপভোগ করুক। দীর্ঘায়ু হওয়ার এবং এই ধরনের আরও আশা এদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করা হতে এদেরকে অমনোযোগী করে রাখুক শীঘ্রই এরা এদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে। এ আয়াতোক্ত বক্তব্য ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিল হওয়ার পূর্বের।

٤. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ زَائِدَةٌ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ اَهْلُهَا إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ اَجَلٌ مَّعْلُوْمٌ مَحْدُوْدٌ لِهَلَاكِهَا ـ

৪. আমি কোনো জনপদকে অর্থাৎ জনপদবাসীকে ধ্বংস করিনি কিন্তু তাদের জন্য ছিল অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের ছিল নির্ধারিত কাল। مِنْ قَرْيَةٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। كِتَابٌ এটা এ স্থানে اَجَلٌ বা কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَعْلُوْمٌ এস্থানে অর্থ নির্ধারিত।

٥. مَا تَسْبِقُ مِنْ زَائِدَةٌ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ يَتَاَخَّرُوْنَ عَنْهُ ـ

৫. কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট কাল আগেও নিয়ে আসতে পারে না বা বিলম্বিত করতে পারে না। مِنْ اُمَّةٍ এ স্থানে শব্দটি مِنْ زَائِدَة অতিরিক্ত। مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ অর্থ নির্দিষ্টকাল হতে পরেও নিয়ে যেতে পারে না।

٦. وَقَالُوْا اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ الْقُرْاٰنُ فِيْ زَعْمِهٖ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ـ

৬. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ রাসূল ﷺ -কে বলে, ওহে যার প্রতি তার ধারণা অনুসারে উপদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই একজন উন্মাদ।

٧. لَوْمَا هَلَّا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِكَ إِنَّكَ نَبِىٌّ وَأَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৭. তুমি নিশ্চয় একজন নবী আর এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ তোমার এ কথায় তুমি সত্যবাদী হলে, তুমি আমাদের নিকট ফেরেশতা নিয়ে আসতেছ না কেন? لَوْمَا এটা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨. قَالَ تَعَالٰى مَا تُنَزَّلُ فِيْهِ حَذْفُ إِحْدَى التَّائَيْنِ الْمَلٰئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ بِالْعَذَابِ وَمَا كَانُوْا إِذًا أَىْ حِيْنَ نُزُوْلِ الْمَلٰئِكَةِ بِالْعَذَابِ مُنْظَرِيْنَ مُؤَخَّرِيْنَ .

৮. সত্যসহ অর্থাৎ আজাবসহ ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হয়। তখন অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আজাবসহ অবতীর্ণ হলে তারা অবকাশ প্রাপ্ত হবে না। তাদের বিষয়ে আর বিলম্ব করা হবে না। تُنَزَّلُ এটা হতে মূলত একটি ت বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

٩. إِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدٌ لِاسْمِ إِنَّ أَوْ فَصْلٌ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ مِنَ التَّبْدِيْلِ وَالتَّحْرِيْفِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ .

৯. আমিই উপদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং পরিবর্তন, বিকৃতি, বৃদ্ধি ও হ্রাস সাধন ইত্যাদি হতে আমিই এটার সংরক্ষক। إِنَّا نَحْنُ এ স্থানে نَحْنُ শব্দটি إِنَّ-এর إِسْم-এর تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টিবাচক শব্দ অথবা فَصْل অর্থাৎ পার্থক্যসূচক শব্দ।

١٠. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فِىْ شِيَعِ فِرَقِ الْأَوَّلِيْنَ .

১০. পূর্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আমি তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম। شِيَعٌ - দলসমূহ।

١١. وَمَا كَانَ يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اِسْتِهْزَاءُ قَوْمِكَ بِكَ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ .

১১. তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেনি যাদের সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত না। যেমন তোমার সম্প্রদায় তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে থাকে। এ আয়াতটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা স্বরূপ। وَيَاْتِيْهِمْ এটার পূর্বে এ স্থানে كَانَ শব্দটি উহ্য রয়েছে.

١٢. كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ أَىْ مِثْلَ إِدْخَالِنَا التَّكْذِيْبَ فِىْ قُلُوْبِ أُولٰئِكَ نُدْخِلُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ أَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ .

১২. এভাবে অর্থাৎ যেভাবে এদের হৃদয়ে আমি অস্বীকার করার প্রবণতা প্রবেশ করে দিয়েছি সেভাবে অপরাধীদের মক্কার কাফেরদের অন্তরে তার সঞ্চার করি। তা প্রবেশ করিয়ে দেই।

١٣. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ أَىْ سُنَّةُ اللّٰهِ فِيْهِمْ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ أَنْبِيَاءَهُمْ وَهٰؤُلَاءِ مِثْلُهُمْ .

১৩. এরা তাঁতে অর্থাৎ রাসূল ﷺ সম্পর্কে বিশ্বাস আনয়ন করবে না। আর পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে রীতি অর্থাৎ নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ কর্তৃক এদেরকে শাস্তি দান সম্পর্কিত রীতি অতিবাহিত হয়েছে। এরাও তাদের মতোই।

١٤. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ فِي الْبَابِ يَعْرُجُونَ يَصْعَدُونَ ـ

১৪. যদি তাদের জন্য আকাশের কোনো এক দুয়ার খুলে দিই আর তাতে দুয়ার দিয়ে তারা দিনে আরোহণ করে। يَعْرُجُونَ - তারা আরোহণ করে।

١٥. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ سُدَّتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ يُخَيَّلُ إِلَيْنَا ذٰلِكَ ـ

১৫. তবুও এরা বলবে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। আমাদের নিকট এতদৃশ খেয়াল সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। سُكِّرَتْ -আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. يَسْتَأْخِرُونَ এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ হতে যা طَلَبٌ -এর উপর দালালত করে অথচ এখানে طَلَبٌ-এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়?।
উত্তর. এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ হলেও تَفَعُّلٌ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ : এটা হলো মুশরিকদের রদ ও ইনকারের জবাব যা মুশরিকরা "إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ" বলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে তাকিদের সাথে অস্বীকার করেছিল। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সত্যতাও তাকিদের সাথে إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الخ বলে ইরশাদ করেছেন।

قَوْلُهُ تَاكِيدٌ أَوْ فَصْلٌ : অর্থাৎ نَحْنُ টা نَا اِسْم -এর তাকিদ অথবা এই যে, فَصْل আর نَحْنُ -কে فَصْل বলার সুরতে এই প্রশ্ন হবে যে, فَصْل দুটি اِسْم-এর মাঝে হয়ে থাকে; اِسْم এবং فِعْل -এর মধ্যে নয়। যেমনটি এখানে হয়েছে।
আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হবে যে, ফসল ضَمِيْر غَائِبٌ থেকে হয় তা ব্যতীত অন্য কিছু থেকে নয়। কাজেই আল্লামা জুরজানী (র.) اِسْم এবং فِعْل-এর মাঝেও فَصْل -কে জায়েজ বলেছেন। সম্ভবত মুসান্নেফ (র.) আল্লামা জুরজানী (র.) -এর মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ كَانَ : كَانَ বৃদ্ধি করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, مَا خَالِيَه সেই মুযারে' -এর উপর প্রবেশ করে যা حَالٌ অর্থে হয়ে থাকে। অথবা ঐ مَاضِى-এর উপর প্রবেশ করে حَال -এর নিকটবর্তী হয়। মুফাসসির (র.) كَانَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مَا خَالِيَه টা مَاضِىْ قَرِيْبُ اِلَى الْحَالِ -এর উপর প্রবেশ করেছে।

قَوْلُهُ نُدْخِلُهُ : অর্থাৎ الْاِسْتِهْزَاء এখানে ، যমীরের مَرْجِعْ হলো اِسْتِهْزَاء -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ذَرْهُمْ يَاكُلُوا : থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মু'মিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরি করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া [অর্থাৎ গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা], কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। –[তাফসীরে কুরতুবী]
দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া।– [কুরতুবী] ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, দামেশকবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধনসম্পদ একত্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদি জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয়?

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরি করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الخ :

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদি পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির প্রাঞ্জল, অলঙ্কারপূর্ণ এবং বিজ্ঞসুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইহুদি? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব।

সে উত্তরে বলল, আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামি ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তিই, যে বিগত বছর এসেছিলেন,? সে বলল, হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদিদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিনটি কপি কমবেশ করে লিখে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রিস্টানরা খুব খাতির-যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের বেলায় আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কমবেশ করে দিলাম! এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা,. যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশকম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাজি ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম বলেন, ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়! কারণ কুরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন, কুরআনে পাক যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে- بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ - ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হেফাজতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআন পাক

সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাজত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নোক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রিসালাতের অবসানের পর আজ চৌদ্দশ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামি ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোনো বড় থেকে বড় আলেমেরও সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

হাদীস সংরক্ষণও কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত : বিদ্বান মাত্রেই এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন শুধু কুরআনি শব্দাবলির নাম নয় এবং শুধু অর্থসম্ভারও কুরআন নয়; বরং শব্দাবলি ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। কারণ এই যে, কুরআনের অর্থসম্ভার এবং বিষয়বস্তু তো অন্যান্য গ্রন্থেও বিদ্যমান আছে। বলতে কি, ইসলামি গ্রন্থাবলিতে সাধারণত কুরআনি বিষয়বস্তুই থাকে। তাই বলে এগুলোকে কুরআন বলা হয় না। কেননা এগুলোতে কুরআনের শব্দাবলি থাকে না। এমনিভাবে যদি কেউ কুরআনের বিচ্ছিন্ন শব্দ ও বাক্যাবলি নিয়ে একটি রচনা অথবা পুস্তিকা লিখে দেয়, তবে একেও কুরআন বলা হবে না; যদিও এতে একটি শব্দও কুরআনের বাইরের না থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন শুধুমাত্র ঐ আল্লাহর মাসহাফ তথা গ্রন্থকেই বলা হয়, যার শব্দাবলি ও অর্থসম্ভার একসাথে সংরক্ষিত রয়েছে।

এ থেকে এ মাসআলাটি জানা গেল যে, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় কুরআনের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করে তাকে উর্দু অথবা ইংরেজি কুরআন নাম দেওয়ার যে প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে, এটা কিছুতেই জায়েজ নয়। কেননা এটা কুরআন নয়। যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, কুরআন শুধু শব্দাবলির নাম নয়; বরং অর্থসম্ভারও এর একটি অংশ, তখন আলোচ্য আয়াতে কুরআন সংরক্ষণের অনুরূপ অর্থসম্ভার সংরক্ষণ তথা কুরআনকে যাবতীয় অর্থগত পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্বও আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, কুরআনের অর্থসম্ভার তাই, যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে- لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি লোকদেরকে ঐ কালামের মর্ম বলে দেন, যা তাদের জন্য নাজিল করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই- يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বলেছেন- إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন কুরআনের অর্থ বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি উম্মতকে যেসব উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, সেসব উক্তি ও কর্মের নামই হাদীস।

যে ব্যক্তি রাসূলের হাদীসকে ঢালাওভাবে অরক্ষিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কুরআনকেই অরক্ষিত বলে। আজকাল কিছু সংখ্যক লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালের অনেক পর সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে।

প্রথমত তাদের এরূপ বলাও শুদ্ধ নয়। কেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলদারিতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মাত্র। এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কুরআনের তাফসীর ও যথার্থ মর্ম। এর সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভব যে, কুরআনের শুধু শব্দাবলি সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসম্ভার [অর্থাৎ হাদীস] বিনষ্ট হয়ে যাবে?

قَوْلُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ : شِيَعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কারো অনুসারী ও সাহায্যকারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে ঐকমত্য পোষণকারী সম্প্রদায়কেও شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি। এখানে إِلَى অব্যয়ের পরিবর্তে فِيْ شِيَعِ الْأَوَّلِيْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁর উপর আস্থা রাখা লোকদের পক্ষে সহজ হয় এবং রাসূল ও তাদের স্বভাব ও মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে তাদের সংশোধনের যথোপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারেন।

অনুবাদ :

١٦. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اثْنَيْ عَشَرَ الْحَمَلَ وَالثَّوْرَ وَالْجَوْزَاءَ وَالسَّرَطَانَ وَالْاَسَدَ وَالسُّنْبُلَةَ وَالْمِيْزَانَ وَالْعَقْرَبَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدْيَ وَالدَّلْوَ وَالْحُوْتَ وَهِيَ مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ اَلْمِرِّيْخِ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهْرَةِ وَلَهَا الثَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعُطَارِدٍ وَلَهُ الْجَوْزَاءُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْقَمَرِ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسِ وَلَهَا الْاَسَدُ وَالْمُشْتَرِيْ وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوْتُ وَزُحَلٍ وَلَهُ الْجَدْيُ وَالدَّلْوُ وَزَيَّنّٰهَا بِالْكَوَاكِبِ لِلنّٰظِرِيْنَ .

১৬. আমি আকাশে বারোটি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এগুলো হলো মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এগুলো হলো সাতটি নক্ষত্রের অবস্থান স্থল। মঙ্গলের জন্য হলো মেষ ও বৃশ্চিক, শুক্রের জন্য হলো বৃষ ও তুলা, বুধের জন্য হলো মিথুন ও কন্যা, চন্দ্রের জন্য হলো কর্কট, সূর্যের জন্য হলো সিংহ, বৃহস্পতির জন্য হলো ধনু ও মীন, শনির জন্য হলো মকর ও কুম্ভ। এবং উহাকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্য।

١٧. وَحَفِظْنٰهَا بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ مَرْجُوْمٍ .

১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি অগ্নিশিখা দ্বারা তা রক্ষা করি। رَجِيْمٍ অর্থ مَرْجُوْمٍ ব বিতাড়িত।

١٨. اِلَّا لٰكِنْ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ خَطْفَةً فَاَتْبَعَهُ لَحِقَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ كَوْكَبٌ مُضِيْءٌ يُحْرِقُهُ اَوْ يَثْقُبُهُ اَوْ يُخَبِّلُهُ .

১৮. তবে কেউ ছোঁ মারার মতো হঠাৎ চুরি করে আকাশের সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে গিয়ে আঘাত করে প্রদীপ্ত শিক্ষা। জ্বলন্ত নক্ষত্র তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় বা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলে বা স্মৃতিভ্রষ্ট পাগল বানিয়ে দেয়। اِلَّا এটা এস্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٩. وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا بَسَطْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتَ لِئَلَّا تَتَحَرَّكَ بِاَهْلِهَا وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ مَعْلُوْمٍ مُقَدَّرٍ .

১৯. পৃথিবীকে আমি বিলম্বিত করেছি। বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা সৃষ্টি যাতে তা না দোলে আর তাতে প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। رَوَاسِيَ অর্থ– সুদৃঢ় পর্বতসমূহ।

٢٠. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ مِنَ الثِّمَارِ وَالْحُبُوْبِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ مَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ فَاِنَّمَا يَرْزُقُهُمُ اللّٰهُ .

২০. এবং তাতে ফল-ফলাদি ও শস্য দানের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমাদের জন্য এমন বস্তুও সৃষ্টি করেছি তোমরা যাদের রিজিকদাতা নও যেমন, দাস-দাসী, জন্তু ও গৃহপালিত পশুসমূহ! এই সকল কিছুকে আল্লাহ তা'আলাই রিজিক দিয়ে থাকেন। مَعَايِشَ এ শব্দটি ش-এর পূর্বে ى সহ পঠিত।

٢١. وَاِنْ مَا مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِهِ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ عَلَى حَسْبِ الْمَصَالِحِ .

২১. এমন কোনো জিনিস নেই যার ভাণ্ডার অর্থাৎ ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আমার নিকট নেই; কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণেই আমি তা অবতীর্ণ করে থাকি। وَاِنْ এ اِنْ শব্দটি এ স্থানে না-বোধক শব্দ مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنْ شَيْءٍ এ مِنْ শব্দটি এস্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٢٢. وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ تَلْقَحُ السَّحَابَ فَيَمْتَلِئُ مَاءً فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ السَّحَابِ مَاءً مَطَرًا فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ اَيْ لَيْسَتْ خَزَائِنُهٗ بِاَيْدِيْكُمْ .

২২. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু অর্থাৎ যে বায়ু মেঘ বহন করে এবং পানিতে ভরে যায় সেই বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হতে অর্থাৎ মেঘ হতে পানি অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই অথচ তোমরা তার ভাণ্ডারী নও অর্থাৎ তার ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই।

٢٣. وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ الْبَاقُوْنَ نَرِثُ جَمِيْعَ الْخَلْقِ .

২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই তো উত্তরাধিকারী অর্থাৎ অবিনশ্বর এবং সকল সৃষ্টির আমিই উত্তরাধিকারী হবো। কারণ একমাত্র আমিই বাকি থাকব।

٢٤. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ اَيْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْخَلْقِ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

২৪. আদম হতে যে সমস্ত সৃষ্টি তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা পরে আসবে তাদেরকেও জানি।

٢٥. وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهٖ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ .

২৫. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাদেরকে একত্র সমাবেশ করবেন। তিনি তাঁর কর্মে প্রজ্ঞাময়, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بُرُوْجًا : بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো প্রকাশ হওয়া। تَبَرُّجٌ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তথা নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে تَبَرُّجٌ বলা হয়। এখানে আকাশের তারকাগুলোকে بُرْجٌ বলা হয়েছে। কেননা সেগুলোও উঁচু এবং প্রকাশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় মুফাসসিরীনের মতে سَبْعٌ سَيَّارَةٌ -এর ১২টি মঞ্জিলের নাম হলো بُرْجٌ ইলমে হাইয়াতে এটাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ الْمَرِّيْخُ : এটা سَبْعٌ سَيَّارَةٌ-এর বর্ণনা।

قَوْلُهٗ الْمَرِّيْخُ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ : حَمَلٌ এবং عَقْرَبٌ -এর مِرِّيْخٌ মঞ্জিলে হওয়ার অর্থ হলো এই যে, مِرِّيْخٌ এ উভয় মঞ্জিলেই প্রবেশ করে। তাফসীর এবং হিকমতের কিতাবে এটা লেখা রয়েছে যে, সূর্যের ১২টি بُرْجٌ রয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, সূর্য এগুলোর সামনা-সামানি পতিত হয়। অর্থ এটা নয় যে, সূর্য তাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য তারকারাজিরও এ অবস্থা। কাজেই উভয় মতাদর্শের মধ্যে কোনোই বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهٗ مَرْجُوْمٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَعِيْلٌ টা مَفْعُوْلٌ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ لٰكِنْ : এখানে إِلَّا-এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হয়েছে। কেননা اِسْتِرَاق টা حفظ-এর- جنس-এর থেকে নয়।

قَوْلُهُ خَطْفَةً : এখানে اِسْتِرَاق-এর তাফসীর خَطْفَةً দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হলো এই যে, سَمْع একটি সিফাত যা سَامِعْ-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এর স্থানান্তর সম্ভব নয়। সুতরাং اِسْتَرَقَ السَّمْعَ -এর কি অর্থ?

উত্তর. اِسْتِرَاق অর্থ হলো। اَلْاِخْتِلَاسُ سِرًّا তথা চুপিসারে ছো-মেরে নিয়ে নেওয়া। এটা তাশবীহের ভিত্তিতে হয়েছে। কাজেই কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ لَحِقَهُ : اَتْبَعَهُ-এর তাফসীর لَحِقَهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اِفْعَالْ টা مُجَرَّد لَازِم অর্থে হয়েছে। কাজেই অর্থ বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَخْبِلُهُ : এটা خَبْلٌ থেকে হয়েছে। এর অর্থ হলো স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত করা, পাগল বানানো। শয়তান অগ্নিশিখা নিক্ষেপের ফলে স্তম্ভিত হয়ে জঙ্গলের ভূতে পরিণত হয়ে যায় যা মানুষদেরকে জঙ্গলে ভীতি প্রদর্শন করে থাকে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا لَكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ لَسْتُمْ-এর আতফ مَعَايِشَ -এর উপর হয়েছে। কাজেই এই সন্দেহ শেষ হয়ে গেল যে, مَنْ لَسْتُمْ-এর আতফ لَكُمْ-এর ضَمِير مَجْرُوْر-এর উপর হয়েছে আর ضَمِير مَجْرُوْر-এর উপর حَرْف جَارّ-এর পুনরাবৃত্তি ছাড়া আতফ বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ الخ : بُرُوْجٌ শব্দটি بَرْجٌ -এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে بروج-এর তাফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বুঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিক কালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগোত্র এবং আকাশের অনেক নিচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল– এই উভয় অর্থে سَمَاء শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত; কুরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سَمَاء শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত এর চূড়ান্ত আলোচনা কুরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا الخ-এর তাফসীরে করা হবে।

قوله وحفظنها من كل الخ : **উল্কাপিণ্ড** : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত হয় প্রমাণিত যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলিসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলিসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এত দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বাক্য থেকেও বুঝা যায় যে, এরা চোরের মতো শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌছে তারা কিছু সংবাদ শুনে নিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে, ফেরেশতাগণ কোনো সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলতেন এবং তারা তা শুনে ফেলত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত; পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূরা জিনের اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে উল্কাপিণ্ড। কুরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হতো এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তাঁরা বলেন, সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোনো কারণে, অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোনো তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয় উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়। আরবি ভাষায়ও এর জন্য اِنْقِضَاضُ كَوْكَبٍ [তারকা খসে যাওয়া] শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্বলিত হওয়া এবং কোনো তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভবপর। এমনটা সম্ভপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায় ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা যায়।

আল্লামা আলূসী (র.) তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন, উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হলো, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে আকাশে তারকা খরেস পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলিয়াহ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন, আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোনো ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোনো মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন, এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কুরআনের পরিপন্থি নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোনো তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কুরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا الخ :

আল্লাহর রহস্য, জীবিকার প্রয়োজনাদিতে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ -এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবনধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশি হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশি উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে তা পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাজিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ -এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে; কিন্তু এগুলোর

বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

সব সৃষ্টজীবনে পানি সরবরাহ করার অভিনব ব্যবস্থা : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ থেকে مَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল, ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবিও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প থেকে বৃষ্টির উপকরণ [মৌসুমি বায়ু] সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীবজন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত– এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে যেসব উড়োজাহাজ তৈরি হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণ্ডারই নয়; বরং মৌসুমি পানির বায়ুও উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এদিকে ইঙ্গিত আছে– وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا এখানে فُرَاتٌ শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি, যা দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

সূরা ওয়াকেআয় বলা হয়েছে– أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۔ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ - لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমারা অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন?

এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর কুদরতের লীলা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে মেঘমালার সাহায্যে কি চমৎকারভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন! ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীবজন্তু ঘরে বসে পানি পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক কারণে অবধারিতভাবেই তাদের কাছে পানি পৌছে গেছে।

কিন্তু মানুষ ও জীবজন্তুর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যার চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। এই তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিনে বৃষ্টিপাত হতো। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্তু জীবিকা নির্বাহের অপরাপর প্রয়োজনাদিতে যে কি পরিমাণ ত্রুটি দেখা দিত, তা অনুমান করা অভিজ্ঞজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাস্থ্যের অপরিসীম ক্ষতি হতো এবং কাজ-কারবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হতো।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতো যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হতো প্রত্যেকের জন্য একটি কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হেফাজত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা

চিন্তা করুন, এরূপ করা হলে প্রত্যেকেই এতগুলো চৌবাচ্চা অথবা পাত্র কোথা থেকে যোগাড় করত, যেগুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জমা করে রাখা যায় যদি কোনোরূপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই এ পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহর কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সর্বত্র সুলভ করার অপর একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা এই যে, আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই গাছপালা, ক্ষেত-খামার মানুষ ও জীব-জন্তুকে সিক্ত করার কাজে লেগে যায়, কিছু পানি উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও নিম্নভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অতঃপর একটি বৃহৎ অংশকে বরফের স্তূপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শৃঙ্গে সঞ্চিত রাখা হয়। সেখানে ধুলাবালি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌঁছতে পারে না। যদি তা পানির মতো তরল অবস্থায় থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধুলাবালি অথবা অন্য কোনো দূষিত বস্তু সেখানে বস্তু সেখানে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। তাতে পশু-পক্ষীদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। ফলে পানি দূষিত হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে উঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চুয়ে-চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সর্বত্র পৌঁছে যায়। যেখানে ঝরনা নেই সেখানে মৃত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনির ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো নিয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথমত পানি সৃষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত। অতঃপর মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর একে মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার সুযোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন আপদবিপদ দেখা দিতে পারে যদ্দরুন মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। কুরআন পাকের فَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخَازِنِيْنَ আয়াতে এসব নিয়ামতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য : وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مُسْتَقْدِمِيْنَ [অগ্রগামী দল] ও مُسْتَأْخِرِيْنَ [পশ্চাদ্গামী দল] -এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত কাতাদাহ ও ইকরিমা (র) বলেন, যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি তারা পশ্চাদ্গামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহহাক বলেন, যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদ্গামী। মুজাহিদ বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদ্গামী। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী, গুনাহগাররা পশ্চাদ্গামী। হাসান বসরী, সাইদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা নামাজের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরি করে, তারা পশ্চাদ্গামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এ আয়াত থেকে নামাজের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি লোকেরা জানত যে, আজান দেওয়া ও নামাজের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফজিলত কতটুকু তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হতো এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারি যোগে স্থান নির্ধারিত করতে হতো।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এজন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহর কোনো এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফজিলত নিহিত, যেমন কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে একপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোনো নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাজের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اٰدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِيْنٍ يَابِسٍ تُسْمَعُ لَهٗ صَلْصَلَةٌ اَىْ صَوْتٌ اِذَا نُقِرَ مِّنْ حَمَاٍ طِيْنٍ اَسْوَدٍ مَّسْنُوْنٍ مُتَغَيِّرٍ ـ

২৬. আমি তো মানুষ অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেছি বিবর্তিত শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে। صَلْصَالٍ-শুষ্ক মৃত্তিকা। যাতে আঘাত করলে ঠনঠন করার আওয়াজ শোনা যায়। حَمَاٍ-অর্থ কালো মাটি। مَسْنُوْنٍ-অর্থ পরিবর্তিত, বিবর্তিত।

٢٧. وَالْجَانَّ اَبَا الْجِنِ وَهُوَ اِبْلِيْسُ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلِ خَلْقِ اٰدَمَ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ هِىَ نَارٌ لَا دُخَانَ لَهَا تَنْفُذُ فِى الْمَسَامِ ـ

২৭. এবং এটার পূর্বে অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্বে জিন অর্থাৎ জিনদের আদি পিতা ইবলীসকে সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ অগ্নি হতে। اَلسَّمُوْمُ-অর্থ এমন উষ্ণ অগ্নি যাতে ধোঁয়া নেই এবং লোমকূপের ভিতর যা ভেদ করে যায়।

٢٨. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ـ

২৮. আর স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি বিবর্তিত শুষ্ক ঠনঠনে কাল মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করতেছি।

٢٩. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ اَتْمَمْتُهٗ وَنَفَخْتُ اَجْرَيْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَصَارَ حَيًّا وَاِضَافَةُ الرُّوْحِ اِلَيْهِ تَشْرِيْفٌ لِاٰدَمَ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ ـ

২৯. যখন আমি তাকে সুঠাম করব পূর্ণাঙ্গ করব এবং তাতে আমার রূহ ফুৎকার করব সঞ্চার করব, অনন্তর তা জীবন্ত হয়ে উঠবে তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হও। অর্থাৎ ঝুঁকিয়ে অভিবাদনমূলক সেজদা করিও। رُوْحِىْ-আমার রূহ, এস্থানে رُوْحٌ [রূহ] শব্দটিকে আদমের মর্যাদাবিধানার্থে আল্লাহর প্রতি اِضَافَتٌ বা সম্বন্ধ করা হয়েছে।

٣٠. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فِيْهِ تَاكِيْدَانِ ـ

৩০. তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সেজদা করল, এস্থানে كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ-এ দুটি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টিবোধক শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

٣١. اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ اَبٰى اِمْتَنَعَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ـ

৩১. কিন্তু ইবলিস অর্থাৎ জিনদের আদি পিতা তা করল না। সে ফেরেশতাদের মধ্যেই বসবাস করত। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। তা হতে বিরত রইল।

٣٢. قَالَ تَعَالٰى يٰاِبْلِيْسُ مَالَكَ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا زَائِدَةٌ تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ـ

৩২. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হলো কি জিনিস তোমাকে বাধা দিল যে, সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? اَلَّا-মূলত ছিল اَنْ لَا এ স্থানে لَا শব্দটি زَائِدَةٌ অতিরিক্ত।

٣٣. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لَا يَنْبَغِى لِىْ اَنْ اَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ .

৩৩. সে বলল, আপনি বিবর্তিত শুষ্ক কাল মৃত্তিকা হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সেজদা করার নই। তাকে সেজদা করা আমার জন্য উচিত নয়।

٣٤. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ مَطْرُوْدٌ .

৩৪. তিনি আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান হতে অর্থাৎ জান্নাত হতে কেউ কেউ অর্থ করেন আকাশ হতে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি অভিশপ্ত। বিতাড়িত।

٣٥. وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ .

৩৫. কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রইল অভিশাপ। اَلدِّيْنِ এস্থানে অর্থ কর্মফল।

٣٦. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ اَىِ النَّاسُ .

৩৬. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

٣٧. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ .

৩৭. তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্যে হলে,

٣٨. اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَقْتِ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى .

৩৮. নির্ধারিত উপস্থিত হওয়ার দিন অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গা ফুৎকারের দিন পর্যন্ত।

٣٩. قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ اَىْ بِاِغْوَائِكَ لِىْ وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهُ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ الْمَعَاصِىَ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ .

৩৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন তার শপথ, আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্ম শোভন করে তুলব এবং তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ এ স্থানে ب টি قَسَمِيَه বা শপথ অর্থব্যঞ্জক। আর مَا টি مَصْدَرِيَه অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎস শব্দব্যঞ্জক। لَاُزَيِّنَنَّ-এটা উপরিউক্ত কসমের জওয়াব।

٤٠. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৪০. তবে তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাদের নয়। অর্থাৎ মু'মিনদেরকে নয়।

٤١. قَالَ تَعَالٰى هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ وَهُوَ

৪১. আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ।

٤٢. اِنَّ عِبَادِىْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ قُوَّةٌ اِلَّا لٰكِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ الْكَافِرِيْنَ .

৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যারা তোমার অনুকরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর অর্থাৎ মু'মিদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। سُلْطَانٌ অর্থ ক্ষমতা। اِلَّا এটা এস্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٣. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ اَىْ مَنِ اتَّبَعَكَ مَعَكَ .

৪৩. অবশ্যই এদের সকলের অর্থাৎ তোমার সাথে যারা তোমার অনুসরণ করেছে তারা সকলের নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।

٤٤. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ.

৪৪. তার সাতটি দরজা স্তর আছে, এর প্রতিটি দরজার জন্য তাদের মধ্য হতে বণ্টিত অংশ রয়েছে।

جُزْءٌ অর্থ– অংশ, হিস্যা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ادم : এখানে اَلْاِنْسَانَ-এর তাফসীর اٰدَمَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْاِنْسَانَ-এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টি عَهْد হয়েছে।

قَوْلُهُ حَمَإٍ : এর অর্থ– কাদা, কালো মাটি।

قَوْلُهُ تَنْفُذُ فِي الْمَسَامِ : এতে مَسْنُوْن-এর وَجْه تَسْمِيَة-এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَعُوْا : এটা وَقَعَ يَقَعُ হতে اَمْر-এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر-এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা সকলে পতিত হও। جَوَاب شَرْط হওয়ার কারণে শুরুতে فَا ، যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَاكِيْدَانِ : প্রথম تَاكِيْد টা اِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَى الْبَعْضِ-এর সম্ভাবনাকে শেষ করে দিয়েছে। যেমন اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ-এর মধ্যে বহুবচনের اِطْلَاق কতেকের উপর হয়েছে। কিন্তু اِنْفِرَادْ-এর সম্ভাবনা অবশিষ্ট রয়েছে। এটাকে اَجْمَعُوْنَ বলে নিরসন করে দিয়েছে। আয়াতের مَفْهُوْم এটা হবে যে, সকল ফেরেশতা সেজদা করেছেন। মনে হয় যেন হুকুমটা বিদ্যমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, যাতে ইবলিসও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَوْلُهُ بِاِغْوَائِكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ-এর মধ্যে مَا টা হলো مَصْدَرِيَه মওসূলাহ নয় যে, عَائِدْ-এর প্রয়োজন পড়বে। আর بَا ، হলো قَسَمِيَّه অর্থাৎ শপথ তোমার আমাকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে।

قَوْلُهُ اُزَيِّنَنَّ : এটা বাবে تَفْعِيْل-এর تَزْيِيْنٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه-এর وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ অর্থ– আমি অবশ্যই সৌন্দর্য দান করব, সজ্জিত করব।

قَوْلُهُ الْمَعَاصِىَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُزَيِّنَنَّ টা مُتَعَدِّىْ হয়েছে। আর তার মাফউল مَعَاصِىْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مُخْلَصِيْنَ : অর্থাৎ اَخْلَصْتَهُ لِعِبَادَتِكَ

قَوْلُهُ هٰذَا : অর্থাৎ تَخَلُّصُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اِغْوَائِكَ

قَوْلُهُ صِرَاطٌ عَلَىَّ : অর্থাৎ حَقٌّ عَلَىَّ

قَوْلُهُ وَهُوَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, هُوَ-এর مَرْجِعْ হলো اِنَّ عِبَادِىْ الخ আর اِنَّ عِبَادِىْ হলো صِرَاط مُسْتَقِيْم-এর بَيَان-

قَوْلُهُ اَطْبَاقٍ : এটা طَبَقٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ মর্যাদা যাতে শয়তানের মর্যাদার অনুসরণের হিসেবে জাহান্নামিদেরকে প্রবেশ করানো হবে। আর তারতীবের হিসেবে জাহান্নামের মর্যাদা সাতটি– ১. জাহান্নাম ২. লাযা ৩. হুতামা ৪. আস সা'ঈর ৫. আস সাকার ৬. আল জাহীম ৭. আল হাবিয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ الخ : **মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা** : রূহ [আত্মা] কোনো যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ– এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আব্দুর রউফ মানাভী বলেন, এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকের উক্তি এই যে, রূহ কোনো যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এ মতের পক্ষে বারোটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نَفَخَ শব্দের অর্থ ফুঁক মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেওয়া অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রূহ ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।

-[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

রূহ ও নফস সম্পর্কে কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি (র)-এর তথ্যানুসন্ধান : এখানে দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি তাফসীরে মাযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) বলেন, রূহ দু প্রকার- স্বর্গজাত ও মর্তজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই- কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা- এগুলো আদেশ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কুরআনে قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্তজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়। এ মর্তজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা মর্তজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরিউক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে; তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্তজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক ঊর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্তজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্তজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্তজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিণ্ডের জীবন ও ঐসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্তজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্তজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই نَفَخَ رُوْحٌ তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোনো বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِنْ رُّوْحِىْ বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মার উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এজন্যই কুরআন পাকে মানব সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্তজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রিফতের নূর, ইশক-মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গে লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহর দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহর সঙ্গ লাভের কারণেই আল্লাহর রহস্য দাবি করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ বলেন- فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ [তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো।]

ফেরেশতাগণ সেজদা করতে আদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে সূরা আ'রাফে ইবলিসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলিসকেও সেজদার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, সেজদার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইবলিসও যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই প্রসঙ্গত সেও আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা আদমের সম্মানার্থে যখন আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য সৃষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সেজদা করার আদেশ দেওয়াই হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কুরআন পাকে اَبٰى اَنْ يَسْجُدَ [সে সেজদা করতে অস্বীকৃত হলো] বলার পরিবর্তে اَبٰى اَنْ يَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ [সে সেজদাকারীদের সাথে শামিল হতে অস্বীকৃত হলো] বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সেজদাকারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্তু ইবলীস যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই যুক্তিগতভাবে তারও সেজদাকারী ফেরেশতাদের সাথে শামিল হওয়া অপরিহার্য ছিল। শামিল না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ : اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানি কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদম কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলে– اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا [আলে ইমরান]। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোনো সময় বুঝতেই পারে না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোনো ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলি এ তথ্যের পরিপন্থি নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্ত যে গুনাহ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা : لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলী (রা.) -এর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর্রি নিচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মতো সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অনুবাদ :

٤٥. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَّعُيُوْنٍ تَجْرِىْ فِيْهَا وَيُقَالُ لَهُمْ

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকিরা অবস্থান করবে জান্নাতে উদ্যানে ও প্রস্রবণসমূহে। জান্নাতে এগুলো প্রবাহিত থাকবে।

٤٦. اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اَىْ سَالِمِيْنَ مِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ اَوْ مَعَ سَلَامٍ اَىْ سَلِّمُوْا وَادْخُلُوْا اٰمِنِيْنَ مِنْ كُلِّ فَزَعٍ

৪৬. তাদেরকে বলা হবে তোমরা শান্তির সাথে ও সকল বিপদ হতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর। بِسَلَامٍ - অর্থাৎ সকল প্রকার ভীতিকর বসন্ত হতে নিরাপদ হয়ে কিংবা এর অর্থ সালামসহ অর্থাৎ সালাম প্রদান কর এবং তাতে প্রবেশ কর।

٤٧. وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ حِقْدٍ اِخْوَانًا حَالٌ مِنْ هُمْ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ حَالٌ اَيْضًا اَىْ لَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى قَفَا بَعْضٍ لِدَوَرَانِ الْاَسِرَّةِ بِهِمْ

৪৭. আর তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা বের করে দিব, তারা ভাই ভাই রূপে পরস্পর মুখামুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। তাদেরকে নিয়ে আসনসমূহ আবর্তন করবে। ফলে, তারা একজন অপর জনের পৃষ্ঠ দর্শন করবে না। غِلٍّ-অর্থ ঈর্ষা। اِخْوَانًا- এটা حَالٌ এর حَالٌ বাচক পদ। مُتَقَابِلِيْنَ-এটাও هُمْ-বাচক পদ।

٤٨. لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ اَبَدًا

৪৮. সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে কখনও বহিষ্কৃত হবে না। نَصَبٌ - অর্থ অবসাদ।

٤٩. نَبِّئْ خَبِّرْ يَا مُحَمَّدُ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الرَّحِيْمُ بِهِمْ

৪৯. হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও আমি মুমিনদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের সাথে আচরণে পরম দয়ালু। نَبِّئْ-অর্থ সংবাদ দাও।

٥٠. وَاَنَّ عَذَابِىْ لِلْعُصَاةِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ الْمُؤْلِمُ

৫০. এবং অবাধ্যাচারীদের জন্য আমার শাস্তি খুবই মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

٥١. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ وَهُمْ مَلَائِكَةٌ اِثْنَا عَشَرَ اَوْ عَشَرَةٌ اَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ جِبْرَئِيْلُ

৫১. আর তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কেও সংবাদ দাও। এরা ছিলেন বার জন বা দশজন বা তিন জন ফেরেশতা। হযরত জিবরাইল (আ.) এদের মধ্যে ছিলেন।

٥٢. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط اَىْ هٰذَا اللَّفْظَ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لَمَّا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْاَكْلُ فَلَمْ يَاْكُلُوْا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ خَائِفُوْنَ

৫২. যখন তারা তার নিকট আসল, বলল 'সালাম'। এই শব্দটি অভিবাদন স্বরূপে বলল। হযরত ইবরাহীম তাদের সামনে খানা পেশ করলেন, কিন্তু তারা আহার গ্রহণ করতেছেন না দেখে তিনি বললেন, আমরা তোমাদেরকে ভয় করতেছি। اِنَّا وَجِلُوْنَ অর্থ আমরা ভীত।

٥٣. قَالُوْا لَا تَوْجَلْ لَا تَخَفْ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ذِىْ عِلْمٍ كَثِيْرٍ هُوَ اِسْحَاقُ كَمَا ذُكِرَ فِىْ هُوْدٍ

৫৩. তারা বলল, 'ভয় করো না। আমরা তোমার প্রভুর তরফ হতে প্রেরিত তোমাকে এক বিদ্বান পুত্রের শুভসংবাদ দিতেছি। সূরা হূদে উল্লেখ রয়েছে যে, এই পুত্র হলেন হযরত ইসহাক। لَا تَوْجَلْ-অর্থ ভয় করো না। عَلِيْمٌ অর্থ যিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী।

٥٤. قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ بِالْوَلَدِ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ حَالٌ اَىْ مَعَ مَسِّهِ اِيَّاىَ فَبِمَ فَبِاَىِّ شَىْءٍ تُبَشِّرُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ

৫৪. সে বলল, আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছ? তোমরা কিসের কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ? عَلٰى اَنْ -এটা حَالٌ অর্থাৎ এই বার্ধক্যাবস্থা আমাকে স্পর্শ করা সত্ত্বেও? اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ -এই স্থানে تَعَجُّبٌ বা বিস্ময় প্রকাশার্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٥. قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ الْاٰئِسِيْنَ

৫৫. তারা বলল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। بِالْحَقِّ -এই স্থানে অর্থ সত্য সহ। اَلْقَانِطِيْنَ-অর্থ হতাশাগ্রস্তগণ।

٥٦. قَالَ وَمَنْ اَىْ لَا يَقْنَطُ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ الْكَافِرُوْنَ

৫৬. সে বলল, যারা পথভ্রষ্ট কাফের তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? আর কেউ হয় না। مَنْ-অর্থ কে? এই স্থানে এটা لَا [না] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَقْنَطُ -এটার ن অক্ষরটিতে কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকতসহ পাঠ করা যায়।

٥٧. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ شَأْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

৫৭. সে বলল, হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর কি বিষয়? আর কি অবস্থা ও কাজ রয়েছে?

٥٨. قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ كَافِرِيْنَ اَىْ قَوْمِ لُوْطٍ لِاِهْلَاكِهِمْ

৫৮. তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী অর্থাৎ কাফেরদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

٥٩. اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ ط اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ لِاِيْمَانِهِمْ

৫৯. লূত-পরিবারের বিরুদ্ধে নয়। আমরা অবশ্যই তাঁদের সকলকে তাঁদের ঈমানের কারণে রক্ষা করব।

٦٠. اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ لِكُفْرِهَا

৬০. তবে লূতের স্ত্রীকে নয়। আমরা নির্ধারণ করেছি যে, সে তার কুফরির কারণে অবশ্যই যারা পশ্চাতে রয়েছে তাদের অর্থাৎ শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سَالِمِيْنَ : سَلَامٌ-এর তাফসীর سَالِمِيْنَ দ্বারা করার কারণ হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।
প্রশ্ন হলো এই যে, سَلَامٌ হলো মাসদার هَا যমীরের উপর এর حَمْل বৈধ নয়। কেননা যমীর দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য যা ذَاتٌ অর মাসদারের حَمْل টা ذَاتٌ -এর উপর বৈধ হয় না।

উত্তর এই যে, মাসদারটা مُشْتَقٌ سَالِمِيْنَ হয়ে حَالٌ হয়েছে কাজেই بِتَاوِيْلِ حَمْلٌ বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَعَ سَلَامٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِسَلَامٍ-এর মধ্যে بَاء টা مَعَ অর্থে হয়েছে سَبَبِيَّة-এর জন্য হয়নি।

قَوْلُهُ سَلِّمُوْا : অর্থাৎ سَلِّمْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

قَوْلُهُ أُدْخُلُوْا : প্রশ্ন. أُدْخُلُوْا উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. হতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, آمِنِيْنَ টা أُدْخُلُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ ثَانِيَه হয়েছে بِسَلَامٍ থেকে নয়। কেননা আমলের ক্ষেত্রে আসল হলো فِعْل; মাসদার নয়।

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ هُمْ : অর্থাৎ هُمْ টা إِخْوَانًا থেকে حَالٌ হয়েছে صِفَتٌ হয় নি।

প্রশ্ন. মুযাফ থেকে حَالٌ হয়ে থাকে مُضَافٌ إِلَيْه যা حَالٌ হয়েছে هُمْ টা إِخْوَانًا যমীর থেকে مُضَافٌ إِلَيْه থেকে নয় আর এখানে

উত্তর. مُضَافٌ إِلَيْه যখন مُضَافٌ-এর جُزْء হয় তখন حَالٌ হওয়া বৈধ হয়। এখানে যেহেতু مُضَافٌ إِلَيْه টা مُضَافٌ-এর جُزْء কাজেই حَالٌ হওয়া বৈধ হয়েছে। আবার أُدْخُلُوْا-এর যমীর থেকেও حَالٌ হওয়া বৈধ। আবার إِخْوَانًا مُتَقَابِلِيْنَ থেকেও حَالٌ হওয়া বৈধ যখন إِخْوَانًا টা مُتَصَافِيْنَ বা مُتَحَابِّيْنَ-এর অর্থে হবে। আবার إِخْوَانًا-এর সিফতও হতে পারে।

قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ فِيْ هُوْدٍ : অর্থাৎ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

قَوْلُهُ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا : অর্থাৎ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَمِنْ بَابِ فَتَحَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ : **শানে নুযূল :** সা'লাবীর বর্ণনা হলো এই যে, পূর্ববর্তী আয়াত وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ [তাদের সকলের জন্যে দোজখের ওয়াদা রইল] এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র হযরত সালমান ফারসী (রা.) ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিহবল হয়ে পলায়ন করেন। তিনদিন পর্যন্ত তিনি পালায়নপর ছিলেন। অবশেষে তাঁকে প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির করানো হলো। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত সালমান ফারসী (রা.) আরজ করেন- وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ যখন নাজিল হয় তখন আমার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্যের বাহক করে প্রেরণ করেছেন- এ আয়াত দ্বারা আমার অন্তর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়; তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬ পৃ. ৩৫০]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পাপিষ্ঠদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে নেককার ঈমানদার পরহেজগার লোকদেরকে আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দান করবেন তার উল্লেখ রয়েছে। আর মুত্তাকী পরহেজগার হলো সেসব লোক যারা আল্লাহ পাকের তৌফিকে শয়তানের প্রতারণা এবং প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে। ইবলিস শয়তানের চরম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা দুনিয়ার পাগল হয় না; বরং আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ -[তাফসীরে কবীর, খ. ১৯, পৃ. ১৯১ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১৭১]

বেহেশতের বিবরণ : নিশ্চয় যারা পরহেজগার হবে, যারা সৎ ও সত্য পথের অনুসারী হবে, যারা শয়তানের ধোঁকা থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলবে, আল্লাহ পাকের শাস্তির ভয়ে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আশায় পাপাচার পরিহার করবে, তারা জান্নাতের চিরসুখ লাভ করবে। বেহেশতের মনোরম বাগানে তারা জীবন যাপন করবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর এবং নিশ্চিন্তে জান্নাতে বাস কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম তাদের পানির দুটি নির্ঝরিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্ঝরিণী থেকে পানি পান করতেই তাদের অন্তর থেকে ঐসব পারস্পরিক শত্রুতা বিধৌত হয়ে যাবে যা কোনো সময় দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বভাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা পারস্পরিক শত্রুতাও একপ্রকার কষ্ট এবং জান্নাত প্রত্যেক কষ্ট থেকেই পবিত্র।

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিন্দু পরিমাণও ঈর্ষা ও শত্রুতা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ ঐ হিংসা ও শত্রুতা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে হয় এবং এর

কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। মানব সুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার; এটা এ সাবধান বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে ঐ শত্রুতাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোনো শরিয়ত সম্মত কারণের উপর ভিত্তিশীল। আয়াতে এ ধরনের হিংসা ও শত্রুতার কথাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতিদের মন থেকে সর্বপ্রকার হিংসা ও শত্রুতা দূর করে দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কেই হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি আশা করি, আমি তালহা ও যুবায়ের ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো, যাদের মনোমালিন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর করে দেওয়া হবে। এতে ঐ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ : এ আয়াত থেকে জান্নাতের দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্ষতি হয়ই, বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোনো না কোনো সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোনো সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে- إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ অর্থাৎ এ হচ্ছে আমাদের রিজিক, যা কোনো সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে কোনো সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোনো বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোনো সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতিকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়! কুরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে- لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا অর্থাৎ তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোনো সময়ই পোষণ করবে না।

অনুবাদ :

٦١. فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوطٍ اَیْ لُوطًا الْمُرْسَلُوْنَ

৬১. প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের অর্থাৎ লূতের নিকট আসল।

٦٢. قَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ لَا اَعْرِفُكُمْ

৬২. তাদেরকে বলল, তোমরা তো অপরিচিত লোক। তোমাদেরকে তো আমি চিনতেছি না।

٦٣. قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا اَیْ قَوْمُكَ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ يَشُكُّوْنَ وَهُوَ الْعَذَابُ

৬৩. তারা বলল, বরং যে বিষয়ে এরা অর্থাৎ যে শাস্তি সম্পর্কে তোমার সম্প্রদায় সন্দেহ পোষণ করে আমরা তোমার নিকট তা নিয়ে এসেছি। يَمْتَرُوْنَ -অর্থ তারা সন্দেহ করে।

٦٤. وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ فِیْ قَوْلِنَا

৬৪. আমরা তো তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা আমাদের কথায় সত্যবাদী।

٦٥. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ اِمْشِ خَلْفَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ لِئَلَّا يَرٰى عَظِيْمَ مَا يَنْزِلُ لَهُمْ وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ وَهُوَ الشَّامُ

৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক অংশে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় আর তুমি তাদের পশ্চাদানুসরণ কর অর্থাৎ তাদের পশ্চাতে চলবে, আর এদের সম্প্রদায়ের উপর যে ভীষণ অবস্থা আপতিত হতে যাচ্ছে তা যেন দেখতে না পায় সেই কারণে তোমাদের কেউ যেন পিছন-দিকে না তাকায়। যে স্থানে তোমরা নির্দেশিত হয়েছ সেস্থানে অর্থাৎ শামদেশে তোমরা চলে যাও।

٦٦. وَقَضَيْنَآ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ وَهُوَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ حَالٌ اَیْ يَتِمُّ اِسْتِئْصَالُهُمْ فِی الصَّبَاحِ

৬৬. এই বিষয়ে তাকে [লূতকে] সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম ওহী পাঠিয়ে দিলাম যে, প্রত্যূষে তাদের সমূলে বিনাশ করা হবে। مُصْبِحِيْنَ -এটা حَالٌ বাচক পদ। অর্থাৎ প্রত্যূষে এদেরকে ধ্বংসসাধন করার কাজ সম্পন্ন হবে।

٦٧. وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ سَدُوْمَ وَهُمْ قَوْمُ لُوْطٍ لَمَّا اُخْبِرُوْا اَنَّ فِیْ بَيْتِ لُوْطٍ مُرْدًا حِسَانًا وَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَسْتَبْشِرُوْنَ حَالٌ طَمَعًا فِیْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ

৬৭. নগরবাসীগণ অর্থাৎ লূত সম্প্রদায় সাদূম নগরবাসীগণ যখন শুনল হযরত লূতের নিকট একদল অতীব সুন্দর বালক এসেছে তখন এদের সাথে অশ্লীল আচরণের আশায় উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হলো। অথচ ঐ বালকগণ মূলত ছিলেন আগন্তুক ফেরেশতা। يَسْتَبْشِرُوْنَ -এটা এইস্থানে حَالٌ বাচক পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٨. قَالَ لُوْطٌ اِنَّ هٰؤُلَآءِ ضَيْفِیْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ

৬৮. লূত বলল, তারা আমার অতিথি। সুতরাং তোমরা আমাকে বে ইজ্জত করোনা।

٦٩. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ بِقَصْدِكُمْ اِيَّاهُمْ بِفِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ

৬৯. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এদের সাথে অশ্লীল কর্মের কুবাসনা করে আমাকে হেয় করিও না।

٧٠. قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ عَنْ اِضَافَتِهِمْ

৭০. তারা বলল, আমরা কি বিশ্ব-জগত হতে অর্থাৎ এদেরকে অতিথি বানাতে নিষেধ করিনি?

٧١. قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ فَتَزَوَّجُوْهُنَّ

৭১. সে বলল, একান্তই তোমরা যদি কিছু করতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা চরিতার্থ করার বাসনা করতেছ তার জন্য এদেরকে বিবাহ করে নাও

٧٢. قَالَ تَعَالٰى لَعَمْرُكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَيْ وَحَيَاتِكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ

৭২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার এই স্থানে রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে জীবনের শপথ। তারা তাদের মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতেছে। يَعْمَهُوْنَ-অর্থ তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতেছে।

٧٣. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ جِبْرَئِيْلَ مُشْرِقِيْنَ وَقْتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর নাদ তাদেরকে আঘাত করল مُشْرِقِيْنَ- অর্থ সূর্য আলোকিত হওয়ার সময়।

٧٤. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا اَيْ قُرَاهُمْ سَافِلَهَا بِاَنْ رَفَعَهَا جِبْرِيْلُ اِلَى السَّمَاءِ وَاَسْقَطَهَا مَقْلُوْبَةً اِلَى الْاَرْضِ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ طِيْنٍ طُبِخَ بِالنَّارِ

৭৪. এবং আমি এইগুলোকে অর্থাৎ তাদের নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম হযরত জিবরাঈল (আ.) এইগুলোকে আকাশের দিকে উল্টিয়ে ছুড়ে মারলেন। আর তাদের উপর কঙ্কর বারি বর্ষণ করলাম। سِجِّيْلٍ-অর্থ আগুনে পোড়া মাটি।

٧٥. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ تَعَالٰى لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ الْمُعْتَبِرِيْنَ

৭৫. অবশ্যই এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহর একত্বের নিদর্শন অর্থাৎ প্রমাণ রয়েছে। اَلْمُتَوَسِّمِيْنَ-অর্থ যারা দেখে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে।

٧٦. وَاِنَّهَا اَيْ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ طَرِيْقِ قُرَيْشٍ اِلَى الشَّامِ لَمْ يَنْدَرِسْ اَفَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهِمْ

৭৬. অবশ্যই এগুলো অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের গ্রামসমূহ পথে অবস্থিত। শামের দিকে কুরায়শদের যাত্রা-পথে বিদ্যমান। এখনও এগুলোর ধ্বংসস্তূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তবুও কি তারা এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

٧٧. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَعِبْرَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

৭৭. অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন অর্থাৎ শিক্ষা বিদ্যমান।

٧٨. وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اِنَّهُ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ هِيَ غَيْضَةُ شَجَرٍ بِقُرْبِ مَدْيَنَ وَهُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ لَظٰلِمِيْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ شُعَيْبًا

৭৮. নিশ্চয় ঘন বনের অধিকারীরাও তো অর্থাৎ শুআইব সম্প্রদায় ও ছিল শুআইবকে অস্বীকার করার দরুন সীমালঙ্ঘনকারী। اِنْ كَانَ-এই اِنْ-টি مُخَفَّفَة অর্থাৎ লঘূকৃত। মূলত ছিল اِنَّ। اَلْاَيْكَةِ-অর্থ হলো ঘন-বন মাদায়েনের নিকটবর্তী একটি অঞ্চল।

٧٩. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بِاَنْ اَهْلَكْنَاهُمْ بِشِدَّةِ الْحَرِّ وَاِنَّهُمَا اَيْ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ وَالْاَيْكَةِ لَبِاِمَامٍ طَرِيْقٍ مُّبِيْنٍ وَاضِحٍ اَفَلَا يَعْتَبِرُ بِهِمْ اَهْلُ مَكَّةَ

৭৯. আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম প্রচণ্ড গরমের শাস্তি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। তারা অর্থাৎ লূত ও শুআইব সম্প্রদায় উভয়েই তো প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং মক্কাবাসীরা কি এদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না? اِمَامٍ-এই স্থানে অর্থ পথ। مُبِيْنٍ-অর্থ প্রকাশ্য

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِيْ لُوْطًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اٰلُ لُوْط দ্বারা শুধুমাত্র হযরত লূত (আ.) উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا থেকেও এটাই বুঝা যায়।

قَوْلُهُ لَا اَعْرِفُكُمْ : তোমরা অপরিচিত। না তোমরা স্থানীয় না আমি তোমাদের চিনি। এবং তোমাদেরকে মুসাফিরও মনে হচ্ছে না। কেননা তোমাদের উপর সফরের কোনো নিদর্শনও নেই।

قَوْلُهُ اَوْحَيْنَا : এটা সেই প্রশ্নের উত্তর যে, قَضَيْنَا-এর সেলাহ اِلٰى আসে না অথচ এখানে এসেছে?
উত্তর. اِلٰى টা قَضَيْنَا -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে আর اَوْحَيْنَا-এর সেলাহ اِلٰى আসে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الْاَمْرَ : এটা مُبْهَمْ বা অস্পষ্ট; اِنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُصْبِحِيْنَ দ্বারা এর تَفْصِيْل করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ هٰؤُلَاءِ থেকে حَالٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ مَقْطُوْعٌ-এর যমীর থেকে حَالٌ বলেছেন। আর مَقْطُوْعٌ টা مَقْطُوْعِيْنَ-এর অর্থে হবে।

قَوْلُهُ مُرْدًا : এটা اَمْرَدُ -এর বহুবচন; শুশ্রুহীন যুবককে বলে।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ يَسْتَبْشِرُوْنَ হলো اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ থেকে حَالٌ হয়েছে, সিফত হয়নি। কেননা জুমলা نَكِرَه হওয়ার কারণে مَعْرِفَه থেকে حَالٌ হতে পারে না।

قَوْلُهُ عَنْ اِضَافَتِهِمْ : অর্থাৎ ضِيَافَتُهُمْ মেজবানি করা।

قَوْلُهُ تَتَرَدَّدُوْنَ : অর্থাৎ يَتَحَيَّرُوْنَ فَكَيْفَ يَسْمَعُوْنَ نَصِيْحَتَكَ

قَوْلُهُ وَقْتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ : আজাবের সূচনা ফজর উদয়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। আর পরিপূর্ণতা পেয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর চিৎকারের মাধ্যমে সূর্যোদয় কালে। কাজেই কোনোই বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ تَنْدَرِسُ : এটা বাবে اِنْفِعَالٌ থেকে অর্থ– বিনষ্ট হওয়া, মিটে যাওয়া।

قَوْلُهُ طَرِيْقٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে اِمَامٌ দ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ مَا يُؤْتَمُّ بِهٖ; বরং এখানে রাস্তা উদ্দেশ্য। কেননা মুসাফির রাস্তারও অনুসরণ করে থাকে। রাস্তা যেদিক যায় মুসাফিরও সেদিকে যায়।

قَوْلُهُ الْمُتَوَسِّمِيْنَ : এটা مُتَوَسِّمٌ ইসমে ফায়েলের বহুবচন বাবে تَفَعُّلٌ হতে মাসদার تَوَسُّمٌ মূলবর্ণ وَسْمٌ অর্থ– তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ সম্মান : لَعَمْرُكَ –রূহুল মা'আনীতে অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম খেয়েছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবূ নয়ীম ও ইবনে মরদওয়াইহ প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে কাউকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোনো পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া : আল্লাহর নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম খাওয়া কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহর কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেন, খবরদার! আল্লাহ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারো কসম করতে হলে আল্লাহর নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলার কালামে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোনো সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

যেসব বস্তির উপর আজাব এসেছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ এতে আল্লাহ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহর আজাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ত'আলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়িকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারির উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই খুবই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ তা'আলার আজাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা পাষাণ হৃদয়ের কাজ; বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আজাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কুরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত লূত (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ একপ্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোনো মাছ, বেঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে 'মৃত সাগার' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, তাই এতে কোনো সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআন পাক অবশেষে বলেছে– إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মু'মিনেদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الخ : أَيْكَة শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙ্গল। কেউ কেউ বলেন, মাদইয়ানের সন্নিকটে একটি বন ছিল। এজন্য মাদয়ানবাসীদেরই উপাধি হচ্ছে أَيْكَة। কেউ কেউ বলেন, আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদয়ান দুটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর হযরত শোয়াইব (আ.) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

তাফসীর রূহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত মরফূ' হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। إِنَّ مَدْيَنَ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى إِلَيْهِمَا شُعَيْبًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

'হিজর' হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকাকে বলা হয় এখানে সামুদ গোত্রের বসতি ছিল।

সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মক্কার কাফেরদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতা বর্ণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সান্তনার বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন সূরার উপসংহারে উপরিউক্ত শত্রুতা ও বিরোধিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার বিস্তারিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ : "তারা উভয়তো প্রকাশ্য পথে অবস্থিত" অর্থাৎ হযরত লূত (আ.)-এর জনপদ সাদূম এবং হযরত শেয়ায়েব (আ.)-এর জনপদ আইকা উভয়ই মক্কা এবং সিরিয়ার মধ্যপথে, রাস্তার পার্শ্বেই রয়েছে। অথবা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর বস্তি আইকা এবং মাদয়ান উভয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এটি প্রকাশ্য পথের ধারেই রয়েছে। মক্কার কাফেররা যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরোধিতা করছিল এবং পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করছিল, তাদের সিরিয়া গমনের পথে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এ জনপদগুলো দেখে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বিরত থাকা উচিত। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৩৫৮]

এসব ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য : আলোচ্য ঘটনাবলির উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, রিসালাতের প্রমাণ উপস্থাপন করা। হযরত লূত সম্প্রদায় হযরত লূত (আ.)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করেছে, ওজনে কম দিয়েছে, পৌত্তলিকতায় মত্ত রয়েছে, এরপর আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর নবীকে অমান্য করবে, তাঁর আদর্শকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের শাস্তি অবধারিত। –[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. -৪, পৃ. -১৭৭]

অনুবাদ :

٨٠. وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ وَادٍ بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّامِ وَهُمْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ صَالِحًا لِاَنَّهُ تَكْذِيْبٌ لِبَاقِى الرُّسُلِ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِى الْمَجِىْءِ بِالتَّوْحِيْدِ

৮০. হিজরবাসীগণও অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়ও রাসূলদেরকে হযরত সালেহকে অস্বীকার করত সকল রাসূলকে অস্বীকার করেছিল। রাসূলগণ যেহেতু তাওহীদের বার্তা নিয়ে আসার বিষয়ে সকলই এক সেহেতু তাঁদের একজনকে অস্বীকার করা বাকি সকলকে অস্বীকার করার নামান্তর। حِجْر-হিজর হলো মদিনা ও শামের মধ্যে অবস্থিত একটি উপত্যকা।

٨١. وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فِى النَّاقَةِ فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا

৮১. আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন উষ্ট্র দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল। এতে তারা চিন্তা-গবেষণা করতো না।

٨٢. وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ

৮২. তারা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতো।

٨٣. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ وَقْتَ الصَّبَاحِ

৮৩. অতঃপর প্রভাতে তাদেরকে আঘাত করল মহানাদ। مُصْبِحِيْنَ -প্রভাতকালে।

٨٤. فَمَآ اَغْنٰى دَفْعَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنْ بِنَاءِ الْحُصُوْنِ وَجَمْعِ الْاَمْوَالِ

৮৪. অনন্তর তারা দুর্গ নির্মাণ ও অর্থ সম্পদ জমা করতো যা করেছিল তা তাদের কোনো কাজ আসেনি। তাদের হতে শাস্তি প্রতিহত করতে পারে নি।

٨٥. وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَا مُحَالَةَ فَيُجَازٰى كُلُّ اَحَدٍ بِعَمَلِهٖ فَاصْفَحْ يَا مُحَمَّدُ عَنْ قَوْمِكَ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ اَعْرِضْ عَنْهُمْ اِعْرَاضًا لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ

৮৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত সুনিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে। অনন্তর প্রত্যেককেই তার নিজের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে সুতরাং হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়কে চরমভাবে উপেক্ষা কর অর্থাৎ কোনোরূপ মনস্তাপ ব্যতিরেকে এদেরকে উপেক্ষা কর। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা এটা مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।

٨٦. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ لِكُلِّ شَىْءٍ الْعَلِيْمُ بِكُلِّ شَىْءٍ

৮৬. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে অতীব জ্ঞানী।

٨٧. وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ قَالَ ﷺ هِىَ الْفَاتِحَةُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لِاَنَّهَا تُثَنّٰى فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

৮৭. আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ আবৃত সাতটি আয়াত। শায়খাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন এই সাতটি আয়াত হলো সূরা ফাতিহার। কেননা এইগুলো প্রত্যেক রাকাতেই পুনঃ পুনঃ আবৃত হয়। আর দিয়েছি মহা কুরআন।

٨٨. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا أَصْنَافًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

৮৮. আমি এদের কতককে কতক শ্রেণিকে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তোমার চক্ষু কখনও প্রসারিত করিও না। এবং এরা যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে তুমি বিষণ্ন-চিন্তিত হয়োনা, আর মু'মিনদের প্রতি তোমার ডানা অবনত কর। অর্থাৎ তুমি নরম হও।

٨٩. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيْرُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ الْإِنْذَارُ

৮৯. এবং বল, আমি অবশ্যই তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হওয়া সম্পর্কে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। অর্থাৎ যার সতর্কীকরণ অতি স্পষ্ট।

٩٠. كَمَا أَنْزَلْنَا الْعَذَابَ عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى

৯০. যেমন আমি শাস্তি আপতিত করেছিলাম তাদের প্রতি যারা এখন বিভক্ত। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি।

٩١. الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ أَيْ كُتُبَهُمُ الْمُنَزَّلَةَ عَلَيْهِمْ عِضِيْنَ أَجْزَاءً حَيْثُ اٰمَنُوْا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوْا بِبَعْضٍ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِيْنَ اقْتَسَمُوْا طُرُقَ مَكَّةَ يَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْقُرْاٰنِ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ وَبَعْضُهُمْ شِعْرٌ

৯১. যারা কুরআন অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহ বিভক্ত করে রেখেছে। কতক অংশের উপর তো ঈমান রাখে আর কতক অংশ তারা প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটি হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যারা ইসলাম হতে লোকদের বাধা দেওয়ার জন্য মক্কার পথসমূহ ভাগ করে নিয়েছিল। কুরআন সম্পর্কে এদের কেউ বলত, এটা জাদু, কেউ বলত, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মন্ত্র, কেউ বলত এটা কবিতা। عِضِيْنَ-অর্থ ভাগ, খণ্ড খণ্ড অংশসমূহ।

٩٢. فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ

৯২. সুতরাং কসম তোমার প্রতিপালকের আমি তাদের সকলকে অবশ্য প্রশ্ন করব এই প্রশ্ন হবে ভর্ৎসনামূলক।

٩٣. عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯৩. সেই বিষয়ে যা তারা করে।

٩٤. فَاصْدَعْ يَا مُحَمَّدُ بِمَا تُؤْمَرُ أَيْ اِجْهَرْ بِهِ وَامْضِهِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ هٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ

৯৪. হে মুহাম্মদ! তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর তা চালু কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। এটা জিহাদ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিলের পূর্বের বিধান ছিল। اِصْدَعْ-এই স্থানে অর্থ প্রকাশ্যে কর।

٩٥. إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِكَ بِأَنْ أَهْلَكْنَا كُلًّا مِنْهُمْ بِاٰفَةٍ وَهُمُ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ وَعَدِيُّ بْنُ قَيْسٍ وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوْثَ

৯৫. তোমার সাথে বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট। এদের প্রত্যেককে কোনো না কোনো বিপদে ফেলে দিব। এই বিদ্রূপকারীরা ছিল, ওয়ালীদ-ইবনে মুগিরা, আল আস ইবনে ওয়াইল, আদী-ইবনে-কায়স, আল আসওয়াদ-ইবনে আল-মুত্তালিব এবং আল আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ।

٩٦. الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ج صِفَةٌ وَقِيْلَ مُبْتَدَأٌ وَلِتَضَمُّنِهٖ مَعْنَى الشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِيْ خَبَرِهٖ وَهُوَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ اَمْرِهِمْ

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদ জড়িয়ে নিয়েছে। শীঘ্রই তারা তাদের কাজের পরিণাম জানতে পারবে। صِفَتْ-এর-اَلْمُسْتَهْزِئِيْنَ-اَلَّذِيْنَ-এটা পূর্বে উল্লিখিত বা বিশেষণ। কেউ কেউ বলেন, এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য। এটার অর্থে যেহেতু শর্তের অর্থও অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তার خَبَرْ বা বিধেয় فَسَوْفَ- তেও ف ব্যবহার করা হয়েছে।

٩٧. وَلَقَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ مِنَ الْاِسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيْبِ

৯৭. আমি অবশ্যই জানি তারা বিদ্রূপ করে বা অস্বীকার করে যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকোচিত হয়। قَدْ-এটা এই স্থানে تَحْقِيْق বা বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٨. فَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ اَيْ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَكُنْ مِنَ السّٰجِدِيْنَ الْمُصَلِّيْنَ

৯৮. সুতরাং তুমি প্রশংসাসহ তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর অর্থাৎ বল, সুবহাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। এবং তুমি সেজদাকারীদের অর্থাৎ মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত হও। رَبِّكَ بِحَمْدِ- এই স্থানে এটা مُتَلَبِّسًا- এর সাথে مُتَعَلِّقْ বা সংশ্লিষ্ট।

٩٩. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ الْمَوْتُ

৯৯. নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِي النَّاقَةِ : মুফাসসির (র.) فِي النَّاقَةِ বলে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, اٰيٰتِنَا হলো বহুবচন আর তার তাফসীর اَلنَّاقَةُ হলো একবচন যা বৈধ নয়।

উত্তরের সার হলো এই যে, نَاقَةٌ কয়েকটি আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, পাহাড় থেকে উষ্ট্রী বের হওয়া, বের হয়ে সাথে সাথে বাচ্চা দেওয়া, তার বারিতে সমস্ত পানি পান করে ফেলা এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দান করা। কাজেই اٰيٰتِنَا -এর তাফসীর نَاقَةٌ দ্বারা করা বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَصْنَافًا : اَزْوَاجًا-এর তাফসীর اَصْنَافًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَزْوَاجًا-এর প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রকারভেদ উদ্দেশ্য। যেমন– কাফের, ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপুঁজক, মূর্তি পূজারী ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ كُتُبُهُمْ : قُرْاٰن- এর তাফসীর كُتُبُهُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, قُرْاٰن দ্বারা এখানে প্রসিদ্ধ قُرْاٰن উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَجْزَاءً : এটা عِضِيْنَ-এর শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করার জন্য বৃদ্ধি করেছেন। এটা عِضَةٌ-এর বহুবচন। মূলে ছিল عَضْوَةٌ যা فِعْلَةٌ ওযনে হয়েছে। এটা عَضَى الشَّاةَ হতে নির্গত। অর্থ– টুকেরা টুকেরা করা।

قَوْلُهُ صِفَةٌ : অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ এটা يَسْتَهْزِئِيْنَ -এর সিফত হয়েছে। কাজেই فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ : আর হে রাসূল! আমি আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বারে বারে [নামাজে] পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছে, হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, سَبْعٌ مَثَانِيْ দ্বারা সূরা ফাতেহাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এর আয়াত সাতটি।

তাফসীরকার কাতাদা (র.), হাসান বসরী (র.), আতা (র.), সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) এ মতই পোষণ করেন। বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, اُمُّ الْقُرْاٰنِ [সূরা ফাতেহা] সাত আয়াত। اَلْمَثَانِىْ অর্থাৎ যা নামাজে বারে বারে পাঠ করা হয়।

মাছানী নামকরণের তাৎপর্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান (রা.), কাতাদা (রা.) বলেছেন, যেহেতু সূরা ফাতেহা নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয় এজন্য এ সূরাকে "মাছানী" مَثَانِىْ বলা হয়েছে।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতেহার দু'টি অংশ রয়েছে। এক অংশ আল্লাহ পাকের জন্য, যাতে আল্লাহ পাকের প্রশংসা রয়েছে। আর অন্য অংশ হলো দোয়া যা বান্দার জন্যে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন সূরা ফাতেহাকে আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। হুসাইন ইবনে ফজল مَثَانِىْ (মাছানী) নামকরণের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সূরা ফাতেহা দুবার নাজিল হয়েছে। একবার মক্কা শরীফে আর একবার মদিনা শরীফে এবং প্রত্যেক বার সূরা ফাতেহার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, مَثَانِىْ শব্দটির অর্থ হলো নির্বাচিত, বাছাই করা। কেননা সূরা ফাতেহাকে আল্লাহ পাক এ উম্মতের জন্য বাছাই করেছেন অন্য কোনো উম্মতকে তা দান করেন নি। আবূ যায়েদ বলখী (র.) বলেছেন, ثَنَيْتُ الْعِنَانَ এর অর্থ হলো, আমি লাগামকে ফিরিয়ে দিয়েছি। যেহেতু সূরা ফাতেহা মন্দ লোকদেরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে দেয় এজন্য তাকে مَثَانِىْ বলা হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, مَثَانِىْ শব্দটি ثَنَىٌ থেকে নিষ্পন্ন। কেননা এ সূরায় আল্লাহর প্রশংসা স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ পাকের মহান গুণাবলির বিবরণ রয়েছে।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াতে سَبْعًا শব্দ দ্বারা সাতটি বড় বড় সূরা উদ্দশ্য করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম সূরা বাকারাহ, সূরা আনফাল এবং সূরা তওবা । এ দুটি সূরা একই সূরার হুকুমে এ জন্যে দুটি সূরার মধ্যখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয় না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সাতটি বড় বড় সূরার শেষ সূরা তওবা। আর কারো মতে সাতটি বড় সূরার মধ্যে সর্বশেষ সূরা হলো সূরা ইউনুস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) "মাছানী" مَثَانِىْ নামকরণের এ কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এ সাতটি সূরার মধ্যে ফরজসমূহ, অপরাধের শাস্তি, ভালোমন্দের দৃষ্টান্তসমূহ এবং শিক্ষণীয় ঘটনাবলি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এ সম্পর্কে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, مَثَانِىْ শব্দটি ثَنَىٌ শব্দ হতে নিষ্পন্ন। পবিত্র কুরআনের ভাষার অলঙ্কার শুধু যে সর্বত্র প্রশংসনীয় হয়েছে তাই নয়, বরং এটি অত্যন্ত বড় মোজেজা। কেননা এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে কেউ সক্ষম হয়নি। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির বিবরণ রয়েছে। এজন্য এটি প্রশংসাকারীও। এ প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনকে مَثَانِىْ বলা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে নাসির হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর ﷺ -ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তাওরাতের স্থলে আমাকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করেছেন। আর ইঞ্জিলের স্থলে সেই সূরাসমূহ দান করেছেন, যেগুলোর শুরুতে الٓرٰ এবং طٰسٓ রয়েছে। আর যাবূরের স্থলে طٰسٓ থেকে حٰمٓ বিশিষ্ট সূরাসমূহ দান করেছেন। আর حٰمٓ বিশিষ্ট সূরাসমূহ বাড়তি দান রয়েছে আমার প্রতি। বড় বড় সূরা ইতঃপূর্বে আর কোনো নবীকে দান করা হয়নি শুধু আমাকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -কে সাতটি বড় বড় সূরা দান করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-কে ছয়টি দেওয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন ফলক হাত থেকে ফেলে দেন, তখন দুটি সূরা উঠিয়ে নেওয়া হয় আর চারটি তাঁর কাছে রাখা হয়।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত ছাওবান (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হুজুর ﷺ -ইরশাদ করেছে, আল্লাহ পাক তাওরাতের স্থলে আমাকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করেছেন, আর ইঞ্জিলের স্থলে مِئِيْن

আর যাবূরের স্থলে مَثَانِىْ এবং আমার প্রতিপালক আমাকে আরও অনেক কিছু দিয়েছেন। তাউসের মত হলো, "মাছানী" শব্দ দ্বারা সমগ্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন, কুরআনে কারীমেও এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনকে مَثَانِىْ বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনকে مَثَانِىْ বলার কারণ হলো এই যে, এতে বিভিন্ন ঘটনা বারে বারে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সাহাবী হযরত আবূ সায়ীদ ইবনে মুআল্লা (রা.) বর্ণনা করেন- আমি নামাজেরত ছিলাম, এমন সময় হুজুরে আকরাম ﷺ আমাকে

ডাকলেন, নামাজে রত থাকার কারণে আমি সাড়া দিতে পারলাম না। নামাজ শেষ করে আমি তাঁর দরবার হাজির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কেন আসলে না? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি নামাজে ছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি কি আল্লাহ পাকের এ বাণী শ্রবণ করেনি- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখনই তিনি তোমাদেরকে ডাকেন। শোন! আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে পবিত্র কুরআনের বড় সূরার কথা বলব। কিছুক্ষণ পর যখন প্রিয়নবী ﷺ বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন, তা হলো সূরা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আর এটিই "সাবউল মাছানী"। অন্য হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা ফাতেহাই হলো সাবয়ে মাছানী। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু], পারা-১৪. পৃ. ১৬]

সূরা ফাতেহা সমগ্র কুরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কুরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতেহা একদিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরের ময়দানে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর উক্তি সম্পর্কে। তাফসীরে কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ঈমান কোনো বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না; বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তস্তলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে, যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহর হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ এ আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম গোপনে গোপনে ইবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সঙ্গোপনে একজন দুজনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, ইবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

قَوْلُهُ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ : এ বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি- আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এ পাঁচজনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্য কথা বললে কোনো উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার : ولقد نعلم আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন-নাহল মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلٰى اٰخِرِهَا مِائَةٌ وَّثَمَانٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

তবে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শেষ পর্যন্ত আয়াতটি ব্যতীত ১২৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. لَمَّا اسْتَبْطَأَ الْمُشْرِكُوْنَ الْعَذَابَ نَزَلَ أَتٰى أَمْرُ اللّٰهِ أَيِ السَّاعَةُ وَأَتٰى بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهِ أَيْ قُرْبٍ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ تَطْلُبُوْهُ قَبْلَ حِيْنِهِ فَإِنَّهُ وَاقِعٌ لَا مُحَالَةَ سُبْحٰنَهُ تَنْزِيْهًا لَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهِ غَيْرَهُ

٢. يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ أَيْ جِبْرَئِيْلَ بِالرُّوْحِ بِالْوَحْيِ مِنْ أَمْرِهِ بِإِرَادَتِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ أَنْ مُفَسِّرَةٌ أَنْذِرُوْا خَوِّفُوْا الْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَأَعْلِمُوْهُمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوْنِ خَافُوْنِ

٣. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَيْ مُحِقًّا تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ

٤. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مَنِيٍّ إِلٰى أَنْ صَيَّرَهُ قَوِيًّا شَدِيْدًا فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ مُبِيْنٌ بَيِّنُهَا فِيْ نَفْيِ الْبَعْثِ قَائِلًا مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

অনুবাদ :

১. মুশরিকরা আল্লাহর শাস্তি অনেক দূর বলে ভাবলে নাজিল হয়। আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসেই গেল। তা সন্নিকটে। সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তা ঘটতে দাবি করো না। সুনিশ্চিত ভাবেই এটা সংঘটিত হবে। তিনি মহান সকল পবিত্রতা তাঁরই এবং তারা তাঁর সাথে অন্য যার শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। أَتٰى -এটা مَاضِيْ বা অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ। বিষয়টির আমোঘতা বুঝাবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে এটার ব্যবহার করা হয়েছে।

২. তিনি তাঁর নির্দেশ তাঁর ইচ্ছায় রূহসহ অর্থাৎ ওহীসহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার নিকট ইচ্ছা অর্থাৎ নবীগণের নিকট ফেরেশতা জিবরাঈলকে প্রেরণ করে বলেন যে, কাফেরদের আজাব সম্পর্কে সতর্ক কর ভীতি প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমাকে ভয় কর। أَنْ أَنْذِرُوْا -এই স্থানে أَنْ শব্দটি مُفَسِّرَة বা বিবরণমূলক। إِتَّقُوْنِ অর্থ আমাকে ভয় কর।

৩. তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা তাঁর সাথে যা যে সমস্ত প্রতিমা শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে بِالْحَقِّ -অর্থ যথাযথভাবে। এটা মূলত এই স্থানে حَال বাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এটার তাফসীরে مُحِقًّا শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. তিনি ফোটা হতে অর্থাৎ শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। শেষে তাকে সুঠাম-শক্তিশালী করেছেন অথচ সে পুনরুত্থান অস্বীকার করার বিষয়ে একজন প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী। বলে, ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়ার পর হাড্ডিগুলোতে জীবন দান করবে? خَصِيْمٌ -অতিশয় বিতণ্ডাকারী। مُبِيْنٌ -স্পষ্ট।

٥. وَالْاَنْعَامَ الْاِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَنَصَبُهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ يُفَسِّرُهُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْ جُمْلَةِ النَّاسِ فِيْهَا دِفْءٌ مَا تَسْتَدْفِئُوْنَ بِهِ مِنَ الْاَكْسِيَةِ وَالْاَرْدِيَةِ مِنْ اَشْعَارِهَا وَاَصْوَافِهَا وَّمَنَافِعُ مِنَ النَّسْلِ وَالدَّرِّ وَالرُّكُوْبِ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ قُدِّمَ الظَّرْفُ لِلْفَاصِلَةِ

৫. তিনি আন'আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুও সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য অর্থাৎ মানুষজাতির জন্য তাতে রয়েছে উষ্ণতা লাভের উপকরণ অর্থাৎ তাদের লোম ও পশম হতে নির্মিত যে সমস্ত চাদর ও পোশাক দ্বারা মানুষ উষ্ণতা লাভ করে তা এবং বহু উপকার যেমন দুগ্ধ, পরিবহন ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে উপকার লাভ। আর তা হতে তোমরা আহারও করে থাক। اَلْاَنْعَامَ-এটা এমন একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যে পরবর্তী خَلَقَ ক্রিয়াটি হচ্ছে তার ভাষ্য স্বরূপ। مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ- এই স্থানে فَاصِلَه বা আয়াতসমূহের অন্তমিল রক্ষার জন্য ظَرْف অর্থাৎ مِنْهَا শব্দটি -কে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ زِيْنَةٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ تَرُدُّوْنَهَا اِلٰى مَرَاحِهَا بِالْعَشِيِّ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ تُخْرِجُوْنَهَا اِلَى الْمَرْعٰى بِالْغَدَاةِ

৬. যখন তোমরা বিকালে চারণভূমি হতে এদের গোয়ালে ফিরিয়ে আন এবং যখন প্রভাতে চারণ ভূমিতে বের করে নিয়ে যাও তখন তাতে দৃশ্য হয় তোমাদের সৌন্দর্য। جَمَالٌ অর্থ– সৌন্দর্য।

٧. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اَحْمَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ وَاصِلِيْنَ اِلَيْهِ عَلٰى غَيْرِ الْاِبِلِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط بِجُهْدِهَا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ بِكُمْ حَيْثُ خَلَقَهَا لَكُمْ

৭. এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেথায় উট ছাড়া অন্যভাবে প্রাণান্তকর ক্লেশ ব্যতীত পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তাই তিনি এই গুলো তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। اَثْقَالَكُمْ-তোমাদের বোঝাসমূহ। لَمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ -সে স্থানে তোমরা পৌছতে পারতে না। اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ –প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও ক্লেশ ব্যতীত।

٨. وَ خَلَقَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط مَفْعُوْلٌ لَهُ وَالتَّعْلِيْلُ بِهِمَا لِتَعْرِيْفِ النِّعَمِ لَا يُنَافِيْ خَلْقَهَا لِغَيْرِ ذٰلِكَ كَالْاَكْلِ فِي الْخَيْلِ الثَّابِتِ بِحَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ مِنَ الْاَشْيَاءِ الْعَجِيْبَةِ الْغَرِيْبَةِ

৮. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং বিস্ময়কর এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা অবগত নও। لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً - এটা مَفْعُوْل لَهُ বা হেতু বোধক কর্মকারক। উক্ত গৃহপালিত পশুসমূহের পরিচয়কে এই দুইটি বিষয়ের সাথে হেতুযুক্ত করা অন্য উপায়ে এগুলোর ব্যবহারকে অস্বীকার করে না। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, খাদ্য রূপেও অশ্ব ব্যবহার করা যায়।

٩. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ اَىْ بَيَانُ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَمِنْهَا اَىِ السُّبُلِ جَائِرٌ حَائِدٌ عَنِ الْاِسْتِقَامَةِ وَلَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدٰكُمْ اِلٰى قَصْدِ السَّبِيْلِ اَجْمَعِيْنَ فَتَهْتَدُوْنَ اِلَيْهِ بِاخْتِيَارٍ مِّنْكُمْ

৯. সরল পথ অর্থাৎ সরল পথের বর্ণনা দান আল্লাহর উপর ন্যস্ত। এটার মধ্যে অর্থাৎ পথের মধ্যে বক্রপথও আছে। আল্লাহ যদি তোমাদের হেদায়েত চাইতেন তবে অবশ্যই তোমাদের সকলকে সরল পথের হেদায়েত করতেন। ফলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা ক্রমেই এই দিকে পরিচালিত হতে। جَائِرٌ-এই স্থানে অর্থ বক্র।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ قُرْبَ : অর্থাৎ قُرْبَ وُقُوْعَهُ এবং تَطْلُبُوْهُ অর্থাৎ تَطْلُبُوْا وُقُوْعَهُ

قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : এটা উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে। অর্থাৎ سَبِّحْ سُبْحَانَهُ

قَوْلُهُ بِهِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَمَّا-এর মধ্যে مَا টি হলো مَوْصُوْلَه যার সেলাহ তে عَائِدْ -এর প্রয়োজন পড়বে না।

قَوْلُهُ عَمَّا : এতে سُبْحَانَهُ এবং تَعَالٰى উভয় ফে'লই تَنَازُعْ করতেছে। প্রত্যেকটাই عَمَّا- কে স্বীয় مَفْعُوْل বানাতে চায়। এ ব্যাপারটি تَنَازُعْ فِعْلَانِ-এর অন্তর্গত। বসরী নাহবীদের মতে দ্বিতীয় ফে'লকে আর কূফী নাহবীদের মতে প্রথম ফে'লকে আমল করতে দেবে।

قَوْلُهُ اَىْ جِبْرِيْلَ : প্রশ্ন. مَلَائِكَة বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে একবচন উদ্দেশ্য করার কারণ কি?

উত্তর. রূপকভাবে এরূপ করেছেন, যেমন اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ-এর মধ্যে مَلَائِكَة দ্বারা শুধুমাত্র হযরত জিবরীল (আ.) -ই উদ্দেশ্য। আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেছেন, যখন একক ব্যক্তি জামাতের নেতা / সর্দার হন তখন তার উপর বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা বৈধ। হযরত জিবরীল (আ.) যেহেতু ফেরেশতাগণের নেতা সেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে বহুবচনের শব্দের প্রয়োগ করা বৈধ।

قَوْلُهُ بِاِرَادَتِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنْ اَمْرِهِ-এর মধ্যকার مِنْ টি بَاء-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এ আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, مِنْ اَمْرِهِ-এর মধ্যে مِنْ টা بَيَانِيَّه ও হতে পারে না, تَبْعِيْضِيَّة ও হতে পারে না, আবার اِبْتِدَائِيَّة হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَنْ مُفَسِّرَةٌ : اَنْ مُفَسِّرَةٌ টা قَالَ অথবা قَالَ -এর مُشْتَقَّاتٌ অথবা قَالَ -এর সমার্থবোধক শব্দের পরে পতিত হয়; আর এখানে এরূপ হয়নি?

উত্তর. এখানে رُوْح যেহেতু ওহীর অর্থে। আর ওহী قَالَ -এর অর্থে। কাজেই اَنْ مُفَسِّرَه হওয়া বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. اِنْذَارٌ হলো مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل আর তা উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَنْذِرُوا الْمُشْرِكِيْنَ কাজেই اَنَّهُ لَا اِلٰهَ-এর মধ্যে اَنَّ টা যবরযুক্ত হওয়ার কারণ কি? কিয়াসের চাহিদা হলো اِنَّ যের যুক্ত হওয়া।

উত্তর. এই যে, এখানে اِعْلَمُوْا উহ্য রয়েছে। আর اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا হলো দ্বিতীয় মাফঊল। এ কারণে اَنَّهُ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مُحِقًّا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِالْحَقِّ টা حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, خَصِيْمٌ টা فَعِيْلٌ-এর ওযনে মুবালাগাহ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ نَصَبَهُ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُ خَلَقَهَا : অর্থাৎ এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ-এর অন্তর্গত। উহ্য ইবারত হলো- خَلَقَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

قَوْلُهُ دِفْءٌ : শীতের পোশাক, গরম কাপড়, উষ্ণতা অর্জন করার বস্তু, বাবে كَرُمَ ও سَمِعَ হতে মাসদার دَفَاءً-دَفُوْءًا-دِفْئًا: অর্থ- গরম হওয়া। উষ্ণতা অনুভব করা। اِسْتِدْفَاءٌ গরম কাপড় পরিধান করা।

قَوْلُهُ مِنْ اَشْعَارِهَا وَاَصْوَافِهَا : এটা مَا تَسْتَدْفِئُوْنَ-এর মধ্যস্থ مَا-এর بَيَانْ হয়েছে। دِفْءٌ-এর তাফসীর مَا تَسْتَدْفِئُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, دِفْءٌ মাসদার اِسْمِ مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে। এমনিভাবে دِفْءٌ -এর حَمْل ও বৈধ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ قَدَّمَ الظَّرْفَ لِلْفَاصِلَةِ : অর্থাৎ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ মূলে ছিল فَوَاصِلَ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ-এর রেয়ায়েতের কারণে ظَرْف -কে مُقَدَّم করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ مُرَاحُ بِضَمِّ الْمِيْمِ : আরামের জায়গা, ঠিকানা, জানোয়ারের পরিবেষ্টন।

قَوْلُهُ وَخَلَقَ : خَلَقَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে اَلْخَيْلَ-এর عَطْف টা اَلْاَنْعَامَ-এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ خَلَقَ الْاَنْعَامَ وَخَلَقَ الْخَيْلَ الخ

قَوْلُهُ مَفْعُوْلٌ لَهُ : এখানে زِيْنَةً হলো مَفْعُول لَهُ এবং لِتَرْكَبُوْهَا-এর مَحَلّ-এর উপর আতফ হয়েছে অর্থাৎ تَرْكَبُوْهَا এবং زِيْنَةً উভয়টিই خَلَقَ-এর مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে।

প্রশ্ন. উভয়টিই مَفْعُول لَهُ কিন্তু উভয়টিকে একই রীতিতে আনা হয়নি?

উত্তর. উভয়টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে যে, رُكُوْب-কে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের ফে'ল আর زِيْنَةً হলো خَالِقَ-এর ফে'ল।

قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيْلُ بِهِمَا لِتَعْرِيْفِ النِّعَمِ الخ : এটা হলো আহনাফের اِسْتِدْلَال-এর জবাব। এ আয়াত দ্বারা আহনাফ এভাবে প্রমাণ পেশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, গাধা এবং খচ্চরের সৃষ্টির কারণ زِيْنَت তথা সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। আর এ তিনটিকে খাওয়ার ইল্লত বলেননি। যেমনিভাবে اِنْعَامْ-এর মধ্যে تَخْلِيْق-এর ইল্লত اَكْل [খাওয়া] বর্ণনা করেছেন । অথচ مَنْفَعَت اَكْل তথা খাওয়ার উপকারিতা অন্যান্য উপকারিতা হতে ঊর্ধ্বে। আর আয়াত নিয়ামতের বর্ণনার জন্যই নেওয়া হয়েছে। আর একথা কিছুতেই মুনাসিব নয় যে, খোঁটা দেওয়ার স্থানে اَدْنٰى নিয়ামতের উল্লেখ করা হয় আর উচ্চ নিয়ামতকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ قَصْدُ السَّبِيْلِ : এটা اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْف-এর অন্তর্গত অর্থাৎ اَلسَّبِيْلُ الْقَصْدُ আর قَصْد হলো قَاصِدٌ অর্থে, যাতে করে حَمْل বৈধ হয়ে যায়। قَصْد বলা হয় সোজা রাস্তাকে। বলা হয় سَبِيْل قَصْد এবং سَبِيْل قَاصِد সোজা রাস্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নাহল প্রসঙ্গে : [সূরা নাহল মক্কায় অবতীর্ণ] এতে ১২৮ আয়াত এবং ১৬ টি রুকূ রয়েছে।

সূরা নাহল -এর নামকরণ : নাহল বলা হয় মধু মক্ষীকাকে। যেহেতু এতে মধু মক্ষীকার কথা রয়েছে তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুন নাহল। এ সূরার আরেকটি নাম হলো সূরাতুন নিয়াম। যেহেতু এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনেক নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে তাই তাকে সূরাতুন নিয়াম বলা হয়। আর এ নিয়ামতসমূহের আলোচনা মূলত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত দলিল প্রমাণ। এর দ্বারা শিরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাওহীদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত তাদের সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর নবুয়ত, রিসালতের বাস্তবতা এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ সূরার শেষ রুকূতে প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের সত্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রিসালতের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু মক্কা মুয়াযযমার কাফের মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে বদ্ধপরিকর ছিল তাই সূরার শেষে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্যধারণের এবং তাকওয়া-পরহেজগারির নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ সূরা মক্কা মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। তবে ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াত মদীনা মুনাওয়ারায় ওহুদের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ الخ : এ সূরাকে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে কিয়ামত ও আজাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহর তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

'আল্লাহর নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখে নেবে। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌছাও দূরবর্তী বিষয় নয়। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরি ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলিল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ এ কথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে رُوْحٌ শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে ওহী এবং অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে হেদায়েত বুঝানো হয়েছে। -[বাহর] এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

خَصِيْمٌ শব্দটি خُصُوْمَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ– ঝগড়াটে। اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– উট, ছাগল, গরু ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু –[মুফরাদাত-রাগিব]

دِفْءٌ-এর অর্থ– উত্তাপ লাভ করার বস্তু। অর্থাৎ পশম যা দ্বারা গরম বস্তু তৈরি করা হয়। تُرِيْحُوْنَ শব্দটি رَوَاحٌ থেকে تَسْرَحُوْنَ শব্দটি سَرَاحٌ থেকে উদ্ভূত। চতুষ্পদ জন্তুর সকাল বেলায় চারণ ক্ষেত্রে গমনকে سَرَاحٌ এবং বিকাল বেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকে رَوَاحٌ বলা হয়। شِقِّ الْاَنْفُسِ -এর অর্থ পরিশ্রম।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সৃষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলি দ্বারা তাওহীদ সপ্রামণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টবস্তু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে নিয়োজিত করেছেন। মানবের সূচনা যে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে– فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হলো, তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কুরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দুটি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপি তৈরি করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

২. وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু জবাই করে খোরাক তৈরি করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। দুধ, দই, মাখন, ঘি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্রদ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য সাধারণ উপকার বুঝার জন্য বলা হয়েছে– وَمَنَافِعُ অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আর অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐ সব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর আরও একটি উপকার আরববাসীদের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের সামগ্রী, বিশেষত চতুষ্পদ জন্তু যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা সকালে গোশালা থেকে চারণক্ষেত্রে গমন করে। কারণ তখন চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মালিকদের বিশেষ শান-শওকত ও জাঁকজমক ফুটে উঠে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারি জিনিসপত্র দূর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ি, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

أَثْقَالَ অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐ সব জন্তুর কথা প্রসঙ্গত উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্টি হয়েছে সওয়ারি ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। এদের দুধ ও গোশতের সাথে মানুষের কোনো উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরিয়তের আইন নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে–

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً অর্থাৎ আমি ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও– বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শানশওকত বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কুরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ : সওয়ারির তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে– وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে বিভিন্ন কলকব্জা তৈরি করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতিপ্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খানি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোনো লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোনো হালকা ধাতু তৈরি করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ/ জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্বোল্লিখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خَلَقَ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে يَخْلُقُ বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ তা'আলা আয়াতে সেগুলোর নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তখনকার দিনে যদি রেল, মোটর, বিমান ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করতেন, তবে তাতে সম্বোধিতদের মস্তিষ্কের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোনো লাভ হতো না। কেননা তখন এমন জিনিসের কল্পনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল না। উপরিউক্ত যানবাহন বুঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহৃত হতো না। ফলে এগুলোর কোনো অর্থই বুঝা যেত না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী (র.) বলতেন, কুরআন পাকে রেলের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্কৃতই হয়নি। তাই তিনি শুধু রেলের কথাই বলতেন।

মাসআলা : কুরআন পাক প্রথমে اَنْعَامٌ অর্থাৎ উট, গরু-ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে– وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু গোশ্ত তক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্ত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশ্ত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্ত ঘোড়ার ব্যাপারে দুটি পরস্পরবিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম। হওয়া বুঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। কারো মতে হালাল এবং কারো মতে হারাম ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এ পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলে-ননি; কিন্তু মাকরূহ বলেছেন। –[আহকামুল কুরআন-জাসসাস]

মাসআলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহংকার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশি অথবা আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একথাই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা– এটা হারাম –[তাফসীরে বায়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তাওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি 'মধ্যবর্তী বাক্য' হিসেবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ওয়াদার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিভাত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথে সোজা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে। এ কারণেই আল্লাহর অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। তারা এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করে না, বরং পথভ্রষ্টতার আবর্তে ঘোরাফেরা করে।

এরপর বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু রহস্য ও যৌক্তিকতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় চলুক। সরল পথ আল্লাহ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা বেছে নিতে পারে।

١٠. هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ تَشْرَبُوْنَهُ وَّمِنْهُ شَجَرٌ يَنْبُتُ بِسَبَبِهِ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ تَرْعَوْنَ دَوَابَّكُمْ .

১১. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً دَالَّةً عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِىْ صُنْعِهِ فَيُؤْمِنُوْنَ .

١٢. وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى مَا قَبْلَهُ وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأً وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ بِالْوَجْهَيْنِ مُسَخَّرٰتٌ بِالنَّصْبِ حَالٌ وَالرَّفْعُ خَبَرٌ بِاَمْرِهِ ط بِاِرَادَتِهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

١٣. وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا ذَرَاَ خَلَقَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ ط كَاَحْمَرَ وَاَخْضَرَ وَاَصْفَرَ وَغَيْرِهَا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ .

١٤. وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ ذَلَّلَهُ لِرُكُوْبِهِ وَالْغَوْصِ فِيْهِ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا هُوَ السَّمَكُ وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج هِىَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

অনুবাদ :

১০. তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় যা তোমরা পান কর আর উদ্ভিদ অর্থাৎ এটার মাধ্যমে উদ্ভিদ জন্মায় যাতে তোমরা পশুচারণ কর। تُسِيْمُوْنَ অর্থ তোমরা পশু চারণ কর।

১১. তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য জন্মান শস্য, জয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল, অবশ্যই তাতে উল্লিখিত বস্তুসমূহে রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রমাণ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। অনন্তর তারা ঈমান আনয়ন করে।

১২. তিনিই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অধীনস্ত তাঁর নির্দেশে তাঁর ইচ্ছায়। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পরিণামদর্শীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। وَالشَّمْسَ পূর্ববর্তী শব্দের عَطْف বা অন্বয় রূপে এটা مَنْصُوْب [ফাতহাযুক্ত] আর مُبْتَدَأً বা উদ্দেশ্য রূপে رَفْع [পেশযুক্ত] সহ পাঠ করা যায়। وَالنُّجُوْ এটাও উপরিউক্ত দুই রূপে পাঠ করা যায়। مُسَخَّرَاتٌ এটা হালরূপে مَنْصُوْب [ফাতহাযুক্ত] আর خَبَرٌ বা বিধেয়রূপে مَرْفُوْع [পেশযুক্ত] রূপে পাঠ করা হয়

১৩. এবং তিনি তোমাদের অধীন করেছেন বিবিধ রঙের যেমন– লাল, সবুজ ও হলুদ ইত্যাদি বস্তু পশু, উদ্ভিদ ইত্যাদি যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। যারা উপদেশ গ্রহণ করে সেই সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। يَذَّكَّرُوْنَ যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪. তিনিই সমুদ্রকে পরিভ্রমণ ও ডুব দেওয়ার জন্য অধীন অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তা হতে আর্দ্র গোশত অর্থাৎ মৎস আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলি বড় ও ছোট মুক্তা যা তোমরা পরিধান কর।

وَتَرَى تُبْصِرُ الْفُلْكَ السُّفُنَ مَوَاخِرَ فِيْهِ تَمْخَرُ الْمَاءَ اَىْ تَشُقُّهُ بِجَرْيِهَا فِيْهِ مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً بِرِيْحٍ وَاحِدَةٍ وَلِتَبْتَغُوْا عَطْفٌ عَلٰى لِتَاْكُلُوْا تَطْلُبُوْا مِنْ فَضْلِهِ تَعَالٰى بِالتِّجَارَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

আর তোমরা দেখতে পাও একই বাতাসে সামনে বা পশ্চাতে তার বুক চিরিয়ে নৌযান চলাচল করে যেন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাঁর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার আর তোমরা যেন এতদ্বিষয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। تَرَى অর্থ দেখ। اَلْفُلْكَ অর্থ নৌযানসমূহ। مَوَاخِرَ বলা تَمْخَرُ الْمَاءَ অর্থাৎ পানি চিরিয়ে চলে। وَلِتَبْتَغُوْا পূর্বোল্লিখিত لِتَاْكُلُوْا ক্রিয়ার সাথে এটার عَطْفٌ বা অন্বয় হয়েছে। অর্থ, এবং যাতে তোমরা তালাশ কর।

১৫. وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ لِ اَنْ لَّا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِكُمْ وَ جَعَلَ فِيْهَا اَنْهَارًا كَالنِّيْلِ وَسُبُلًا طُرُقًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ اِلٰى مَقَاصِدِكُمْ ـ

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে না দোলে এবং তিনি এতে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী যেমন নীলনদ ও বহু পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। رَوَاسِىَ সুদৃঢ় পর্বতসমূহ। اَنْ تَمِيْدَ এটা হেতুবোধক। তাই তাফসীরে এটার পূর্বে ل-এর উল্লেখ করা হয়েছে। تَمِيْدَ -এর পূর্বে এক না-বোধক لا উহ্য রয়েছে। অর্থ যেন না দোলে। سُبُلًا পথসমূহ।

১৬. وَعَلٰمٰتٍ تَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا عَلَى الطُّرُقِ كَالْجِبَالِ بِالنَّهَارِ وَبِالنَّجْمِ بِمَعْنَى النُّجُوْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ اِلَى الطُّرُقِ وَالْقِبْلَةِ بِاللَّيْلِ ـ

১৬. এবং চিহ্নসমূহও। যা দ্বারা তোমরা দিবসে পথ নির্ণয় কর যেমন পাহাড়সমূহ। আর নক্ষত্ররাজির সাহায্যেও তারা রাত্রিতে কিবলা ও পথ নির্দেশ পায়। اَلنَّجْمِ এটা এ স্থানে বহুবচন اَلنُّجُوْمِ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭. اَفَمَنْ يَّخْلُقُ وَهُوَ اللّٰهُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ط وَهُوَ الْاَصْنَامُ حَيْثُ تُشْرِكُوْنَهَا مَعَهُ فِى الْعِبَادَةِ لَا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ هٰذَا اَفَتُؤْمِنُوْنَ ـ

১৭. যিনি সৃষ্টি করেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তিনি কি তাঁর মতো যে সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের মতো যে, তোমরা এগুলিকে তাঁর শরিক কর। না, তিনি এগুলির মতো নন। তবুও কি তোমার এ উপদেশ গ্রহণ করবে না? এবং ঈমান আনয়ন করবে না?

১৮. وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط تَضْبِطُوْهَا فَضْلًا اَنْ تُطِيْقُوْا شُكْرَهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ حَيْثُ يُنْعِمُ عَلَيْكُمْ مَعَ تَقْصِيْرِكُمْ وَعِصْيَانِكُمْ ـ

১৮. তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার শুকরিয়া আদায় করা তো দূরের কথা তার সংখ্যা নির্ণয়ও করতে পারবে না। গণনাবদ্ধ করতে পারবে না আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই তিনি তোমদের ক্রটি ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেন।

١٩. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

১৯. তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন।

٢٠. وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِالتَّا وَالْيَاءِ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهُوَ الْاَصْنَامُ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ يُصَوَّرُوْنَ مِنَ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا

২০. তারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিমাকে আহ্বান করে উপাসনা করে তারা তো কিছুই সৃষ্টি করে না অথচ তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। পাথর ইত্যাদি দ্বারা এগুলোর আকৃতি গঠন করা হয়। يَدْعُوْنَ এটা ى বা নাম পুরুষ ও ت বা দ্বিতীয় পুরুষ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে

٢١. اَمْوَاتٌ لَا رُوْحَ فِيْهِمْ خَبَرٌ ثَانٍ غَيْرُ اَحْيَاءٍ تَاكِيْدٌ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيِ الْاَصْنَامُ اَيَّانَ وَقْتَ يُبْعَثُوْنَ اَيِ الْخَلْقُ فَكَيْفَ يَعْبُدُوْنَ اِذْ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا اِلَّا الْخَالِقُ الْحَيُّ الْعَالِمُ بِالْغَيْبِ.

২১. এরা মৃত এদের আসলেই কোনো প্রাণ নাই। নির্জীব এবং কখন সকল সৃষ্টির পুনরুত্থান-এর সময় সে বিষয়ে তাদের এ প্রতিমাসমূহের কোনো চেতনা নেই। সুতরাং কেমন করে এদের উপাসনা করা যায়? কেননা, চিরঞ্জীব, অদৃশ্য সম্পর্কে পরম জ্ঞানী, সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন কেউ ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না। اَلَّذِيْنَ এটা পূর্ববর্তী আয়াতোক্ত - اَمْوَاتٌ -এর خَبَرٌ ثَانٍ বা দ্বিতীয় বিধেয়। غَيْرُ اَحْيَاءٍ এটা تَاكِيْدٌ বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ حَالٌ : (مُسَخَّرَاتٍ) اَلشَّمْسَ -এর উপর نَصَبٌ -এর সুরতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর পূর্বে উল্লিখিত سَبَبٌ থেকে حَالٌ হবে আর আমেল হবে سَخَّرَ-এর যমীর। আর اَلشَّمْسُ -এর উপর رَفْع -এর সুরতে مُسَخَّرَاتٌ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ مَا ذَرَاَ : এর আতফ হয়েছে اَللَّيْلَ-এর উপর। মুফাসসির (র.) سَخَّرَ উহ্য বের করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَوَاخِرَ : এটা مَاخِرٌ-এর বহুবচন। বাবে فَتَحَ হতে মাসদার مَخْرًا ، مُخُوْرًا অর্থ– পানি ভেদ করা।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى لِتَاكُلُوْا : অর্থাৎ تَبْتَغُوْا -এর আতফ لِتَاكُلُوْا-এর উপর হয়েছে। আর মাঝের বাক্যটি হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا : এর আতফ হলো رَوَاسِيَ -এর উপর। কেননা اَلْقٰى -এর মধ্যে جَعَلَ -এর অর্থ রয়েছে।

قَوْلُهُ خَبَرٌ ثَانٍ : অর্থাৎ اَمْوَاتٌ টা اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ-এর দ্বিতীয় খবর। আর প্রথম খবর হলো مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ تَاكِيْدٌ : অর্থাৎ غَيْرُ اَحْيَاءٍ টা اَمْوَاتٌ-এর تَاكِيْد হয়েছে কাজেই عَدَمُ حَاجَتٍ -এর প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ : شَجَرٌ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোনো কোনো সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجَرٌ বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। কেননা এরপরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশির ভাগ সম্পর্ক। تُسِيْمُوْنَ শব্দটি اِسَامَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বারবার এ বিষয়ের প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তাভাবনার দাবি রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোনো কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই; বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবরাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে–

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বুঝতে তেমন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই। এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে–

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ এতে তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোনো নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

قَوْلُهُ سَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ : রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশ্‌ত লাভ করে।

قَوْلُهُ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا : এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশ্‌ত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে জবাই করা শর্ত নয় এ যেন আপনা-আপনি তৈরি গোশ্‌ত।

قَوْلُهُ وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا : এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةً-এর শাব্দিক অর্থ– শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐ রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বুঝানো হয়েছে, যা সমুদ্র গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করে গলায় অথবা অন্যান্য পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজসজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

قَوْلُهُ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ : এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْكٌ শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি مَاخِرَةٌ-এর বহুবচন। مَخْرٌ-এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূরদূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূরদূরান্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

قَوْلُهُ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ : رَوَاسِىَ শব্দটি رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– ভারী পাহাড়। تَمِيْدَ শব্দটি مَيْدٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূমণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোনো দিক দিয়ে ভারী এবং কোনো দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূপৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছু সংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মতো একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক– উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরি ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন, যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মতো চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কিনা, এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَامَاتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মঞ্জিলে মকসূদে পৌছার জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে– وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোনো গন্তব্যস্থানে পৌছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

قَوْلُهُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : অর্থাৎ পথিক যেমন ভূপৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

অনুবাদ :

٢٢. اِلٰهُكُمُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَا نَظِيْرَ لَهُ فِىْ ذَاتِهٖ وَلَا فِىْ صِفَاتِهٖ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ جَاحِدَةٌ لِلْوَحْدَانِيَّةِ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ مُتَكَبِّرُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا.

২২. তোমাদের ইবাদতের যোগ্য অধিকারী তোমাদের ইলাহ তিনিই এক ইলাহ। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে কেউই তাঁর নজির নাই। তিনি হচ্ছেন সুমহান আল্লাহ পাক। সুতরাং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর আল্লাহর একত্বের অস্বীকারকারী এবং তারা ঈমান আনয়নের বিষয়ে অহংকারী। مُنْكِرَةٌ অর্থ– অস্বীকারকারিণী। يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তারা অহংকার প্রদর্শন করে।

٢٣. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ط فَيُجَازِيْهِمْ بِذٰلِكَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ وَنَزَلَ فِى النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ

২৩. এটা নিঃসন্দেহ যে, যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। অনন্তর তিনি তাদেরকে এগুলোর প্রতিফল প্রদান করবেন। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন। لَا جَرَمَ অর্থ– নিঃসন্দেহে।

٢٤. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ ذَا مَوْصُوْلَةٌ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ قَالُوْا هُوَ اَسَاطِيْرُ اَكَاذِيْبُ الْاَوَّلِيْنَ اِضْلَالًا لِلنَّاسِ.

২৪. আল্লাহ তা'আলা নযর ইবনে হারিছ সম্পর্কে নাজিল করেন– তাদেরকে যখন বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর কি অবতীর্ণ করেছেন? তখন তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে এটা সেকালের উপকথা, মিথ্যা কাহিনী। مَا এটা এ স্থানে اِسْتِفْهَامِيَّةٌ বা প্রশ্নবোধক। ذَا এটা مَوْصُوْلَةٌ বা সংযোজক অব্যয়।

٢٥. لِيَحْمِلُوْا فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ اَوْزَارَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ كَامِلَةً لَمْ يُكَفَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَمِنْ بَعْضِ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط لِاَنَّهُمْ دَعَوْهُمْ اِلَى الضَّلَالِ فَاتَّبَعُوْهُمْ فَاشْتَرَكُوْا فِى الْاِثْمِ اَلَا سَاۤءَ بِئْسَ مَا يَزِرُوْنَ يَحْمِلُوْنَهُ حِمْلُهُمْ هٰذَا.

২৫. পরিণামে কিয়ামত দিবসে তারা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা তার বিন্দুমাত্র কাফ্ফারা হবে না এবং তাদের পাপের কতক যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। কেননা, এরা তাদেরকে গোমরাহির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। তারা এদের অনুসরণ করেছে। সুতরাং পাপের মধ্যে এরাও তাদের অংশী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُتَكَبِّرُوْنَ : مُسْتَكْبِرُوْنَ-এর তাফসীর مُتَكَبِّرُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتِفْعَالٌ টা تَفَعُّلٌ-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এ আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, এখানে طَلَبٌ-এর অর্থ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, حُبٌّ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহার বৈধ নয়। কেননা حُبٌّ-এর تَعَلُّقٌ অন্তঃকরণের সাথে হয়ে থাকে। আর অন্তঃকরণ مُجَسَّمٌ হয়ে থাকে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র উত্তর. عَدَمِ حُبٍّ-এর লাযেমী অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ শাস্তি। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ هُوَ : প্রশ্ন. هُوَ উহ্য মানার কারণ কি?

উত্তর. اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ যেহেতু قَالَ-এর مَقُوْلَهٗ আর مَقُوْلَهٗ-এর জন্য জুমলা হওয়া জরুরি অথচ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ হলো مُفْرَدٌ অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাক্য নয়। মুফাসসির (র.) هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়ে পরিপূর্ণ বাক্য হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِيَحْمِلُوْا-এর মধ্যে لَامٌ টা عَاقِبَتٌ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ حِمْلُهُمْ هٰذَا : এটা مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত নিদর্শনগুলো এত সুস্পষ্ট যে, যে কোনো বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের তৌহিদ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে- اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মাবুদ তিনি একক, অদ্বিতীয় মাবুদ, তাঁর কোনো শরিক নেই।

কিন্তু যারা নির্বোধ, যারা ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে না, যাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় নেই তথা এ জীবনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই নেই, পৃথিবীতে কেন তারা এসেছে? কার নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তারা নিজেদের অস্তিত্ব লাভ করেছে? এ জীবনের অবসানের পর তাদের কি অবস্থা হবে? এসব কথা যারা চিন্তা করেন না তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির প্রতি বিশ্বাস করে না এবং এজন্য কোনো প্রস্তুতিও গ্রহণ করে না। তাই ইরশাদ হয়েছে-

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ বস্তুত যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যকে গ্রহণ করে না, যদি কেউ দিবালোকে চক্ষু বন্ধ করে রাখে এবং সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তবে তার যে অবস্থা হয়, কাফের মুশরিকদেরও অনুরূপ অবস্থা। তাদের অন্তরে সত্যকে গ্রহণ করার এবং অসত্যকে বর্জন করার শক্তি নেই, তাদের দৃষ্টিতে আলো-আঁধারের পার্থক্য নেই। দুনিয়ার ক্ষণাস্থায়ী জীবনকে তারা চিরস্থায়ী মনে করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে তারা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ : আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আখেরাতকে মানে না তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার অনন্ত-অসীম নিয়ামতকে অস্বীকার করে, অথচ এ নিয়ামতসমূহকে তারা অহরহ ভোগ করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। এর কারণ এই, আল্লাহ পাক তাদের নাফরমানি, নিমকহারামী এবং অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে মারেফাতের নূর থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাই চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধ।

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তৌহিদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেছে এ আয়াত থেকে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের এ সন্দেহ নতুন কিছু নয়, বরং পূর্বকালের নবীগণের সময়ও এমন সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ কারণে তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের ধ্বংস হওয়াই ছিল সন্দেহের প্রতি উত্তর। ইরশাদ হয়েছে- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ তাদেরকে যখন বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি নাজিল করেছেন? তারা বলে প্রাচীনকালের লোকদের কিস্সা-কাহিনী মাত্র।

শানে নুযূল : প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম ﷺ যখন তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের দলিল হিসেবে ঘোষণা করেন, এই কুরআনে কারীম আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহ পাক আমাকে নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আর পবিত্র কুরআন আমার প্রতি নাজিল করেছেন, তখন কাফের মুশরিকরা বলত এটি আল্লাহর কালাম নয়; বরং এটি প্রাচীন কিচ্ছা-কাহিনী [নাউযুবিল্লাহ] তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে লিখেছেন– আরববাসী যখন এ কথা জানতে পারল যে, মক্কা মুয়াযযমায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তারা হজের মৌসুমে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে, এদিকে মক্কার মুশরিকরা বিভিন্ন রাস্তায় মোড়ে দুর্বৃত্তদেরকে মোতায়েন করে রাখে যেন তারা মানুষকে প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ লোকেরা যখন মক্কাবাসীকে জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের পরওয়ারদেগার কি নাজিল করেছেন? অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দাবি করেছেন তাঁর প্রতি আল্লাহ পাক কুরআন নাজিল করেছেন, সে সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ তখন তারা বলত, না তেমন কিছু নয়; বরং এটি প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এটি আল্লাহর প্রেরিত কালাম নয়। [নাউযুবিল্লাহ]

–[তাফসীরে মাযহারী. খ. ৬ পৃ. ৩৮৫]

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যখন প্রিয়নবী ﷺ তাঁর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআনকে মোজেজা হিসেবে পেশ করেছেন, তখন কাফেররা বলেছে, এটি মোজেজা বলে কিছু নয়; বরং এতে প্রাচীন কালের লোকদের কিছু-কিচ্ছা কাহিনীই রয়েছে।

প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ আপত্তিকর মন্তব্য কে করেছে? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কাফেররা একে অন্যকে একথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হজের উদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে কাফের সর্দাররা যে দুর্বৃত্তদের মোতায়েন করে রাখত, তারা এসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। ঐ দুর্বৃত্তরা সর্বদা মানুষকে প্রিয়নবী ﷺ এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত।

قَوْلُهُ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ : অর্থাৎ তারা যে পবিত্র কুরআনের অমর্যাদা করেছে এবং এ সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, তার পরিণামে কেয়ামতের দিন তারা নিজেদের গুনার বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুনার বোঝাও বহন করবে যারা তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) এবং মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাকবে, তাকে নেক আমলকারীর সমান ছওয়াব দেওয়া হবে। [তার আহ্বানে যে নেক আমল করল] তার সওয়াব কম করা হবে না। আর যে পাপাচারের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, তার এতটুকু গুনাহ হবে, যতখানি পাপাচারীর হবে। আর এজন্যে যে পাপকার্যে লিপ্ত হবে, তার গুণাহ কম হবে না।

قَوْلُهُ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ : যারা পথভ্রষ্টকারী, তারা তাদের অনুসারীদের কিছু গুনার বোঝা বহন করবে। مِنْ অব্যায়টির কারণে এ মর্ম প্রকাশ পায়। কেননা পাপাচারীদের নিজস্ব কিছু গুনাহ থাকবে। আর কিছু গুনাহ পথভ্রষ্টকারীদের কারণে হবে, আর এ গুনাহগুলোর বোঝা কেয়ামতের দিন তাদেরকেই বহন করতে হবে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৩৮৬]

قَوْلُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : অর্থাৎ যারা মানুষকে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে পথভ্রষ্ট করে, তাদের নিকট এর কোনো জ্ঞান বা দলিল নেই। অথবা এর অর্থ হলো যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা অজানা অবস্থায় পথভ্রষ্ট হয়, তারা একথা জানেনা যে পথভ্রষ্ট লোকরাই তাদেরকে পথহারা করেছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে সতর্কবাণী রয়েছে যে, না জানার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তাদের না জানা ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেককে বিবেক– বুদ্ধি দিয়েছেন যা দ্বারা হক্ব ও বাতিল বা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

قَوْلُهُ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ : সতর্ক হও! তারা যে গুনার বোঝা নিজেদের উপর তুলে নিচ্ছে তা অত্যন্ত মন্দ বোঝা। কেননা যে গুনার কাজের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীর ন্যায় গুনার অংশীদার হয়। কিন্তু এজন্য অনুসারীর গুনার বোঝা এতটুকুও কম হয় না।

আলোচ্য আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা করত। কেয়ামতের দিন তাদের নিজেদের পাপাচারের শাস্তির পাশাপাশি অন্যদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার শাস্তিও তারা ভোগ করবে। –[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৫৫২]

অনুবাদ :

٢٦. قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُوَ نَمْرُوْدُ بَنٰى صَرْحًا طَوِيْلًا لِيَصْعَدَ مِنْهُ اِلَى السَّمَاءِ لِيُقَاتِلَ اَهْلَهَا فَاَتَى اللّٰهُ قَصَدَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْاَسَاسِ فَاَرْسَلَ عَلَيْهِ الرِّيْحَ وَالزَّلْزَلَةَ فَهَدَمَتْهَا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ اَيْ وَهُمْ تَحْتَهُ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ مِنْ جِهَةٍ لَا تَخْطُرُ بِبَالِهِمْ وَقِيْلَ هٰذَا تَمْثِيْلٌ لِاِفْسَادِ مَا اَبْرَمُوْهُ مِنَ الْمَكْرِ بِالرُّسُلِ.

২৬. তাদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন ফলে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল আর তারা এর নিচে চাপা পড়ল এবং এমন দিক হতে তাদের উপর শাস্তি আসল যা ছিল তাদের ধারণার অতীত। তাদের কল্পনায়ও এই দিকের চিন্তা আসে নাই। সে ছিল নমরূদ। আকাশে চড়ে তথাকার অধিবাসীদের হত্যা করার জন্য সে বিরাট এক বালাখানা নির্মাণ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে তা ধ্বংস করেছিলেন। فَاَتَى اللّٰهُ 'আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন' এ বাক্যটি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তাদের সুকঠিন চক্রান্তকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তা বুঝাতে উদাহরণ স্বরূপ এ বাক্যটির ব্যবহার হয়েছে। এ স্থানে اَتَى اللّٰهُ এটা قَصَدَ 'তিনি ইচ্ছা করেন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْقَوَاعِدُ অর্থ ভিত্তিমূল।

٢٧. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ يُذِلُّهُمْ وَيَقُوْلُ لَهُمُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ تَوْبِيْخًا اَيْنَ شُرَكَائِيَ بِزَعْمِكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ تُخَالِفُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهِمْ ط فِيْ شَانِهِمْ قَالَ اَيْ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَهُ شَمَاتَةً بِهِمْ.

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের বাচনিক ভর্ৎসনা করে তাদেরকে বলবেন, কোথায় তোমাদের কল্পনা প্রসূত আমার সেই সমস্ত শরিক যাদের সম্বন্ধে যাদের বিষয় নিয়ে তোমরা বিতণ্ডা করতে মু'মিনদের বিরোধিতা করতে। যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা অর্থাৎ নবী ও মু'মনগণ বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যই। এ কথা তাঁরা এদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আনন্দ প্রকাশার্থে বলবেন। يُخْزِيْهِمْ অর্থ তিনি এদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। قَالَ الَّذِيْنَ এ স্থানে قَالَ ক্রিয়াটি مَاضِيْ বা অতীতকাল বাচক হলেও مُسْتَقْبِلْ বা ভবিষ্যৎকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেহেতু এটার তাফসীরে يَقُوْلُ ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٨. اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ص بِالْكُفْرِ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ اِنْقَادُوْا وَاسْتَسْلَمُوْا عِنْدَ الْمَوْتِ قَائِلِيْنَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ ط شِرْكٍ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

২৮. কুফরি করত নিজেদের উপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটাবে, অনন্তর তারা আত্মসমর্পণ করত অর্থাৎ মৃত্যুর সময় বাধ্যগত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলবে আমরা কোনো মন্দকর্ম অর্থাৎ শিরক করতাম না। ফেরেশতাগণ বলবেন, হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এটার প্রতিফল দেবেন। يَتَوَفّٰهُمْ এটা ي বা নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت বা নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয় রূপেই পাঠ করা যায়।

২৯. وَيُقَالُ لَهُمْ فَادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوَى مَأْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ـ

২৯. তাদেরকে বলা হবে সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর তাতে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে; অহংকারীদের আবাসস্থল অবশ্যই কত নিকৃষ্ট। مَأْوٰى অর্থ আবাসস্থল।

৩০. وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْاِيْمَانِ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط حَيٰوةٌ طَيِّبَةٌ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اَيِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ ط مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا قَالَ تَعَالٰى فِيْهَا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ هِيَ ـ

৩০. এবং যারা শিরক হতে আত্মরক্ষা করেছিল তাদেরকে বলা হবে 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, মহাকল্যাণ।' যারা ঈমান আনয়নের মাধ্যমে সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ার মঙ্গল অর্থাৎ পবিত্র ও সুখময় জীবন এবং পরকালের আবাস অর্থাৎ জান্নাত; এ দুনিয়া ও এর সকল কিছু হতে তা আরো উৎকৃষ্ট এবং তাতে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মুত্তাকীদের কত উত্তম আবাসস্থল এটা।

৩১. جَنّٰتُ عَدْنٍ اِقَامَةٍ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ الْجَزَاءِ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ـ

৩১. স্থায়ী ভাবে বসবাসের জান্নাত। এতে তারা প্রবেশ করবে। جَنّٰتُ عَدْنٍ মুবতাদা আর يَدْخُلُوْنَهَا খবর এর পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে এতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবে পুরস্কার প্রদানের মতো আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পুরস্কৃত করেন।

৩২. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ طَاهِرِيْنَ مِنَ الْكُفْرِ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ وَيُقَالُ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

৩২. কুফর হতে পবিত্রাবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে ফেরেশতাগণ মৃত্যুকালে বলবে, তোমাদের উপর সালাম– শান্তি। পরকালে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার ফলস্বরূপ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। اَلَّذِيْنَ এটা نَعْتٌ বা বিশেষণমূলক সংযোজক অব্যয়। طَيِّبِيْنَ অর্থ যারা পবিত্র।

৩৩. هَلْ مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُ الْكُفَّارُ اِلَّآ اَنْ تَأْتِيَهُمُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ط الْعَذَابُ اَوِ الْقِيٰمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ

৩৩. তারা অর্থাৎ কাফেররা কি هَلْ এটা এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতীক্ষা করে তাদের রূহ কবজ করার জন্য তাদের নিকট ফেরেশতা আসার বা তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ অর্থাৎ শাস্তি বা শাস্তি সংবলিত কিয়ামতের দিন আসার?

كَذٰلِكَ كَمَا فَعَلَ هٰؤُلَاءِ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْاُمَمِ كَذَّبُوْا رُسُلَهُمْ فَاُهْلِكُوْا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ بِاِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ.

এরা যেমন করে এদের পূর্ববর্তীগণও জাতিগণও এরূপ করত। তাঁরাও তাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অপরাধ ছাড়া ধ্বংস করত আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি; বরং তরাই কুফরি করত নিজেদের প্রতি জুলুম করত। يَنْتَظِرُوْنَ এ স্থানে অর্থ يَنْظُرُوْنَ [এরা প্রতীক্ষা করছে।] يَأْتِيَهُمْ এটা ى বা নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت বা নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٣٤. فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا ج اَىْ جَزَاؤُهَا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَىِ الْعَذَابُ.

৩৪. সুতরাং তারা যা করেছিল তার মন্দতা অর্থাৎ মন্দকর্মের প্রতিফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা অর্থাৎ আল্লাহর আজাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। আর তা তাদের উপর নেমে এসেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَصَدَ : যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য اِتْيَانٌ-এর اِطْلَاقٌ অসম্ভব, তাই مَجَازٌ হিসেবে اِتْيَانٌ-এর তাফসীর قَصَدَ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ بُنْيَانَهُمْ : এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ قَصَدَ اِسْتِيْصَالَ بُنْيَانِهِمْ

قَوْلُهُ لِاِفْسَادِ مَا اَبْرَمُوْهُ : অর্থাৎ تَمْثِيْل উদ্দেশ্য নেওয়ার সুরতে তাদের ষড়যন্ত্রকে যাকে তারা মহাশক্তিমান মনে করেছিল তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া উদ্দেশ্য হবে। নমরূদের নির্মিত ইমারত ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হবে না।

قَوْلُهُ اَىْ يَقُوْلُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَاضِىْ টা مُضَارِعْ-এর অর্থে হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়ার কারণে مُضَارِعْ-কে مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَائِلِيْنَ : قَائِلِيْنَ-এর বৃদ্ধিকরণ বাক্যকে সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক বানানোর জন্য করা হয়েছে। তা ব্যতীত পূর্বাপরের সংযুক্তি থাকে না।

قَوْلُهُ نَعْتٌ : অর্থাৎ اَلْمُتَّقِيْنَ হলো مَوْصُوْفٌ আর تَتَوَفّٰهُمْ হলো তার সিফত আর طَيِّبِيْنَ টা تَتَوَفّٰهُمْ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ : যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছিল এবং পবিত্র কুরআনকে অমান্য করেছিল, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে পূর্ববর্তীকালে যারা এমন অন্যায় করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা। এতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জন্যে একপ্রকার সান্ত্বনা। মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্যে এবং সত্যের আহ্বানকে চাপা দেওয়ার অপচেষ্টায় আজ যারা লিপ্ত রয়েছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, নবুয়ত ও রেসালতের ইতিহাসে এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়; বরং ইতঃপূর্বেও যুগে যুগে যখনই কোনো নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখনই সে যুগের দুর্বৃত্তরা সত্যের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে চক্রান্তের সৌধ নির্মাণ করেছে, কিন্তু অবশেষে ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে। আর এভাবেই ষড়যন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের চিরসমাধি ঘটেছে, তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ষড়যন্ত্র করে গেছে, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসে এবং তাদের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, পরিণামে তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে।

নমরুদের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলো নমরুদের ঘটনা। সে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল এবং পৃথিবীতে সেই সর্বপ্রথম অবাধ্য হয়েছিল। আল্লাহ পাক নমরুদকে ধ্বংস করার জন্য একটি মশা প্রেরণ করেছিলেন যা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছিল, সুদীর্ঘ চারশত বছর যাবৎ ঐ মশাটি তার মগজ চুষে খেয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে সে শুধু ঐ সময়েই একটু স্বস্তি লাভ করত যখন তার মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করা হতো। সে চারশ' বছর রাজত্ব করেছিল এবং চরম অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ ব্যক্তি হলো বখতে নসর। এ লোকটিও ছিল অত্যন্ত বড় ষড়যন্ত্রকারী এবং জঘন্য জালেম। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু], পারা ১৪, পৃ. ২৯ তাফসীরে কাবীর, খ. ২০, পৃ. ২০]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন, যারা ইতঃপূর্বে নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, ষড়যন্ত্রের ইমারত নির্মাণ করেছে, যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশ এসেছে তথা যখন তাদের প্রতি আজাবের হুকুম হয়েছে তখন তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা সত্যের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিরুদ্ধে তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেই ব্যবস্থাগুলোই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যেমন কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের দুশমন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করে আর ভূমিকম্প এসে সেই প্রাসাদকেই ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের উপর প্রাসাদের ছাদ নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ধ্বংসের উপকরণে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের পরিণামের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে কেউ কোনো প্রাসাদ তৈরি করেছিল যা ভেঙ্গে পড়ার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবশ্য ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা নমরুদ ইবনে কেনানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সে ইরাকের বাবুল শহরে আসমানের দিকে আরোহণের উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল সাড়ে সাত হাজার গজ। কাব এবং মোকাতেল (রা.) বলেছেন, এ প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল ছয় মাইল। কিন্তু প্রবল ঝড়ের কারণে ঐ প্রাসাদটি ভেঙ্গে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তার কিছু অংশ কাফেরদের মাথার উপর পড়ার কারণে তারা ধ্বংসের হয়ে যায়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৩৮৭ খোলাসাতুততাফাসীর, খ. ২, পৃ. ৫২৫]

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন যে, নমরুদ নির্মিত এ প্রাসাদটি পাঁচ হাজার গজ উঁচু ছিল। আর কারো কারো মতে এটি ছয় মাইল উঁচু ছিল। যখন আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসের হুকুম জারি করলেন, তখন ভূমিকম্পের কারণে এ প্রাসাদটির ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যায় আর কাফের মুশরিকরা তার নিচে পড়ে চিরতরে শেষ হয়ে গেল । তাই ইরশাদ হয়েছে– فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ। এরপর তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের উপর এমন স্থান থেকে আজাব আসে যা তারা ভাবতেও পারেনি। ফলে, তারা তাদেরই প্রাসাদের তলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় –[তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৯৭]

আল্লামা আলূসী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাফসীরকার যাহহাক (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তিনি একথাও লিখেছেন, নমরুদ নির্মিত এ উঁচু ইমারতটিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর ডানার আঘাতে ধ্বংস করে দেন কিন্তু নমরুদ তখন ধ্বংস হয়নি। সে ধ্বংসে হয়েছে মশার দংশনে যা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছিল

–[তাফসীরে রুহুল মাআনী, খ. ১৪, পৃ. ১২৫-২৬]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ : অর্থাৎ অপমান এবং লাঞ্ছনা সেই কাফেরদের জন্যে, ফেরেশতারা যাদের প্রাণ সংহার করে থাকেন এবং যারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে। তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা তো কোনো অসৎকাজ করতাম না। যারা কুফর ও নাফরমানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, কেননা তারা নিজেদেরকে চিরকাল আজাবে রাখার ব্যবস্থা করে, আর এটি তাদের প্রতি তাদের নিজেদেরই জুলুম। মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা, মরণ মুহূর্তের ভয়াবহ দৃশ্য, ফেরেশতাদের ধমক– সব মিলিয়ে যখন তারা চরম অসহায় হয়ে পড়বে, তখন তাদের সকল অহংকার চির বিদায় গ্রহণ করবে, তাদের দৌরাত্ম্য এবং ধৃষ্টতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে যাবে, তখন তারা বিনীত হয়ে বলবে– فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ আমরা তো কখনও মন্দ কাজ করেনি অথবা এর অর্থ হলো কাফেররা তখন আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি, আমরা সব সময়ই ভালো কাজ করে এসেছি

قَوْلُهُ بَلْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, না, তোমরা সব সময়ই মন্দ কাজ করতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কাফেররা তখনও মিথ্যা কথা বলে ফাঁকি দেওয়ার অপচেষ্টা করবে, অথচ তাদের জন্য উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোনো অবস্থাই গোপন নেই। তাই এ মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের কোনো উপকার হবে না।

তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কাফেরদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো সেই কাফের যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।

فَادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا : অতএব, তোমরা দোজখে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে তোমাদের কোনো ফন্দি ফিকির কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র, কলাকৌশল আল্লাহ পাকের আজাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

قَوْلُهُ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ : অতএব, অহংকারীদের ঠিকানা কত মন্দ, কাফের মুশরিকরা তাদের অহংকারের কারণেই নবীর দাওয়াতকে অস্বীকার করত। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় ঈমানের মোকাবিলায় কুফরি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকারের পরিণতি অপমান এবং লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, মক্কার কাফেরদেরকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি কি নাজিল হয়েছে? তখন তারা অহংকার করে বলত, এসব তো প্রাচীনকালের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র। তাদের এ আপত্তিকর মন্তব্যে ছিল অহংকার। ঈমানের মোকাবিলায় নাফরমানি শোকরের মোকাবিলায় না- শোকরী এবং বিনয়ের মোকাবিলায় অহংকার। এই অহংকারের শাস্তিই তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ভোগ করবে। -[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ২০২]

قَوْلُهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ الخ : সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি। আর তাদের পরিবেষ্টন করেছিল তাই, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত। আল্লাহর নবী-রাসূলগণের শত্রুতায় ইতঃপূর্বে যারা তৎপর হয়েছিল, দীন ইসলামের মহান শিক্ষাকে যারা উপহাস করেছিল অবশেষে তাদের উপর আপতিত হয় আল্লাহ পাকের আজাব। তাদের অন্যায়-অনাচারের জুলুম-অত্যাচারের বিভৎস পরিণাম তারা স্বচক্ষে দেখতে পায়। খোদাদ্রোহিতা তথা সত্যদ্রোহিতা যাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে, যারা সত্যকে শুধু বর্জনই করে না, বরং সত্যের প্রতি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে, তাদের আজাব হয়ে অত্যন্ত কঠিন, তাদের আত্মরক্ষার কোনো পথ থাকে না, তাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয় অবধারিত, তাদের দুর্ভোগের জন্য তারা নিজেরাই হয় দায়ী।

সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে সত্যদ্রোহীদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। যদিও মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। পবিত্র কুরআন বিশ্বগ্রন্থ। এতে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে রয়েছে হেদায়েত। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সুসংবাদ যেমন সর্বকালের সকল মানুষের উদ্দেশ্যে, ঠিক তেমনিভাবে এর প্রতিটি সতর্কবাণীও সকল দেশের সর্বকালীন মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। এ যুগে যারা দীন ইসলামের বিরোধিতা করে এমনকি দীন ইসলামের বিশেষ নিদর্শন টুপি-দাড়িকে উপহাস করে, আলোচ্য আয়াতের কঠোর সতর্কবাণী তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, তাদের শাস্তি অবধারিত। এ শাস্তির ভয়াবহতা তারা তখনই উপলব্ধি করবে, যখন তারা আল্লাহর আজাবের সম্মুখীন হবে। বিশেষত যখন তারা এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায় নেবে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত ১৯১৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দীন ইসলামকে উপহাস করা হয়েছিল। বোখারা, সমরকন্দ, আজাবরাইজান, বাকু, উজবেকিস্তান, তাজকিস্তান সহ বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মসজিদ মাদরাসাগুলোকে যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ তাদের শক্তি কেন্দ্রগুলো বন্ধ, তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত। কিন্তু শাস্তি শুধু এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতে হবে কঠিনতর শাস্তি।

قَوْلُهُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ : "আর আখেরাতের আজাব অত্যন্ত কঠিন" সে আজাব অবধারিত, চিরনির্ধারিত। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকবে তাদের শুভ পরিণতি তথা জান্নাত সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, তাঁর বিধানকে অমান্য করবে, এমনকি দীন-ইসলামের কোনো বিধানকে উপহাস করবে তাদের শাস্তি অবধারিত। আর এ শাস্তি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই হয়ে থাকে এটি আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান, এর ব্যতিক্রম নেই।

অনুবাদ :

٣٥. وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ط مِنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ فَاِشْرَاكُنَا وَتَحْرِيْمُنَا بِمَشِيَّتِهٖ فَهُوَ رَاضٍ بِهٖ قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ع اَيْ كَذَّبُوْا رُسُلَهُمْ فِيْمَا جَاؤُوْا بِهٖ فَهَلْ فَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الْاِبْلَاغُ الْمُبِيْنُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هِدَايَةٌ.

৩৫. মক্কাবাসী অংশীবাদীরা বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোনো কিছুর উপাসনা করতাম না এবং তাঁর হুকুম ব্যতীত কোনো কিছু যেমন বাহীরা সায়িবা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করতাম না। আমাদের এ শিরক করা ও নিষিদ্ধ করা আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে। সুতরাং তিনি এ কাজে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের পূর্ববর্তীগণও এরূপ করত অর্থাৎ তারাও রাসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তা অস্বীকার করেছিল। সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন রাসূলগণের উপর অন্য কিছু কর্তব্য আছে কি? না, নাই। সৎপথ কবুল করানো তাঁদের দায়িত্ব নয়। هَلْ এটা এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ সুস্পষ্টভাবে পৌছানো।

٣٦. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا كَمَا بَعَثْنَاكَ فِيْ هٰؤُلَاءِ اَنِ اَيْ بِاَنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج الْاَوْثَانَ اَنْ تَعْبُدُوْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ فَاٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ فَلَمْ يُؤْمِنْ فَسِيْرُوْا يَا كُفَّارَ مَكَّةَ فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ رُسُلَهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ.

৩৬. এদের নিকট যেমন প্রেরণ করেছি তেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আমি এ নির্দেশসহ রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর এবং তাগূত অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের উপাসনা বর্জন কর। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করে এবং তাদের কতকের উপর আল্লাহর জ্ঞানানুসারে পথ-ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। সুতরাং হে মক্কার কাফেরগণ! তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যারা রাসূলগণকে মিথ্যা জেনেছে তাদের কি ধ্বংসকর পরিণাম হয়েছে! حَقَّتْ এ স্থানে অর্থ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

٣٧. اِنْ تَحْرِصْ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى هُدٰهُمْ وَقَدْ اَضَلَّهُمُ اللّٰهُ لَا تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ مَنْ يُضِلُّ مَنْ يُرِيْدُ اِضْلَالَهٗ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

৩৭. হে মুহাম্মদ! আল্লাহ যখন এদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন তখন তুমি যদি এদের হেদায়েত করতে আগ্রহী হও তবু তা পারবে না। কেননা আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন যার বিভ্রান্তির তিনি ইচ্ছা করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী অর্থাৎ আল্লাহর আজাব হতে রক্ষাকারী নাই। لَا يَهْدِيْ এটা بِنَاءٌ لِلْفَاعِلِ বা কর্তৃবাচ্য ও بِنَاءٌ لِلْمَفْعُوْلِ বা কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।

٣٨. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَىْ غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ط قَالَ تَعَالٰى بَلٰى يَبْعَثُهُمْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا مَصْدَرَانِ مُؤَكِّدَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ اَىْ وَعَدَ ذٰلِكَ وَعْدًا وَحَقَّهُ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ـ

৩৮. তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে, যে মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন এতদ্বিষয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তা অবগত নয়। جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ অর্থ চূড়ান্ত দৃঢ়তার সাথে।
حَقًّا ... وَعْدًا এরা উভয়েই مَصْدَرْ [ক্রিয়ার উৎস] : تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সমধাতুজ উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে مَنْصُوْبْ [ফাতহাযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল وَعَدَ ذٰلِكَ وَعْدًا وَحَقَّهُ حَقًّا

٣٩. لِيُبَيِّنَ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْعَثُهُمُ الْمُقَدَّرِ لَهُمُ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ بِتَعْذِيْبِهِمْ وَاِثَابَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ فِىْ اِنْكَارِ الْبَعْثِ ـ

৩৯. যে বিষয়ে অর্থাৎ তাদের শাস্তি ও মু'মিনদের জন্য পুণ্যফল সম্পর্কিত দীনের বিধান সম্পর্কে তারা মু'মিনদের সাথে মতানৈক্য করত তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা যেন জানতে পারে যে, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করায় তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। সেজন্য তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। لِيُبَيِّنَ এটা এ স্থানে উহ্য يَبْعَثُهُمْ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٤٠. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَىْ اَرَدْنَا اِيْجَادَهُ وَقَوْلُنَا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى نَقُوْلَ وَالْاٰيَةُ لِتَقْرِيْرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ ـ

৪০. আমি কোনো কিছু চাইলে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব দিতে চাইলে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর কুদরত সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি আনা হয়েছে। قَوْلُنَا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَنْ نَّقُوْلَ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। فَيَكُوْنُ এটা অপর এক কেরাতে نَقُوْلَ-এর সাথে عَطْف বা অন্বয়রূপে نَصْبْ [ফাতহা] সহও পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَهُوَ رَاضٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কাফের মুশরিকদের এ কথা বলা যে, আমাদের শরিক করা এবং কোনো জিনিসকে হারাম করা আল্লাহর ইচ্ছা ও চাহিদার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, একথা তো একেবারেই ঠিক। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তো কোনো কিছুই হতে পারে না। এরপরও এটা অস্বীকার করা ও প্রতিহত করার কি উদ্দেশ্যে?

উত্তর. فَهُوَ رَاضٍ بِهٖ দ্বারা এই সংশয়েরই জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো এই যে, আল্লাহর مَشِيْئَتْ এবং ইরাদা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মনঃপূত হওয়া। অথচ مَشِيْئَتْ এবং اِرَادَهْ-এর জন্য রেজামন্দি জরুরি নয়। **قَوْلُهُ الْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ** : এখানে الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ-এর তাফসীর اَلْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, উভয়টি অর্থের ক্ষেত্রে مُتَعَدِّىْ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ تَعْبُدُوْهَا : এতে মুযাফ উহ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা نَفْس اَوْثَان থেকে বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য হয় না।

قَوْلُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, هِدَايَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ কাজেই এই সংশয়ের নিরসন হয়ে গেল যে, হেদায়েত ও রাহনুমায়ী তো عَامٌ এরপরও تَخْصِيْص -এর কি উদ্দেশ্য?

قَوْلُهُ لَا تَقْدِرُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِنْ تَحْرِصْ -এর جَزَاء উহ্য রয়েছে আর তা হলো– لَا تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ

قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ : এর কারণ হচ্ছে এই যে, مَنْ يُضِلُّ হলো মুবতাদা আর لَا يَهْتَدِىْ হলো তার খবর। অর্থ হলো এই যে, اِنَّ مَنْ يُضِلَّ اللّٰهُ لَا يَهْتَدِىْ اِلَيْهِ لِعَدَمِ تَغْيِيْرِ فِعْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

قَوْلُهُ مَنْ يُرِيْدُ اِضْلَالَهُ الخ : অর্থাৎ যদি مَنْ يُضِلُّ দ্বারা বাস্তবিক ভ্রষ্টতা উদ্দেশ্যে হয় তবে তো হেদায়েতের نَفِىْ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ لِيُبَيِّنَ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْعَثُهُمُ الْمُقَدَّرُ : এ ইবারতের উদ্দেশ্যে হলো এই যে, لِيُبَيِّنَ এর সম্পর্ক يَبْعَثُهُمْ-এর সাথে لَا يَعْلَمُوْنَ-এর সাথে নয়। কাজেই এই সংশয়ের নিরসন হয়ে গেল যে, لِيُبَيِّنَ -এর- لَا يَعْلَمُوْنَ-এর ইল্লত হওয়া সহীহ নয়। এখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, اِنَّهُمْ يَبْعَثُوْنَ لِيُبَيِّنَ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ

قَوْلُهُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে আর জুমলা হয়ে نَصَبْ -এর مَحَلْ-এ হয়েছে। আর যারা يَكُوْنَ-কে اَمْر-এর জবাব বলে مَنْصُوْب বলেছেন এটা ঠিক নয়। কেননা উভয় মাসদারই এক। অথচ نَصَبْ-এর মধ্যে এই شَرْط রয়েছে যে, প্রথমটা দ্বিতীয়টার জন্য سَبَبْ হবে আর এটা تَغَايُرْ -কে চায়। نَصَبْ-এর সুরতে جَوَابُ اَمْرٌ বৈধ। যদি نَقُوْلُ-এর উপর আতফ হয় جَوَابُ اَمْر হওয়ার কারণে নয়। অন্যথায় তো একটি مَوْجُوْد (مُكَوَّنْ)-এর জন্য দুটি وُجُوْدْ অর্থাৎ দুটি كَوْنْ হওয়া আবশ্যক হবে যে, তাদের একটি অপরটির سَبَبْ হবে।

قَوْلُهُ وَالْاٰيَةُ لِتَقْرِيْرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ : এ ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো এই প্রশ্নকে প্রতিহত করা যে, আল্লাহর বাণী كُنْ হয়তো مَوْجُوْدٌ থেকে হবে। এ সুরতে تَحْصِيْلِ حَاصِلْ আবশ্যক হবে। অথবা مَعْدُوْمٌ থেকে হবে তাহলে مَعْدُوْمٌ -কে خِطَابْ করা আবশ্যক হবে যা অসম্ভব। উত্তরের সার হলো, (كُنْ) -এর উদ্দেশ্য قُدْرَتْ عَلَى الْبَعْثِ -এর প্রমাণ করা ও سُرْعَةٌ فِى الْاِيْجَادِ তথা দ্রুত অস্তিত্বে আসা। কাজেই এখন আর কোনো প্রশ্ন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا الخ : কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন? এ সন্দেহ যে আসার তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে আসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে একপ্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আজাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না; ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধা করেন না কেন। একটি বোকামি ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

উপমহাদেশেও আল্লাহর কোনো রাসূল আগমন করেছেন কি? لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا এবং আরও একটি আয়াত وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোনো দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপর পক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذِيْرٍ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোনো রাসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত আরব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর কোনো পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই কুরআন পাকে তাদেরকে اُمِّيِّيْن নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে কোনো পয়গম্বর আসেননি।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ : আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি [এই নির্দেশ দিয়ে] যে তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগি কর, মিথ্যা উপাস্যদের থেকে দূরে থাক।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে নবী-রাসূলগণ এভাবে মানুষকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং কুফর, শিরক ও নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে শিরক ও কুফরের পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কেননা হযরত নূহ (আ.)-এর যুগেই জমিনে সর্বপ্রথম শিরক ও কুফর শুরু হয়। এ পর্যায়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন আমাদের নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ, যাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কুরআনের হেফাজত করা হবে। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এবং তাঁর অনুসরণই হলো আখেরাতে নাজাত লাভের একমাত্র পন্থা। কুরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ "হে রাসূল! আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি সকলের নিকট এ মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব, তোমরা শুধু আমার বন্দেগি কর।" যেমন সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে, وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ "আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগি কর এটি সরল সঠিক পথ" অতএব, মুশরিকদের একথা আদৌ সঠিক নয় যে "আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না।" তাদেরকে বারে বারে যুগে যুগে সতর্ক করা হয়েছে কিন্তু তারা সতর্ক হয়নি।

قَوْلُهُ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ : যেহেতু প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্তরে মানুষের জন্য অসাধারণ দয়ামায়া ছিল, মানুষের পথভ্রষ্টতায় তিনি হতেন অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যথিত, বিশেষত্ব মক্কার কাফের মুশরিকদেরকে হেদায়েত করার জন্যে তিনি থাকতেন অত্যন্ত উদগ্রীব। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ অর্থাৎ হে রাসূল! যদিও আপনি কাফের মুশরিকদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে আছেন এবং আপনার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই যে, কাফেররা ভ্রান্ত মত ও পথ বর্জন করে সরল সঠিক পথে চলে আসুক এবং দোজখ থেকে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করুক। কিন্তু হে রাসূল! যারা চরম নাফরমানীর কারণে হেদায়েত লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে আপনার আকঙ্ক্ষা পুরা হবার নয়। তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে তারা হেদায়েত গ্রহণ করবে না। তাই আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, আর তাদের হেদায়েতের জন্য আপনার ইচ্ছা এবং সংকল্প যত প্রবল হোকনা কেন, তা তাদের পক্ষে ফলদায়ক হবে না।

পুনরুত্থান আদৌ কঠিন নয় : আর মানবজাতির পুনরুত্থান আল্লাহ পাকের জন্যে কোনো কঠিন কাজই নয় কেননা আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হলো এই- اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ "আমি যখন কোনো কিছু করতে চাই তখন শুধু বলি হও, তখনই তা হয়ে যায়।" অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোনো কিছুর ইচ্ছা করা মাত্রই তা বাস্তবায়িত হয়। এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। অতএব, তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখনই কিয়ামত কায়েম হবে এবং সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থান হবে। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। اِذَا اَرَدْنٰهُ [আমি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করি।]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত হেকমত এবং শক্তিতে কোনো কিছুর সৃষ্টি অন্য কিছুর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রত্যেকটি সৃষ্টিই আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এজন্যই যখন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং কোনো কিছুর দৃষ্টান্ত ও ছিলনা তখন তিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং তার মাঝে যা কিছু আছে, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাই দ্বিতীয়বার এসব কিছু সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়। কেননা কোনো কিছুর সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হওয়াই যথেষ্ট।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, আমার বান্দা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, অথচ তার জন্য তা শোভনীয় ছিল না। আর আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে, আর এ কাজটিও তার জন্য উচিত হয়নি। আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই যে বান্দা বলেছে, যেভাবে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এভাবে দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না। অথচ প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের চেয়ে সহজ ছিল না। আর বান্দার গালি দেওয়ার কথা হলো এই যে, সে বলেছে আল্লাহ পাক সন্তানসন্ততি গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক, অদ্বিতীয় কারো মুখাপেক্ষী নই, আমি কারো পিতাও নই, পুত্রও নই, আমার কোনো দৃষ্টান্তও নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, বান্দার গালি দেওয়া হলো এই যে, সে বলেছে আমার সন্তানসন্ততি রয়েছে অথচ আমি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। -[বুখারী শরীফ]

অনুবাদ :

٤١. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ لِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا بِالْاَذٰى مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهٗ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُنْزِلَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا دَارًا حَسَنَةً ط هِىَ الْمَدِيْنَةُ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةِ اَكْبَرُ ـ اَعْظَمُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ اَوِ الْمُتَخَلِّفُوْنَ عَنِ الْهِجْرَةِ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ مِنَ الْكَرَامَةِ لَوَافَقُوْهُمْ ـ

৪১. মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে কষ্ট পেয়ে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা আল্লাহর পথে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার মানসে হিজরত করে এরা হলেন রাসূল ﷺ ও সাহাবীবৃন্দ আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার ঠিকানা দেব তাদেরকে অবতারণ করাব উত্তম আবাসে অর্থাৎ মদিনায়। حَسَنَةً এটা এ স্থানে উহ্য মওসূফ دَارً-এর সিফত। আর পরকালের পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত অবশ্যই অধিকতর বড় মহান হায় যদি তারা অর্থাৎ কাফেররা বা হিজরত হতে যারা পশ্চাতে রয়েছে তারা জানত যে, মুহাজিরদের জন্য কি মর্যাদা বিদ্যমান তবে নিশ্চয় তারা এদের অনুসরণ করত।

٤٢. هُمُ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلٰى اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْهِجْرَةِ لِاِظْهَارِ الدِّيْنِ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوْنَ ـ

৪২. এরা তারা যারা মুশরিকদের পীড়নের সম্মুখে ও দীন প্রকাশের তাগিদে হিজরতের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তিনি তাদেরকে তাদের ধারণার অতীত স্থান হতে জীবিকার ব্যবস্থা করবেন।

٤٣. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىٓ اِلَيْهِمْ لَا مَلٰئِكَةً فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ الْعُلَمَاءَ بِالتَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُوْنَهٗ وَاَنْتُمْ اِلٰى تَصْدِيْقِهِمْ اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ـ

৪৩. তোমার পূর্বেও আমার প্রত্যাদেশসহ মানুষ ভিন্ন আর কাউকেও পাঠাইনি ফেরেশতা পাঠাননি তোমার যদি তা না জান তবে উপদেশ অধিকারীদেরকে অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তারা তা জানে। মু'মিনরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে যতটুকু বিশ্বাস করে তোমার তো এদেরকে তা হতেও অধিক বিশ্বাস করে থাক।

٤٤. بِالْبَيِّنٰتِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ اَرْسَلْنَاهُمْ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ وَالزُّبُرِ الْكُتُبِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ فِيْهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ فَيَعْتَبِرُوْنَ ـ

৪৪. আমি তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন প্রমাণাদি ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতিও উপদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি এতে মানুষের জন্য হালাল-হারাম ইত্যাদি যে বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য যাতে তারা এতে চিন্তা করে। অনন্তর শিক্ষা গ্রহণ করে। بِالْبَيِّنٰتِ এটা এ স্থানে উহ্য اَرْسَلْنَا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। اَلزُّبُرُ অর্থ কিতাবসমূহ।

٤٥. اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا الْمَكَرَاتِ السَّيِّاٰتِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِىْ دَارِ النَّدْوَةِ مِنْ تَقْيِيْدِهٖ اَوْ قَتْلِهٖ اَوْ اِخْرَاجِهٖ كَمَا ذُكِرَ فِى الْاَنْفَالِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ كَقَارُوْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ اَىْ مِنْ جِهَةٍ لَا تَخْطُرُ بِبَالِهِمْ وَقَدْ اُهْلِكُوْا بِبَدْرٍ وَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْدِرُوْا ذٰلِكَ.

৪৫. নাদওয়া বা পরামর্শ কক্ষে বসে যারা রাসূল ﷺ-কে বন্দী বা হত্যা কিংবা বহিষ্কার করার মতো কুচক্রান্ত করে যেমন সূরা আনফালে উল্লিখিত হয়েছে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, কারূনের মতো আল্লাহ তাদেরকেসহ জমিন ধসিয়ে দেবেন না অথবা এমন দিক হতে তাদের উপর শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত। যে স্থান হতে শাস্তি আসার কল্পনাও তাদের মনে আসবে না। বদর যুদ্ধে এরা ধ্বংস হয়েছিল অথচ তাদের এটার অনুমানও হয়নি। اَلسَّيِّئَاتُ এটা এ স্থানে উহ্য مَوْصُوْف ব বিশেষিতব্য শব্দ اَلْمَكْرُ-এর صِفَتْ বা বিশেষণ।

٤٦. اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فِىْ اَسْفَارِهِمْ لِلتِّجَارَةِ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ الْعَذَابَ

৪৬. ব ব্যবসাব্যপদেশে এদের চলা-ফিরা কালে যাত্রাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেন না? এরা তো অপরাগকারী নয়। শাস্তি এড়িয়ে যাবার নয়।

٤٧. اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ط تَنَقُّصٍ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتّٰى يَهْلِكَ الْجَمِيْعُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ.

৪৭. অথবা এদেরকে তিনি ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার শাস্তিতে বিধৃত করবেন না? শেষে একদিন তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে শাস্তি ত্বরান্বিত করেননি। تَخَوُّفٍ অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া। عَلٰى تَخَوُّفٍ এটা يَاْخُذَهُمْ ক্রিয়ার فَاعِلْ অর্থাৎ কর্তা বা مَفْعُوْلٌ অর্থাৎ কর্ম হতে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

٤٨. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ لَهٗ ظِلٌّ كَشَجَرٍ وَجَبَلٍ يَتَفَيَّؤُا يَمِيْلُ ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ جَمْعُ شِمَالٍ اَىْ عَنْ جَانِبَيْهِمَا اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهٗ سُجَّدًا لِّلّٰهِ حَالٌ اَىْ خَاضِعِيْنَ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَهُمْ اَىِ الظِّلَالُ دٰخِرُوْنَ صَاغِرُوْنَ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ.

৪৮. তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর ঐ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যেগুলোর ছায়া বিদ্যমান যেমন বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি সেইগুলোর ছায়া বাধ্যগতভাবে সেজদাবনত থেকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় তার অনুগত থেকে দিনের শুরুতে ও শেষে ডানে ও বামে উভয় দিকে ঢলে পড়ে? يَتَفَيَّؤُا -ঢলে পড়ে। اَلشَّمَائِلُ এটা شِمَالٌ-এর বহুবচন। سُجَّدًا এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। এ স্থানে অর্থ, নির্দেশের সামনে অনুগত। دَاخِرُوْنَ অর্থ একান্ত বাধ্যগত। এ স্থানে বিবেকবান প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৪৯. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ اَىْ نَسَمَةٍ تَدُبُّ عَلَيْهَا اَىْ يَخْضَعُ لَهٗ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَغَلَبَ فِى الْاِتْيَانِ بِمَا مَالَا يَعْقِلُ لِكَثْرَتِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ تَفْضِيْلًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ.

৪৯. আল্লাহকেই সেজদা করে অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ পালনে বাধ্যগত যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, আর পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী আছে সেই সমস্তও এবং ফেরেশতাগণও মর্যাদা বিধান হেতু এদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কেউ তাঁর ইবাদত করা হতে অহংকার করে না। ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না। مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -বিবেক-বোধহীন বস্তুর সংখ্যা যেহেতু বেশি সেহেতু এ স্থানে مَا-এর ব্যবহাররের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। دَابَّةٌ অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল।

৫০. يَخَافُوْنَ اَىِ الْمَلٰئِكَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يَسْتَكْبِرُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ حَالٌ مِنْ هُمْ اَىْ عَالِيًا عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ بِهٖ.

৫০. এরা ফেরেশতারা ভয় করে এদের উপর পরাক্রমশালী এদের প্রতিপালককে এবং যা আদেশ করা হয় এরা তা করে। يَخَافُوْنَ এটা يَسْتَكْبِرُوْنَ-এর ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনাম هُمْ-এর حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য। مِنْ فَوْقِهِمْ এটা رَبَّهُمْ-এর هُمْ-এর حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ যিনি এদের উপর পরাক্রমশালী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ : এ বৃদ্ধিকরণে সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, فِى اللّٰهِ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটি مُهَاجِرٌ-এর ظَرْفٌ হয়েছে অথচ اَللّٰهُ-এর ظَرْف হওয়ার কোনোই অর্থ নেই।

উত্তর. উত্তরের সার কথা হলো, فِىْ টা لَامْ অর্থে হয়েছে এবং مُضَافٌ উহ্য রয়েছে فِى اللّٰهِ অর্থাৎ لِدِيْنِ اللّٰهِ

قَوْلُهٗ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে تَثْقِيْلَةٌ بَانُوْنِ تَاكِيْد لَامْ تَاكِيْد -مُضَارِعْ এর- جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। অর্থ আমরা তাদেরকে অবশ্যই অবতরণ করাবো। অবশ্যই ঠিকানা দেব। মূলবর্ণ হলো (ب - و - ء) আর هُمْ যমীর হলো جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ

قَوْلُهٗ دَارًا : এ বৃদ্ধি করণের মধ্যে حَسَنَةً-এর تَانِيْث-এর عِلَّتْ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَىِ الْكُفَّارُ وَالْمُتَخَلِّفُوْنَ عَنِ الْهِجْرَةِ : এতে يَعْلَمُوْنَ-এর যমীরের মধ্যে দুটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ : এটা يَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْلٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَوَافَقُوْهُمْ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে لَوْ-এর জবাব উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ فَاِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَهٗ : এটা হলো اِنْ شَرْطِيَّةٌ -এর জবাব, যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ مُتَعَلِّقٌ لِمَحْذُوْفٍ : অর্থাৎ بِالْبَيِّنٰتِ টা উহ্য اَرْسَلْنَا-এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে; উল্লিখিত مَا اَرْسَلْنَا এবং نُوْحِىْ এবং تَعْلَمُوْنَ-এর مُتَعَلِّقٌ নয়। কেননা প্রথম দু সুরতে مُتَعَلِّقٌ এবং مُتَعَلِّقٌ-এর মাঝে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِىْ আবশ্যক হয় আর তা হলো فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ আর তৃতীয় সুরতে شَرْط টা تَبْكِيْت ও اِلْزَام-এর জন্য হয়েছে। কেননা তাদের عَالَمْ হওয়ার نَفِىْ সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهٗ الْمَكَرَاتِ : এটা দ্বারা اَلسَّيِّئَاتُ-এর تَانِيْث হওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَتَفَيَّؤُ : এটা বাবে تَفَعُّلْ-এর تَفَيُّئْ মাসদার হতে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। মূলবর্ণ ف - ى - ء) অর্থ ঝুঁকে যায়।

قَوْلُهُ تَنَقُّص : تَخَوُّفٍ-এর তাফসীর تَنَقُّصٍ দ্বারা করা হয়েছে অর্থ বর্ণনা করার জন্য। কেননা تَخَوُّفٌ-এর অর্থ ভয়ভীতিও আসে এবং ধীরে ধীরে কম করার অর্থেও এসে থাকে। তাই এ স্বল্পতা نَفْس-এর মধ্যেই হোক বা সম্পদেই হোক মুফাসসির (র.) এ অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। বলা হয়– تَخَوَّفُ الشَّيْءَ অর্থাৎ تَنَقَّصَهُ

قَوْلُهُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ عَلٰى تَخَوُّفٍ টা হয়তো يَأْخُذَ-এর فَاعِلْ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে অথবা هُمْ যমীর থেকে।

قَوْلُهُ جَمْعُ شِمَال : এটা মানুষের يَمِيْن [ডান] شِمَالْ [বাম] হতে কেনায়া হয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَمِيْن-কে مُفْرَدْ নেওয়ার মধ্যে مَا-এর শব্দের প্রতি আর شَمَائِلْ-কে বহুবচন নেওয়ার ক্ষেত্রে 'مَا' -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেমন ظِلَالُهُ-এর মধ্যে مَا-এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে আর سُجَّدًا-এর মধ্যে مَا-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ : এতে এই সংশয়ের জবাব রয়েছে যে, ون দ্বারা ذَوِى الْعُقُوْلِ-এর বহুবচন নেওয়া হয়। আর ظِلَالٌ এটা ذَوِى الْعُقُوْلِ নয় অথচ এর বহুবচন دَاخِرُوْنَ-কে ون দ্বারা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর. যেহেতু ظِلَالٌ-এর দিকে دُخُوْرٌ [অক্ষম করা] -এর নিসবত করা হয়েছে যা ذَوِى الْعُقُوْلِ-এর সিফত। তাই ون দ্বারা তার বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ دَابَّةٍ : এটা مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-এর بَيَانٌ এবং এতে সেই প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, دَابَّةٌ তাকে বলা হয় যা পৃথিবীতে / জমিনে বিচরণ করে থাকে। কাজেই তাতে সেই مَخْلُوْقْ [সৃষ্টজীব] অন্তর্ভুক্ত নয় যা আকাশে বা শূন্যে নড়াচড়া করে এবং চলাফেরা করে। এর জবাব দিয়েছেন যে, إِنَّ الدَّبِيْبَ هِيَ حَرَكَةٌ جِسْمَانِيَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ فِى الْاَرْضِ اَوْ فِى السَّمَاءِ কাজেই এটা বলা যে, دَابَّةٌ বলা হয় مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ-কে যাতে ফেরেশতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয় বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ الخ -এর ব্যাখ্যা : اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا-এটি هِجْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ– দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে এটি বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গুনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়। হিজরতের কোনো কোনো অবস্থায় ফরজ, ওয়াজিব এবং কোনো কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত– اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا-এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি? আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসেবে ছওয়াবের। 'দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা' এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসে জন্য গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিজিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইজ্জত ও গৌরব পাওয়া– সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে কুরতুবী]

আয়াতের শানে নুযূল মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তীকালে মদিনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদিনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহর এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মদিনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন! উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে

বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকির, মিসকিন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশীল, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ তা'আলা অসামান্য ইজ্জত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন– وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا عَامٌ فِى الْمُهَاجِرِيْنَ كَائِنًا مَا كَانُوْا فَيَشْمَلُ اَوَّلَهُمْ وَاٰخِرَهُمْ অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোনো অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ তাফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণির লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে– وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলি এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলিও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِى اللّٰهِ অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকরি এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে– مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা যেমন বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহর উপর রাখা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে– وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোনো মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কুরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষে যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধিবিধান : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধিবিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকরার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো–

কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন, দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোনো সময় কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোনো সময় কোনো বস্তু অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার।

প্রথম. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেও ফরজ ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তি সামর্থ্যের শর্তসহ ফরজ, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গুনাগার হবে।

দ্বিতীয়. বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোনো মুসলমানদের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এ উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবী লিখেন, এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা যদি তুমি কোনো গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরি; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয়. যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

চতুর্থ. দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েজ; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যে স্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সে স্থান ত্যাগ করা উচিত, যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) এ প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে

সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বলেন- إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي তারপর হযরত মূসা (আ.) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কুরআন বলে- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

পঞ্চম. দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে হিজরত করা। ইসলামি শরিয়ত এরও অনুমতি দেয়; যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন রাখালকে মদিনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারুক (রা.) আবূ ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোনো মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

কিন্তু এটা তখন, যখন কোনো স্থানে প্লেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে। যেখানে কোনো মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এই যে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ার সফরে হযরত ওমর (রা.) এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছার পর জানতে পারেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে আবিরাম পরামর্শের পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ যখন কোনো ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না। -[তিরমিযী]

খলিফা হযরত ওমর (রা.) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাফেলাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। কোনো কোনো আলেম বলেন, হাদীসের নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর জীবাণু থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবে যে ব্যক্তির মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই এটা হাদীসের বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা।

ষষ্ঠ. ধনসম্পদ হেফাজতের জন্য হিজরত করা। কোনো স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সেস্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা মুসলমানের ধনসম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোনো বস্তুর অন্বেষণে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত

১. শিক্ষার সফর অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টজগৎ, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কুরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে- أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ হযরত জুলকারনাইনের সফরও কোনো কোনো আলেমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

২. হজের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামি ফরজ, তা সুবিদিত।

৩. জিহাদের সফর। এটাও যে ফরজ, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

৪. জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

৫. বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরিয়তে এটাও জায়েজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতে اِبْتِغَاءُ فَضْلٍ [কৃপা অন্বেষণ] বলে বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হজের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম রূপে বৈধ হবে।

৬. জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য যতটুকু জরুরি, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরজে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরজে কেফায়া।

৭. কোনো স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয়- মসজিদে হারাম [মক্কা], মসজিদে নববী [মদিনা] এবং মসজিদে আকসা [বায়তুল মোকাদ্দাস]। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েজ। -[মোঃ শফি]

৮. ইসলামি সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

৯. স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোনো বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

قَوْلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا الخ : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর মক্কার মুশরিকরা মদিনার ইহুদিদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইলে যে, বাস্তবিকই পূর্বেই সব পয়গাম্বর মানব জাতির মধ্যে থেকে প্রেরিত হয়েছেন কিনা?

أَهْلَ الذِّكْرِ : শব্দটি গ্রন্থধারী সম্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বুঝায়। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা দ্বারাই তুষ্ট হতে পারত। কারণ তারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনায় সন্তুষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বর্ণনা তারা কিরূপে মানতে পারত। أَهْلَ الذِّكْرِ - ذِكْر শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জ্ঞান। অর্থের সাথে সম্পর্ক রেখে কুরআন পাকে তাওরাতকে ذِكْر বলা হয়েছে- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এবং কুরানকেও ذِكْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন এর পরের আয়াতে أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। অতএব أَهْلَ الذِّكْرِ -এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়াল বিদ্বান, জ্ঞানবান। এখানে স্পষ্টতই বিদ্বান বলে গ্রন্থধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদ্দী প্রমুখ তাই বলেছেন। কেউ কেউ এখানেও ذِكْر -এর অর্থ কুরআনকে ধরে أَهْلَ الذِّكْرِ -এর তাফসীরে 'কুরআনধারী' বলেছেন। এ ব্যাপারে বাযযার ও মাহারীর বক্তব্য অধিক স্পষ্ট। তাঁরা বলেন- الْمُرَادُ بِأَهْلِ الذِّكْرِ عُلَمَاءُ أَخْبَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَالذِّكْرُ بِمَعْنَى الْحِفْظِ كَأَنَّهُ قِيلَ إِسْأَلُوا الْمُطَّلِعِينَ عَلَى أَخْبَارِ الْأُمَمِ يُعَلِّمُوكُمْ بِذَٰلِكَ এ ভাষা অনুযায়ী গ্রন্থধারী ও কুরআনধারী সবাই أَهْلَ الذِّكْرِ -এর অন্তর্ভুক্ত।

بَيِّنَات-এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মোজেজা বুঝানো হয়েছে। زُبُر শব্দটি আসলে زُبْرَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ খণ্ডসমূহকে সংযোজন করার সাথে সম্পর্কে রেখে লেখাকে زُبُر বলা হয় এবং লিখিত গ্রন্থকে زُبُر ও زَبُور বলা হয়। এখানে زُبُر বলে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর ও কুরআনসহ ঐশীগ্রন্থসমূহ বুঝানো হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অন্যদের উপর ওয়াজিব : আলোচ্য আয়াতের فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কুরআনি বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধিবিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামতো কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরজ হবে। একেই তকলীদ [অনুসরণ] বলা হয়। এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোনো উপায় নেই। সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তাকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তাকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছের থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোনো নির্দেশকে শরিয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তাকলীদ। এ তাকলীদ যে বৈধ বরং জরুরি, তাতে কোনোরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কুরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বুঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তাকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কুরআনি আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, যেসব বিধিবিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফীহ মাস'আলা, বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা জরুরি। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কুরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরিয়ত সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহভীতি ও পরহেজগারিতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আব্দুল্লাইস প্রমুখ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সংসর্গের বরকত শরিয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বুঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরিয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোনো না কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোনো নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম গাযালী, রাজী, তিরমিযী, ত্বাহাভী, মুযানী, ইবনে হুমাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণির আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবি ভাষা ও শরিয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ করে গেছেন। তাঁরা ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোনো ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কুরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কুরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোনো মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তাকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো মাসআলায় যে-কোনো ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ শরিয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরিয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশি। অথচ দীন ও শরিয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তাকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকহবিদগণ এটা জরুরি মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোনো একজন ইমামেরই তাকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তাকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত উসমান গনী (রা.)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সাতটি কেরাতের মধ্যে থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কুরআন সাত কেরাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরাতে কুরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরাতে কুরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা.) সেই এক কেরাতে কুরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্ত ও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরাত সঠিক ছিল না; বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কুরআন হেফাজতের কারণে একটি মাত্র কেরাত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোনো একজনকে তাকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তাকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তাকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্যে থেকে কোনো একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরি মনে করে; কারণ সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশি কিছু ছিল না। একে দালাদলির রঙ দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোনো সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোনো কোনো আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাব প্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ। وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তাকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খ. ইজতিহাদ অধ্যায়, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খ. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইকভিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থের দ্রষ্টব্য।

কুরআন বুঝার জন্য হাদীস জরুরি, হাদীস অস্বীকার কুরআন অস্বীকারের নামান্তর : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذِكْر -এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কুরআন পাক। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাকের তত্ত্ব তথ্য ও বিধানবলি নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করেই কুরআনের বিধানাবলি আল্লাহর অভিপ্রেত পন্থায় বুঝাতে সক্ষম হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোনো অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কুরআনর ব্যাখ্যা। কেননা কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেছে إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ -এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে কোনো উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কুরআনেরই বক্তব্য। কোনো কোনোটি বাহ্যত কোনো আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোনো কোনোটি বাহ্যত কুরআনে নেই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কুরআনই। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ কোনো কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى এতে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ তা'আলার ওহী ও কুরআনি নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমু'আ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাজত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরিয়তের বিধানাবলির ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোনো ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনি নির্দেশ অমান্য করে কুরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেননি কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কুরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন- وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অতএব উপরিউক্ত দাবি কুরআনের এ আয়াতের পরিপন্থি হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনই অস্বীকার করে نَعُوذُ بِاللّٰهِ

قَوْلُهُ أَفَأَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমাদের যে মাটির উপর বসে আছি, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যেতে পারে। কিংবা কোনো ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমারা আজাবে পতিত হতে পার। যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোনো আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোনো দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আজাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আয়াতে ব্যবহৃত تَخَوُّفٌ শব্দটি خَوْف ভয় করা থেকে উদ্ভূত। এ অর্থের দিক দিয়ে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে, একদলকে আজাবে ফেলে অপর দলকে ভয় প্রদর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আজাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ প্রমুখ এখানে تَخَوُّفٌ এর অর্থ নিয়েছেন تَنَقُّصٌ অর্থাৎ হ্রাস পাওয়া। এদিক দিয়েই ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি তরজমা করা হয়েছে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, হযরত ওমর ফরূক (রা.)ও تَخَوُّفٌ শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হননি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিম্বরে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন- আপনারা تَخَوُّفٌ শব্দের অর্থ কি বুঝেছেন? সবাই নিশ্চুপ, কিন্তু হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মু'মিনীন, এটি আমাদের গোত্রের বিশেষ ভাষা। আমাদের ভাষায় এর অর্থ تَنَقُّصٌ অর্থাৎ আস্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, আরবি কাব্যে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি? জবাবে বলা হলো, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবূ কবীর হুযায়লীর একটি কবিতা পেশ করলেন। তাতে تَخَوُّفٌ শব্দটি আস্তে আস্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন খলিফা বললেন, তোমরা অন্ধকার যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কর। কারণ তা দ্বারা কুরআনের তাফসীর তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সালা হয়।

কুরআন বুঝার জন্য যেনতেন আরবি জানা যথেষ্ট নয় : এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, আরবি ভাষা বলা ও লেখার মামুলি যোগ্যতা কুরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এতে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরি, যা দ্বারা প্রাচীন যুগের আরবদের কবিতাও পুরোপুরি বুঝা যায়। কেননা কুরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই ঐ স্তরের আরবি সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য।

আরবি সাহিত্য শিক্ষার জন্য অন্ধকার যুগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েজ; যদিও তাতে অশ্লীল কথাবার্তা আছে : এ থেকে আরও জানা গেল যে, কুরআন বুঝার জন্য আন্ধকার যুগের আরবি সাহিত্য পাঠ করা জায়েজ এবং সেই যুগের শব্দার্থও পড়ানো জায়েজ যদিও একথা সুপরিজ্ঞাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুলভ আচারণবিধি এবং ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে। কিন্তু কুরআন বুঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া ও পড়ানো বৈধ করা হয়েছে।

দুনিয়ার আজাবও একপ্রকার রহমত : আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আজাব বর্ণনা করার পর সবশেষে বলা হয়েছে- إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ এতে প্রথমে رَبّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আজাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لَامْ সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুঁশিয়ারি প্রকৃতপক্ষ স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ : অর্থাৎ আসমান জমিনে যতকিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদা রত হয় তথা অনুগত থাকে। যা কিছু আসমানে আছে যেমন– চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারা, আর যা কিছু জমিনে আছে যেমন জীবজন্তু, একথায় আসমান-জমিনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের অনুগত এবং তাঁর মহান দরবারে অবনত থাকে।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ : অর্থাৎ ফেরেশতাগণ! সকলেই বিনীত হয়ে আল্লাহ পাককে সেজদা করে থাকে, ক্ষণিকের জন্য বিন্দুমাত্রও তারা অহংকার করে না। বিশ্ব সৃষ্টির কি ছোট, কি বড় সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মাথা নত করে রাখে। বিনীত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয়। অতএব, আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানো অথবা গাফলত করা আমার্জনীয় অপরাধ। যারা আল্লাহ পাকের দরবারে মাথানত করতে অস্বীকৃতি জানায় বা অহংকার করে তাদের শাস্তি হবে কঠোর এবং কঠিন।

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করে ইরশাদ করেছেন, আসমান-জমিনের সব কিছুই আল্লাহকে সেজদা করে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হয়েও আল্লাহ পাকের দরবারে আনুগত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকে এবং অন্য সৃষ্টির সম্মুখে মাথানত করে, এমনকি তারা আল্লাহর আজাবকে ভয় করে না, অথচ নিখিল বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ফেরেশতাগণও মহিমাময় আল্লাহ পাকের তাবেদারিতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকে।

قَوْلُهُ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ : আর তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে যিনি পরাক্রমশালী। অথবা এর অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ এজন্য ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে তাদের উপর কোনো প্রকার আজাব না আসে।

قَوْلُهُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ : আর তাদেরকে যা আদেশ দেওয়া হয় তা তারা পালন করে থাকে। অতএব, আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা, তাঁর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না। আর আমি যা শ্রবণ করি তোমরা তা শ্রবণ কর না। শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আসমানে আঙ্গুল পরিমাণ স্থান নেই, যেখানে তাঁর ফেরেশতা সেজদায় মশগুল নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি যদি তোমরা জানতে তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি। আর আনন্দ-উল্লাসে মশগুল হতে না। এবং বাড়ি-ঘর ছেড়ে ময়দানে এসে আল্লাহ পাকের দরবারে চিৎকার দিতে এবং ফরিয়াদ করতে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবূ যর (রা.) বললেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমি বৃক্ষ হতাম তবে আমাকে কেটে ফেলা হতো –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

অনুবাদ :

٥١. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ تَاكِيْدٌ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج اَتٰى بِهٖ لِاِثْبَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ خَافُوْنِ دُوْنَ غَيْرِيْ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ

৫১. আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না : তিনিই একমাত্র ইলাহ। আল্লাহর উপাস্য হওয়ার বিষয়টি এবং তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এটার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অন্য কাউকেও নয় আমাকেই ভয় কর। اِثْنَيْنِ এটা تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। فَاِيَّايَ এস্থানে غَيْب বা নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَات বা রূপান্তর করা হয়েছে। فَارْهَبُوْنِ অর্থ আমাকে ভয় কর।

٥٢. وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَلَهُ الدِّيْنُ الطَّاعَةُ وَاصِبًا ط دَائِمًا حَالٌ مِنَ الدِّيْنِ وَالْعَامِلُ فِيْهِ مَعْنَى الظَّرْفِ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ وَهُوَ الْاِلٰهُ الْحَقُّ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ اَوِ التَّوْبِيْخِ

৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সকল কিছু তাঁরই। আর ধর্ম অর্থাৎ আনুগত্য তাঁরই সকল সময়ের জন্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? অথচ তিনিই সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই। وَاصِبًا অর্থ সকল সময়ের জন্য। এটা اَلدِّيْن-এর حَال হয়েছে। এস্থানে ظَرْف অর্থাৎ অধিকরণবাচক। পদ لَهٗ-এর ইঙ্গিতবাচক ক্রিয়া এটার عَامِل রূপে গণ্য। اِنْكَار এস্থানে اَفَغَيْرَ অর্থাৎ অস্বীকার কিংবা تَوْبِيْخ অর্থাৎ ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

٥٣. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ اَيْ لَا يَاْتِيْ بِهَا غَيْرُهٗ وَمَا شَرْطِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ اَصَابَكُمُ الضُّرُّ الْفَقْرُ وَالْمَرَضُ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ تَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَكُمْ بِالْاِسْتِغَاثَةِ وَالدُّعَاءِ وَلَا تَدْعُوْنَ غَيْرَهٗ

৫৩. তোমাদের সাথে যে সমস্ত অনুগ্রহ বিদ্যমান তা আল্লাহর নিকট হতে অন্য কেউ এগুলো তোমাদেরকে দেয়নি আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ রোগ-শোক ও দরিদ্রতা স্পর্শ করে এটা তোমাদেরকে আঘাত করে তখন তোমরা সাহায্য চেয়ে ও দোয়া করে তাঁকেই উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান কর, অন্য কাউকেও আহ্বান কর না। مَا এ مَابِكُمْ শব্দটি শর্তবাচক বা مَوْصُوْلَةٌ আর تَجْئَرُوْنَ অর্থ তোমরা তোমাদের আওয়াজ উচ্চ করে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাক।

٥٤. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ

৫৪. অতঃপর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ দূরীভূত করেন তখন তেমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরিক করে।

٥٥. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ط مِنَ النِّعْمَةِ فَتَمَتَّعُوْا بِاجْتِمَاعِكُمْ عَلٰى عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اَمْرُ تَهْدِيْدٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ ذٰلِكَ

৫৫. আমি তাদেরকে যা অর্থাৎ যে সমস্ত অনুগ্রহ দান করেছি তার অকৃতজ্ঞতা করতে। সুতরাং প্রতিমা উপাসনার ব্যাপারে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বাদ ভোগ করে লও। শীঘ্রই তোমরা তার পরিণাম জানতে পারবে। فَتَمَتَّعُوْا এস্থানে হুমকি প্রদর্শনার্থে اَمْر অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

٥٦. وَيَجْعَلُوْنَ اَىْ الْمُشْرِكُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَهِىَ الْاَصْنَامُ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ط مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ بِقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلّٰهِ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اَنَّهُ اَمَرَكُمْ بِذٰلِكَ

৫৬. আমি তাদেরকে কাফেরদেরকে শস্য ও গবাদি ইত্যাদি যে সমস্ত জীবনোপকরণ দান করি তারা এই অংশ আল্লাহর আর এই অংশ প্রতিমাসমূহের এই কথা বলে তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা জানে না যে, এগুলো লাভ-লোকসান কিছুই করতে পারে না। কসম আল্লাহর ভর্ৎসনামূলকভাবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তিনি তোমাদেরকে এ সমস্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি যে মিথ্যারোপ কর সেই সম্পর্কে। لَتُسْئَلُنَّ এস্থানে غَيْبٌ বা নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

٥٧. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ بِقَوْلِهِمُ الْمَلٰئِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ تَنْزِيْهًا لَهُ عَمَّا زَعَمُوْا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ اَىْ الْبَنُوْنَ وَالْجُمْلَةُ فِىْ مَحَلِّ رَفْعٍ اَوْ نَصْبٍ بِيَجْعَلُ الْمَعْنٰى يَجْعَلُوْنَ لَهُ الْبَنَاتِ الَّتِىْ يَكْرَهُوْنَهَا وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْوَلَدِ وَيَجْعَلُوْنَ لَهُمُ الْاَبْنَاءَ الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَهَا فَيَخْتَصُّوْنَ بِالْاَبْنَاءِ كَقَوْلِهِ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ

৫৭. ফেরেশতাগণ আল্লাহর দুহিতা এই কথা বলে তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে। এদের এই স্বকপোলকল্পনা হতে আল্লাহ পবিত্র তাঁরই তরে সকল পবিত্রতা, আর তাদের নিজেদের জন্য হলো যা তারা কামনা করে অর্থাৎ পুত্র। সন্তান হতে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর প্রতি কন্যা সন্তান আরোপ করে। যা নিজেদের ব্যাপারেও তারা পছন্দ করে না; নিজেদের জন্য তারা পুত্র সন্তান হওয়া কামনা করে এবং তাই নিজেদের জন্য বিশেষ করে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন− فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ 'এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য হলো কন্যা আর তাদের জন্য হলো পুত্র? مَا يَشْتَهُوْنَ এ ই বাক্যটি رَفْعٌ [পেশযুক্ত]-এর مَحَلٌ বা স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা يَجْعَلُ ক্রিয়ার মাধ্যমে نَصْبٌ সহকারেও পাঠ করা যায়।

٥٨. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى بِتُوْلَدُ لَهُ ظَلَّ صَارَ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرَ مُغْتَمٍّ وَهُوَ كَظِيْمٌ مُمْتَلِئٌ غَمًّا فَكَيْفَ تُنْسَبُ الْبَنَاتُ اِلَيْهِ تَعَالٰى

৫৮. তাদেরর কাউকেও যদি কন্যা সন্তানের অর্থাৎ তার কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে বলে সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল দুঃখ ভারাক্রান্তরূপে কালো হয়ে যায় বিষণ্ণ ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং কেমন করে আল্লাহর প্রতি এটা আরোপ করা হয়ে থাকে? ظَلَّ এ স্থানে অর্থ صَارَ হয়ে যায়। كَظِيْمٌ অর্থ দুঃখভারাক্রান্ত।

٥٩. يَتَوَارَى يَخْتَفِي مِنَ الْقَوْمِ أَيْ قَوْمِهِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ط خَوْفًا مِنَ التَّعْيِيْرِ مُتَرَدِّدًا فِيْمَا يَفْعَلُ بِهِ أَيُمْسِكُهُ يَتْرُكُهُ بِلَا قَتْلٍ عَلَى هُوْنٍ هَوَانٍ وَذُلٍّ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ط بِأَنْ يَئِدَهُ أَلَا سَاءَ بِئْسَ مَا يَحْكُمُوْنَ حُكْمُهُمْ هٰذَا حَيْثُ نَسَبُوْا لِخَالِقِهِمُ الْبَنَاتِ اللَّاتِي هُنَّ عِنْدَهُمْ بِهٰذَا الْمَحَلِّ

৫৯. তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু লজ্জা পাওয়ার ভয়ে সম্প্রদায় হতে স্ব সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। এটাকে নিয়ে কি করবে সেই বিষয়ে সে দ্বিধান্বিত থাকে, হীনতা সত্ত্বেও অর্থাৎ লজ্জা ও অপমান সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে হত্যা না করে ছেড়ে রাখবে না মাটিতে পুতে ফেলবে জীবন্ত প্রোথিত করবে। শুনে রাখ, তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা অর্থাৎ তাদের এই সিদ্ধান্ত কত নিকৃষ্ট। তাই তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কন্যা সন্তান আরোপ করে যাদের স্থান তাদের নিকটও এই ধরনের।

٦٠. لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ أَيِ الْكُفَّارُ مَثَلُ السَّوْءِ ج أَيِ الصِّفَةُ السُّوْأَى بِمَعْنَى الْقَبِيْحَةِ وَهِيَ وَأْدُهُمُ الْبَنَاتِ مَعَ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِنَّ لِلنِّكَاحِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ط اَلصِّفَةُ الْعُلْيَاءُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِي خَلْقِهِ

৬০. যারা পরলোক বিশ্বাস করে না তাদের অর্থাৎ কাফেরদের কত নিকৃষ্ট উদাহরণ কত নিকৃষ্ট গুণ ও আচরণ। তা হলো, বিবাহ দিতে নারীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা। আর আল্লাহর হলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ মহান গুণাবলি। তা হলো, লা ইলাহ ইল্লা হুওয়া অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী, তাঁর সৃষ্টিতে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَاكِيْدٌ : অর্থাৎ اِثْنَيْنِ টা اِلٰهَيْنِ-এর تَاكِيْد হয়েছে।

لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ-এর তারকীবে দুটি উক্তি রয়েছে– এবং اِثْنَيْنِ শব্দের ব্যাপারেও দুটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. اِثْنَيْنِ টা اِلٰهَيْنِ-এর تَاكِيْد হয়েছে। এ সুরতে لَا تَتَّخِذُوْا টা مُتَعَدِّيْ بِيَكْ مَفْعُوْل হবে। আর لَا تَتَّخِذُوْا টা لَا تَعْبُدُوْا-এর অর্থে হবে।

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, لَا تَتَّخِذُوْا টা مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْل হবে, আর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য হবে। অর্থাৎ لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ مَعْبُوْدًا এখানে اِلٰهَيْنِ হলো প্রথম মাফউল। আর اِثْنَيْنِ তার تَاكِيْد এবং مَعْبُوْدًا হলো দ্বিতীয় মাফউল যা উহ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় উক্তি হলো এই যে, اِثْنَيْنِ টা لَا تَتَّخِذُوْا-এর প্রথম মাফউল কিন্তু তাকে مُؤَخَّرْ করে দিয়েছে। আর اِلٰهَيْنِ হলো দ্বিতীয়। মাফউল যা শাব্দিকভাবে مُقَدَّمْ হয়েছে। মূল ইবারত হলো– لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ

আশ্চর্য মিল : প্রায় সকল মুফাসসিরই اِثْنَيْنِ -কে- اِلٰهَيْنِ -এর تَاكِيْد বলেছেন। অথচ اِثْنَيْنِ টা تَاكِيْد لَفْظِىْ ও নয় আবার تَاكِيْد مَعْنَوِىْ ও নয়। এটা এক আশ্চর্য ধরনের মিল। সহীহ হলো এই যে, اِثْنَيْنِ হলো اِلٰهَيْنِ -এর সিফত। হতে পারে যে, যারা اِثْنَيْنِ -কে- تَاكِيْد বলেছেন তারা مَعْنٰى وَصْفِىْ -এর কারণে تَاكِيْد বলেছেন। কেননা সিফতের মধ্যেও تَاكِيْد -এর অর্থ হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, বাক্যের মধ্যে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر হয়েছে, মূল ইবারত এভাবে যে, لَا تَتَّخِذُوْا اِثْنَيْنِ اِلٰهَيْنِ কেউ কেউ বলেছেন যে, اِثْنَيْنِ -কে সেই تَثْنِيَةً -এর تَاكِيْد বলেছেন যা اِلٰهَيْنِ থেকে বুঝা যায় [জুমাল]। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ টা تَكْرَارْ -এর জন্য হয়েছে- কেননা অক্ষরের আ- مُبَالَغَةٌ فِى التَّنْفِيْرِ ধিক্যতা অর্থের ব্যাপকতাকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ : প্রশ্ন. اِلٰهَيْنِ দ্বিবচন হওয়ার কারণে নিজেই দুয়ের উপর বুঝায়। তাতে مَعْدُوْدٌ -এর প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -এর মধ্যেও مَعْدُوْدٌ -কে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না, কেননা اِلٰهَيْنِ এবং اِلٰهٌ টা عَدَدْ ও مَعْدُوْدٌ উভয়ের উপরই দালালত করে। কাজেই দু থেকে বেশি এর জন্য مَعْدُوْدٌ নেওয়া জরুরি হয়ে থাকে। যেমন رَجُلٌ একজন পুরুষ رَجُلٌ وَاحِدٌ বলার প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে رَجُلَيْنِ দুজন পুরুষ। এতে رَجُلَيْنِ اِثْنَيْنِ বলার প্রয়োজন নেই। এর ব্যতিক্রম হলো رِجَالٌ ثَلٰثَةٌ এবং نِسَاءٌ ثَلٰثٌ এতে مَعْدُوْدٌ -এর উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা رِجَالٌ এবং نِسَاءٌ হলো مُبْهَمٌ বা অস্পষ্ট। এর অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য مَعْدُوْدٌ -এর প্রয়োজন হয়।

উত্তর. কয়েকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

১. ইবারতে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر হয়েছে উহ্য ইবারত হলো- لَا تَتَّخِذُوْا اِثْنَيْنِ اِلٰهَيْنِ

২. কোনো বস্তু যখন অপছন্দনীয় ও কবীহ হয় এবং তার قَبَاحَتْ -এর মধ্যে মুবালাগা উদ্দেশ্যে হয় তখন তাকে অধিক সংখ্যক ইবারত দ্বারা ব্যক্ত করে যাতে করে অক্ষরের অধিক্যতা অর্থের ব্যাপকতাকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اَتٰى بِهِ لِاِثْبَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ : এটা সেই প্রশ্নের উত্তর যে, اِلٰهٌ টা নিজেই এককের উপর বুঝায়। তদুপরি وَاحِدٌ নেওয়ার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. শুধুমাত্র اِلٰه উল্লেখ করলে এই সংশয় হতে পারত যে, সম্ভবত শুধুমাত্র اُلُوْهِيَّتْ -কে সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য হয়েছে। এ কারণে وَاحِدٌ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যাতে করে اُلُوْهِيَّتْ এবং وَاحْدَنِيَّتْ উভয়ের উপরই বুঝায়। কাজেই এই আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, اِلٰهٌ শব্দটি جِنْسِيَّةٌ এবং وَحْدَتْ উভয়টিকে বুঝায়। কাজে- وَاحِدٌ -এর সাথে- تَاكِيْد -এর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ الطَّاعَةُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, دِيْن অর্থ হলো طَاعَتْ বা আনুগত্য, جَزَاءٌ বা প্রতিদান নয়। কেননা جَزَاءٌ সর্বদা থাকে না। যেহেতু প্রতিদান পরকালে হবে।

قَوْلُهُ وَاصِبًا : এটা وُصُوْبٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো সুদৃঢ়, স্থায়ী।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ وَاصِبًا টি دِيْن থেকে حَالٌ হয়েছে صِفَتْ নয়। কেননা مَعْرِفَةٌ টা نَكِرَةٌ হতে صِفَتْ হতে পারে না এবং عَامِلْ তাতে সেই ফে'ল যা جَارْ ও مَجْرُوْر হতে বুঝা যায়। অর্থাৎ اِسْتَقَرَّ বা ثَبَتَ আর কেউ কেউ ثَبَتَ বা اِسْتَقَرَّ -এর উহ্য যমীর থেকে حَالٌ বলেছেন। উভয় সুরতে অর্থ একই হবে। উহ্য ইবারত হলো- اِسْتَقَرَّ الدِّيْنُ وَثَبَتَ لَهُ حَالَ كَوْنِهِ دَائِمًا

قَوْلُهُ تَجْاَرُوْنَ : তোমরা ফরিয়াদ করো। আওয়াজ উচ্চ কর। اَلْجُوَارُ হলো رَفْعُ الصَّوْتِ فِى الدُّعَاءِ এটা مُضَارِعْ -এর جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهُ وَلَا تَدْعُوْنَ غَيْرَهُ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো اِلَيْهِ تَجْاَرُوْنَ -এর মধ্যে ظَرْف -এর تَقْدِيْم -এর ফায়েদার দিকে ইঙ্গিত করা।

قَوْلُهُ اَمْرُ تَهْدِيْد : অর্থাৎ فَتَمَتَّعُوْا -এর মধ্যে اَمْرْ টা تَهْدِيْد -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا : يَعْلَمُوْنَ -এর যমীর মুশরিকদের দিকে ফিরেছে। আর مَا -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর উহ্য রয়েছে যাকে আল্লামা সুয়ূতী (র.) اَنَّهَا বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই عَدَمْ عَائِدْ -এর আপত্তির নিসরন হয়ে গেল। উহ্য ইবারত হলো- لَا يَعْلَمُوْنَهَا اَنَّهُمْ اٰلِهَةٌ وَيَعْتَقِدُوْنَ فِيْهَا اَنَّهَا تَضُرُّ وَتَنْفَعُ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ لِاَنَّهَا جَمَادٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ فِىْ مَحَلِّ رَفْعٍ اَوْ نَصْبٍ بِيَجْعَلُ : অর্থাৎ مَا لَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ -এর মধ্যে দুটি اِعْرَابْ বৈধ। প্রথম হলো مَا يَشْتَهُوْنَ বাক্য হয়ে رَفْعْ -এর- مَحَلّ -এ হয়েছে। আর لَهُمْ উহ্য ثَابِتٌ ইত্যাদির সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَرْ مُقَدَّمْ আর اَلْبَنَاتُ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে يَجْعَلُ -এর মাফঊল হওয়ার কারণে نَصَبْ হয়েছে।

قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : এটা مَعْطُوف এবং مَعْطُوف عَلَيْه -এর মাঝে جُمْلَهٔ مُعْتَرِضَة হয়েছে, فَصْل بِالْاَجْنَبِىْ হয়নি।
قَوْلُهُ يَخْتَارُوْنَهَا : نُسْخُ مُتَدَاوِلَة -এর মধ্যে এটাই রয়েছে আর স্পষ্ট এটা যে, يَخْتَارُوْنَهُمْ হওয়া উচিত ছিল। কেননা যমীর اَيْنَا -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ : এ বৃদ্ধিকরণ একটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। প্রশ্ন হলো এই যে, يَجْعَلُوْنَ -এর ফায়েলের যমীর যা কাফেরদের দিকে ফিরেছে এবং মাফউলের যমীর যা لَهُمْ উভয়টির মেসদাক একই। আর তা হলো كُفَّار অথচ নাহুর রীতি রয়েছে যে, فَاعِل এবং মাফউলের যমীর مُتَّحِدْ হওয়া نَفْس -এর মাধ্যম ব্যতীত জায়েজ নেই। বাবে ظَنَّ ব্যতীত এবং তার اَخَوَات-এরও একই কারণ যে, زَيْدٌ ضَرَبَهُ জায়েজ নেই। অবশ্য زَيْدٌ ظَنَّهُ قَائِمًا অর্থাৎ نَفْسَهُ বলা বৈধ রয়েছে।

উত্তর. اَلَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ দ্বারা এই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন যে, يَجْعَلُوْنَ অর্থ يَخْتَارُوْنَ কেননা اِخْتِيَار টা দুই মাফউলকে কামনা করে না। আর এক মাফউল হলো مَا يَشْتَهُوْنَ কাজেই اَلْاَم টা اَجَلْ অর্থে হবে।

قَوْلُهُ يَئِدُ : وَادَ يَئِدُ বাবে ضَرَبَ হতে অর্থ হলো জীবজন্তু প্রোথিত করা।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْقَبِيْحَة : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, مَثَلُ بِمَعْنَى صِفَتْ مُؤَنَّثْ আর اَلسُّوْءُ হলো مُذَكَّرْ অথচ صِفَتْ এবং مَوْصُوْف -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ জরুরি?

উত্তর. জবাবের সার হলো এই যে, اَلسُّوْءُ টা اَلسُّوى যা قَبِيْحَة-এর অর্থে হয়েছে কাজেই مُوَافَقَتْ বিদ্যমান।

قَوْلُهُ الصِّفَةُ الْعُلْيَاءُ : এ বৃদ্ধি করণ সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা দুই মাবুদে বিশ্বাস করো না, তিনি একক মাবুদই, অতএব তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, করতলগত। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক খাঁটি তৌহিদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলত সমগ্র বিশ্বের সব কিছু যখন আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত এবং অবনত ও সেজদারত তখন খবরদার তোমরা কখনো আল্লাহ পাকের সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, তিনি এক, অদ্বিতীয় فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ অতএব, তোমরা শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে ভয় কর তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর।

قَوْلُهُ وَلَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আর আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সব কিছুর মালিক এবং তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

قَوْلُهُ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا : ইবাদত তাঁরই, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় কর? অর্থাৎ আনুগত্য আল্লাহ পাকের প্রতিই থাকতে হবে এবং ভয় শুধু তাঁকেই করতে হবে। ফেরেশতাদের ন্যায় মানুষেরও কর্তব্য হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার অনুগত থাকা। প্রিয়নবী ﷺ -ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানির কাজে কারো কোনো কথা মেনে চলার অনুমতি নেই। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফে হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানির কাজে কারো কাছে আনুগত্য প্রকাশ করা বৈধ নয়। আনুগত্য, শুধু নেক কাজে, মন্দ কাজে নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কোনো মালিক নেই, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা। অতএব, শুধু তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই মানুষের কর্তব্য। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلدِّيْنُ শব্দটির অর্থ হলো সৎ কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি। মানুষের আমলের বদলা আল্লাহ পাকই দান করবেন। মুমিনদেরকে তাদের নেক আমলের ছওয়াব তিনিই দান করবেন। আর তিনিই কাফেরদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلدِّيْنُ শব্দটির অর্থ আজাব অর্থাৎ তিনিই কাফেরদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেবেন।

قَوْلُهُ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ : এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদেরকে ভয় কর? অর্থাৎ শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করা উচিত, আর কাউকে নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অতএব, শুধু আল্লাহ পাককেই ভয় করতে হবে, অন্য কাউকে নয়।

তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ামত রয়েছে সবইতো আল্লাহ পাকের দান। বস্তুত মানুষের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব তথা সম্পদ, শক্তি, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, সম্মান ও পদমর্যাদা, সন্তানসন্ততি, জনপ্রিয়তা, প্রভাব- প্রতিপত্তি এককথায় সব কিছুই তো আল্লাহ পাকের দান, তাঁরই দয়া এবং তাঁরই করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ : এরপর যখন তোমাদের প্রতি বিপদ আসন্ন হয় তখন তোমরা তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতে থাক। কেননা তোমরা জান কঠিন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত সম্ভব নয়, তাই বিপন্ন বিপদগ্রস্ত অবস্থায়, মুশরিক এবং নাস্তিকদেরকেও দেখা যায় বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহ পাককে ডাকতে, তারা যাঁকে অবিশ্বাস করে, যাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে অথচ বিপদ মুহূর্তে তাঁকেই ডাকতে তারা বাধ্য হয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ : এরপর যখন আল্লাহ পাক তোমাদের বিপদ দূর করে দেন তখন তোমাদেরই একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক করে। কিন্তু কি আশ্চর্য আর কি লজ্জাস্কর ব্যাপার যে, যার হাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, বিপদ মুক্তির জন্য যার নিকট মানুষ আকুল আবেদন জানায় সেই করুণাময় আল্লাহ পাক যখন দয়া করে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখন অকৃতজ্ঞ মানুষ মহান আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, যদি আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে মনে করা হয় অর্থাৎ মুমিন ও কাফের উভয়কে সম্বোধন করা হয় তবে مِنْكُمْ -এর তাৎপর্য হবে কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে আর যদি মনে করা হয় যে আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই, কাফেরদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে, আর কিছু লোক বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৪০১]

قَوْلُهُ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমে তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বেইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে! উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ তা'আলার কন্যা।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اَلَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাফসীরে বাহরে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরিউক্ত দুটি বদ অভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শাস্তি ও বেইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

তৃতীয় আয়াতের শেষে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেলা আল্লাহর রহস্যের মোকাবিলা করার নামান্তর। কেননা নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহর একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি। -[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফেরদের কাজ। তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ মহিলা পুণ্যময়ী, যার প্রথম গর্ভের সন্তান কন্যা হয়। কুরআন পাকের يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ আয়াতে কন্যার কথা অগ্রে উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ভ থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই সন্তানেরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। -[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা। এ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহর ওয়াদায় মুসলমানদের আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

অনুবাদ :

٦١. وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ بِالْمَعَاصِيْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا اَىْ الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ نَسَمَةٍ تَدِبُّ عَلَيْهَا وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ عَلَيْهِ ـ

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য পাপকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তবে এতে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তার উপর বিচরণশীল কোনো জীবকে রেহাই দিতেন না । কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন । অতঃপর যখন তাদের জন্য নির্ধারিত সময় আসে তখন তারা তা হতে মুহূর্তকাল বিলম্ব বা হতে ত্বরা করতে পারে না ।

٦٢. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ مِنَ الْبَنَاتِ وَالشَّرِيْكِ فِى الرِّيَاسَةِ وَاِهَانَةِ الرُّسُلِ وَتَصِفُ تَقُوْلُ اَلْسِنَتُهُمْ مَعَ ذٰلِكَ الْكَذِبَ وَهُوَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ط عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ اَلْجَنَّةُ كَقَوْلِهِ وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى قَالَ تَعَالٰى لَاجَرَمَ حَقًّا اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ مَتْرُوْكُوْنَ فِيْهَا اَوْ مُقَدَّمُوْنَ اِلَيْهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ مُتَجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ ـ

৬২. যা তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে অর্থাৎ কন্যা সন্তান, ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরিকানা, দূতকে অপমান করা ইত্যাদি তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এতদসহ তাদের জিহ্বা মিথ্যা বিবরণ দেয় যে এটা হলো এই যে, আল্লাহর নিকটস্থ মঙ্গল অর্থাৎ জান্নাত তাদের জন্যই। যেমন একটি আয়াতে আছে যে এরা বলত– وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى "যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাই তবে তাঁর নিকট নিশ্চয় আমার জন্য মঙ্গলময় বস্তু থাকবে।" [সূরা হা-মীম আস্সাজদা ৫০] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে অগ্নি এবং তাদেরকে তাতে অগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। لَا جَرَمَ অর্থ অবশ্যই। مُفْرَطُوْنَ অর্থ তাতে ছেড়ে রাখা হবে, বা এদেরকে তার দিকে অগ্রবর্তী করা হবে। অপর এক কেরাতে এটার ر -এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ সীমা অতিক্রমকারী।

٦٣. تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمُ السَّيِّئَةَ فَرَاَوْهَا حَسَنَةً فَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ مُتَوَلِّىْ اُمُوْرِهِمُ الْيَوْمَ اَىْ فِى الدُّنْيَا

৬৩. কসম আল্লাহর! আমি তোমাদের পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি অনন্তর শয়তান এদের মন্দ কার্যকলাপ এদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছিল ফলে তাই তাদের ভালো বলে মনে হয়। অনন্তর তারা রাসূলগণকে অস্বীকার করে বসে সেই আজ অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের অভিভাবক এদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْيَوْمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى حِكَايَةِ الْحَالِ الْاٰتِيَةِ اَىْ لَا وَلِىَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَصْرِ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَنْصُرُهُمْ ـ

এবং এদের জন্য পরকালে রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি কেউ কেউ বলেন, اَلْيَوْم বলতে حِكَايَةُ الْحَالِ الْاٰتِيَةِ [অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা বর্তমানে ঘটতেছে] রূপে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শয়তান ব্যতীত ঐ দিন তাদের আর কেউ অভিভাবক নেই। সেই দিন তো সে নিজেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় সুতরাং সে অন্যকে কেমন করে সাহায্য করবে?

٦٤. وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ لِلنَّاسِ الَّذِىْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَهُدًى عَطْفٌ عَلٰى لِتُبَيِّنَ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

৬৪. হে মুহাম্মদ! আমি তো তোমার প্রতি কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি। এদেরকে অর্থাৎ মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে বিষয়ে অর্থাৎ দীন সম্পর্কিত যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে তা আর এতে বিশ্বাসস্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ। وَهُدًى -পূর্বে উল্লিখিত لِتُبَيِّنَ -এর সাথে এটার عَطْف হয়েছে।

٦٥. وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا يُبْسِهَا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً دَالَّةً عَلَى الْبَعْثِ لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ ـ

৬৫. আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তিনি ভূমিকে এটার মৃত্যুর পর বিশুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃক্ষলতাদি দ্বারা পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ যারা চিন্তা ও ধ্যানের কানে শ্রবণ করে তাদের জন্য নিদর্শন পুনরুত্থানের উপর প্রমাণ রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْاَرْض : প্রশ্ন. عَلَيْهَا-এর যমীরের مَرْجِعْ-কে اَلْاَرْض নির্ধারণ করেছেন। অথচ পূর্বে اَلْاَرْض উল্লেখ নেই। এতে اِضْمَارْ قَبْلَ الذِّكْر আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর. যেহেতু نَاسْ এবং دَابَّةْ টা اَلْاَرْض-এর উপর বুঝায় কাজেই যদিও اَلْاَرْض প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ নেই কিন্তু دَلَالَةْ উল্লেখ রয়েছে। কাজেই اِضْمَارْ قَبْلَ الذِّكْر-এর প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهُ نَسَمَةْ : অর্থ ব্যক্তি, রূহ, বহুবচনে نَسَمَاتْ-نَسَمْ

قَوْلُهُ تَقُوْلُ : تَصِفْ-এর তাফসীর تَقُوْلُ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, تَصِفُ শব্দটি مَوْصُوْف এবং সিফতকে কামনা করে। অথচ এখানে مَوْصُوْفও নেই এবং صِفَتْও নেই।

উত্তর. এখানে تَصِفُ টা تَقُوْلُ অর্থে হয়েছে। কাজেই مَوْصُوْف ও صِفَتْ-এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ هُوَ : এটা উহ্য মানার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ টা তার مَدْخُوْل সহকারে جُمْلَةْ হয়ে উহ্য هُوَ মুবতাদা -এর খবর হয়েছে। تَصِفُ-এর মাফউল নয়। কেননা تَصِفُ-এর মাফউল اَلْكَذِبَ বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ مُقَدَّمُوْنَ : অর্থ– আগে করা হয়েছে। এটা اَفْرَطْتُهُ فِىْ طَلَبِ الْمَاءِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ قَدَّمْتُ لَهُ তথা আমি তাকে পানির জন্য অগ্রে প্রেরণ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের অন্যায়-অনাচারের বিবরণ স্থান পেয়েছে : আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে তাদের নাফরমানি ও অন্যায়-অনাচারের জন্যে তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না; বরং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাঁর দয়ামায়া এবং করুণার কারণেই তিনি অপবাদের সঙ্গে অপরাধীদেরকে পাকড়াও করেন না।

পাকড়া করার অর্থ শাস্তি দেওয়া আর আলোচ্য আয়াতের اَلنَّاسُ শব্দটির দ্বারা কাফের মুশরিক এবং পাপিষ্ঠদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ظُلْمٌ শব্দটি এ ব্যাখ্যারই ইঙ্গিতবহ। ظُلْمٌ শব্দ দ্বারা কুফর, শিরক, নাস্তিকতা, মোনাফেকী এক কথায় যাবতীয় পাপাচারকে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ আয়াতের মর্মকথা : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত-অসীম দয়ামায়া এবং করুণার উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর শিরক ও যাবতীয় নাফরমানি দেখেন, কিন্তু তবুও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন যেন তারা আত্মসংশোধনের সুযোগ পায়। এটি বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিতান্ত করুণা ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ الخ "যদি আল্লাহ পাক মানুষের অপরাধের সঙ্গে তার শাস্তি বিধান করেন তবে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীও থাকবে না।" পৃথিবী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিরান হয়ে যাবে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা, মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ব্যবহৃত হচ্ছে, যদি মানুষের পাপাচারের কারণে তাদের শাস্তি বিধান করেন তবে মানুষ তো ধ্বংস হবেই, তার পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টিও শেষ হয়ে যাবে, জীবজন্তুই হোক বা বৃক্ষ তরুলতাই হোক। তাছাড়া যদি মানুষই না থাকে অন্য কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না। কেননা মানুষ ব্যতীত অন্যসব কিছুকে আল্লাহ পাক মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। যদি মানুষের পাপাচারের পরিণামে প্রলয়ঙ্করী ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আজাব আপতিত হয়, তখন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জীবজন্তুও ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) শুনেছিলেন যে, এক ব্যক্তি বলেছিল, যদি কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি জুলুম করে, তবে সে জালেম তার নিজেরই ক্ষতি করে, তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন না, তা নয়; বরং ঐ ব্যক্তির জুলুমের কারণে পাখিরা ও তাদের নীড়ে ধ্বংস হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর, [উর্দু] পারা ১৪, পৃ. ৪০]

মানুষের অন্যায়-অনাচারের কারণে যখন আল্লাহ পাকের আজাব স্বরূপ বন্যা বা অনাবৃষ্টি আসে, তখন জীবজন্তুরাও সে আজাবের কবল থেকে রক্ষা পায় না। যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজ অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ পাকের শান, উচ্চতম মর্যাদা এবং সর্বময় ক্ষমতা এ কথার দাবিদার হয় যে, অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করা হোক। কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া, তাঁর করুণা ও তাঁর উদারতার কারণে অপরাধীদেরকে তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন, অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড প্রদান করেন না; বরং তাকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে তখন আর তার শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয় না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক যখন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি আজাব নাজিল করার ইচ্ছা করেন, তখন সকলেই ঐ আজাবের কবলে পড়ে, কিন্তু কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ এবং নিষ্পাপকে তাদের নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে।

قَوْلُهُ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ .... وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : "হে রাসূল! আমি আপনার প্রতি এই কিতাব [কুরআনে করীম] এজন্যে নাজিল করেছি যেন আপনি তাদের জন্যে সে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তারা মতবিরোধ করেছে" অর্থাৎ তওহীদ, রেসালত, আখেরাত, হালাল-হারাম প্রভৃতি এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যেন আপনি মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসন করেন। এ উদ্দেশ্যেই আপনার নিকট কুরআন নাজিল করা হয়েছে। "আর বিশেষত মুমিনদের জন্য রয়েছে এতে হেদায়েত এবং রহমত।"

বস্তুত নবী রাসূলগণের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। আর এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া হলো মানুষের দায়িত্ব। যারা এ দায়িত্ব যত্নসহকারে পালন করে তথা সত্যকে গ্রহণ করে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, দুনিয়া আখেরাত দোজাহানে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে যারা এ দায়িত্ব পালন না করে, তাদের পরিণাম হয় শোচনীয়। অতএব, হে রাসূল! আপনি তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا : কাফের মুশরিকরা তাওহীদের বিশ্বাস করতে রাজি হতো না, তাই এ আয়াত থেকে তাওহীদের কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু তাওহীদের প্রমাণই নয়; বরং একদিকে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের বিবরণও রয়েছে, অন্যদিকে এতে রয়েছে হেদায়েতের দলিল এবং আল্লাহর রহমতের কথা। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ পাকই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ধরার মৃত্যুর পর তাকে পানি দ্বারা জীবন দান করেছেন। নিশ্চয়ই এতে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে।

যখন খরায় ধরা পৃষ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়, মানুষ পানির জন্যে হাহাকার আর্তনাদ করতে থাকে তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি আছে যে মানব জাতিকে পানির এ নিয়ামত দান করতে পারে? আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে আসমান থেকে পানি নাজিল করেন এবং মৃত শুষ্ক জমিনকে জীবন দান করেন আর ঐ পানির মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠকে শস্য-শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ করে দেন। মৃত শুষ্ক মাটি নবজীবন লাভ করে। যাঁর অনন্ত অসীম কুদরতে বিশ্ব সৃষ্টির চেহারা বদলে যায়, তিনি মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পারেন।

অতএব, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ : নিশ্চয়ই এতে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে। মৃত শুষ্ক জমিন যখন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, আল্লাহ পাকের হুকুমে, মৃত মানুষও পুনর্জীবন লাভ করবে। অতএব, আসমান থেকে বারি বর্ষণে রয়েছে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনুবাদ :

٦٦. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط اِعْتِبَارًا نُسْقِيْكُمْ بَيَانٌ لِلْعِبْرَةِ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ اَىِ الْاَنْعَامِ مِنْ لِلْاِبْتِدَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُسْقِيْكُمْ بَيْنِ فَرْثٍ ثُفْلِ الْكَرِشِ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَا يَشُوْبُهُ شَىْءٌ مِنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ مِنْ طَعْمٍ اَوْ لَوْنٍ اَوْ رِيْحٍ وَهُوَ بَيْنَهُمَا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ سَهْلَ الْمُرُوْرِ فِىْ حَلْقِهِمْ لَا يَغُصُّ بِهٖ.

৬৬. আর অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা তার অর্থাৎ গবাদি পশুর গোবর ও রক্তের মাঝে উদরস্থিত যা আছে তা হতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ তোমাদেরকে পান করাই গোবর ও রক্তের সাথে অবস্থান সত্ত্বেও এটার স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে এতদুভয়ের কোনোরূপ সংমিশ্রণ নেই যা পানকারীদের জন্যে সুপেয় গলায় আটকায় না অতি সহজে গলাধঃকরণ হয়ে যায়। عِبْرَةً অর্থ শিক্ষা। نُسْقِيْكُمْ এটা উক্ত শিক্ষার বিবরণ। مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ এস্থানে مِنْ শব্দটি اِبْتِدَائِيَّه বা সূচনাবাচক; نُسْقِيْكُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট فَرْثٌ উদরের ময়লা, গোবর।

٦٧. وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ ثُمَّ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا خَمْرًا تُسْكِرُ سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ وَهٰذَا قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً دَالَّةً عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

৬৭. এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর হতে নেশাকর বস্তু মদ্য, سَكَرًا অর্থ নেশাকর মদ্য। مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎসমূলরূপে এস্থানে তার নামকরণ করা হয়েছে। এই আয়াতটি হলো এটা হারাম হওয়ার পূর্বের এবং উত্তম খাদ্য যেমন শুকনা খেজুর, কিশমিশ, রস ইত্যাদি লাভ করে থাক। এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন।

٦٨. وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ وَحْىَ اِلْهَامٍ اَنْ مُفَسِّرَةٌ اَوْ مَصْدَرِيَّةٌ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا تَاْوِىْ اِلَيْهَا وَّمِنَ الشَّجَرِ بُيُوْتًا وَّمِمَّا يَعْرِشُوْنَ اَىِ النَّاسُ يَبْنُوْنَ لَكَ مِنَ الْاَمَاكِنِ وَاِلَّا لَمْ تَاْوِ اِلَيْهَا.

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ওহী করেছেন অন্তরে ইলহাম করেছেন যে, পাহাড়ে তোমরা গৃহ নির্মাণ কর আবাস গ্রহণ কর; اَنِ اتَّخِذِىْ এস্থানে اَنْ টি مُفَسِّرَة অর্থাৎ বিবরণমূলক বা مَصْدَرِيَّه বা ক্রিয়ার উৎসমূল ব্যঞ্জক। বৃক্ষে গৃহ নির্মাণ কর এবং তারা অর্থাৎ মানুষ যে কুটির তৈরি করে তাতে অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে কুটির নির্মাণ করে তাতেও আবাস গ্রহণ কর। আল্লাহ যদি ইলহাম না করতেন তবে সে ঐ সমস্ত স্থানে আবাস গ্রহণ করত না।

٦٩. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ طُرُقَهُ فِي طَلَبِ الْمَرْعٰى ذُلُلًا جَمْعُ ذَلُولٍ حَالٌ مِنَ السُّبُلِ اَيْ مُسَخَّرَةٌ لَكِ فَلَا تَعْسُرُ عَلَيْكِ وَاِنْ تَوَعَّرَتْ وَلَا تَضِلِّي عَنِ الْعَوْدِ مِنْهَا وَاِنْ بَعُدَتْ وَقِيلَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي اُسْلُكِي اَيْ مُنْقَادَةً لِمَا يُرَادُ مِنْكِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ هُوَ الْعَسَلُ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ط مِنَ الْاَوْجَاعِ قِيلَ لِبَعْضِهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَنْكِيرُ شِفَاءٍ اَوْ لِكُلِّهَا بِضَمِيمَةٍ اِلٰى غَيْرِهِ اَقُولُ وَبِدُونِهِ بِنِيَّتِهِ وَقَدْ اَمَرَ بِهِ ﷺ مَنِ اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فِي صُنْعِهِ تَعَالٰى ـ

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু আহার কর। এবং আহরণ-ক্ষেত্র অন্বেষণে তোমার প্রভুর পথসমূহে চল যা তোমার বাধ্যগত করে দেওয়া হয়েছে। فَاسْلُكِي তুমি প্রবেশ কর। سُبُلَ পথসমূহে। ذُلُلًا -এটা ذَلُولٌ -এর বহুবচন। سُبُلَ -এর حَالٌ অর্থাৎ সেই পথসমূহ যেগুলো বাধ্যগত করে দেওয়া হয়েছে। বহু দূরের পথ হলেও তোমার জন্য তা কষ্টকর হবে না যতদূরই যাও না কেন ফেরার পথ ভুল হবে না। কেউ কেউ বলেন, এটা اُسْلُكِي -এর ضَمِيرٌ [সর্বনাম] [اَنْتِ]-এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ তুমি আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হয়ে চলো। তার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় মধু এতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির ব্যথা-বেদনার প্রতিকার অবশ্যই এতে অর্থাৎ আল্লাহর ক্রিয়াকর্মে যারা চিন্তা করে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। شِفَاءٌ لِلنَّاسِ মানুষের জন্য প্রতিষেধক। কেউ কেউ বলেন, কতক অবস্থার জন্য এটা প্রতিষেধক। شِفَاءٌ শব্দটির نكره ব্যবহার এটার প্রমাণ। অথবা এটার অর্থ অন্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত করলে সকল রোগের জন্যই এটা প্রতিষেধক। আমি বলি, নিয়ত ঠিক থাকলে অন্য উপাদানের সাথে এটার মিশ্রণ না ঘটালেও এটা সকল রোগের প্রতিষেধক হতে পারে। শায়খাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীর পেটের পীড়ায় রাসূল ﷺ তাকে মধু পান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٧٠. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ عِنْدَ انْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ اَيْ اَخَسِّهِ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرَفِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ط قَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَصِرْ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ قَدِيرٌ عَلٰى مَا يُرِيدُهُ ـ

৭০. আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না। অতঃপর তোমাদের মেয়াদ অন্ত হলে তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও কাউকেও করা হবে জরাগ্রস্ত। বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে উপনীত করা হবে, বুদ্ধি-বিভ্রম অবস্থায় পৌঁছানো হবে। ফলে, যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে না। ইকরিমা বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে এই অবস্থায় উপনীত হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি পরিচালনা সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ এবং তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নে সর্ব-শক্তিমান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ : এখানে مِنْ টা تَبْعِيْضِيَّه اِبْتِدَائِيَّه হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ : এটা لَبَنًا থেকে حَال مُقَدَّمْ হয়েছে। অথবা مَا থেকে حَالْ হয়েছে যা তার থেকে مُقَدَّمْ হয়েছে।

প্রশ্ন. بُطُوْنِه-এর যমীর اَنْعَامُ-এর দিকে ফিরেছে। আর اَنْعَامٌ বহুবচন হওয়ার কারণে مُؤَنَّثْ আর তার দিকে প্রত্যাবর্তিত যমীর হলো مُذَكَّر উভয়ের মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. اَنْعَامٌ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে যমীর مُذَكَّر নিয়েছেন আর সূরা আল মু'মিনূনে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে مؤنث নিয়েছেন। ইমাম সীবাওয়াইহি বলেন যে, اَنْعَام টা اَفْعَالْ-এর ওজনে مُفْرَدْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ بَيْنَهُمَا : এটা لَبَنًا থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ : এটা উহ্য نُسْقِيْكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ الخ-এর উপর এর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ : অর্থাৎ سَكَرًا যদিও মাসদার কিন্তু অর্থের দিক থেকে মদের অর্থ দেবে অর্থাৎ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ خَمْرًا এখন حَمل-এর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। আর مُبَالَغَة এবং مَجَازْ স্বরূপ خَمْر-এর নাম سَكَرْ রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا এটা খোঁটা দেওয়ার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। অথচ শরাব হারাম। আর হারাম জিনিসের সাথে খোঁটা দেওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. জবাবের সারমর্ম হলো এই যে, এই اِمْتِنَانْ বা অনুগ্রহ করা হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বের, আয়াতটি মাক্কী, আর মদের হুরমত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ : অর্থাৎ مَا يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوْتًا لِلنَّحْلِ الَّتِى تَتَعَسَّلُ فِيْهَا অর্থাৎ يَعْرِشُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই বেড়া বা বাশের কাঠামো যা মানুষ মধুমক্ষিকা লালনপালনের জন্য বানিয়ে থাকে।

قَوْلُهُ جَمْعُ ذَلُوْلٍ : এই হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, سُبُلَ হলো বহুবচন যা ذُو الْحَالِ হয়েছে, আর ذُلُلًا হলো একবচন, আর সেটা حَالْ হয়েছে। কাজেই حَالْ এবং ذُو الْحَالِ-এর মাঝে مُطَابَقَتْ পাওয়া যায়নি।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, ذُلُلًا টা একবচন নয়; বরং ذَلُوْل-এর বহুবচন। কাজেই عَدَم مُطَابَقَتْ-এর প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَوَعَّرَتْ : এ শব্দটি اَلْوَعْرُ থেকে এসেছে। অর্থ হলো– সহজতার বিপরীত, কঠিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً الخ : بُطُوْنِه শব্দের সর্বনামটি اَنْعَامْ-কে বুঝায়। اَنْعَامْ বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সূরা মু'মিনে এভাবেই بُطُوْنِهَا বলা হয়েছে।

কুরতুবী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, সূরা মু'মিনূনে বহুবচনের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নাহলে বহুবচনের রেওয়ায়েত করে সর্বনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবদের বাচন পদ্ধতিতে এর ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শব্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে।

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চলায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারির পরিপন্থি নয় তবে। শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন, দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোনো খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহর নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহর কুদরত যা চতুষ্পদ জীবজন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করেছি।

এরপর ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরি করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু-ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো, উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিজিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তা দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে- মাদকদ্রব্য তৈরি করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরি করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিয়ামত। যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سَكَرٌ-এর বিপরীত رِزْقٌ حَسَنٌ আনার কারণে জানা গেছে যে, سَكَرٌ ভালো রিজিক নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে سَكَرٌ-এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাসসাস]

[কোনো কোনো আলেমের মতে এর অর্থ সিকরা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।]

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাজিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভালো নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কুরআনে বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়।

-[জাস্সাস, কুরতুবী-সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ الخ : اَوْحٰى এখানে وَحْيٌ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোনো বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

اَلنَّحْلُ-জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলেছেন, কিন্তু এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে اَوْحٰى رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবণ্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বারো হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে দিয়ে [illegible] সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবণ্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাজত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুঁড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোনো মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। –[আল জাওয়াহের]

قَوْلُهُ اَوْحٰى رَبُّكَ...... بُيُوْتًا : বলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ। এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্তু অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু মৌমাছিদেরকে এমন গুরুত্ব সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কি? এছাড়া এখানে শব্দও بُيُوْتْ ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষের বাসগৃহের অর্থে আসে। এতে প্রথমত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরি করতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই তারা একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে নিক। দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা যে গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্তু-জানেয়ারের গৃহের মতো হবে না, বরং তার গঠন ও নির্মাণ হবে অনন্য সাধারণ। সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্তু-জানেয়ারের গৃহ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। তাদের গৃহ ছয় কোণাকৃতির হয়ে থাকে। স্কেল ও রুলার দিয়ে পরিমাপ করলেও তাতে চুল বরাবরও পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোণাকৃতি ছাড়া অন্য কোনো আকৃতি যেমন চতুর্ভুজ ও পঞ্চভূজ ইত্যাদি আকৃতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোনো কোনো বাহু অকেজো থেকে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিদেরকে শুধু গৃহ নির্মাণেরই নির্দেশ দেননি, বরং গৃহের অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোনো উঁচুস্থানে হওয়া উচিত। কারণ উঁচুস্থানে মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে। এছাড়া ভাঙনের আশঙ্কা থেকেও নিরাপদ থাকে। বলা হয়েছে। مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ এসব গৃহ পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং সুউচ্চ দালানকোঠায় নির্মিত হওয়া উচিত, যাতে সুরক্ষিত পদ্ধতিতে মধু তৈরি হতে পারে।

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ এটা দ্বিতীয় নির্দেশ। এতে বলা হয়েছে যে, নিজেদের পছন্দমতো ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও। مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ দ্বারা বাহ্যত সারা বিশ্বের ফল-ফুল বুঝানো হয়নি; বরং যেসব ফল ও ফুল পর্যন্ত তারা অনায়াসে পৌছাতে পারে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। সাবার রাণীর ঘটনায়ও كُلَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলা বাহুল্য, সেখানেও সারা বিশ্বের বস্তুসামগ্রী বোঝানো হয়নি, যদ্দরুন রাণীর কাছে উড়োজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি থাকাও জরুরি হয়ে পড়ে; বরং তখনকার সব জিনিসপত্র বুঝানো হয়েছে। এখানেও مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ বলে তাই বুঝানো হয়েছে। মৌমাছিরা এমন সব সূক্ষ্ম ও মূল্যবান নির্যাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও এরূপ নির্যাস বের করা সম্ভবপর নয়।

قَوْلُهُ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا : এটা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অর্থাৎ স্বীয় পালনকর্তার প্রস্তুতকৃত পথে চলমান হও। মৌমাছিরা যখন রস চুষে নেওয়ার জন্য গৃহ থেকে দূরদূরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গৃহে ফিরে আসা সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনোরূপ ভুল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা শূন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা ভূপৃষ্ঠের আঁকাবাকা পথে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তা'আলা শূন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য অনুবর্তী করে দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গৃহে আসা-যাওয়া করতে পারে।

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ অর্থাৎ তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়! অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ : মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজুন তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন! এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল [Alcohol]-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কোনো এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন, অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এলো যে, অসুখে কোনো পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন, صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ অর্থাৎ আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شِفَاءٌ শব্দটি نَكِرَه تَحْتَ الْإِثْبَاتِ এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু شِفَاءٌ শব্দের تَنْوِين যা تَعْظِيم -এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বুঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের কিছুসংখ্যক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ -[তাফসীরে কুরতুবী]

বান্দার সাথে আল্লাহ তদ্রূপ ব্যবহারই করেন, যেরূপ বান্দা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي অর্থাৎ আল্লাহ বলেন বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি [অর্থাৎ ধারণার অনুরূপ করে দেই।]

قَوْلُهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তির উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করার পর মানুষকে পুনরায় চিন্তাভাবনার আহ্বান জানিয়েছেন যে, তোমরা শক্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখ, আল্লাহ মৃত জমিনকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিত্র বস্তুর মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত করেন। তিনি আঙ্গুর ও খেজুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সৃষ্টি করেন, যা দ্বারা তোমরা সুস্বাদু শরবত ও মোরব্বা তৈরি কর। তিনি একটি ছোট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মুখরোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চমৎকার উপাদান সরবরাহ করেন। এরপরও কি তোমরা দেব-দেবীরই আরাধনা করবে? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও মালিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোনো অন্ধ, বধির, চেতনাহীন বস্তুর লীলাখেলা হবে? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, জ্ঞান ও কৌশলের এই বিস্ময়কর কীর্তি এবং বুদ্ধি-বিবেকের এই চমৎকার ফয়সালা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন স্রষ্টা অদ্বিতীয় ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা। তিনিই ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য। তিনিই বিপদ বিদূরণকারী এবং শোকর ও হামদ তাঁর জন্যই শোভনীয়।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ الخ : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা পানি, উদ্ভিদ, জন্তু ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে স্বীয় অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত করেছেন। এখন আলোচ্য আয়াতে মানুষকে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাকে অস্তিত্বের সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত খতম করে দেন। কোনো কোনো লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছে দেন যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা কোনো বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও স্মরণ রাখতে পারে না। বিশ্বজোড়া এই পরিবর্তন থেকে বুঝা যায় যে, যিনি স্রষ্টা ও প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারেই যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি সংরক্ষিত।

قَوْلُهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ : এখানে مَنْ يُرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে একপ্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনোরূপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ اَنْ ارد الى...... অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ -এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কুরআনও এর প্রতি لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ যে বয়সে হুঁশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ -এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলেছেন। হযরত আলী (রা.) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো হয়ে যায়, আর কোনো কিছুর খবর থাকে না। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ : নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্তি-সমর্থ্য যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

অনুবাদ :

٧١. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ج فَمِنْكُمْ غَنِيٌّ وَفَقِيْرٌ وَمَالِكٌ وَمَمْلُوْكٌ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا اَيِ الْمَوَالِيْ بِرَادِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَيْ بِجَاعِلِيْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَغَيْرِهَا شِرْكَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَمَالِيْكِهِمْ فَهُمْ اَيِ الْمَمَالِيْكُ وَالْمَوَالِيْ فِيْهِ سَوَاءٌ شُرَكَاءُ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ مِنْ مَمَالِيْكِهِمْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ فَكَيْفَ يَجْعَلُوْنَ بَعْضَ مَمَالِيْكِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ لَهُ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ يَكْفُرُوْنَ حَيْثُ يَجْعَلُوْنَ لَهُ شُرَكَاءَ.

৭১. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন সুতরাং তোমাদের মধ্যে রয়েছে ধনী ও নির্ধন, মালিক ও দাস। অনন্তর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। অর্থাৎ মালিক সম্প্রদায় তাদের মালিকানাস্থ ব্যক্তিদের নিজেদের জীবনোপকরণ হতে কিছু দেয় না অর্থাৎ ধনসম্পদ ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিস আমি এদেরকে প্রদান করেছি তাতে এরা নিজেরা ও এদের দাস-দাসীরা সমঅংশী হবে তেমন ভাবে কিছু দেয় না যাতে তারা অর্থাৎ দাস-দাসীও এক সমান শরিক হবো। অর্থাৎ এদের মালিকানাস্থ দাস-দাসীরা এদের শরিক হয় না, সুতরাং এরা আল্লাহর মালিকানাভুক্ত কতক দাস-দাসীকে কেমন করে তাঁর শরিক রূপে নির্ধারণ করে? তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? তাই তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে। يَجْحَدُوْنَ অস্বীকার করে. কুফরি করে।

٧٢. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا فَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ وَسَائِرَ النَّاسِ مِنْ نُطَفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً اَوْلَادَ الْاَوْلَادِ وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط مِنْ اَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْحُبُوْبِ وَالْحَيَوَانِ اَفَبِالْبَاطِلِ الصَّنَمِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِاِشْرَاكِهِمْ.

৭২. আর আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। হযরত হাওয়া (আ.)-কে তিনি হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরাস্থি হতে আর সকল মানুষকে পুরুষ ও নারীর শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেন। তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে নানা প্রকার ফল-ফলাদি, শস্য ও জীব-জন্তু দ্বারা সুপবিত্র জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যাতে প্রতিমাতে বিশ্বাস করবে এবং শিরক করত তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? حَفَدَةً অর্থ পৌত্র-পৌত্রী।

٧٣. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَیْ غَیْرِهِ مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ بِالنَّبَاتِ شَيْئًا بَدَلٌ مِنْ رِزْقًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ وَهُوَ الْاَصْنَامُ

৭৩. এবং তারা উপাসনা করে আল্লাহ ব্যতীত অপরদের অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের যারা আকাশমণ্ডলী হতে বৃষ্টির মাধ্যমে এবং পৃথিবী হতে গাছপালা জন্মাবার মাধ্যমে তাদেরকে জীবনোপকরণ সরবরাহের মালিক নয় এবং তারা সক্ষমও নয়। কোনো কিছুরই তারা শক্তি রাখে না। شَيْئًا -এটা رِزْقًا -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

٧٤. فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ط لَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَشْبَاهًا تُشْرِكُوْنَهُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنْ لَّا مِثْلَ لَهٗ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ

৭৪. সুতরাং আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করোনা। অর্থাৎ আল্লাহর কোনো সদৃশ নির্ধারণ করে তাকে তাঁর সাথে শরিক করো না। আল্লাহ অবশ্য জানেন যে তাঁর কোনো সদৃশ নেই এবং তোমার তা জান না।

٧٥. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ عَبْدًا مَّمْلُوْكًا صِفَةٌ تُمَيِّزُهٗ مِنَ الْحُرِّ فَاِنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ لِعَدَمِ مِلْكِهٖ وَّمَنْ نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ اَیْ حُرًّا رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ط اَیْ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَالْاَوَّلُ مَثَلُ الْاَصْنَامِ وَالثَّانِیْ مَثَلُهٗ تَعَالٰى هَلْ يَسْتَوٗنَ اَیِ الْعَبِيْدُ الْعَجَزَةُ وَالْحُرُّ الْمُتَصَرِّفُ لَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وحده بل اَكْثَرُهُمْ اَیْ اَهْلُ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ.

৭৫. আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন মালিকানাভুক্ত এক দাসের মালিকানা অধিকার না থাকায় যে কোনো কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক স্বাধীন ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে তা হতে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে অর্থাৎ যথেচ্ছা তার ব্যবহার করতে পারে। তারা কি অর্থাৎ ক্ষমতাহীন দাস ও স্বাধীকার সম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তি কি একে অপরের সমান? না, সমান নয়। সকল প্রশংসা এক আল্লাহরই প্রাপ্য। তবে তাদের মক্কাবাসীদের অধিকাংশজনই জানে না কি শাস্তির দিকে তারা চলেছে, তাই তারা শিরক করে। এ আয়াতটিতে প্রথমটি [মালিকানাহীন দাস] হলো প্রতিমাসমূহের উদাহরণ, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ তা'আলার উদাহরণ। عَبْدًا এটা مَثَلًا-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مَمْلُوْكًا এটা عَبْدًا-এর বিশেষণ। এটার মাধ্যমে স্বাধীন ব্যক্তি হতে তার পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কেননা عَبْد বা দাস বলতে সকলেই তো আল্লাহর। مَنْ এটা এস্থানে نَكِرَه مَوْصُوْفَة বা বিশেষণযুক্ত অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ।

٧٦. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ وُلِدَ أَخْرَسَ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ وَلَا يُفْهِمُ وَّهُوَ كَلٌّ ثَقِيلٌ عَلٰى مَوْلٰيهُ وَلِيِّ أَمْرِهِ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ يُصَرِّفْهُ لَا يَأْتِ مِنْهُ بِخَيْرٍ ط بِنُجْحٍ وَهٰذَا مَثَلُ الْكَافِرِ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ أَيِ الْأَبْكَمُ الْمَذْكُوْرُ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ أَيْ وَمَنْ هُوَ نَاطِقٌ نَافِعٌ لِلنَّاسِ حَيْثُ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحِثُّ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَهُوَ الثَّانِي الْمُؤْمِنُ لَا وَقِيْلَ هٰذَا مَثَلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْأَبْكَمُ لِلْأَصْنَامِ وَالَّذِيْ قَبْلَهُ فِي الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ ـ

৭৬. আল্লাহ আরও উদাহরণ দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির তাদের একজন মূক, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না কেননা সে নিজেও বুঝে না এবং তাকে বুঝাতেও পারা যায় না। সে তার অভিভাবকের উপর তার বিষয়াদির তত্ত্বধায়কের উপর ভারস্বরূপ। তাকে যে দিকেই ঘুরানো হোক না কেন তার তরফ হতে ভালো কিছু আসে না সে উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়ে আসে না। এটা হলো কাফেরের উদাহারণ। সে কি অর্থাৎ উল্লিখিত মূক ব্যক্তি কি সমান হবে ঐ কাফের ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ যে সবাক ও মানুষের উপকারকারী। কারণ সে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় ও মানুষকে এটার জন্য উৎসাহিত করে এবং সে আছে সরল পথে? না তার সমান নয়। এই দ্বিতীয়টি হলো মু'মিনের উদারহণ। কেউ কেউ বলেন, এটা হলো আল্লাহর উদাহরণ আর মূক ব্যক্তিটি হলো প্রতিমাসমূহের উদাহরণ। পূর্ববর্তী আয়াত [৭৫ নং] -এ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে কাফের ও মু'মিনের উদারহরণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِرَادِّيْ : এখানে بَاء হলো حَرْف جَارّ আর رَادِّيْ আসলে ছিল رَادِّيْنَ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) অর্থ ফিরিয়ে দেয় যে প্রত্যর্পণকারী, দাতা, ইযাফতের কারণে نُوْن টা পড়ে গেছে।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ : এ বাক্যটি جَوَاب نَفْى -এর স্থানে পতিত হয়েছে এবং এটা মুশরিকদের উপর رَدّ হয়েছে। তার স্বীয় দাসদেরকে নিজেদের মালিকানায় সম অধিকারের ভিত্তিতে শরিক করার জন্য তৈরি নয় আর আল্লাহর কতিপয় দাসকে তাঁর উলূহিয়্যাতের মধ্যে শরিক করে।

قَوْلُهُ يَكْفُرُوْنَ : يَجْحَدُوْنَ-এর তাফসীর يَكْفُرُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَجْحَدُوْنَ টা يَكْفُرُوْنَ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে কাজেই তার مُتَعَدِّيْ بِالْبَاءِ হওয়া বৈধ রয়েছে। অন্যথায় يَجْحَدُوْنَ টা مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِهٖ হয়েছে।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ رِزْقًا : মুফাসসির (র.) যদি شَيْئًا -কে رِزْقًا থেকে بَدَل না বলে مَفْعُوْل بِهٖ বললে বেশি ভালো হতো। চাই মাসদার হোক বা اِسْم مَصْدَرْ হোক। কেননা بَدَل টা দুটি অর্থ হতে একটি অর্থের জন্য আসে, হয়তো بَيَانٌ -এর জন্য অথবা تَاكِيْد-এর জন্য। এখানে এ উভয়টিই বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ : প্রশ্ন. এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর مَا لَا يَمْلِكُ -এর মধ্যে একবচনের। অথচ উভয় যমীরের مَرْجِع একই। আর তা হলো شُرَكَاءُ

উত্তর. يَمْلِكُ-এর মধ্যে مَا-এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, আর يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর মধ্যে مَا-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ الخ : ইতঃপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে তাওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোনো সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ইত্যাদি গুণাবলিতে অংশীদার মেনে নিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে তাওহীদের এ বিষয়বস্তুই একটি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্যবশতই মানুষের উপকারার্থে জীবিকার ক্ষেত্রে সব মানুষকে সমান করেননি; বরং একজনকে অপরজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। কাউকে এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধিকারী। নিজেও ইচ্ছামতো ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নকররাও তার হাত থেকে রিজিক পায়। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন, সে অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের ব্যয়ও অন্যের হাত থেকে পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কাউকে মধ্যবিত্ত করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মতো ধনীও নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো নিঃস্বও নয়।

এই প্রাকৃতিক বণ্টনের ফলশ্রুতি সবার চোখের সামনে। যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনো এটা পছন্দ করে না যে, নিজের ধন-সম্পত্তি গোলাম ও খাদেমের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পত্তিতে তার সমান হয়ে যাবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার সৃজিত ও মালিকানাধীন, তখন তারা এটা কিরূপে পছন্দ করে যে, এসব সৃষ্ট ও মালিকানাধীন বস্তু স্রষ্টা ও মালিকের সমান হয়ে যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্তু শুনেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে? এরূপ করার অনিবার্য পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি অস্বীকার করে। কেননা তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দান, স্বকল্পিত প্রতিমা অথবা কোনো মানুষ ও জিনের কোনো হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত?

এসব বিষয়বস্তুই সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে- ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিজিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা তাতে তাদের সমান হয়ে যাও? এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেমদেরকে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার জন্য কিরূপে পছন্দ কর যে, তাঁর সৃজিত ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ তাঁর সমান হয়ে যাবে।

জীবিকার শ্রেণি-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহর অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধনদৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোনো যুগে ও কোনো সময়ে সব মানুষ ধনসম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোরজবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্যমান রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণি থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতার বন্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কুরআনের বিধান : তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিজিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, সেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণির

অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কুরআন পাক সূরা হাশরে বলেন- كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ অর্থাৎ আমি সম্পদ বণ্টনের আইন এজন্য তৈরি করেছি, যাতে ধনসম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা এই আল্লাহর আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্রুতি। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য দাসত্ব ও মজুরি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। তারা যোগ্যতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা রাখতে পারে না।

পুঁজিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি পরস্পর বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সর্বস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পুঁজিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ শ্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ শ্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা। অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র্য অনাহার ও উপবাস সত্ত্বেও একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার মালিক ছিল। কম্যুনিজমে এ মানবিক সম্মানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় মেশিনের কলকজার চাইতে অধিক মানুষের কোনো মূল্য নেই। এতে কোনো সম্পত্তির মালিকানা কল্পনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এই যে, সে কোনো কিছুর মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়; বরং সবই রাষ্ট্ররূপী মেশিনের কলকজার। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কল্পিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোনো বিবেক আর না আছে কোনো বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রযন্ত্রের জোর-জুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উহঃ আহঃ করাও প্রাণদণ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ও ধর্মের বিরোধিতা এবং খাঁটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিস্তম্ভ।

কোনো সমাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণধারদের গ্রন্থাবলি এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একত্রিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে।

কুরআন পাক উৎপীড়নমূলক পুঁজিবাদ এবং নির্বোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝা-মাঝি, স্বল্পতা ও বহুল্য বিবর্জিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এতে রিজিক ও অর্থসম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং কৃত্রিম দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করতে পারে না। সুদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি ভূমিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে তাদেরকে তাতে অংশীদার করা হয়েছে। এটা দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং কর্তব্য সম্পাদন মাত্র। وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ আয়াতটি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে বণ্টন করে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে উঠা সম্পদকে সমগ্র জাতির যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোতে কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বৈধ নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তুর উপর পুঁজিপতিদের মালিকানা স্বীকার করা হয়। জ্ঞানগত ও কর্মগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও যথার্থ তাৎপর্যের তাগাদা। সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা অস্বীকার করতে পারে না। সাম্যের ধ্বজাধারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সাম্যের দাবি পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন-

"আমরা মজুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। আমরা মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মজুরি এক পর্যায়ে আনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এই যে, সমাজে সমাজবাদী বৈষয়িক কারণাদির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে।" -[সোভিয়েট ওয়ার্ল্ড, ৩৪৬ পৃ.]

অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধ্যমে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই সবার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ অসাম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াতে সাধারণ পুঁজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে। লিউন শিডো লিখেন-

"এমন কোনো উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।" উল্লিখিত কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ অবিশ্বাসীদের মুখে وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়ে দিয়েছে। وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর সম্পদ বণ্টনে ইসলামি মূলনীতি এবং পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে তার পার্থক্য ইনশাআল্লাহ সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا : আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালোবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً : অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সন্তানসন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু নিষ্প্রাণ একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এজন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ : বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর সদৃশরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোনো রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালন করতে পারে না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে তাঁকে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল কেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

শেষের দু আয়াতে মানুষের দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভু ও গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই যখন একই জাতি ও একই শ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোনো সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সমান কিরূপে সাব্যস্ত কর?

দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভালো কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে চলে। এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার অধিকারী ব্যক্তির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং অন্যের কাজও ঠিকমতো করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণি এবং একই সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তাঁর সাথে কোনো সৃষ্টবস্তু কিরূপে সমান হতে পারে।

অনুবাদ :

٧٧. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ عِلْمِ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ مِنْهُ لِاَنَّهُ بِلَفْظِ كُنْ فَيَكُوْنُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে যা অদৃশ্য সেই সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহরই। কিয়ামতের বিষয়টি তো চক্ষুর পলকের মতো বা তা অপেক্ষাও নিকটতর কেননা তা 'কুন' শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই সংঘটিত হবে। আল্লাহ অবশ্যই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧٨. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا اَلْجُمْلَةُ حَالٌ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ الْقُلُوْبَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ.

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণেন্দ্রীয় ও হৃদয়, যাতে তোমরা এগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আনয়ন কর। .... لَا تَعْلَمُوْنَ এটা حَالٌ - اَلسَّمْعَ এটা এই স্থানে বহুবচন اَسْمَاء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْاَفْئِدَةَ অর্থ– হৃদয়সমূহ।

٧٩. اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ مُذَلَّلَاتٍ لِلطَّيَرَانِ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ اَىِ الْهَوَاءِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَا يُمْسِكُهُنَّ عِنْدَ قَبْضِ اَجْنِحَتِهِنَّ وَبَسْطِهَا اَنْ يَّقَعْنَ اِلَّا اللّٰهُ بِقُدْرَتِهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ هِىَ خَلْقُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا الطَّيَرَانَ وَخَلَقَ الْجَوَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الطَّيَرَانُ فِيْهِ وَاِمْسَاكُهَا.

৭৯. আকাশের শূন্য গর্ভে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বায়ুমণ্ডলে নির্দেশাবদ্ধ উড্ডয়নের জন্য বাধ্যগত পক্ষীকূলকে কি তারা লক্ষ্য করে না? আল্লাহই অর্থাৎ তাঁর কুদরতেই তিনি তাদেরকে ডানা সংকোচন ও বিস্তারের সময় পতন হতে স্থির রাখেন। অবশ্যই এতে অর্থাৎ উড্ডয়নের সামর্থ্য দিয়ে এদেরকে সৃষ্টি করা এবং উড্ডয়ন ও স্থির থাকার উপযোগী করে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

٨٠. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا مَوْضِعًا تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا كَالْخِيَامِ وَالْقِبَابِ تَسْتَخِفُّوْنَهَا لِلْحَمْلِ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ سَفَرِكُمْ.

৮০. এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদেরকে পশু-চর্মের ঘরেরও যেমন বড় ছোট তাঁবু ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা তোমাদের ভ্রমণকালে বহনের জন্য এবং অবস্থানকালেও তা খুবই হালকাবোধ কর।

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا أَيِ الْغَنَمِ وَأَوْبَارِهَا أَيِ الْإِبِلِ وَأَشْعَارِهَا أَيِ الْمَعْزِ أَثَاثًا مَتَاعًا لِبُيُوتِكُمْ كَبُسُطٍ وَأَكْسِيَةٍ وَمَتَاعًا تَتَمَتَّعُونَ بِهِ إِلَى حِينٍ تُبْلَى فِيهِ.

তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদেরকে যেমন মেষের পশম উষ্ট্রের লোম ও ছাগলের কেশ হতে গৃহ-সামগ্রী। যেমন বিছানা, বস্ত্র ইত্যাদি ও নির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ্য সামগ্রীর। যা তোমরা পুরাতন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভোগ কর। سَكَنًا অর্থ- আবাসস্থল। ظَعْنِكُمْ অর্থ- তোমাদের যাত্রাকালে। أَثَاثًا অর্থ- গৃহ-সামগ্রী।

٨١. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ مِنَ الْبُيُوتِ وَالشَّجَرِ وَالْغَمَامِ ظِلٰلًا جَمْعُ ظِلٍّ تَقِيكُمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا جَمْعُ كِنٍّ وَهُوَ مَا يُسْتَكَنُّ فِيهِ كَالْغَارِ وَالسِّرْدَابِ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ قُمُصًا تَقِيكُمُ الْحَرَّ أَيْ وَالْبَرْدَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ط حَرْبَكُمْ أَيِ الطَّعْنَ وَالضَّرْبَ فِيهَا كَالدُّرُوعِ وَالْجَوَاشِنِ كَذٰلِكَ كَمَا خَلَقَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ فِي الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ بِخَلْقِ مَا تَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ تُسْلِمُوْنَ تُوَحِّدُوْنَهُ.

৮১. এবং আল্লাহ গৃহাদি, বৃক্ষ ও মেঘ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন। যাতে তোমরা সূর্য-তাপ হতে আত্মরক্ষা করতে পার এবং পাহাড়ে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছেন। আরও ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের জামা ইত্যাদি তা তোমাদেরকে তাপ ও শীত হতে রক্ষা করে এবং এমন বস্ত্রের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে খোঁচার আঘাত হতে রক্ষা করে যেমন লৌহবর্ম ইত্যাদি। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তিনি তোমাদের জন্য এ সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সৃষ্টি করত দুনিয়ায় তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা হে মক্কাবাসীরা আত্মসমর্পণ কর, তাওহীদ অবলম্বন কর। ظِلٰلًا এটা ظِلٌّ -এর বহুবচন; ছায়া। أَكْنَانًا এটা كِنٌّ -এর বহুবচন। অর্থাৎ যাতে একজন আত্মগোপন করে। بَأْسَكُمْ অর্থ- তোমাদের যুদ্ধে।

٨٢. فَإِنْ تَوَلَّوْا أَعْرَضُوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الْإِبْلَاغُ الْبَيِّنُ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ.

৮২. অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ইসলাম উপেক্ষা করে তবে হে মুহাম্মদ, তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ সংবলিত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল। اَلْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

٨٣. يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ أَيْ يُقِرُّوْنَ بِأَنَّهَا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا بِإِشْرَاكِهِمْ وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

৮৩. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে। অর্থাৎ তারা জ্ঞানত স্বীকার করে যে তা আল্লাহর পক্ষ হতে কিন্তু শিরক করত মূলত আবার এগুলো অস্বীকার করে এবং তারা অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عِلْمُ مَا غَابَ : مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ

قَوْلُهُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ : অর্থাৎ كَرَجْعِ الطَّرْفِ مِنْ أَعْلَى الْحَدِيقَةِ إِلَى أَسْفَلِهَا

قَوْلُهُ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ : أَوْ لِلتَّخْيِيرِ أَوْ بِمَعْنَى هَلْ

قَوْلُهُ الْجُمْلَةُ حَالٌ : এখানে لَا تَعْلَمُوْنَ টা বাক্য হয়ে كُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর شَيْئًا হলো مَفْعُوْل بِهٖ

قَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمْ : এর আতফ হলো أَخْرَجَكُمْ -এর উপর। তার ফায়েল তাতে উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بَسْطٌ : অর্থ– বিছানা, ফরাশ। একবচনে بِسَاطٌ

قَوْلُهُ أَكْسِيَةٌ : বহুবচন; একবচনে كِسَاءٌ অর্থ– চাদর।

قَوْلُهُ ظَعْنِكُمْ : ظَعْنٌ অর্থ– সফর, যাত্রা, স্থানান্তর। বাবে فَتَحَ থেকে মাসদার ظَعْنًا অর্থ– স্থানান্তর করা, সফর করা।

قَوْلُهُ قِبَابٌ : এটা قُبَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– গম্বুজ, মিনার।

قَوْلُهُ سَرَابِيْلُ : জামা, কোর্তা। এটা سِرْبَالٌ -এর বহুবচন। مَجَازٌ হিসেবে মুতলাক পোশাক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ جَوَاشِنُ : এটা جَوْشَنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– লৌহবর্ম, যুদ্ধের পোশাক বিশেষ, বর্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধের পোশাক লৌহ নির্মিত হোক বা অন্য কিছুর। অথবা এখানে শিরস্ত্রাণ উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোনো জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোনো ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কান্না জুড়ে দেয়। অনুরূপ অন্য যে কোনো কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তাঁরা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতেই সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হতো, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোনো অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে কোন ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোনো কোনো বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয়ে নিয়ে চিন্তা করার ও বুঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا -এর পরে বলা হয়েছে وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ অর্থাৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোনো কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سَمْع অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে, কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞান সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কুরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে أَفْئِدَةَ বলা হয়েছে। এটা فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোনো কিছু বুঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তিও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন। বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোনো শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا : এখানে بُيُوْتٌ শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بَيْتٌ বলা হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরে বলেন- كُلُّ مَا عَلَاكَ فَاَظَلَّكَ فَهُوَ سَقْفٌ وَسَمَاءٌ وَكُلُّ مَا اَقَلَّكَ فَهُوَ اَرْضٌ وَكُلُّ مَا سَتَرَكَ مِنْ جِهَاتِكَ الْاَرْبَعِ فَهُوَ جِدَارٌ فَاِذَا انْتَظَمَتْ وَاتَّصَلَتْ فَهُوَ بَيْتٌ অর্থাৎ "যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করেছে তা জমিন এবং যে বস্তু চতুর্দিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بَيْتٌ তথা গৃহে পরিণত হয়।"

গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তি : আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবগৃহকে শান্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শান্তি। মানুষ অভ্যাসগতভাবে গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে পৌঁছে বিশ্রাম ও শান্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকর্মে মশগুল থাকে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব কমই হয়।

এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান গুণ হচ্ছে তাতে শান্তি পাওয়া। বর্তমান বিশ্বের গৃহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে। এতে বাহ্যিক সাজসজ্জার জন্য বেহিসাব খরচও করা হয়, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি পাওয়া যায়, এরূপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানে। এটা না হলে গৃহে যাদের সাথে উঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুরম্য অট্টালিকার চাইতে এমন কুড়ে ঘরও উত্তম, যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্তি পায়।

কুরআন পাক প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শান্তিকে মানব গৃহের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শান্তি সাব্যস্ত করে বলেছে, لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا অর্থাৎ "তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার।" যে দাম্পত্য জীবন থেকে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজসজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজসজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে।

مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ এবং مِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا থেকে প্রমাণিত হলো যে, জীবজন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি জবাইকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশ্‌ত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোনো শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোনো প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েজ হয়ে যায়। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

قَوْلُهُ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ : এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী (র.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কুরআন পাক আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, কুরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٨٤. وَاذْكُرْ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا هُوَ نَبِيُّهَا يَشْهَدُ لَهَا وَعَلَيْهَا وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْاِعْتِذَارِ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ لَا تُطْلَبُ مِنْهُمُ الْعُتْبٰى اَيِ الرُّجُوْعُ اِلٰى مَا يَرْضَى اللّٰهُ.

৮৪. এবং স্মরণ কর যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। আর এ ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের দিন। সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীকে অজুহাত পেশ করারও অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে ফিরার সুযোগও দেওয়া হবে না অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসারও ব্যবস্থা হবে না।

٨٥. وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوا الْعَذَابَ النَّارَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ يُمْهَلُوْنَ عَنْهُ اِذَا رَاَوْهُ.

৮৫. যখন সীমালজ্ঘনকারীগণ কাফেরগণ শাস্তি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে তাদের হতে তা লঘুও করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো বিরামও দেওয়া হবে না। তা প্রত্যক্ষ করার পর তাদেরকে কোনোরূপ অবকাশও প্রদান করা হবে না।

٨٦. وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاۤءَهُمْ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ وَغَيْرِهَا قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ شُرَكَاۤؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا نَعْبُدُهُمْ مِنْ دُوْنِكَ ج فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اَيْ قَالُوْا لَهُمْ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ اِنَّكُمْ عَبَدْتُمُوْنَا كَمَا فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ.

৮৬. অংশীবাদীগণ শয়তান ইত্যাদি যাদেরকে তারা আল্লাহর শরিক করেছিল তাদেরকে যখন দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরিক করেছিলাম এবং তোমার পরিবর্তে আহবান করতাম অর্থাৎ উপাসনা করতাম। এ বক্তব্য তাদের প্রতিই তারা ছুড়ে দেবে অর্থাৎ প্রত্যুত্তরে তাদেরকে তারা যাদেরকে শরিক করা হয়েছিল তারা বলবে অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে উপাসনা করতে বলে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছে তাতে মিথ্যাবাদী। অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা বলবে- مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ 'তারা আমাদের উপাসনা করত না।' [সূরা কাসাস : ৬৩] অর্থাৎ তারা তাদেরকে উপাসনা করার কথা অস্বীকার করবে।

٨٧. وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ اَيِ اسْتَسْلَمُوا الْحِكْمَةَ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ مِنْ اَنَّ اٰلِهَتَهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ.

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে অর্থাৎ তাঁর হুকুমের তাবেদার হবে এবং তারা যে মিথ্যা-উদ্ভাবন করত যে, তাদের দেবতারা তাদের জন্য সুপারিশ করবে তা তাদের হতে হারিয়ে যাবে। গায়েব হয়ে যাবে।

٨٨. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهٖ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ الَّذِىْ اسْتَحَقُّوْهُ بِكُفْرِهِمْ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَقَارِبُ اَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ بِصَدِّهِمِ النَّاسَ عَنِ الْاِيْمَانِ ـ

৮৮. যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে তাঁর দীন হতে বাধা প্রদান করে কুফরির দরুন তারা যে শাস্তির অধিকারী হয়েছিল সেই শাস্তির উপর তাদেরকে আমি আরও শাস্তি বৃদ্ধি করব। কারণ তারা ঈমান হতে মানুষকে বাঁধা প্রদান করে অশান্তি সৃষ্টি করত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এদের শাস্তির জন্য এমন এমন বৃশ্চিক হবে যেগুলোর দাঁত হবে সুদীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষের ন্যায়।

٨٩. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ هُوَ نَبِيُّهُمْ وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدُ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَاۤءِ اَىْ قَوْمِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْقُرْاٰنَ تِبْيَانًا بَيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ اِلَيْهِ مِنْ اَمْرِ الشَّرِيْعَةِ وَّهُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى بِالْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ ـ

৮৯. আর স্মরণ কর সেই দিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদের মধ্য হতে এক একজন সাক্ষী। তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-ই হবেন এই সাক্ষী [এবং] হে মুহাম্মদ! তোমাকে আমি এদের বিষয় অর্থাৎ তোমার সম্প্রদায়ের বিষয়ে আনব সাক্ষীরূপে। আমি তোমার নিকট কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য শরিয়ত সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন সেই সমস্ত প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে বিভ্রান্তি হতে পথ-নির্দেশ, রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারী সম্প্রদায়ের জন্য। তাওহীদ অবলম্বী সম্প্রদায়ের জন্য। تِبْيَانًا অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিবরণস্বরূপ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يُسْتَعْتَبُوْنَ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالْ-এর اِسْتِعْتَابٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ-এর جَمْع مُذَكَّرغَائِبْ-এর সীগাহ, অর্থ– আনন্দ অর্জন করার জন্য বলা, সন্তুষ্টি অর্জন করার ইচ্ছা করা। কতিপয় মুফাসসির لَا يُسْتَعْتَبُوْنَ-এর অনুবাদ করেছেন, তাদের ওজর কবুল করা হবে না, আল্লামা মহল্লী (র.) এই শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ اَنْ يُرْضُوْا رَبَّهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ لِاَنَّهَا لَا تَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ তাদের থেকে এ কথা প্রার্থনা হবে না যে, তওবা ও আনুগত্যের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে নাও। কেননা সেদিন এ সকল বস্তু কোনোই কাজে আসবে না।

قَوْلُهٗ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : এটা হলো মুবতাদা আর زِدْنَاهُمْ হলো তার খবর। আবার এটাও হতে পারে যে, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ হলো يَفْتَرُوْنَ-এর ফায়েল এবং زِدْنَاهُمْ হলো جُمْلَه مُسْتَانِفَه ।

قَوْلُهٗ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ : এখানে بَا টি হলো سَبَبِيَّه আর مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ– بِسَبَبِ كَوْنِهِمْ مُفْسِدِيْنَ

قَوْلُهٗ اَىْ قَوْمِكَ : এটা একটা তাফসীর অর্থাৎ প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন এবং রাসূল ﷺ ও স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। বায়যাবী এরূপই বলেছেন আবার কতিপয় মুফাসসির বলেন যে, هٰؤُلَاۤءِ দ্বারা নবীগণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নবীগণের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। কেননা প্রত্যেক নবীর স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া

যাতে রাসূল ﷺ ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ থেকে বুঝা যায়, এটাকে রাসূল ﷺ -এর ব্যাপারে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করাটা অহেতুক تَكْرَارٌ হয়েছে। কাজেই شَهِيدًا عَلَى هٰؤُلَاءِ দ্বারা شَهَادَةٌ عَلَى ﷺ -ই উদ্দেশ্য হবে। আর আবূ সউদের ইবারত হলো এই- عَلَى هٰؤُلَاءِ الْأُمَمِ وَشُهَدَائِهِمْ -الْأَنْبِيَاءِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, অনেক লোক আল্লাহ পাকের নিয়ামত দেখেও তা অস্বীকার করে। আর এ আয়াতে কিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই কাফেরদের সম্পর্কে যারা বুঝেশুনেও আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা আলোচ্য আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে। -[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ২৪০]

ইমাম রাজী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর নিয়ামতের পরিচয় পাওয়ার পরও তা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তাদের অধিকাংশই হলো কাফের। আর আলোচ্য আয়াতে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। -[তাফসীরে কবীর, খ. ২০, পৃ. ৯৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের যে দুর্গতি হবে, আলোচ্য আয়াতে তারই উল্লেখ রয়েছে।

এ আয়াতে شَهِيد শব্দ দ্বারা পয়গম্বরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি তাঁর উম্মতের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন যে তিনি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কাফেরদেরকে তাদের পক্ষে কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না অথবা এর অর্থ হলো তাদেরকে সেদিন কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ভয়াবহ আজাব প্রত্যক্ষ করার পর তারা দুনিয়াতে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। কিন্তু তাদেরকে সে অনুমতিও দেওয়া হবে না।

বস্তুত কিয়ামতের দিন সমাগত, স্থির-নিশ্চিত। যেদিন প্রত্যেককে তার সারা জীবনের হিসাবপত্র পেশ করার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে। প্রত্যেক উম্মতের পয়গম্বর সেই উম্মতের সাক্ষী হিসেবে পেশ হবেন এবং নিজের উম্মতের নেককার, বদকার, অসৎ এবং পাপী লোকদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। -[তাফসীরে মাযহারী. খ. -৬, পৃ,. -৪২২-২৩]

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের সঙ্গে তাঁদের উম্মত বা জাতি কি ব্যবহার করেছে তার বিবরণ পেশ করবেন, সে মুহূর্তে এত ভয়াবহ হবে যে মুশরিক তথা পৌত্তলিক এবং নাস্তিকরা তাদের প্রকৃত রূপ এবং ভয়াবহ পরিণাম দেখে এমন অসহায় হয়ে পড়বে যে কোনো কথা বলার অবস্থায় তারা থাকবে না, তারা এত অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে যে, কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করার কোনো সুযোগই তারা পাবে না। এমনকি ঈমান আনার এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করারও কোনো সুযোগ থাকবে না। তারা সেদিন এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবী ছিল কর্মস্থল আর আখেরাত হলো কর্মফল লাভের স্থান। অতএব, কথা বলার চেষ্টা হবে বৃথা। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের উম্মত সম্পর্কে যে স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন, সে অনুযায়ীই ফয়সালা হবে। যারা শিরক কুফর এবং নাফরমানীর মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا : ইমাম রাজী (র.) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে- ১. কাফেরদেরকে কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ২. তাদেরকে অধিক কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৩. তাদেরকে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৪. সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের সময় কাউকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না, সকলে তখন থাকবে নীরব।

قَوْلُهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ : অর্থাৎ তাদেরকে একথাও বলা হবে না যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে রাজী করে নাও তথা তওবার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ কর। এক কথায় কাফেররা সেদিন কোনোভাবেই আল্লাহ পাককে রাজী করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ : জালেমরা যখন আল্লাহর আজাব দেখতে পাবে তখন তাদের প্রতি আজাব লঘু হবে না এবং তারা অবকাশও পাবে না। তারা আজাব থেকে কোনো অবস্থাতেই রেহাই পাবে না, এমনকি তাদের প্রতি আজাব কিছুমাত্র লঘুও করা হবে না এবং মুহূর্তের জন্যেও তাদের প্রতি আজাবে বিরতি হবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদেরকে জালেম বলা হয়েছে। কেননা, কাফেররা কুফরি এবং নাফরমানির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। আর যখন তারা আজাবের সম্মুখীন হবে, তখন যত কান্নাকাটিই তারা করুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই আজাব থেকে তারা রেহাই পাবে না এবং তাদের প্রতি আজাবকে লঘু করা হবে না এবং আজাব প্রদানে বিরতি করে ক্ষণিকের জন্যেও তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ প্রসঙ্গে আজাবের কিছু বিবরণ পেশ করেছেন। কাফেরদেরকে সেদিন হঠাৎ পাকড়াও করা হবে। দোজখ তাদের সম্মুখে বর্তমান থাকবে, যার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। তখন দোজখ থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যার বিভৎস আকৃতি দেখে কেয়ামতের ময়দানের লোকেরা নতজানু হয়ে পড়বে। তখন দোজখ তাদের নিজের ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, আমি সেই জেদী, বিদ্রোহী ব্যক্তির জন্য নিযুক্ত আছি যে আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করেছে এবং এ অন্যায় কাজ করেছে।

এরপর কয়েক প্রকার পাপিষ্ঠ লোকদের নাম উল্লেখ করবে। যেভাবে পাখি একটি খাদ্য-দানাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, ঠিক এমনিভাবে কাফের মুশরেক এবং পাপিষ্ঠ লোকদেরকে দোজখ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তারা মহা বিপদ ও চরম শাস্তির কারণে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, কিন্তু মৃত্যু আর হবে না। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মরক্ষার কোনো পথ হবে না। তখন তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না এবং আজাব থেকে রেহাই পাবার কোনো ব্যবস্থাও হবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, পারা ১৪ পৃ. ৫০]

قَوْلُهُ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ شُرَكَاءَهُمْ : আর মুশরিকরা যখন তাদের শরিকদেরকে [উপাস্য] দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের সেসব শরিক, আমরা তোমার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকতাম, আজীবন আমরা তাদেরই পূজা অর্চনা করেছি, তাদের নামেই নজর-নিয়াজ মেনেছি। কাফেররা তাদের উপাস্যদেরকে দেখিয়ে বলবে যে, এরা হলো আমাদের ধ্বংসের মূল কারণ। অতএব, এদের দ্বিগুণ শাস্তি হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ : উপাস্যরা তখন তাদের পূজারীদের উপর কথা ফেলে বলবে, নিশ্চয়ই তোমরাই মিথ্যাবাদী। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তখন মূর্তিগুলোকে বাকশক্তি দান করবেন, তখন মূর্তিগুলো তাদের পূজারীদের সম্বোধন করে বলবে, তোমরা তোমাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী। তোমরা মূলত আমাদের পূজা করতে না; বরং নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়ানার পূজা করতে। আমরা কখন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা আমাদের পূজা কর, আল্লাহর সাথে শরিক কর, তখন তোমাদের যা ইচ্ছা করেছ আর এখন তোমাদের পাপের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাও। অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের এ দাবিতে মিথ্যাবাদী যে আমরা তোমাদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছি এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে শিরক করতে বাধ্য করেছি। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেররা হয়তো এ আশায় তাদের দেব-দেবীর উল্লেখ করবে যে, এ সুযোগে তাদের আজাব কিছু লঘু হবে, অথবা আজাব পূজারী এবং পূজনীয়ের মাঝে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু এ পন্থা তাদের জন্য কার্যকর হবে না। তাদের কথার প্রতিবাদ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে। তখন কাফেররা আরও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। এরপর আর কোনো উপায় না দেখে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আত্মসমর্পণ করবে। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ نِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ সেদিন তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত হয়ে হাজির হবে এবং নিজেদের যাবতীয় মিথ্যা রচনা ভুলে যাবে। দুরাত্মা কাফের মুশরিকরা সেদিন সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। যারা দুনিয়াতে অহংকার করত, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করত তারা মনে করত তাদের দেব-দেবীরা আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করবে। কিন্তু যখন দেখবে এ ˉবেই ছিল মিথ্যা ধোঁকা, প্রতারণা তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা তা তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাদের অপরাধ জঘন্য, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

قوله ونزلنا عليك القران تبيانا لكل شئ : এতে কুরআনকে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। 'প্রত্যেক বস্তু' বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় বুঝনো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরি সমাধান কুরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কুরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কুরআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

উত্তর এই যে, কুরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। যেসব মূলনীতির আলোকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কুরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

৯০. إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ التَّوْحِيْدِ أَوِ الْإِنْصَافِ وَالْإِحْسَانِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَوْ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ وَإِيْتَائِ إِعْطَاءِ ذِي الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ اهْتِمَامًا بِهِ وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ الزِّنَا وَالْمُنْكَرِ شَرْعًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ وَالْبَغْيِ ج الظُّلْمِ لِلنَّاسِ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ اهْتِمَامًا كَمَا بَدَأَ بِالْفَحْشَاءِ كَذٰلِكَ يَعِظُكُمْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ تَتَّعِظُوْنَ وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) هٰذِهِ أَجْمَعُ اٰيَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

৯১. وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ مِنَ الْبَيْعَةِ وَالْإِيْمَانِ وَغَيْرِهِمَا إِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا ج تَوْثِيْقِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط بِالْوَفَاءِ حَيْثُ حَلَفْتُمْ بِهِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ.

অনুবাদ :

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ আদল অর্থাৎ তাওহীদ ও ন্যায়পরায়ণতা সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন গুরুত্ব প্রদানের জন্য এ স্থানে নিকট আত্মীয়দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা ব্যভিচার, শরিয়তের দৃষ্টিতে যা অসৎকর্ম যেমন কুফরি ও অবাধ্যাচরণ ও সীমালঙ্ঘন। মানুষের উপর জুলুম করা। فَحْشَاءِ বা ব্যভিচারে কথা যেমন গুরুত্বের জন্য শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিভাবে সে জন্য এ স্থানে জুলুমের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করার মাধ্যমে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর উপদেশ গ্রহণ কর। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রমুখাৎ মুস্তাদরাক -এ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ভালো ও মন্দ সকল কিছু সম্পর্কে এ আয়াতটি আল কুরআনের সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ একটি আয়াত। এতে সকল কিছুই সন্নিবিষ্ট রয়েছে। اَلْإِحْسَانِ অর্থাৎ ফরজ কাজসমূহ পালন করা। একটি হাদীসে এটার ভাষ্যে উল্লেখ হয়েছে যে, 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করছ।' إِيْتَاءِ অর্থ এ স্থানে إِعْطَاءِ ব দান করা। ذِي الْقُرْبٰى অর্থাৎ ذِي الْقَرَابَةِ নৈকট্যের অধিকারী স্বজন। تَذَكَّرُوْنَ এতে মূলত ذ -এ একটি ت-এর إِدْغَامٌ বা সন্ধি হয়েছে।

৯১. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার অর্থাৎ শপথ, বায়'আত ইত্যাদি বিষয়ের অঙ্গীকার পূরণ কর যখন তোমরা অঙ্গীকার কর এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না অথচ তোমরা তা পূরণ করবে বলে আল্লাহকে তার উপর জামিন করেছ। তাই তো তোমরা তাঁর নামে হলফ করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। এ বাক্যটি তাদের প্রতি হুমকিস্বরূপ। بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا তা সুদৃঢ় করার পর। وَقَدْ এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য।

٩٢. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ أَفْسَدَتْ غَزْلَهَا مَا غَزَلَتْهُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ إِحْكَامٍ لَهُ وَبَرْمٍ أَنْكَاثًا ط حَالٌ جَمْعُ نِكْثٍ وَهُوَ مَا يُنْكَثُ أَيْ يُحَلُّ إِحْكَامُهُ وَهِيَ امْرَأَةٌ حَمْقَاءُ مِنْ مَكَّةَ كَانَتْ تَغْزِلُ طُولَ يَوْمِهَا ثُمَّ تَنْقُضُهُ تَتَّخِذُونَ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ تَكُونُوا أَيْ لَا تَكُونُوا مِثْلَهَا فِي اتِّخَاذِكُمْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا هُوَ مَا يَدْخُلُ فِي الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ فَسَادًا أَوْ خَدِيعَةً بَيْنَكُمْ بِأَنْ تَنْقُضُوهَا أَنْ أَيْ لِأَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ جَمَاعَةٌ هِيَ أَرْبَى أَكْثَرُ مِنْ أُمَّةٍ ط وَكَانُوا يُحَالِفُونَ الْحُلَفَاءَ فَإِذَا وَجَدُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَعَزَّ نَقَضُوا حِلْفَ أُولٰئِكَ وَحَالَفُوهُمْ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ يَخْتَبِرُكُمُ اللّٰهُ بِهِ أَيْ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِيَنْظُرَ الْمُطِيعَ مِنْكُمْ وَالْعَاصِيَ أَوْ تَكُونَ أُمَّةٌ أَرْبَى لِيَنْظُرَ أَتَفُونَ أَمْ لَا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَمْرِ الْعَهْدِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يُعَذِّبَ النَّاكِثَ وَيُثِيبَ الْوَافِيَ.

৯২. অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের পরস্পরে প্রবঞ্চনারূপে শপথকে ব্যবহার করে অর্থাৎ পূর্ব শপথ বিনষ্ট করে সেই নারীর মতো হয়ো না যে শক্তিশালী অর্থাৎ মজবুত ও সুদৃঢ় করার পর সুতা খুলে ফেলে তার সুতাকাটা নষ্ট করে দেয়। মক্কায় এক নির্বোধ রমণী ছিল সারাদিন সুতাকাটার পর আবার তা নষ্ট করে ফেলত। কাফেররা কোনো গোত্রের সাথে বন্ধুত্বচুক্তি করার পর যদি অপর কোনো গোত্রকে অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী পেত তবে পূর্বের চুক্তি ভঙ্গ করে এদের সাথে চুক্তি আবদ্ধ হতো। এ স্থানে তা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তো তোমাদেরকে এটা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে কে বাধ্যগত আর কে অবাধ্য তা পরীক্ষা করেন। অথবা এটার অর্থ অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর কিনা তা লক্ষ্য করার জন্য। এবং দুনিয়ায় অঙ্গীকার ইত্যাদির বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ কর কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্য তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। অঙ্গীকারভঙ্গকারীকে শাস্তি দেবেন আর তা পালনকারীকে পুণ্যফল দান করবেন। نَقَضَتْ নষ্ট করে দেওয়া। غَزْلَهَا অর্থাৎ সে যে সূতা কাটে তা। أَنْكَاثًا এটা نِكْثٌ-এর বহুবচন। যার মজবুত বাঁধন খুলে যায়। এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য। অর্থাৎ শপথকে প্রতারণারূপে ব্যবহার করার মধ্যে ঐ রমণীর মতো হয়ো না। دَخَلًا অর্থ কোনো বস্তুতে বিজাতীয় কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটানো। এ স্থানে অর্থ প্রতারণামূলকভাবে বিনষ্ট করতে। أَنْ এটার পূর্বে একটি হেতুবোধক لِ উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল لِأَنْ। أُمَّةٌ অর্থ দল। لِيَبْلُوكُمْ অর্থ– তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে।

٩٣. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَهْلَ دِيْنٍ وَاحِدٍ وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَلَتُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سُؤَالَ تَبْكِيْتٍ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ لِتُجَازُوْا عَلَيْهِ.

৯৩. ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন একই ধর্মের অনুসারী করতে পারতেন কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তোমাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করা হবে। تَبْكِيْتٌ অর্থাৎ নিশ্চুপ বা লা জওয়াব করার জন্য এ প্রশ্ন করা হবে।

٩٤. وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا فَتَزِلَّ قَدَمٌ اَىْ اَقْدَامُكُمْ عَنْ مَحَجَّةِ الْاِسْلَامِ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا اِسْتِقَامَتِهَا عَلَيْهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ الْعَذَابَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ بِصَدِّكُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ اَوْ بِصَدِّكُمْ غَيْرَكُمْ عَنْهُ لِاَنَّهُ يَسْتَنُّ بِكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ.

৯৪. পরস্পর প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের শপথ ব্যবহার করো না; করলে তোমাদের পা ইসলামে স্থির হওয়ার পর সুদৃঢ় হওয়ার পর ইসলামের সুস্পষ্ট পথ হতে পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে অর্থাৎ অঙ্গীকার পূরণ করা হতে বা অন্যকে তা হতে বাধা দানের কারণে; কেননা অন্যরা এ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করবে তোমরা মন্দের আস্বাদ শাস্তির আস্বাদ নিবে। পরকালে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। وَلَا تَتَّخِذُوْا এটার تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। قَدَمٌ এটা এস্থানে বহুবচন اَقْدَامٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٥. وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا بِاَنْ تَنْقُضُوْهُ لِاَجْلِهِ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا فِى الدُّنْيَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَلَا تَنْقُضُوْا.

৯৫. তোমরা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। অর্থাৎ এই তুচ্ছ জিনিসের লোভে তা ভঙ্গ করো না। আল্লাহর নিকট যা আছে অর্থাৎ কাজের পুণ্যফল অবশ্যই তা তোমাদের জন্য এ দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা হতে উত্তম যদি তোমরা তা জানতে তবে আর তা ভঙ্গ করতে না।

٩٦. مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا يَنْفَدُ يَفْنِىْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط دَائِمٌ وَلَنَجْزِيَنَّ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعُهُوْدِ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَحْسَنِ بِمَعْنٰى حَسَنٍ.

৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ এ দুনিয়া তা অস্থায়ী। যারা অঙ্গীকার পূরণে ধৈর্যশীল আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবেন। يَنْفَدُ ধ্বংস হয়ে যাবে। بَاقٍ অর্থাৎ স্থায়ী। لَنَجْزِيَنَّ এটা ى [নাম পুরুষ] ও ن [উত্তম পুরুষ বহুবচন] সহ পঠিত রয়েছে। اَحْسَنِ এটা تَفْضِيْل বা দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষবোধক শব্দ হলেও এ স্থানে সাধারণভাবে حَسَنٍ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٧. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج قِيْلَ هِيَ حَيَاةُ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ فِي الدُّنْيَا بِالْقَنَاعَةِ وَالرِّزْقِ الْحَلَالِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

৯৭. ঈমান গ্রহণ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি অবশ্যই পবিত্রময় জীবন দান করবে এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব। حَيَاةً طَيِّبَةً পবিত্র জীবন। অর্থাৎ জান্নাতের জীবন। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হলো হালাল উপজীবিকা ও অল্পতুষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াতেই তা দান করব।

٩٨. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ أَيْ أَرَدْتَ قِرَاءَتَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ أَيْ قُلْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে অর্থাৎ তা তেলাওয়াতের ইচ্ছা করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নেবে বলবে- أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নিচ্ছি।

٩٩. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ تَسَلُّطٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

৯৯. তার কোনো আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। سُلْطَانٌ আধিপত্য।

١٠٠. إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ بِطَاعَتِهِ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ أَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُشْرِكُوْنَ .

১০০. তার অধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তাঁর সাথে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْقُرْبٰى : এটা إِسْمُ مَصْدَرٍ অর্থ আত্মীয়তার বন্ধন।

قَوْلُهُ تَخْصِيْصُ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ : আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা إِحْسَانٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَا بَدَأَ بِالْفَحْشَاءِ لِذٰلِكَ : অর্থ গুরুত্বের কারণে সর্বপ্রথম فَحْشَاء তথা ব্যভিচারের বিবরণ দিয়েছেন। কেননা ব্যভিচারের কারণে বংশধারা সংরক্ষিত থাকে না। আর তা আল্লাহর ক্রোধকে আবশ্যক করে।

قَوْلُهُ مِنَ الْبَيْعَةِ : অর্থাৎ بَيْعَةُ الرَّسُوْلِ عَلَى الْإِسْلَامِ এর দ্বারা بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ উদ্দেশ্যে নয়। কেননা এ সূরা মাক্কী। আর বায়'আতে রেযওয়ান হিজরতের পরে হয়েছিল।

قَوْلُهُ كَفِيْلًا : অর্থাৎ شَهِيْدًا

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ : অর্থাৎ وَقَدْ جَعَلْتُمْ টা জুমলা হয়ে تَنْقُضُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে مَعْطُوْف নয়। অন্যথায় عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْإِنْشَاءِ আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের জবাব যে, إِنَّ اللّٰهَ مَا تَفْعَلُوْنَ দ্বারা مَعْطُوْف عَلَيْهِ لَا تَنْقُضُوْا এবং لَا تَكُوْنُوْا মা'তূফ-এর মধ্যে فَصْلٌ بِالْأَجْنَبِيِّ হয়েছে।

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ হলো جُمْلَة تَهْدِيْد যা أَجْنَبِيْ নয়।

قَوْلُهُ مَا غَزَلَتْهُ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, غَزْلٌ হলো মাসদার এর দিকে نَقْض তথা ভাঙ্গার নিসবত করা বৈধ নয়। মুফাসসির (র.) غَزْل -এর তাফসীর مَا غَزَلَتْهُ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মাসদার টা মাফঊল অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সে যে সুতা কেটেছে তা ভেঙ্গে দিয়েছে।

قَوْلُهُ بَعْدَ قُوَّةٍ : কেউ কেউ بَعْدَ قُوَّةٍ -এর অর্থ নিয়েছেন মজবুত করার পর। মুফাসসির (র.)ও এ অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আবার অন্যান্য কতিপয় মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেন– "কষ্ট করে কাটার পরে"।

قَوْلُهُ غَزْلَهَا : এটা মাসদার যা هَا যমীরের প্রতি মুযাফ হয়েছে। এর অর্থ হলো– সুতা কাটা। এখানে إِسْم مَفْعُوْل অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কর্তিত সুতা। মক্কায় একজন নির্বোধ নারী ছিল। যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বীয় বাঁদিদের সাথে সুতা কাটত, আর সন্ধ্যায় সকল কর্তিত সুতা বিনষ্ট করে দিত। সেই মহিলার নাম ছিল রাবতা বিনতে ওমর। এই মহিলা আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা -এর মাতা এবং সা'দের মেয়ে ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, তার নাম ছিল রাবতা বিনদে সা'দ ইবনে তাইম আল কুরাশিয়্যাহ। অর্থ হলো এই যে, তোমরা আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করে রেখেছে তা বিনষ্ট করো না, অন্যথায় তোমাদের কৃত কষ্ট অহেতুক হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ بَرْم : এর অর্থ হলো সবল ও মজবুত করা, সুতা কর্তন করার পর পুনরায় কাটা।

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَكُوْنُوْا : অর্থাৎ تَتَّخِذُوْنَ টা تَكُوْنُوْا-এর যমীর হতে حَالٌ হয়েছে; দ্বিতীয় মাফঊল নয়। কেননা تَكُوْنُوْا টা مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْل হয় না। তবে এটা যদি تَصْيِيْر ইত্যাদি অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهُ اَنْكَاثًا : এটা نِكْثٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পুরাতন তুলাকে নতুন করে কাটার জন্য ভেঙ্গে ফেলা।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَنْكُثُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نِكْثٌ টা مَكْوُثٌ অর্থে হয়েছে। আর مَنْكُوْثٌ অর্থ হলো مَنْقُوْضٌ-

قَوْلُهُ دَخَلًا : টা لَا تَكُوْنُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে অর্থাৎ لَا تَكُوْنُوْا مُشَابِهِيْنَ اِمْرَأَةً شَانُهَا هٰذَا

قَوْلُهُ خَدِيْعَةً : এর অর্থ– বাহানা, ধোঁকা, দাগাবাজি, বিশৃঙ্খলা, অপরিচিত।

قَوْلُهُ اَرْبٰى : অর্থ বর্ধিত, উর্ধ্বস্থত হওয়া। এটা رِبًا থেকে اِسْم تَفْضِيْل-এর সীগাহ।

قَوْلُهُ اَتَفُوْنَ : এখানে هَمْزَة টি হলো اِسْتِفْهَامٌ-এর জন্য। تَفُوْنَ এটা وَفٰى থেকে مُضَارِعْ এর-جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ -এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা পূরণ কর।

قَوْلُهُ اَىْ اَقْدَامٌ : قَدَمٌ -এর তাফসীর اَقْدَامٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন এক পায়ের পদচ্যুতিই লজ্জা শরম ও শাস্তিকে আবশ্যককারী তখন উভয় পা পিছলে গেলে অবস্থা কিরূপ হবে?

قَوْلُهُ مُحَجَّه : অর্থ– মধ্যবর্তী রাস্তা, রাজপথ, ভি.আইপি. রোড।

قَوْلُهُ بِصَدِّكُمْ عَنِ الْوَفَاءِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, صَدّ হলো লাযেম।

قَوْلُه بِصَدِّكُمْ غَيْرَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, صَدّ টা নিষেধের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে مُتَعَدِّىْ ও ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ فَلَا تَنْقُضُوْا : এটা اِنْ شَرْطِيَّة -এর জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الخ : আলোচ্য আয়াতটি কুরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামি শিক্ষার যাবতীয় বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুজুর্গগণের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জুমা ও দুই ঈদের খুতবার শেষ দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সূরা নাহলের اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াতটি হচ্ছে কুরআন পাকের ব্যাপকতার অর্থবোধক আয়াত। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা.) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাছীর হাফেযে হাদীস আবূ ইয়া'লার গ্রন্থ মারেফাতুস্ সাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত দাবি ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল, আপনি সবার প্রধান। আপনার স্বয়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন, তবে গোত্র থেকে দু ব্যক্তিকে মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমারা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দুটি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দুটি এই– مَنْ اَنْتَ وَمَا اَنْتَ আপনি কে এবং কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর তিনি সূরা নাহলের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ উভয় দূত অনুরোধ করল, এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল, এতে বুঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম হঠাৎ তাঁর উপর ওহি অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন, আল্লাহর দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাজিল হয়েছে। হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, এ ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাছীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সেও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরাইশদের সামনে ভাষণ দেয় যে, وَاللّٰهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُوْرِقٌ وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ "আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোনো মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন- সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন- নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক মন্দকাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

عَدْلٌ শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عَدْلٌ বলা হয়। أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিকে দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عَدْلٌ বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عَدْلٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ عَدْلٌ এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عَدْلٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরিউক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরাবী বলেন, 'আদল' শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার হককে নিজের ভোগ-বিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহর বিধানাবলি পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবি করা এবং কোনো মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়া একপ্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও একপ্রকার আদল। আবূ আব্দুল্লাহ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কর্মের সমতা, চরিত্রের সমতা সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দকর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

اَلْاِحْسَانُ -এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু প্রকার। ১. কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভালো করা। ২. কোনো ব্যক্তির সাথে ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবি ভাষায় اِحْسَانٌ শব্দের সাথে اِلٰى অব্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন এক আয়াতে اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরিউক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহসান অর্থাৎ কোনো কাজকে সুন্দর করা– এটাও ব্যাপক অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরাঈলে' স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহসানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহসান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহর ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছু থাকতে পারে না– এটা ইসলামি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফের মানুষ ও জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, যে ব্যক্তির গৃহে তার বিড়াল খোরাক ও অন্যান্য দরকারি বস্তু না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখির পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহসানকারী গণ্য হবে না। আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে ইহসানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে– কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেওয়া– কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকু কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও কবুল করে নেওয়া এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও; বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হলো ফরজ ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহসানের আদেশ হলো কর্মের স্তরে।

قَوْلُهُ اِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى : এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ اِيْتَاءٌ শব্দের অর্থ কোনো কিছু দেওয়া এবং قُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা ذِى الْقُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়স্বজন। অতএব اِيْتَاءِ ذِىالْقُرْبٰى -এর অর্থ হলো আত্মীয়স্বজনকে কিছু দেওয়া। কি বস্তু দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান করা। বাহ্যত আলোচ্য আয়াতেও তাই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মীয়কে তার পাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে, আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরিউক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ; অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত। তাই ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোনো পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গুনাহ মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْىٌ শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বুঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فَحْشَاءٌ ও بَغْى ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاءٌ -কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। بَغْىٌ -কে পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এ সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুলুম ব্যতীত এমন কোনো গুনাহ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বুঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই এর আগে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা জালেমকে শাস্তি দেন যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের আমোঘ প্রতিকার। رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِتِّبَاعَهٗ

قَوْلُهٗ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ الخ : অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম : যেসব লেনদেন ও চুক্তি মুখে জরুরি করে নেওয়া হয় অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عَهْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতসমূহ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। عَدْل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে কুরতুবী]

কারো সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা খুব বড় গুনাহ। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোনো নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গুনাহ। পরকালে বিরাট শাস্তি হবে এবং দুনিয়াতেও কোনো কোনো অবস্থায় কাফফরা জরুরি হয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهٗ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ : এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে জাগতিক স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েজ নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরিয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরিউক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্বার্থ ও বাসনার বশবর্তী হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহর আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে : لَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গুনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। اَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা : وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহর অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোনো বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়া বলেন, যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারো কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম **ঘুষই** হারাম। উদাহরণত সরকারি **কর্মচারী** কোনো কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন যদি সে একাজ করার জন্য কারো কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে তা করাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

ঘুষের সংজ্ঞা : ইবনে আতিয়ার এ আলোচনায় ঘুষের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তাফসীরে বাহরে মুহীতের ভাষায় তা এই– أَخْذُ الْأَمْوَالِ عَلَىٰ مَا يَجِبُ عَلَى الْآخِذِ فِعْلُهُ أَوْ فِعْلِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃ. ৫ম খ.]

সমগ্র বিশ্বের সমগ্র নিয়ামত যে অল্প, তা পরবর্তী আয়াতেত এভাবে বর্ণিত হয়েছে– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে [এতে পার্থিব মুনাফা বুঝানো হয়েছে] তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে [এতে পরকালের ছওয়াব ও আজাব বুঝানো হয়েছে] তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বন্ধুত্ব-শত্রুতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও পরিণতি, যা আল্লাহর কাছে রয়েছে, যা চিরকাল বাকি থাকবে : مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন, مَا শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধনসম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে ছওয়াব ও আজাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আজাব ও ছওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

قَوْلُهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ الخ : 'হায়াতে তাইয়েবা' কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়েবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে পারলৌকিক জীবন বুঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মু'মিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দুটি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। ১. অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। ২.. তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেল অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

ইবনে আতিয়া বলেন, ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও প্রফুল্লতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত এ কারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সর্বাবস্থায় উদ্বেগেরে কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি অভাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও সম্মুখীন হয়, তবে আল্লাহর ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং কষ্টের পরেই সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কৃষক ক্ষেতে শস্য বপনের পর তার

নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কষ্টই করুক, সব তার কাছে সুখ বলে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাবে। ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়ে, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম করে, এমনকি মাঝে মাঝে অপমানও সহ্য করে, কিন্তু এ কারণে আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন পর সে ব্যবসায়ে বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে। মু'মিনও বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক কষ্টের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর প্রতিদান চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে। পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের কোনো মূল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাণ্ডা-গরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে যায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বেগজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে 'হায়াতে তাইয়েবা', যা মু'মিন দুনিয়াতে নগদ পায়।

قَوْلُهُ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ الخ : **পূর্বাপর সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধিবিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কুরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যা দ্বারা শয়তান পলায়ন করে, دیو بگریزد ازاں قوم کہ قراں خوانند "যারা কুরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়।" এছাড়া কোনো কোনো বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানি প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

এ সত্ত্বেও যখন কুরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরি হয়ে যায়। এছাড়া স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানি কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এজন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, মাযহারী]

ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মানুষের শত্রু দু রকম। ১. স্বয়ং মানবজাতির মধ্যে থেকে; যেমন সাধারণ কাফের। ২. জিনদের মধ্যে থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আজাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক– জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে ছওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা : কুরআন তেলাওয়াতের সময় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিক সংখ্যক আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়– সুন্নত বলেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত যত হাদীস রয়েছে, তেলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং কোনো অবস্থায় না পড়ার– সব বিবরণ ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

নামাজে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু প্রথম রাকাতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াত নামাজে হোক কিংবা নামাজের বাইরে– উভয় অবস্থাতেই তেলাওয়াতের পূর্বে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই তেলাওয়াত হবে প্রথম أَعُوْذُ بِاللّٰهِ যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়তের সময় بِسْمِ اللّٰهِ ও أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়ে নেওয়া উচিত।

কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু بِسْمِ اللّٰهِ পড়া উচিত। –[দুররে মুখতার]

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় أَعُوْذُ بِاللّٰهِ -এর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ পাঠ করা মোস্তাহাব। –[শামী]

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ : এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোনো মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশত কিংবা কোনো স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা হয়েছে– যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎকাজের তাওফীকদাতা এবং প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোনো সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুও তাই। তাতে শয়তানের দাবির বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন– إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোনো জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজই বিপথগামী হয় এবং তোমার অনুসরণ করতে থাকে।

অনুবাদ :

١٠١. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ بِنَسْخِهَا وَإِنْزَالِ غَيْرِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا أَيِ الْكُفَّارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ كَذَّابٌ تَقُولُهُ مِنْ عِنْدِكَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ الْقُرْآنِ وَفَائِدَةَ النَّسْخِ .

১০১. আমি যখন বান্দাদের কল্যাণার্থে এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি। অর্থাৎ এক আয়াত মানসূখ বা রহিত করত অন্য আয়াত অবতীর্ণ করি তখন তারা কাফেররা রাসূল ﷺ -কে বলে, তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী। তুমি অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী, নিজের তরফ হতে তুমি এটা বল। অথচ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই ভালো জানেন; কিন্তু এটা তাদের অধিকাংশই কুরআনের হাকীকত ও মূলতত্ত্ব এবং নাসখ বা রহিতকরণের উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ।

١٠٢. قُلْ لَهُمْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرَئِيلُ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَّلَ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا بِإِيْمَانِهِمْ بِهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِينَ .

১০২. তাদেরকে বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল যথাযথভাবে তা অবতীর্ণ করেছে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য। بِالْحَقِّ এটা نَزَّلَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

١٠٣. وَلَقَدْ لِلتَّحْقِيقِ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ بَشَرٌ ط وَهُوَ قَيْنٌ نَصْرَانِيٌّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى لِسَانُ لُغَةُ الَّذِي يُلْحِدُونَ يَمِيلُونَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ أَعْجَمِيٌّ وَهٰذَا الْقُرْآنُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ذُو بَيَانٍ وَفَصَاحَةٍ فَكَيْفَ يُعَلِّمُهُ أَعْجَمِيٌّ .

১০৩. আমি তো জানিই তারা বলে, তাঁকে অবশ্যই একজন মানুষ অর্থাৎ জনৈক খ্রিস্টান কর্মকার তা অর্থাৎ আল-কুরআন শিখিয়ে দেয়। বলা হয়, রাসূল ﷺ উক্ত কর্মকারের নিকট যেতেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা যার প্রতি তা আরোপ করে অর্থাৎ তাঁকে শিখিয়ে দেয় বলে তার ভাষা তো আরবি নয় অথচ এটা কুরআন তো সুস্পষ্ট অলঙ্কার সমৃদ্ধ ও পরিষ্কার আরবি ভাষায় সুতরাং একজন অনারব কেমন করে তাঁকে এটা শিক্ষা দিতে পারে? لَقَدْ এটার لَامْ অক্ষরটি تَحْقِيق অর্থাৎ বক্তব্য প্রতিষ্ঠাকরণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। لِسَانٌ অর্থ এ স্থানে ভাষা।

١٠٤. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ .

১০৪. যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

١٠٥. اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ج الْقُرْاٰنِ بِقَوْلِهِمْ هٰذَا مِنْ قَوْلِ الْبَشَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ وَالتَّاكِيْدُ بِالتَّكْرَارِ وَاِنَّ وَغَيْرِهِمَا رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ.

১০৫. যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে এটা মানব রচিত কথা– এই বলে যারা আল-কুরআনে বিশ্বাস করে না তারাই মিথ্যা উদ্ভাবন করে আর এরাই মিথ্যাবাদী। এ আয়াতটিতে "তুমি অবশ্যই মিথ্যা উদ্ভাবনকারী" তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে اِنَّ ও বক্তব্যের পুনরুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টি করা হয়েছে।

١٠٦. مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِالْكُفْرِ فَتَلَفَّظَ بِهٖ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَمَنْ مُبْتَدَاٌ اَوْ شَرْطِيَّةٌ وَالْخَبَرُ اَوِ الْجَوَابُ لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ دَلَّ عَلَيْهِ هٰذَا وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا لَهٗ اَىْ فَتَحَهٗ وَوَسَّعَهٗ بِمَعْنٰى طَابَتْ بِهٖ نَفْسُهٗ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

১০৬. যাকে কোনো কুফরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয় আর সে তা উচ্চারণ করে বসে তবে তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত থাকে সেই ধরনের ব্যক্তি ব্যতীত যারা ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অস্বীকার করে আর কুফরির জন্য তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয় অর্থাৎ আনন্দিত চিত্তে সে তা গ্রহণ করে নেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। مَنْ كَفَرَ এ مَنْ শব্দটি مُبْتَدَاٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্যবাচক বা شَرْطِيَّةٌ অর্থাৎ শর্তবাচক। এটার خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয় বা জওয়াব এ স্থানে উহ্য। তা হলো لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ অর্থাৎ এদের জন্য রয়েছে ভীষণ হুমকি। পরবর্তী বাক্য وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ এটার প্রতি ইঙ্গিতবহ। شَرَحَ অর্থ উন্মুক্ত করে দেয়, প্রশস্ত করে দেয়।

١٠٧. ذٰلِكَ الْوَعِيْدُ لَهُمْ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِخْتَارُوْهَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

১০৭. এটা অর্থাৎ উক্ত হুমকি এজন্য যে তারা ইহজীবনকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

١٠٨. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ.

১০৮. ওরাই তারা যাদের অন্তর, কর্ণ, চক্ষু আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই তাদের নিকট হতে যা চাওয়া হয় সেই সম্পর্কে উদাসীন।

١٠٩. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ.

১০৯. নিঃসন্দেহে তারা পরকালে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। لَا جَرَمَ অর্থ- নিঃসন্দেহে।

١١٠. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا عُذِّبُوْا وَتَلَفَّظُوْا بِالْكُفْرِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ كَفَرُوْا أَوْ فَتَنُوا النَّاسَ عَنِ الْإِيْمَانِ ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا عَلَى الطَّاعَةِ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا أَيِ الْفِتْنَةِ لَغَفُوْرٌ لَهُمْ رَّحِيْمٌ بِهِمْ وَخَبَرُ إِنَّ الْأُوْلَى دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الثَّانِيَةِ .

১১০. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর এবং কুফরি কথা উচ্চারণ করার পর মদিনায় হিজরত করে অতঃপর জিহাদ করে এবং আনুগত্য প্রদর্শনে ধৈর্যধারণ করে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সবের পর এ নির্যাতনের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাদের বিষয়ে অতি দয়ালু। فُتِنُوْا অর্থ- নির্যাতিত হয়ে। অপর এক কেরাতে এটা مَعْرُوْف بِنَاءً لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ বা কর্তৃবাচ্য রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে কুফরি করে বা অপরাপর মানুষকে ঈমান হতে বাধা প্রদান করত ফিতনায় নিপতিত করে। এ আয়াতটির প্রথমোক্ত إِنَّ-এর خَبَرْ বা বিধেয় । উহ্য। দ্বিতীয় إِنَّ-এর خَبَرْ বা বিধেয়টি (لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) তার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِذَا : এটা شَرْطِيَّة আর إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ হলো جَوَابُ شَرْط -

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ : এখানে شَرْط ও جَزَاءٌ মধ্যখানে এটা جُمْلَهُ مُعْتَرِضَهُ تَوْبِيْخِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ رُوْحُ الْقُدُسِ : এটা হলো إِضَافَةُ الْمَوْصُوْفِ إِلَى الصِّفَةِ অর্থাৎ اَلرُّوْحُ الْمُقَدَّسُ এখানে اَلْقُدُسُ শব্দের دَالْ-এর উপর পেশ এবং সাকিন উভয়টিই বৈধ।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَّلَ : অর্থাৎ مُتَلَبِّسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে نَزَّلَهُ-এর যমীরে মাফউল থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ نَزَّلَهُ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

قَوْلُهُ هُدًى وَبُشْرٰى : প্রশ্ন. এর আতফ হয়েছে لِيُثَبِّتَ -এর উপর। অথচ এ আতফ বৈধ নয়, কেননা এ উভয়টি مَعْطُوْف عَلَيْهِ-এর সাথে না إِعْرَابْ -এর ক্ষেত্রে মিল রয়েছে না عِلَّتْ -এর মধ্যে মিল রয়েছে। অথচ এ উভয় বিষয়টিই জরুরি।

উত্তর. هُدًى এবং بُشْرٰى -এর আতফ لِيُثَبِّتَ-এর مَحَلْ -এর উপর হয়েছে। لِيُثَبِّتَ-এর লাম টি تَعْلِيْلِيَّهْ যার পরে أَنْ উহ্য রয়েছে। যার কারণে مُضَارِعْ টা মাসদারের অর্থে হয়েছে। يُثَبِّتَ-এর মধ্যে هُوَ যমীর ফায়েল যার مَرْجِعْ হলো কুরআন- এবং لِيُثَبِّتَ টা مَفْعُوْلْ لِأَجْلِهِ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর بُشْرٰى ও هُدًى উভয়টি মাসদার যার আতফ لِيُثَبِّتَ-এর مَحَلْ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ تَثْبِيْتًا وَهِدَايَةً وَبِشَارَةً কাজেই এখন عَدَمْ مُطَابَقَتْ প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهُ لِلتَّحْقِيْقِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, قَدْ টা যখন مُضَارِعْ -এর উপর আসে তখন সাধারণত تَقْلِيْلْ -এর জন্য হয়ে থাকে, অথচ এখানে تَقْلِيْلْ-এর অর্থ لِنَعْلَمُ -এর সাথে মিলে না এবং আল্লাহ তা'আলার শানেরও মুনাসিব নয় জবাবের সার কথা হলো এই যে, এখানে قَدْ টা تَحْقِيْقْ -এর জন্য হয়েছে। لَقَدْ -এর মধ্যে লাম টি হলো قَسَمِيَّهْ

قَوْلُهُ قَيْنٌ : এটা একবচন, বহুবচনে أَقْيَانٌ - قُيُوْنٌ অর্থ- লৌহকার, কর্মকার, কামার।

قَوْلُهُ يَمِيْلُوْنَ إِلَيْهِ : অর্থাৎ يُشِيْرُوْنَ إِلَيْهِ

قَوْلُهُ أَعْجَمِيٌّ : যে বিশুদ্ধ ভাষী হয় না যদিও সে আরব ভাষী হয়। আর عَجَمِيٌّ হলো مَنْسُوْبٌ إِلَى الْعَجَمِ তথা অনারবি ভাষী হওয়ার প্রতি নিসবতকৃত। যে ব্যক্তি আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ যদিও সে বিশুদ্ধভাষী হয়।

قَوْلُهُ وَالتَّاكِيْدُ بِالتَّكْرَارِ وَإِنَّ وَغَيْرِهِمَا : যেহেতু মক্কার কাফেররা বিভিন্ন ধরনের তাকিদ সহকারে إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ বলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেছিল, তাদের প্রতি উত্তরও বিভিন্ন تَاكِيْد-এর সাথে দেওয়া হয়েছে। প্রথম تَكْرَارْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غَيْرِهِمَا আর تَكْرَارْ এর-إِنَّ এবং تَكْرَارْ -এর إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো ضَمِيْرْ فَصْلْ এবং تَعْرِيْفُ مُسْنَدْ এবং جُمْلَهُ اِسْمِيَّهْ হওয়া। কাজেই প্রকাশ্য দৃষ্টিতে تَكْذِيْبْ-এর حَصْرْ যা কুরাইশদের মধ্যে বুঝা যাচ্ছিল তা শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ مَنْ مُبْتَدَأٌ أَوْ شَرْطِيَّةٌ : এখানে مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ -এর- مَنْ -এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. مَنْ টা مَوْصُولَةٌ হয়ে মুবতাদা হবে, الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ থেকে بَدَل হবে না। কেননা بَدَل এবং مُبْدَلٌ مِنْهُ -এ মাঝে فَصْل بِالْأَجْنَبِيِّ বৈধ নয়। আর এখানে أُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -এর فَصْل বিদ্যমান রয়েছে। مَنْ -কে মাওসূলাহ মুবতাদা মানার সুরতে كَفَرَ তার সেলাহ হবে। আর مَوْصُول এবং সেলাহ মিলে মুবতাদা হবে। আর তার খবর উহ্য হবে। আর তা হলো لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ

২. مَنْ টা شَرْطِيَّةٌ হবে। আর جَزَاءٌ উহ্য হবে। আর তা হলো لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ যেমনটি আল্লামা সুয়ূতী (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর আগত বাক্যটি উহ্য হওয়ার প্রতি দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। তা হলো فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ অথবা وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

قَوْلُهُ صَدْرًا لَهُ : لَهُ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, شَرَحَ -এর সেলাহ بَاءٌ আসে না। অথচ এখানে بِالْكُفْرِ -এর মধ্যে بَاءٌ সেলাহ হয়েছে।

উত্তর. হলো এই যে, بَاءٌ টা لَام অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى طَابَتْ : এটা সেই সংশয়ের নিরসন যে, এখানে فَتَحَ -এর কোনো অর্থ নেই।

উত্তর. হলো এই যে, فَتَحَ টা طَابَ অর্থে হয়েছে এবং এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَدْرًا টা মাফউল হতে স্থানান্তরিত হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ اخْتَارُوْهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, اِسْتَحَبُّوْا -এর সেলাহ عَلٰى আসে না। অথচ এখানে عَلٰى সেলাহ এসেছে? জবাবের সারকথা হলো এই যে, اِسْتَحَبُّوْا টা اِخْتَارُوْا-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ : অর্থাৎ فُتِنُوْا-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। একটি مَجْهُوْل আর অপরটি مَعْرُوْف মাজহুল হওয়ার সুরতে مُهَاجِرِيْنَ টা নায়েবে ফায়েল হবে এবং كَفَرُوْا-এর ফায়েলও। আর مَعْرُوْف -এর সুরতে উভয় ফে'লের ফায়েল كُفَّارٌ হবে অর্থাৎ মুশরিকরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মানুষদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধা প্রদান করেছে।

قَوْلُهُ خَبَرُ إِنَّ الْأُوْلٰى الخ : অর্থাৎ প্রথমে إِنَّ-এর খবরকে ফেলে দিয়েছে। কেননা দ্বিতীয় إِنَّ-এর খবর উহ্য খবরের উপর বুঝাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ الخ : **পূর্বাপর সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের সময় أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কুরআন তেলাওয়াতের সময় মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের কুমন্ত্রণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

নবুয়ত সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জওয়াব : যখন আমি কোনো আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, [অর্থাৎ এক আয়াতকে শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই] অথচ আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ [প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার] প্রেরণ করেন [তার উপযোগিতা ও তাৎপর্য] তিনিই ভালো জানেন [যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরূপ হয়ে গেছে] তখন তারা বলে, [নাউযুবিল্লাহ!] আপনি [আল্লাহর বিরুদ্ধে] মনগড়া উক্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহর আদেশ হলে তা পরিবর্তন করা কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ কি পূর্বে জানতেন না? তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জান থাকা সত্ত্বেও প্রথম অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন জানা থাকে, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় না; বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্তু রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কুরআন ও হাদীসেও বিধিবিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যে ব্যক্তি এ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, সে

শয়তানের প্ররোচনায় নসখ অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এজন্যই এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মনগড়া কথা বলেন না] বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক মূর্খ [ফলে বিধিবিধানের রহিতকরণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর কালাম হওয়ার পরিপন্থি মনে করে।], আপনি [তাদের জবাবে] বলে দিন– [এ কালাম আমার রচিত নয়; বরং] একে পবিত্র আত্মা [অর্থাৎ জিবরাঈল] পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন, [তাই এটা আল্লাহর কালাম। বস্তুত বিধানের পরিবর্তন তাৎপর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য প্রেরিত হয়েছে] যাতে ঈমানদারদেরকে [ঈমানের উপর] দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়ত ও সুসংবাদ [-এর উপায়] হয়ে যায়। [এরপর কাফেরদের আরও একটি অনর্থক সন্দেহের জবাব দেওয়া হচ্ছে যে] আমি জানি, তারা [অন্য একটি ভ্রান্ত কথা] আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দান করে [এতে একজন অনারব, রোমের অধিবাসী কর্মকারকে বুঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বসত। সে ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এ থেকেই কাফেররা রটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই মুহাম্মদকে কুরআনের কালাম শিক্ষা দেয়। –[দুররে মনসূর] আল্লাহ তা'আলা এর জবাব দিয়েছেন যে, কুরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিকে বলা হয়। তোমরা যদি কুরআনের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হও, তবে কমপক্ষে আরবি ভাষার উচ্চমান অলঙ্কার সম্পর্কে তো অনবগত নও। অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কুরআনের অর্থ– ভাণ্ডার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কুরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলঙ্কার, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম– কোত্থেকে এসে গেল? কেননা] যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কুরআনের ভাষা সুস্পষ্ট আরবি। [কোনো অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলি কিরূপে রচনা করতে পারে? যদি বলা হয় যে, বাক্যাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ রচনা করে থাকবেন, তবে ঐ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি জবাব হয়ে গেছে, যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আদেশে স্বীয় নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং অনুপম ভাবালঙ্কারের দাবিদার। অতএব তোমরা তদনুরূপ কালাম বেশি না হোক এক আয়াত পরিমাণেই লিখে আন। কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্বীকারকারী এবং কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,] যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এরা যে আপনাকে, নাউযুবিল্লাহ– মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে] মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ : "আর আমি ভালো করেই জানি যে তারা বলে, তাকে এক ব্যক্তি শিক্ষা দিয়ে থাকে।" বলাবাহুল্য, কাফেররা অন্ধ বিদ্বেষে মেতে উঠেছিল, তাই এমন ভিত্তিহীন, আজগুবি কথা তারা বলেছে। যার সম্পর্কে তারা একথা বলে ইঙ্গিত করত, সে ব্যক্তিটি কে? আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চিহ্নিত করতে পারেনি।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে তারা এ মিথ্যা কথা বলত, তাকে নির্দিষ্ট করে কেউ এ পর্যন্ত তার নাম ঠিকানা বলেনি তবে ইবনে জারীর মসনদে অতি দুর্বল সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কা মুয়াযযামায় সে যুগে একজন অনারব খ্রিস্টান গোলাম ছিল, তার নাম ছিল বালআম। পেশার দিক থেকে সে ছিল একজন কামার। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বালআমের কোনো কোনো সময় কথাবার্তা হতো। তাই কাফেররা বলত লাগল, এই বালআমই তাঁকে কুরআন শিক্ষা দেয়।

হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, বনী মুগীরার ইয়াইশা নামক একজন গোলাম ছিল। হুজুর ﷺ তাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। কাফেররা বলতে লাগল, এ ইয়াইশাই তাঁকে কুরআন শিক্ষা দেয়।

ইমাম ফররা বলেছেন, হুয়াইতব ইবনে আব্দুল ওযযার আয়েশ নামক এক গোলাম ছিল। সে অনারবি ভাষায় কথা বলত। কোনো কোনো কাফের বলত যে তিনি আয়েশ থেকেই কুরআন শিখে নেন। অবশেষে আয়েশ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়েছিলেন।

হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ একজন রুমী ঈসায়ী গোলামের সঙ্গে কথা বলতেন, তার নাম ছিল জবর। সে বনীল হুজরম গোত্রের এক ব্যক্তির গোলাম ছিল সে কিতাব পত্র পাঠ করতে পারত। আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম হাজরামী বর্ণনা করেন, আমাদের দুটি ইয়ামনী গোলাম ছিল। একজনের নাম ছিল ইয়াছার, আরেকজন ছিল জবর। তারা উভয়ে মক্কায় তরবারি তৈরি করত এবং তাওরাত ইঞ্জিল পাঠ করত। কখনো কখনো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিক দিয়ে অতিক্রম করতেন, তাদেরকে তাওরাত ইঞ্জিল পাঠ করতে দেখে তিনি তা তা শ্রবণ করতেন। ইবনে আবি হাতেম হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে একথাই বর্ণনা করেছেন।

যাহহাক (র.) বর্ণনা করেছেন, দুর্বৃত্তরা যখন হুজুর ﷺ -কে কষ্ট দিত, তখন তিনি এ দু ব্যক্তির সঙ্গে বসতেন এবং তাদের কথায় তিনি সান্ত্বনা লাভ করতেন। মুশরিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ এ দু ব্যক্তি থেকেই এসব কথা শিক্ষা করেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ পাক মুশরিকদের মিথ্যা কথার প্রতি উত্তরে ইরশাদ করেছেন।

-[তাফসীরে ইবনে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৮]

لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ভাষা অনারবি, অথচ এ কিতাব স্পষ্ট আরবি ভাষায় রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, 'আয়েশ' ছিলেন রুমী নওমুসলিম। পূর্বে ঈসায়ী ছিল। ইঞ্জিলের শিক্ষা সম্পর্কেও তার ভালো ধারণা ছিল। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথাবার্তা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। এজন্য তিনি কখনো কখনো তাঁর আবাসস্থলে গমন করতেন। শুধু এ কারণেই কাফেররা বলত যে, এ ব্যক্তির নিকটই তিনি কুরআন করীম শিক্ষা করতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরা দুজন গোলাম ছিল। কাফেররা তাদের সম্পর্কে একথা বলত। একবার কাফেররা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরাই কি মুহাম্মদ ﷺ কুরআন শেখাও? তারা বলল, আমরা তাঁকে কি করে শেখাব? বরং আমরাই তাঁর নিকট শিখি। এতদসত্ত্বেও তারা বলত- اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ 'তাকে একজন মানুষ এসে শিক্ষা দিয়ে যায়।'

মূলত পবিত্র কুরআনের ভাষার অলঙ্কার এবং মাধুর্য, নতুন নতুন তথ্য এবং তাৎপর্যমণ্ডিত শিক্ষা দেখে তারা বিস্মিত হতো এবং কে প্রিয়নবী ﷺ -কে এসব শিক্ষা দিত তার অনুসন্ধান করতে থাকত। ঐ অবস্থায় কখনো একজনের নাম বলত, কখনো আরেক জনের নাম বলত। -[তাফসীরে মাজেদী; খ. ১, পৃ. ৫৭১]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম বলেছেন, রূমের অধিবাসী দু ব্যক্তি তাদের নিজেদের ভাষায় ইঞ্জিল পাঠ করত। কখনো হুজুর ﷺ ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতেন। তারা যদি ইঞ্জিল পাঠ করত তবে তিনি তা শ্রবণ করতেন। এতেই মুশরিকরা এ গুজব রটিয়ে দেয় যে, প্রিয়নবী ﷺ এদের থেকে কুরআন শিক্ষা করেন।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র.) বর্ণনা করেন, কাফেরদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ওহী লিপিবদ্ধ করত। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়। সে এসব আপত্তিকর কথা রটায়। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর; পারা ১৪, পৃ. ৫৮]

قَوْلُهٗ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ الخ : মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরি কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোনো গুনাহ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরি কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাঁদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরি অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব (রা.)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাকে দু উটের মাঝখানে বেঁধে উট দুটিকে দুদিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দুজন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত

খাব্বাবও কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফরির মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যখন কুফরি কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরজ করলেন, আমার অন্তরে ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোরজবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা : إِكْرَاهٌ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোরজবরদস্তির দুটি পর্যায় রয়েছে–

১. মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষমও অবশ্যও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে إِكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফরি বাক্য অথবা কোনো হারাম করা জায়েজ নয়। তবে কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহশাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

২. জোরজবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারগ করে দেওয়া যে, সে যদি জোরজবরদস্তিকারীদের কথামতো কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোনো অঙ্গহানি করা হবে। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে إِكْرَاهٌ مُلْجِئٌ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোরজবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফরি কালিমা উচ্চারণ করা জায়েজ। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোনো গুনাহ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোরজবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয়, তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে। –[তাফসীরে মাযহারী]

লেনদেন দু প্রকার। ১. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য যেমন কেনাবেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কুরআন বলে– إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে ব্যবস্থা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে– لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ অর্থাৎ কোনো মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মানের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে– জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনাবেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, না হয় বাতিলও করে দিতে পারে।

২. কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয় যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) অর্থাৎ দু ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোনো স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও শুদ্ধ হবে। –[তাফসীরে মাযহারী]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, শা'বী, যুহরী, নখয়ী ও ক্বাতাদাহ (র.) প্রমুখ বলেন, জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে– মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয় যেমন পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে, رُفِعَ عَنْ اُمَّتِىْ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোনো কথা অথবা কাজ শরিয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোনো গুনাহ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্যজনকে ভুলবশত হত্যা করলে। এখানে হত্যার গুনাহ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরিয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধনসম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরিয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে। –[তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا : যারা অত্যাচারিত উৎপীড়িত হওয়ার পর হিজরত করেছে, এরপর আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে ও সবর অবলম্বন করেছে। এসব কিছুর পর [হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, কাফের, মুশরিক এবং মুরতাদ তাদের অবস্থা এবং পরিণাম বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। আর যারা কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়েছে এবং এরপর নিজের ভিটামাটি এমনকি প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করেছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে, শত নির্যাতন সত্ত্বেও সবর অবলম্বন করেছে, এ আয়াতে তাদের জন্য মাগফেরাত এবং রহমতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

মক্কা মুয়াযযমায় যখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবী ﷺ মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার স্থলে মক্কাবাসী শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করল তাই নয়; বরং প্রিয়নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করল। কোনো কোনো সাহাবী ঐ অমানুষিক নির্যাতনের কারণে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কখনো অমানুষিক নির্যাতনের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণ রক্ষার তাগিদে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হতেন। যখন এমন বিপদ সাময়িকভাবে লাঘব হতো তখন ঐ ক্রটির জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও ব্যথিত হতেন। তাঁরা অবশেষে হিজরত করেন মদিনা মুনাওয়ারায়, আলোচ্য আয়াতে তাঁদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে। কেননা তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের দ্বারা চরম নির্যাতন ভোগ করেছেন। এরপর তাঁরা হিজরত করেছেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন, অত্যন্ত ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাদের জন্য এ সুসংবাদ যে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাঁদের ক্রটি-বিচ্যুতি তিনি ক্ষমা করবেন এবং তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

অনুবাদ :

١١١. اُذْكُرْ يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ تُحَاجُّ عَنْ نَفْسِهَا لَا يُهِمُّهَا غَيْرُهَا وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ جَزَآءَ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

১১১. স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সমর্থনে বিতর্ককারী যুক্তি প্রদর্শন করে উপস্থিত হবে। সেদিন তার অন্য কারো চিন্তা হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না।

١١٢. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ قَرْيَةً هِىَ مَكَّةُ وَالْمُرَادُ اَهْلُهَا كَانَتْ اٰمِنَةً مِنَ الْغَارَاتِ لَا تُهَاجُ مُطْمَئِنَّةً لَا يُحْتَاجُ اِلَى الْاِنْتِقَالِ عَنْهَا لِضِيْقٍ اَوْ خَوْفٍ يَاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا وَاسِعًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ بِتَكْذِيْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ فَقُحِطُوْا سَبْعَ سِنِيْنَ وَالْخَوْفِ بِسَرَايَا النَّبِىِّ ﷺ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ .

১১২. এবং আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের মক্কানগরীর অর্থাৎ সেখানের অধিবাসীদের যা ছিল সকল লুণ্ঠন ও উসকানি-উত্তেজনা হতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ভয়-ভীতি বা স্থান সংকীর্ণতার দরুন তথা হতে অন্যত্র গমনের প্রয়োজন ছিল না সর্বাদিক হতে সেখানে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর তারা রাসূল ﷺ -কে অস্বীকার করত আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে, তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা এবং রাসূল ﷺ প্রেরিত যোদ্ধা বাহিনীর ভীতির অস্বাদ ভোগ করালেন। একাধারে সাত বছর তারা দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। قَرْيَةً -এটা مَثَلًا-এর بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। رَغَدًا এ স্থানে অর্থ প্রচুর।

١١٣. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ الْجُوْعُ وَالْخَوْفُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ .

১১৩. তাদের নিকট তো এক রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এসেছে তাদের হতে কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল। ফলে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির শাস্তি পাকড়াও করল, আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

١١٤. فَكُلُوْا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

১১৪. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তন্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, সত্যিই যদি তোমরা ইবাদত কর।

١١٥. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১১৫. আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতবস্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা, তবে কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٦. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمْ اَىْ لِوَصْفِ اَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِمَا لَمْ يُحِلَّهُ اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط بِنِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ـ

১১৬. তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বিবরণানুসারে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য যা তিনি হালাল করেননি তা তাঁর প্রতি সম্পর্কিত করে তা হালাল এবং যা তিনি হারাম করেননি তা তাঁর প্রতি আরোপ করে তা হারাম বলো না। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে না। لِمَا تَصِفُ এটার مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ক্রিয়ার উৎসবাচক শব্দ। অর্থ তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বিবরণের কারণে।

١١٧. لَهُمْ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ ـ

১১৭. তাদের সুখ-সম্ভোগ দুনিয়ায় সামান্য দিনের এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

١١٨. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ج فِىْ اٰيَةِ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ اِلٰى اٰخِرِهَا وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ بِتَحْرِيْمِ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِى الْمُوْجِبَةِ لِذٰلِكَ ـ

১১৮. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ الخ এ আয়াতটিতে তোমার নিকট পূর্বে যা বিবৃত করেছি ইহুদিদের জন্য আমি তো কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম। আর ঐগুলো নিষিদ্ধ করত আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করি নাই বরং এ জুলুমের কার্য-কারণ পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করত।

اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ ইহুদিগণ।

١١٩. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ الشِّرْكَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا رَجَعُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا اَىِ الْجَهَالَةِ اَوِ التَّوْبَةِ لَغَفُوْرٌ لَهُمْ رَّحِيْمٌ بِهِمْ ـ

১১৯. অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে শিরক করে তারপর তারা তওবা করলে ফিরে আসলে এবং নিজেদের ক্রিয়া-কলাপ সংশোধন করলে তার পর অর্থাৎ অজ্ঞতা বা তওবার পর তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল তাদের প্রতি অতি দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُحَاجُّ : যেহেতু تُجَادِلُ-এর সেলাহ عَنْ আসে না, এ কারণে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, تُجَادِلُ টা تُحَاجُّ-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يُهِمُّهَا غَيْرُهَا : অর্থাৎ কারোর জন্য কারোর কোনো রকম চিন্তা পেরেশানি হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকেই نَفْسِيْ نَفْسِيْ বলতে থাকবে।

قَوْلُهُ جَزَاءُ : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা تَوَفّٰى عَمَلْ -এর কোনো অর্থ হয় না যেহেতু أَعْرَاضْ-এর স্থানান্তর হয় না।

قَوْلُهُ لَا تَهَاجُ : এটা أَهَاجَ الْغُبَارَ থেকে নির্গত অর্থাৎ ধুলাবালি উড়িয়েছে।

قَوْلُهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ : ক্ষুধা এবং ভয়কে পোশাকের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে وَجْهُ شِبْهٍ হলো এই যে, যেমনিভাবে ক্ষুধা ও ভীতি মানুষের শরীরকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলে। কেননা এ উভয়টির প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর হয়ে থাকে। এমনিভাবে পোশাকও শরীরকে বেষ্টন করে ফেলে। এ কারণেই ক্ষুধা ও ভয়ের প্রতিক্রিয়াকে পোশাকের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর إِدْرَاكْ-কে আস্বাদনের দ্বারা এজন্য ব্যক্ত করেছেন যে, আস্বাদনের দ্বারাও কোনো বস্তুর إِدْرَاكْ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لِوَصْفِ اَلْسِنَتِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِمَا تَصِفُ-এর মধ্যে مَا টা হলো مَصْدَرِيَّةٌ

قَوْلُهُ الْكَذِبَ : এটা لَا تَقُوْلُوْا-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ : এটা اَلْكَذِبَ হতে بَدَلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ مَتَاعٌ : এখানে مَتَاعٌ قَلِيْلٌ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর لَهُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ -

প্রশ্ন. يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا এখানে একটি এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, عَنْ نَفْسِهَا-এর মধ্যে نَفْسٌ-এর ইযাফত نَفْسٌ-এর দিকে হচ্ছে। অথচ مُضَافٌ এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর মাঝে পরিবর্তন হওয়া জরুরি। অন্যথায় إِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلَى نَفْسِهٖ আবশ্যক হবে।

উত্তর. প্রথম نَفْسٌ দ্বারা جِسْمِ اِنْسَانِيْ উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় نَفْسٌ দ্বারা ذَاتٌ উদ্দেশ্য। ইবারত হলো এরূপ যে, كُلُّ اِنْسَانٍ يُجَادِلُ عَنْ ذَاتِهٖ وَلَا يُهِمُّ غَيْرَهَا আর مُجَادَلَةٌ অর্থ হলো ওজরখাহী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا : **কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা :** আলোচ্য আয়াতেও কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করার তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকেই নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করতে করতে হাজির হবে। ঐ সংকটময় মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজের নিজের চিন্তায় এত বিভোর এবং ব্যস্ত থাকবে যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ভাইবেরাদর, পিতামাতা কারো উপকার করা তো দূরের কথা; অন্যের সম্পর্কে চিন্তা করারও সুযোগ পাবে না। সেদিন সকলেই নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে, নিজের কৃতকর্মের কি কৈফিয়ত দেবে, বা কি সাফাই পেশ করবে, প্রত্যেকে এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে। প্রত্যেকে আপন মনে প্রশ্নোত্তর তৈরি করতে করতে হাজির হবে। আল্লাহ পাকের দরবারে অবিচার নেই, সকলেই তার জীবনের যাবতীয় কৃকর্মের যথার্থ ফল পুরোপুরি পাবে। সেদিন প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে। কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের কথা মেনে পথভ্রষ্ট হয়েছি। আমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, আমরা নেক আমল করব। মুমিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে রক্ষা করুন, আজাব থেকে পানাহ চাই। হে প্রতিপালক! আমাকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

দোজখকে কোথা থেকে আনা হবে : হযরত ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে হযরত মু'আয (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয় কিয়ামতের দিন দোজখকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি ইরশাদ করেন, জমিনের সপ্তম স্তর থেকে। তার এক হাজার লাগাম হবে, প্রত্যেক লাগামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে। দোজখ যখন মানুষ থেকে এক হাজার বছরের দূরত্বে থাকবে, তখন সে একটি নিঃশ্বাস ফেলবে, যার কারণে প্রত্যেক নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত মাটিতে বসে পড়বেন এবং আরজ করবেন, হে আমার মালিক! আমাকে রক্ষা করুন।

আখেরাতের আলোচনা : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত ওমর (রা.) একবার কা'ব আহবারকে বলেছিলেন, আখেরাতের আলোচনা করুন, যাতে করে আমাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হয়।

কা'ব আহবার আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি সত্তরজন পয়গাম্বরের সমান নেক আমল করে আপনি কিয়ামতের দিন হাজির হন, তবুও সেদিন এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবেন যে নিজের প্রাণরক্ষা ছাড়া আর কারো কথা আপনার মনেও হবে না। দোজখ এমন এক ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস ফেলবে, যার কারণে প্রত্যেক নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবী-রাসূল বসে পড়বেন এমনকি হযরত হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) পর্যন্ত বলে উঠবেন, হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার নিকট আমার প্রাণের নিরাপত্তা চাই। আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে সেই অবস্থার বিবরণ। এরপর কা'ব আহবার আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

হযরত ইকরিমা (র.) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে একাধারে ঝগড়া হতে থাকবে এমনকি একটি মানুষের রূহ এবং দেহের মধ্যেও ঝগড়া হবে। রূহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাত ছিল না যে আমি কোনো কিছু ধরব, আমার পা ছিল না যে আমি কোথাও যাব, আমার চক্ষু ছিল না যে আমি কিছু দেখব, যা কিছু অন্যায়-অনাচার হয়েছে, তা শুধু দেহেরই কাজ আমার নয়। আর দেহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় প্রাণহীন সৃষ্টি করেছ, আমার হাত ছিল না যে আমি ধরব, আমার পা ছিল না যে আমি চলব, আমার চক্ষু ছিল না যে আমি দেখব, কিন্তু এই রূহ যখন আমার মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় প্রবেশ করল, তখন আমার রসনা কথা বলতে লাগল, আমার নয়ন যুগল দেখতে লাগল, আমার পা চলতে লাগল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ পাক রূহ এবং দেহকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যেমন একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু ব্যক্তি কোনো বাগানে পৌঁছল, বাগানের বৃক্ষগুলোতে অনেক ফল ধরে রয়েছে, অন্ধ ব্যক্তি তো ফল দেখতেই পারেনি, আর পঙ্গু ব্যক্তি ফল দেখছিল কিন্তু ফলের কাছে পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তখন অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গু লোকটিকে তার কাঁধে তুলে নিল এবং উভয়ে ফল তুলে নিল। [আর চুরির অপরাধে উভয়ে ধৃত হলো] এভাবেই কেয়ামতের দিন রূহ এবং দেহ পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত হবে এবং আজাবের জন্যে তাদের পাকড়াও করা হবে।

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا : প্রত্যেকেই সেদিন নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করবে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট থাকবে।

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ : অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সেদিন কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না। তথা সেদিন সকলের ছওয়াব পুরোপুরি দেওয়া হবে, কারো ছওয়াব এতটুকু কম করা হবে না, কারো হক বিনষ্ট করা হবে না, কাউকে অযথা বা অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৪৫০-৫১]

قَوْلُهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ الخ : **উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় :** এ আয়াতে ব্যবহৃত إِنَّمَا শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হারাম নয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল অথচ আল্লাহ তদ্রূপ কোনো নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তাফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল কুরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার ১৭৩ আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

যে গুনাহ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গুনাহ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে : আয়াতে ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ -এর جَهْل শব্দ নয়; বরং جَهَالَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جَهْل শব্দটি عِلْم-এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে جَهَالَةٌ -এর অর্থ হয় মূর্খতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বুঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গুনাহই মাফ হয় না; বরং যে গুনাহ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

অনুবাদ :

١٢٠. إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً إِمَامًا قُدْوَةً جَامِعًا لِخِصَالِ الْخَيْرِ قَانِتًا مُطِيْعًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا ط مَائِلًا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

১২০. ইবরাহীম তো ছিলেন এক উম্মত অর্থাৎ নেতা, পরিচালক ও সকল মঙ্গলময় চরিত্রের সমাবেশকারী আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ সত্য ও সরল ধর্মের প্রতি ছিল অনুরক্ত এবং সে অংশীবাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না قَانِتًا অনুগত।

١٢١. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ط اِجْتَبٰهُ اِصْطَفَاهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

১২১. সে ছিল তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনিই তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। اِجْتَبٰهُ তাকে মনোনীত করেছিলেন।

١٢٢. وَاٰتَيْنٰهُ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ط هِيَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِيْ كُلِّ أَهْلِ الْأَدْيَانِ وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى

১২২. এবং তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল সকল ধর্মাবলম্বীর নিকট তাঁর সুনাম ও প্রশংসা রয়েছে এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা তাদের অন্যতম। اٰتَيْنٰهُ এ স্থানে اِلْتِفَاتٌ অর্থাৎ নামরুপুরুষবাচক রূপ হতে غَيْبَةٌ অর্থাৎ রূপান্তর হয়েছে।

١٢٣. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ دِيْنَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَرَّرَ رَدًّا عَلٰى زَعْمِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى أَنَّهُمْ عَلٰى دِيْنِهِ .

১২৩. হে মুহাম্মদ অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের ধর্মাদর্শের অনুসরণ কর, আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ যারা তাঁকে স্ব-স্ব ধর্মের অনুসারী বলে ধারণা করে তার প্রতিবাদ স্বরূপ এ স্থানে এই বক্তব্যটির পুনরুক্তি করা হয়েছে।

١٢٤. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ فُرِضَ تَعْظِيْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط عَلٰى نَبِيِّهِمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ أُمِرُوْا أَنْ يَتَفَرَّغُوْا لِلْعِبَادَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالُوْا لَا نُرِيْدُهٗ وَاخْتَارُوا السَّبْتَ فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ فِيْهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ أَمْرِهِ بِأَنْ يُّثِيْبَ الطَّائِعَ وَيُعَذِّبَ الْعَاصِيَ بِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهٖ .

১২৪. শনিবার পালন তো নির্ধারিত করা হয়েছিল অর্থাৎ ঐ দিবসটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ফরজ করা হয়েছিল তাদের জন্যই যারা এ বিষয়ে তাদের নবীর সাথে মতবিরোধ করেছিল অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর। জুমার দিন শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য খালি রাখতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা বলেছিল, আমরা ঐ দিনটিকে চাই না, শেষে তারা নিজেরাই শনিবার দিনটিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, সেহেতু এ দিনটিতে তাদের উপর অতি কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাঁর বিধানের যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল সে বিষয়ে তাদের ফয়সালা করে দেবেন। অর্থাৎ অনুগতদেরকে পুণ্যফল দান করবেন এবং তৎকৃত হারামের সীমা ভেঙ্গে যারা পাপী হলো তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

١٢٥. أُدْعُ النَّاسَ يَا مُحَمَّدُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ دِيْنِهٖ بِالْحِكْمَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ مَوَاعِظِهٖ اَوِ الْقَوْلِ الرَّفِيْقِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ اَيْ بِالْمُجَادَلَةِ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ كَالدُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ بِاٰيَاتِهٖ وَالدُّعَاءِ اِلٰى حُجَجِهٖ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ اَيْ عَالِمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

১২৫. হে মুহাম্মদ! তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথের দিকে ধর্মের দিকে আহ্বান কর হিকমত আল কুরআন এবং সদুপদেশ দ্বারা ওয়াজ-নসিহত বা বিনম্র কথায় এবং তাদের সাথে আলোচনা কর এমন বিতর্কের মাধ্যমে যা সুন্দর যেমন আল্লাহর প্রতি আহ্বান কর তাঁর নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে এবং তাঁর যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে। কে তাঁর পথ হতে বিপথগামী সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অধিক সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে সেই বিষয়ও তিনি অধিক অবহিত সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের বিধান ছিল। أَعْلَمُ এটা تَفْضِيْل বা তুলনামূলক শব্দ হলেও এ স্থানে عَالِمٌ [অবহিত] সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٢٦. وَنَزَلَ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ وَمُثِّلَ بِهٖ فَقَالَ ﷺ وَقَدْ رَاٰهُ لَاَمْثُلَنَّ بِسَبْعِيْنَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَنِ الْاِنْتِقَامِ لَهُوَ اَيِ الصَّبْرُ خَيْرٌ لِلصّٰبِرِيْنَ فَكَفَّ ﷺ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِيْنِهٖ رَوَاهُ الْبَزَّارُ .

১২৬. উহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা নিহত হন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করে তার চেহারা বিকৃত করা হয়। এতদদর্শনে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'আপনার স্থলে সত্তরজন কাফেরের আমি অবশ্যই এই দশা করব।' এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে তবে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে যদি ধৈর্যধারণ কর তবে তা অর্থাৎ ধৈর্যধারণ ধৈর্যশীলদের জন্য অবশ্যই উত্তম। বাযযার বর্ণনা করেন, অনন্তর রাসূল ﷺ উক্ত সংকল্প হতে বিরত হয়ে গেলেন এবং কসমের কাফফারা আদায় করে দেন।

١٢٧. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ بِتَوْفِيْقِهٖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اَيِ الْكُفَّارِ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا لِحِرْصِكَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اَيْ لَا تَهْتَمَّ بِمَكْرِهِمْ فَاَنَا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ .

১২৭. এবং ধৈর্যধারণ কর, আর আল্লাহর সাহায্যে তাঁরই প্রদত্ত তাওফীকে হবে তোমার এই ধৈর্যধারণ। যদি ঈমান গ্রহণ নাও করে তবুও তুমি তোমার আগ্রহের কারণে তাদের উপর কাফেরদের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না তোমারও তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমিই তোমাকে এদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করব।

١٢٨. إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ بِالطَّاعَةِ وَالصَّبْرِ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ .

১২৮. আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা সহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন যারা কুফর ও পাপকর্ম হতে বেঁচে থাকে এবং যারা আনুগত্য প্রদর্শন ও ধৈর্যধারণ করত সৎকর্ম অবলম্বন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أُمَّةً : أُمَّةً শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর أُمَّةً শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এটা হয়তো এ কারণে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একাকী صِفَاتْ كَمَالِيَةْ-এ جَامِعْ হওয়ার হিসেবে এক উম্মতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। যেমন কোনো কবি বলেন–

لَيْسَ مِنَ اللّٰهِ بِمُسْتَنْكِرٍ ★ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدٍ

দ্বিতীয় কারণ হলো তিনি স্বীয় যুগে একাই মুমিন ছিলেন, বাকি সকলেই কাফের ছিল। এ কারণেই তাঁকে উম্মত বলা হয়েছে। তৃতীয়. কারণ হলো أُمَّةً অর্থ مَأْمُوْمٌ তথা ইমাম ও অনুসরণযোগ্য; যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا উল্লিখিত তিনটি ব্যাখ্যার আলোকে এই প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর أُمَّةً-এর প্রয়োগ বৈধ নয়। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) একা ছিলেন। আর أُمَّةً-এর اِطْلَاقْ বহুবচনের উপর হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِجْتَبَاهُ : অর্থাৎ لِلنُّبُوَّةِ তথা নবীরূপে তাঁকে নির্বাচন করেছেন।

قَوْلُهُ فُرِضَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جُعِلَ টা فُرِضَ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعْظِيْمَةً : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে– কেননা فُرِضَ-এর تَعَلُّقْ ফে'লের সাথে হয় اَشْيَاء-এর সাথে নয়।

قَوْلُهُ الْقَوْلُ الرَّفِيْقُ : رَفِيْقْ শব্দটি رِفْقْ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো– নম্রতা ও সহজতা। উদ্দেশ্য এই যে, দীনের দাওয়াত নরম ও মিষ্ট ভাষায় দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا الخ : **পূর্বাপর সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ শিরক ও কুফরের মূল অর্থা তাওহীদ ও রেসালতের অস্বীকৃতি খণ্ডন এবং কুফর ও শিরকের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল। কুরআন পাকের সম্বোধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এরা দাবি করত যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরই শিক্ষা। তাই আলোচ্য চারটি আয়াতে তাদের এ দাবি খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচটি আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন স্বীকৃত অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গাম্বর ছিলেন। এর সাথেই مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিষ্কলুষ একত্ববাদী ছিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে তিনি যে কৃতজ্ঞ এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা করে মুশরিকদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েও নিজেদেরকে কোন মুখে হযরত ইবরাহীমে (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি কর? তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে যথার্থ মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদের দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্য ব্যতীত এ দাবি সত্য হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ : এই পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিল্লাতে ইবরাহীমীতে পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গুণাবলি : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করেছেন।

১. اُمَّةً তিনি ছিলেন সকলের মুরব্বি, সকলের জন্যে চির অনুসরণীয়।

২. قَانِتًا আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদার।

৩. حَنِيْفًا সবদিক থেকে বিমুখ হয়ে শুধু এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশকারী।

৪. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ তিনি মুশরিক ছিলেন না, শিরক থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তৌহিদের উপর কায়েম ছিলেন।

৫. شَاكِرًا لِاَنْعُمِهٖ আল্লাহ পাকের শোকরগুজার বান্দা।

৬. اِجْتَبٰهُ আল্লাহ পাক তাঁকে মনোনীত করেছেন।

৭. وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ তিনি ছিলেন সঠিক পথের অনুসারী, আল্লাহ পাক তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

৮. وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর বংশেও বরকত দান করেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

৯. وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং আখেরাতেও নিঃসন্দেহে তিনি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

১০. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আদেশ হয়েছে যেন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করেন।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যেসব গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সর্বপ্রথম ইরশাদ হয়েছে, তিনি ছিলেন উম্মত। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং একটা জাতির সমতুল্য। আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, অদ্বিতীয়তা প্রকাশে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। যে কারণে জালেম নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, উম্মত অর্থ ইমাম। যার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, যার অনুসরণ করা হয়। আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামূসে উম্মত শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– উম্মত সেই ব্যক্তি, যার মাঝে বিপুল গুণের সমাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি, যিনি সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকেন, যিনি সকল বাতিল ধর্মের বিরোধী হন।

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে এত গুণ একত্রিত হয়েছিল যা বহু লোকের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং চিরস্মরণীয় ও চির অনুকরণীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সত্যের ধারক, বাহক, প্রবর্তক, সত্য পথ প্রদর্শক, তৌহিদ বা একত্ববাদের মূর্ত প্রতীক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, হযরত ইহরাহীম (আ.) ছিলেন সত্যের মহান শিক্ষক, সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর অনুসরণের দাবিদার।

হযরত মুজাহেদ (র.) বলেছেন, উম্মত শব্দটির তাৎপর্য হলো এই যে, সারা বিশ্ববাসী যখন কাফের ছিল তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই ছিলেন মুমিন। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২০, পৃ. ১৩৪]

قَانِتًا لِلّٰهِ এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مُطِيْعًا لِلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত। আর حَنِيْفًا হলো শিরক বর্জনকারী এবং তৌহিদ অবলম্বনকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -কে যখন اُمَّةً قَانِتًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন, মানুষকে কল্যাণকর কাজের শিক্ষা দানকারী এবং আল্লাহ পাকের অনুগত রাসূল ﷺ -এর অনুসারী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে اُمَّةً শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দীনের মহান শিক্ষক।

হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) হেদায়েতের ইমাম ছিলেন, আল্লাহ পাকের গোলাম ছিলেন, আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহের জন্যে শোকরগুজার ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধানের উপর আমলকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবী এবং রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। তিনি ছিলেন সত্য সাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহ্বায়ক।

মক্কার কাফেররা বলত যে, আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনের উপর রয়েছি। আল্লাহ পাক তাদের এ মিথ্যা দাবি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলেন– وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "তিনি মুশরিক ছিলেন না," অথচ তোমরা মুশরেক। ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি শৈশব কাল থেকেই তৌহিদপন্থি ছিলেন এবং তৌহিদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

قَوْلُهُ اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ الخ : দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়স্বজনরা অনুরোধ করল– আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, মানুষ সাধারণত অর্থসম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে অসিয়ত করছি : এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دَعْوَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– ডাকা, আহ্বান করা। পয়গাম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রাসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ পদবি হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সূরা আহযাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে– وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا এবং সূরা আহকাফের ৩১নং আয়াতে বলা হয়েছে– يَا قَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও ফরজ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আছে– وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। অন্য আয়াতে আছে– وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ কথাবার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى اللّٰهِ কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى الْخَيْرِ এবং কোনো কোনো সময় دَعْوَتُ اِلٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ শিরোনাম দেওয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ : এতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ رَبٌّ [পালনকর্তা] উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তার উপর বোঝা না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা পয়গাম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধিবিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কুরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ স্থলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীর নিম্নরূপ করেছেন– اِنَّهَا الْكَلَامُ الصَّوَابُ الْوَاقِعُ مِنَ النَّفْسِ اَجْمَلَ مَوْقِعٍ অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এ অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন– "হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।"

اَلْمَوْعِظَةُ - مَوْعِظَةٌ ও **وَعْظٌ**-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত তার কাছে কবুল করার ছওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা। [কামূস, মুফরাদাতে রাগিব]

اَلْحَسَنَةُ-এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই– শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন।

مَوْعِظَةً শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حَسَنَةً শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - جَادِلْ শব্দটি مُجَادَلَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে مُجَادَلَةٌ বলে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক বুঝানো হয়েছে। بِالَّتِىْ هُوَ اَحْسَنُ -এর অর্থে এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্কবিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্কবিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ অবলম্বন না করে। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অন্য আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا নির্দেশ দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে– ১. হিকমত, ২. সদুপদেশ এবং ৩. উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে– আমাকে লজ্জিত করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দুটি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি– হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোনো কোনো সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে উপরিউক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হতো, তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই عطف যোগে এভাবে বর্ণনা করা হতো– بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْجِدَالِ الْاَحْسَنِ কিন্তু কুরআন পাক হিকমত ও উপদেশকে عطف যোগে একই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্তু বিতর্কের জন্য আলাদা বাক্য جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অবলম্বন করেছে। এতে জানা যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আসলে দাওয়াতের স্তম্ভ অথবা শর্ত নয়; বরং দাওয়াতের পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মাত্র। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবর করার কথা বলা হয়েছে। কেননা দাওয়াতের পথে মানুষ যে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তজ্জন্য সবর করা অপরিহার্য।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দুটি– হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোনো দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলেম ও বিশেষ শ্রেণির লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্কবিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় তর্কবিতর্ক করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -এর শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যে তর্কবিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরিয়তে তার কোনো মর্যাদা নেই।

قَوْلُهُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ : এ বাক্যটি দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা পূর্বোল্লিখিত নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্ত্বেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্বভাবত মানুষ দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এমন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের কোনো উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বর্জন করে বসতে পারে। তাই এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভুল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে যাওয়া। দাওয়াত কবুল করা বা না করা, এতে আপনার কোনো দখল নেই এবং এটা আপনার দায়িত্ব নয়; এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাজ। তিনিই জানেন কে পথভ্রষ্ট থাকবে এবং কে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ করে যান। সাহস হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বুঝা গেল যে, এ বাক্যটিও দাওয়াতের আদবেরই পরিশিষ্ট।

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েজ, কিন্তু সবর করা উত্তম : বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মূর্খদের সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বুঝানো হোক না কেন তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কটুকথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোনো কোনো সময় আরও বাড়াবাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত?

এ সম্পর্কে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ الخ বাক্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায় তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন : সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দারাকুতনী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তরজন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা.)-এর মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তাঁর নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তরজনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَاِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।

–[তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান]

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তরজন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তরজনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেবে না। এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার এটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয়

সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বারবার নাজিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করল আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোনো মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে। –[জাস্সাস]

মাসআলা : আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত হলো, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকাপয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকাপয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে পারবে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু একপ্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। উদাহরণত টাকাপয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোনো ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোনো কোনো ফিকহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন– একপ্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকহগ্রন্থের দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ : আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে– وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না– সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অর্জিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা বলে দেওয়া হয়েছে যে– اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দুটি গুণে গুণান্বিত। ১. তাকওয়া, ২. ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহসানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ যারা শরিয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ [সাহায্য] অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

---

١. سُبْحٰنَ تَنْزِيْهٌ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ لَيْلًا نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ وَالْاِسْرَاءُ سَيْرُ اللَّيْلِ وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ الْاِشَارَةُ بِتَنْكِيْرِهٖ اِلٰى تَقْلِيْلِ مُدَّتِهٖ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَيْ مَكَّةَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِبُعْدِهٖ مِنْهُ الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ بِالثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط عَجَائِبَ قُدْرَتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَيِ الْعَالِمُ بِاَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَفْعَالِهٖ فَاَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْاِسْرَاءِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى اِجْتِمَاعِهٖ بِالْاَنْبِيَاءِ وَعُرُوْجِهٖ اِلَى السَّمَاءِ وَرُؤْيَتِهٖ عَجَائِبَ الْمَلَكُوْتِ وَمُنَاجَاتِهٖ لَهٗ تَعَالٰى . فَاِنَّهٗ ﷺ قَالَ اُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ اَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَ دُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهٗ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهٖ .

অনুবাদ :

১. পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর নিদর্শনসমূহ কুদরতের অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি দেখানোর জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন سُبْحَانَ পবিত্রতা তাঁরই। لَيْلًا এটা ظَرْف [স্থান বা কালবাচক] শব্দরূপে এ স্থানে مَنْصُوْب ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْرَاءٌ শব্দের অর্থ যদিও রাত্রিতে পরিভ্রমণ করা তবুও এ স্থানে نَكِرَة অর্থাৎ অনির্দিষ্টবাচক রূপে لَيْلًا শব্দটি উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে সময়ের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করা। মাসজিদুল হারাম থেকে অর্থাৎ মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসায় বায়তুল মুকাদ্দাসে যার চতুষ্পার্শ্ব আমি ফল-ফলাদি ও নদীনালা দ্বারা করেছি বরকতময়। তিনি অবশ্যই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সেই রাতে নবীগণের একত্রিত সমাবেশ, আকাশে আরোহণ, সৃষ্ট-সাম্রাজ্যের অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি দর্শন আল্লাহ তা'আলার সাথে আলাপন ইত্যাদি বহু বিষয় সংবলিত 'ইসরা'-এর নিয়ামত দ্বারা তাঁকে বিভূষিত করেছিলেন তিনি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমার জন্য বোরাক আনয়ন করা হলো। তা গর্দভ অপেক্ষা কিছু বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি প্রাণী। এত দ্রুতগতি সম্পন্ন যে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে এর এক এক কদম পড়ে।

فَرَكِبْتُهُ فَسَارَ بِيْ حَتّٰى اُتِيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِيْ يَرْبِطُ فِيْهَا الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِيْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرَئِيْلُ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ يَحْيٰى وَعِيْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَرَحَّبَا بِيْ وَدَعَوَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ۔

অনন্তর আমি তাতে আরোহণ করলাম। আমাকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসা হলো। অন্যান্য নবীগণ যে আংটাটিতে নিজেদের বাহন বাঁধতেন আমিও সে স্থানে তাকে বাঁধলাম। অতঃপর আমি তাতে প্রবেশ করলাম এবং দু-রাকাত নামাজ পড়লাম। পারে বের হলাম। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এক পেয়ালা মদ ও এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন। আমি দুধেরটি গ্রহণ করলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি সঠিক স্বভাবের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমাকে নিয়ে পৃথিবীর আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সে স্থানে হযরত আদম (আ.) -কে পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে দুই খালাতো ভাই হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর তৃতীয় আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল?

قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁকে যেন সেই সৌন্দর্যের অর্ধেকই দান করা হয়েছে। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর চতুর্থ আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত ইদরীস (আ.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর পঞ্চম আসমানে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত হারূন (আ.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর ষষ্ঠ আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর সপ্তম আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো।

فَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا قَالَ فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ وَإِنِّيْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّيْ فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِيْ فَحَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى قَالَ مَا فَعَلْتَ قُلْتُ قَدْ حَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ وَبَيْنَ مُوْسَى وَيَحُطُّ عَنِّيْ خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ ﷺ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِكُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً.

তিনি 'বায়তুল মামূর'-এ হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাতে [বায়তুল মামূরে] প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। পুনর্বার আর তারা তাতে প্রবেশের সুযোগ পান না। অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'য় নিয়ে আসা হলো। এর পাতাগুলো ছিল হাতির কানের মতো বিরাট আর ফলগুলো ছিল মটকার মতো বড়। আল্লাহর হুকুমে যখন তাকে যা আচ্ছাদিত করার আচ্ছাদিত করে তখন তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে সক্ষম সৃষ্টির মধ্যে কেউ নেই। রাসূল ﷺ বলেন, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা ওহি করার তা ওহি করলেন এবং প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করলেন। অতঃপর আমি নেমে আসলাম। হযরত মূসার নিকট গিয়ে পৌঁছলে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা কি ফরজ করলেন? বললাম, প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, পুনরায় প্রভুর দরবারে ফিরে যান; আরো সহজ করে দিতে প্রার্থনা করুন। আপনার উম্মত এটা পারবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা করেছি। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, আমি প্রভুর দরবারে পুনরায় ফিরে গেলাম। আরজ করলাম, হে প্রভু! আমার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিন। আমার উম্মতের দায়িত্ব থেকে তখন পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করে দেওয়া হলো। পুনরায় হযরত মূসার নিকট আসলে তিনি বললেন, কি করলেন? বললাম, পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এখনও তা পারবে না। প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিতে আবেদন করুন। রাসূল ﷺ বলেন, এভাবে আল্লাহর দরবার ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করলাম। প্রতিবারই পাঁচ ওয়াক্ত করে হ্রাস করা হলো। শেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মুহাম্মদ! রাত্র-দিনে এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো। প্রতি ওয়াক্তের বিনিময়ে হলো দশ ওয়াক্তের সমান প্রতিদান। সুতরাং এতদনুসারে এটা মোট পঞ্চাশ বলেই বিবেচ্য হবে।

وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّيْ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ .

কেউ যদি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করে তবে তা আদায় না করতে পারলেও তার জন্য আমি একটি নেকি লিখি; আর তা আদায় করলে দশটি নেকি লিখা হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোনো মন্দ কার্যের ইচ্ছা করে আর তা না করে তবে কোনো পাপ লিখা হয় না। আর যদি তা করে তবে কেবল একটি পাপই লিখা হয়। অতঃপর আমি হযরত মূসার নিকট নেমে আসলাম এবং তাঁকে এটা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রভুর নিকট পুনরায় ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিতে আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এটা পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি বললাম, প্রভুর নিকট বিষয়টি নিয়ে এতবার ফিরে গিয়েছি যে এখন পুনর্বার যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। উপরিউক্ত বিষয়টি শায়খাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বিবৃত করেছেন। তবে এর শব্দগুলো হচ্ছে মুসলিমের। হাকিম তৎপ্রণীত মুস্তাদরাকে ইবনে আব্বাস প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমি আমার মহান ও পরাক্রমশালী প্রভুকে দর্শন করেছি। اَلْاَقْصٰى দূরবর্তী। বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদটি যেহেতু মাসজিদুল হারাম থেকে দূর সেহেতু তাকে 'মাসজিদুল আকসা' বলা হয়।

২. وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ إِسْرَاءِيْلَ لِ أَنْ لَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا يُفَوِّضُوْنَ إِلَيْهِ أَمْرَهُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تَتَّخِذُوْا بِالْفَوْقَانِيَّةِ اِلْتِفَاتًا فَأَنْ زَائِدَةٌ وَالْقَوْلُ مُضْمَرًا . قَالَ تَعَالٰى

২. আর আমি মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের পথ-নির্দেশক। এজন্য যে তারা যেন আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ না করে তাদের বিষয়াদি অপর কারো নিকট যেন সোপর্দ না করে। اَلَّا يَتَّخِذُوْا এটা অপর এক কেরাতে فَوْقَانِيَّه অর্থাৎ ت সহ দ্বিতীয় পুরুষ নিষেধবাচক শব্দরূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْ এতে اِلْتِفَاتْ অর্থাৎ রূপান্তর হয়েছে বলে এবং শব্দটি زَائِدَه বা অতিরিক্ত বলে বিবেচ্য হবে। এর পূর্বে قَوْل ধাতু থেকে উদগত কোনো শব্দ উহ্য আছে বলে ধরা হবে যেমন وَاَقُوْلُ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বলেছিলাম......।

৩. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ط فِي السَّفِيْنَةِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا كَثِيْرَ الشُّكْرِ لَنَا حَامِدًا فِيْ جَمِيْعِ أَحْوَالِهِ .

৩. যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ সর্বাবস্থায় আমার প্রশংসাকারী এক বান্দা। اَلشَّكُوْرُ পরম কৃতজ্ঞ।

٤. وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ التَّوْرٰةِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ اَرْضِ الشَّامِ بِالْمَعَاصِيْ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا تَبْغُوْنَ بَغْيًا عَظِيْمًا ـ

৪. এবং আমি কিতাবে তাওরাতে বনী ইসরাঈলকে প্রত্যাদেশ মারফত জানিয়েছিলাম নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে অর্থাৎ সিরিয়া ভূমিতে পাপাচারের মাধ্যমে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের খুবই বাড় বাড়বে অতিশয় জুলুম ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটাবে। قَضَيْنَا এ স্থানে অর্থ– প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলাম।

٥. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا اُوْلٰى مَرَّتَيِ الْفَسَادِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ اَصْحَابِ قُوَّةٍ فِي الْحَرْبِ وَالْبَطْشِ فَجَاسُوْا تَرَدَّدُوْا لِطَلَبِكُمْ خِلٰلَ الدِّيَارِ ط وَسَطَ دِيَارِكُمْ لِيَقْتُلُوْكُمْ وَيَسْبُوْكُمْ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا وَقَدْ اَفْسَدُوْا الْاُوْلٰى بِقَتْلِ زَكَرِيَّا فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ جَالُوْتَ وَجُنُوْدَهُ فَقَتَلُوْهُمْ وَسَبُوْا اَوْلَادَهُمْ وَخَرَّبُوْا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ ـ

৫. অতঃপর এ দুয়ের প্রথমটির অর্থাৎ এ দুই বিপর্যয় ঘটাবার প্রথমবারেরটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে বিক্রমশালী বান্দাদেরকে যুদ্ধবিগ্রহে যারা অতীব শক্তিশালী সেই বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তারা তোমাদের সন্ধানে তোমাদেরকে হত্যা ও বন্দী করার জন্য তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল। এটা কার্যকরীকৃত এক অঙ্গীকার ছিল প্রথমবার তারা হযরত যাকারিয়াকে হত্যা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে জালূত ও তার সেনাদলকে প্রেরণ করেন। তারা এসে তাদেরকে হত্যা করে। তাদের সন্তানদের বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে ক্ষতি সধান করে। جَاسُوْا অর্থ তারা অনুসন্ধানের জন্য ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। خِلٰلَ الدِّيَارِ গৃহের অভ্যন্তরে।

٦. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ الدَّوْلَةَ وَالْغَلَبَةَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ بِقَتْلِ جَالُوْتَ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا عَشِيْرَةً ـ

৬. অতঃপর একশত বৎসর পর জালূতকে হত্যা করার মাধ্যমে অমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম বিজয় ও সাম্রাজ্য দান করলাম। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম এবং পরিবার-পরিজনে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

٧. وَقُلْنَا اِنْ اَحْسَنْتُمْ بِالطَّاعَةِ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ لِاَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا وَاِنْ اَسَاْتُمْ بِالْفَسَادِ فَلَهَا اِسَاءَتُكُمْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْمَرَّةِ الْاٰخِرَةِ بَعَثْنَاهُمْ ـ

৭. বললাম তোমরা যদি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকর্ম কর তবে তা নিজদের জন্যই কেননা এর পুণ্যফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর ফাসাদ ঘটিয়ে মন্দ কার্য যদি কর তবে এই মন্দতাও তারই। অতঃপর শেষ বারের প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হলে। অমি বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম

لِيَسُوْءُوا وُجُوهَكُمْ يَحْزُنُوكُمْ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ حُزْنًا يَظْهَرُ فِي وُجُوهِكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَيُخَرِّبُوهُ كَمَا دَخَلُوهُ وَخَرَّبُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا يُهْلِكُوا مَا عَلَوْا غَلَبُوا عَلَيْهِ تَتْبِيرًا إِهْلَاكًا وَقَدْ أَفْسَدُوا ثَانِيًا بِقَتْلِ يَحْيَى فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ بُخْتَ نَصَّرَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أُلُوفًا وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ وَخَرَّبَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ -

তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য অর্থাৎ হত্যা ও বন্দী করত তোমাদেরকে এমন দুঃখ দিতে যে তার প্রভাব যেন তোমাদের মুখমণ্ডলে ভেসে উঠে। এবং প্রথমবার যেভাবে মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল এবং তার ধ্বংস সাধন করেছিল পুনরায় সেভাবে তাতে প্রবেশ করার জন্য অনন্তর তা ধ্বংস করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল যাতে তারা বিজয় লাভ করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। হযরত ইয়াহয়া (আ.)-কে হত্যা করে তারা দ্বিতীয়বারের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে সম্রাট বুখতে নাসসারকে প্রেরণ করেন। সে তাদের হাজার হাজার লোককে হত্যা করে, সন্তানসন্ততিকে বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস সাধন করে। لِيُتَبِّرُوا تَتْبِيرًا সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য।

৮. وَقُلْنَا فِي الْكِتٰبِ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ج بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِنْ تُبْتُمْ وَإِنْ عُدْتُّمْ إِلَى الْفَسَادِ عُدْنَا م إِلَى الْعُقُوبَةِ وَقَدْ عَادُوا بِتَكْذِيبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا مَحْبَسًا وَسِجْنًا -

৮. এবং কিতাবে আরো বলেছিলাম দ্বিতীয়বারের পর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি বিপর্যয় সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও আমার শাস্তির পুনরাবৃত্তি করব। আর জাহান্নামকে আমি করেছি কাফেরদের জন্য কারাগার। তারা রাসূল ﷺ -এর অস্বীকার করে নিজেদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করে। ফলে তাদের বনূ কুরাইযাকে হত্যা ও বনূ নাযীরকে দেশান্তর করে ও জিজিয়া আরোপ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর ক্ষমতাধিকারী করেন। حَصِيْرًا অর্থ– বন্দী করে রাখার স্থান, কারাগার।

৯. إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ أَيْ لِلطَّرِيْقَةِ الَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ أَعْدَلُ وَأَصْوَبُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا -

৯. এ কুরআন অবশ্যই হেদায়েত করে এমন বিষয়ের এমন পথের যা সুদৃঢ় ন্যায়ানুগ ও সঠিক। এবং যে সকল মুমিন সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

১০. وَيُخْبِرُ أَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا مُؤْلِمًا هُوَ النَّارُ -

১০. এবং সংবাদ দেয় যে আখেরাতের যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি তা হলো জাহান্নাম। أَعْتَدْنَا প্রস্তুত রেখেছি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُبْحَانَ : এটা উহ্য ফে'লের মাসদার অর্থাৎ سَبَّحْتُ اللّٰهَ سُبْحَانًا

قَوْلُهُ لَيْلًا نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ : অর্থাৎ لَيْلًا টা اَسْرٰى -এর ظَرْف زَمَانْ হয়েছে মাফউল নয়, কেননা اَسْرَا এবং سَرَا উভয়টিই لَازِمْ -

প্রশ্ন. اَسْرٰى বলা হয় سَيْرٌ فِى اللَّيْلِ তথা রাতের ভ্রমণকে, এরপরও لَيْلًا উল্লেখ করার কারণ কি?

উত্তর. سَيْرٌ فِى اللَّيْلِ যদিও اَسْرٰى -এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু لَيْلًا -কে نَكِرَهْ উল্লেখ করে স্বল্প সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর لَيْلًا - এর তানবীন এখানে قِلَّتْ -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ لِبُعْدِهِ مِنْهُ : এটা দ্বারা মসজিদে আকসা-এর নামকরণের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার মাঝে এক মাসের ব্যবধান রয়েছে। অথবা এজন্য যে, সে সময় মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসার মাঝে কোনো মসজিদ ছিল না। এ কারণেই তার নাম মসজিদে আকসা রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَالْقِلَالِ : قِلَالٌ টা قُلَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মটকা, কলস।

قَوْلُهُ اَلَّا تَتَّخِذُوْا : এখানে اَنْ টা হলো মাসদারিয়া। আর لَام تَعْلِيْل উহ্য রয়েছে, যাকে ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে দিয়েছেন। لَا تَتَّخِذُوْا টা উহ্য نُوْنْ -এর সাথে مَنْصُوْب হয়েছে। আর لَا টা হলো نَافِيَه আর এই তারকীব يَاء -এর সুরতে হবে। আর تَاء -এর সুরতে উহ্য نُوْنْ -এর সাথে مَجْزُوْم হবে। আর لَا টা نَافِيَة হবে, আর اَنْ টা অতিরিক্ত হবে।

قَوْلُهُ اَلْقَوْلُ مُضْمَرٌ : অর্থাৎ مَقُوْلًا لَهُمْ لَا تَتَّخِذُوْا এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, اَنْ টা مُفَسِّرَه হওয়াটা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কেননা اٰتَيْنَا টা قُلْنَا -এর অর্থে হয়েছে, যা اَنْ مُفَسِّرَه -এর জন্য শর্ত।

قَوْلُهُ نَفِيْرًا : এটা نَفَرٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– জামাত, বংশ।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا : প্রশ্ন. نُقْصَانٌ -এর জন্য সেলাহ এর মধ্যে عَلٰى ব্যবহার হয়। অথচ এখানে لَامْ ব্যবহার হয়েছে, যা نَفْع -এর জন্য ব্যবহার হয়।

উত্তর. এটা اِزْدِوَاجْ তথা মোকাবিলার ভিত্তিতে عَلٰى -এর স্থানে لَامْ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ الخ : আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের রাসূল ﷺ -এর একটি বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যমূলক মোজেজা। اَسْرٰى শব্দটি اِسْرَاءٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ– রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نَكِرَهْ ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আর মি'রাজ সূরা নাজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بعبده শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহলভী চমৎকার বলেছেন–

بنده حسن بصد زبان گفت که بنده توام

تو بزبان خود بگو بنده نواز کیستی

অর্থাৎ তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা; তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা যে, আমি তোমারই দাস!

আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন একটা অতুলনীয় মর্যাদা। যেমন অন্য এক আয়াতে عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ বলে স্বীয় মকবুল বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে যাওয়াই মানুষের সর্ববৃহৎ গুণ। কেননা বিশেষ সম্মানের স্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক গুণের মধ্য থেকে দাসত্ব গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও একটি বড় উপকার সাধন লক্ষ্য। তা এই যে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলিতে পূর্ণ এই সফর থেকে কারো মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে যায় যে, এ অলৌকিক উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের ব্যাপারটি একটি আল্লাহর গুণের অংশবিশেষ। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে খ্রিস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে। তাই عَبْد [বান্দা] শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এসব গুণ চরম পরাকাষ্ঠা ও মোজেজা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর বান্দাই- স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লাহর কোনো অংশীদার নন।

কুরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা : ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মতো দৈহিক ছিল, একথা কুরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হতো তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عَبْد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। এমনকি কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোনো আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থি নয়। وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মতে رُؤْيَا [স্বপ্ন] বলে رُؤْيَتْ [দেখা] বুঝানো হয়েছে, কিন্তু একে رؤيا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ মি'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মি'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশজন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। নামগুলো এই- হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবূ যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রহমান ইবনে কুর্য, আবূ হাইয়্যা, আবূ লায়লা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইয়ুব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)।

এরপর ইবনে কাছীর (র.) বলেন- فَحَدِيْثُ الْاِسْرَاءِ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُوْنَ মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাছীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাছীর (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন, সত্য কথা এই যে, নবী করীম ﷺ ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ইদানিং কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই আলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গাম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়, যাঁদের অবস্থান কোনো নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণত ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গাম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল মুন্‌তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয়শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পালকিকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মূরও দেখেন। বায়তুল মা'মূরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মূরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচক্ষে জান্নাত ও দোজখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং আকাশে যেসব পয়গাম্বরের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা [যেন] তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাজের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গাম্বরগণের সাথে নামাজ আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাজও হতে পারে। ইবনে কাছীর বলেন, নামাজে পয়গাম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারো কারো মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা আকাশে পয়গাম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) সব পয়গাম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গাম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবার ইমাম বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই মক্কা মুকাররমা পৌঁছে যান। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য : তাফসীর ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, হাফেয আবূ নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর [ওয়াকেদীকে হাদীস বর্ণনায় হাদীসবিদগণ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে কাছীরের মতো সাবধানী মুহাদ্দিস তাঁর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ ব্যাপারটি আকিদা কিংবা হালাল-হারামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাঁর রেওয়ায়েত ধর্তব্য।] সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুর্যীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন—

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবূ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবো এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি বললাম, আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবূ সুফিয়ান বলল, নবুয়তের এই দাবিদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সে রাত্রেই প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার [বায়তুল মুকাদ্দাসের] সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল, আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হলো না। [দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।] মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রিদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল, কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, কোনো নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাতে তিনি আমাদের মসজিদে নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।"

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃ.]

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ : ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাত নবুয়তপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন, নবুয়াতপ্রাপ্তির আঠারো মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্রি মি'রাজের রাত্রি। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা : হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাজের সময় হয়, সেখানেই নামাজ পড়ে নাও। -[মুসলিম]

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু-হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ.) নির্মাণ করেছেন।

-[নাসায়ী, তাফসীরে কুরতুবী, ১২৭ পৃ. ৪র্থ খণ্ড]

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দুটি রেওয়ায়েতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

মসজিদে আকসা ও সিরিয়ার বরকত : আয়াতে بَارَكْنَا حَوْلَهُ বলা হয়েছে। এখানে حَوْلَ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আবশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ- ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বরতক এই যে, এ ভূ-ভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরনা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! শহরসমূহের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। - [তাফসীরে কুরতুবী] মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না- ১. মদিনার মসজিদ ২. মক্কার মসজিদ ৩. মসজিদে আকসা এবং ৪. মসজিদে তূর।

قَوْلُهُ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيلَ الخ : পূর্বাপর সম্পর্ক : ইতঃপূর্বেকার جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْ إِسْرَائِيلَ আয়াতে শরিয়তের বিধিবিধান এবং আল্লাহর নির্দেশাবলি অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বনী ইসরাঈলের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা শত্রুদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হুঁশিয়ার হলে এবং অনাচারের অভ্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু কিছু দিন পর আবার তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত করেন। কুরআন পাকে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ওফাতের কিছু দিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মুকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদি মূর্তি পূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতানসর বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরিউক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতানসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতানসর পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনাটি হযরত সোলায়মান (আ.) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদিরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেল স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। এ সময় ইহুদিরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদিরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদিদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে কিন্তু মসজিদের মূল তবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারী শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল মুকাদ্দাস রোম সম্রাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদিরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদিও ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না। কেননা তার অনেক দিন পর কন্স্টানটাইন প্রথম খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়েছিল। হযরত ওমর (রা.) এটি পুনঃনির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত দুটি ঘটনা কোন গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যত এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদিদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বুঝা দরকার। বলা বাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হুযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো, হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলাম, বায়তুল মুকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান ইবনে দাঊদ (আ.)-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা, ইয়াকূত ও যমররদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ.) যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিনদের তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানি করে গুনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতানসরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতানসর ছিল অগ্নি উপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মুকাদ্দাস শাসন করে। কুরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। বুখতানসররের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে পুরুষদের হত্যা করে, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানারকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতানসরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতানসর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল মুকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানি কর এবং গুনাহের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আজাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বুঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে এলো এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণ মন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ জমানায় হযরত মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্র করবেন। [এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন।]

বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, কুরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুটি শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। ১. হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং ২. হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলি প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলির বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন।

উল্লিখিত ঘটনাবলির সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সলা ছিল এই– তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কুরআন পাক তাদের দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন শরিয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং জনবল ও সন্তানসন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

এ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন– وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানির দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আজাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আজাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরিয়তে মুহাম্মদীয় যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরিয়তে মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবৎ বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গাম্বরগণের এ কিবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ-বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ : বনী ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কুরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, মুসলমানগণ এ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শানশওকত, অর্থসম্পদ ও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

সাম্প্রতিককালে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর ইহুদিদের অধিকার এবং তাতে অগ্নি সংযোগের হৃদয়বিদারক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উদ্বেগাকুল করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, এতে করে কুরআনের উপরিউক্ত বক্তব্যেরই সত্যায়ন হচ্ছে। মুসলমানগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব শানশওকত মনোনিবেশ করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহর কুদরতেরই সেই বিধানই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, কোটি কোটি আরবের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আরবদের ধনসম্পদের বিস্তর ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম মসজিদের একটি মসজিদ যা সব সময়ই পয়গাম্বরগণের কিবলা ছিল

আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে জাতি বিশ্বে সর্বাধিক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বলে গণ্য হতো, আজ সে ইহুদি জাতিই আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি দেখা যায়, এ জাতি সংখ্যায় মুসলমানদের মোকবিলায় কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসলমানদের সমষ্টিগত সমরাস্ত্রের মোকাবিলায়ও ওদের কোনো গুরুত্ব নেই। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদিদেরকে কোনো সম্মানের আসন দান করে না। তবে এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই। এ থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে যদি আমরা স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তওবা করি, আল্লাহর নির্দেশাবলির আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকরণ ও বিজাতির উপর ভরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভুক্ত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার মুসলমান জনগণ এখনও এ সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখন বিজাতির সাহায্যের উপর ভরসা করে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করছে। অথচ বাহ্যত এর কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। فَاللّٰهُ الْمُشْتَكٰى

যে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন পুনরায় মসুলমানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে শুধু আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিজাতির উপর ভরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুনরায় আল্লাহর উপর ভরসা করে খাঁটি ইসলামি জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর তাওফীক দান করুন।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের ইবাদতের জন্য দুটি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল মুকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তীবাহিনীর সে ঘটনা, যা কুরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়েমেনের খ্রিস্টান বাদশাহ বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ তা'আলা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখিদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কিবলা ও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় : উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কুরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কুরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عِبَادَنَا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দিকে কোনো বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ-এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কুরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম অথবা কোনো বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عَبْدِهٖ [বান্দা] বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক তাকে বান্দা বলে আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে عِبَادَنَا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে اِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহর বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের اِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হতে পারে।

قَوْلُهُ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত সম্পর্কে আলোচনা ছিল, আর তাওরাতের উপর আমল না করার কারণে বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি যেসব আজাব এবং বিপদাপদ এসেছিল তার উল্লেখ ছিল।

আর এ আয়াতে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের আলোচনা করা হয়েছে যা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের দলিল।

পবিত্র কুরআন বিশ্বগ্রন্থ : এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, তাওরাত নিঃসন্দেহে আসমানি গ্রন্থ যা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নাজিল হয়েছে। তাওরাতও সরল সঠিক পথের দিশারী ছিল। তবে তাওরাত শুধু বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে তাওরাতের আহ্বান শুধু বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে। সমগ্র বিশ্ব মানবের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণের সর্বাপেক্ষা সহজ সরল এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে পবিত্র কুরআন। সমগ্র বিশ্ব মানবের নামে বিশ্বনবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ এই গ্রন্থ হলো মানব জাতির উদ্দেশ্যে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সর্বশেষ বাণী, সর্বশেষ পয়গাম। যেভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল; ঠিক তেমনিভাবে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক এ মহান গ্রন্থ। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত রূপে আগমন করেছেন, তিনিই পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক। পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার অনুশীলন এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণ ব্যতীত নাজাতের বিকল্প কোনো পন্থা নেই, তাই যারা পবিত্র কুরআনের বিধান মেনে চলে তাদের জন্য রয়েছে এতে সুসংবাদ।

قَوْلُهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا : পবিত্র কুরআন মুমিনদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহান পুরস্কারের তথা জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, যারা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলও করে। আর নেক আমলের মানদণ্ড হলো পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাগ্রহণ ও প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণ।

قَوْلُهُ وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا : কিন্তু যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে না, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে মুগ্ধ মত্ত হয়ে আখেরাত সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে তারা তার পরিণাম স্বরূপ ভোগ করবে আখেরাতের মর্মান্তিক শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দুটি কথার ঘোষণা রয়েছে–

১. পবিত্র কুরআন সর্বাপেক্ষা সহজ সরল এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।

২. পবিত্র কুরআন নেককার মুমিনদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মহান পুরস্কার লাভের সুসংবাদ দেয় এবং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে কাফেরদের উদ্দেশ্যে যেমন আজাবের ঘোষণা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মুমিনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ, যারা মুমিনদের সঙ্গে শত্রুতা করে, মুমিনদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করে, তাদের উদ্দেশ্যে আজাবের ঘোষণা মু'মিনদের জন্যে সুসংবাদ। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছে দুনিয়াতেই যেমন তাদের শাস্তি হয়েছে, এমনিভাবে মক্কার যে কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে, তাদের শাস্তিও দুনিয়াতেই হয়েছে। তবে কথা এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতেও হবে তাদের কঠিন শাস্তি। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে– اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আমি তৈরি রেখেছি তাদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অনুবাদ :

١١. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاَهْلِهٖ اِذَا ضَجِرَ دُعَآءَهٗ اَىْ كَدُعَائِهٖ لَهٗ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ الْجِنْسُ عَجُوْلاً بِالدُّعَاءِ عَلٰى نَفْسِهٖ وَعَدَمِ النَّظْرِ فِىْ عَاقِبَتِهٖ .

১১. মানুষ যখন মারাত্মক পেরেশানিতে নিপতিত হয় তখন নিজের ও পরিবারের জন্য অকল্যাণ প্রার্থনা করে যেভাবে সে নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করে। মানুষ জাতি তো নিজের উপর বদদোয়া করার এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য না দেওয়ার মধ্যে বড় তাড়াহুড়া প্রিয় دُعَاءٌ - এর পূর্বে ك উহ্য রয়েছে। অর্থ যেমন সে প্রার্থনা করে।

١٢. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ دَالَّتَيْنِ عَلٰى قُدْرَتِنَا فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ طَمَسْنَا نُوْرَهَا بِالظَّلَامِ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً اَىْ مُبْصِرًا فِيْهَا بِالضَّوْءِ لِتَبْتَغُوْا فِيْهِ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ بِالْكَسْبِ وَلِتَعْلَمُوْا بِهِمَا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط لِلْاَوْقَاتِ وَكُلَّ شَىْءٍ يُحْتَاجُ اِلَيْهِ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً اَىْ بَيَّنَّاهُ تَبْيِيْنًا .

১২. আমি রাত্রি ও দিবসকে দুটি নিদর্শন অর্থাৎ আমার কুদরতের উপর দুটি প্রমাণ রূপে বানিয়েছি, রাত্রির নিদর্শনকে মুছে ফেলি অর্থাৎ তার আলো বিলুপ্ত করে দেই যাতে তোমরা এতে আরাম নিতে পার আর দিবসকে করেছি আলোকময় অর্থাৎ এর জ্যোতিতে সবকিছু পরিদৃষ্ট হয় এমনভাবে বানিয়েছি যাতে উপার্জনের জন্য তাতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা এতদুভয়ের মাধ্যমে বর্ষ-সংখ্যা ও সময়ের হিসাব স্থির করতে পার। আর আমি প্রয়োজনীয় সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। اٰيَةَ الَّيْلِ এ স্থানে اَلَّيْلِ -এর প্রতি اٰيَةَ -এর اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধ بَيَانِيَةٌ বা বিবরণমূলক। فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

١٣. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ عَمَلَهٗ يَحْمِلُهٗ فِىْ عُنُقِهٖ خُصَّ بِالذِّكْرِ لِاَنَّ اللُّزُوْمَ فِيْهِ اَشَدُّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا وَفِىْ عُنُقِهٖ وَرَقَةٌ مَكْتُوْبٌ فِيْهَا شَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا مَكْتُوْبًا فِيْهِ عَمَلُهٗ يَلْقٰهُ مَنْشُوْرًا صِفَتَانِ لِكِتَابًا .

১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি তা সে বহন করে। গ্রীবায় কোনো বস্তুর বাঁধন সুদৃঢ় হয় বেশি। সেহেতু এ স্থানে বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, প্রতিটি ভূমিষ্ঠ সন্তানের গ্রীবায় একটি কাগজ আঁটা থাকে। তাতে লিখা থাকে সে দুর্ভাগ্যের অধিকারী না সৌভাগ্যের অধিকারী। এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব যা সে পাবে উন্মুক্ত। এতে তার কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ থাকবে। طَائِرَهٗ এ স্থানে এর অর্থ তার কৃতকর্ম। يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا এটি كِتَابٌ - এর صِفَتٌ বা বিশেষণ।

١٤. وَيُقَالُ لَهٗ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا مُحَاسِبًا .

১৪. এবং তাকে বলা হবে তুমি পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট। حَسِيْبًا অর্থাৎ হিসাব-নিকাশকারী রূপে।

١٥. مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ لِاَنَّ ثَوَابَ اِهْتِدَائِهٖ لَهٗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط لِاَنَّ اِثْمَهٗ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَّازِرَةٌ اٰثِمَةٌ اَىْ لَا تَحْمِلُ وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ اَحَدًا حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا يُّبَيِّنُ لَهٗ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ

১৫. যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে সে নিজের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে কেননা সৎপথ অবলম্বনের পুণ্যফল তো তারই। আর যে কেউ পথভ্রষ্ট হবে সে তো নিজের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে কারণ এর পাপ তার উপরই বর্তাবে। এবং কোনো বহনকারী অর্থাৎ পাপী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। আর আমি রাসূল যিনি তাদেরকে তাদের কর্তব্য করণীয় সম্পর্কে বিবরণ দেন তাকে প্রেরণ না করে কাউকেও শাস্তি দেই না। لَا تَزِرُ অর্থাৎ কোনো প্রাণী বহন করে না।

١٦. وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا مُنَعَّمِيْهَا بِمَعْنٰى رُؤَسَائِهَا بِالطَّاعَةِ عَلٰى لِسَانِ رُسُلِنَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا خَرَجُوْا عَنْ اَمْرِنَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا اَهْلَكْنَاهَا بِاِهْلَاكِ اَهْلِهَا وَتَخْرِيْبِهَا

১৬. আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর নিয়ামত উপভোগকারীদেরকে অর্থাৎ তথাকার নেতৃবর্গকে আমার রাসূলগণের যবানী আনুগত্য প্রদর্শনের কাজে রত হতে আদেশ করি কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কর্ম করে আমার নির্দেশের সীমালঙ্ঘন করে ফলে তথায় আমার আজাবের নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় আর আমি অঞ্চলটিকে তার অধিবাসীদেরসহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। دَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا অর্থাৎ তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

١٧. وَكَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا عَالِمًا بِبَوَاطِنِهَا وَظَوَاهِرِهَا وَبِهٖ يَتَعَلَّقُ بِذُنُوْبِ.

১৭. নূহের পর আমি কত অর্থাৎ বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য যথেষ্ট। এর সাথেই তো ذُنُوْبِ বা পাপাচারসমূহ সংশ্লিষ্ট। اَلْقُرُوْنُ যুগসমূহ, অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীসমূহ।

١٨. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الْعَاجِلَةَ اَىِ الدُّنْيَا عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاۤءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ التَّعْجِيْلَ لَهٗ بَدَلٌ مِنْ لَهٗ بِاِعَادَةِ الْجَارِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا يَدْخُلُهَا مَذْمُوْمًا مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا عَنِ الرَّحْمَةِ.

১৮. কেউ স্বীয় কার্যের বিনিময়ে নগদ বস্তু অর্থাৎ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে সত্বর দিতে চাই তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই, অনন্তর পরকালে তার জন্য নির্ধারিত করি জাহান্নাম যেথায় সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ভর্ৎসিত অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায়। لِمَنْ نُرِيْدُ এটা جَرّ বাচক শব্দটির পুনরাবৃত্তিসহ لَهٗ-এর بَدَل হয়েছে। مَدْحُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত।

١٩. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا عَمِلَ عَمَلَهَا اللَّائِقَ بِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ حَالٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ مَقْبُوْلًا مُثَابًا عَلَيْهِ.

১৯. যারা ঈমান গ্রহণ করত পরলোক কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে অর্থাৎ তার জন্য যথোপযুক্ত ও যথাযোগ্যভাবে কাজও করে তাদেরই চেষ্টা আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতার অধিকারী হয় অর্থাৎ তা গ্রহণীয় হয় এবং তার জন্য ফল প্রদত্ত হয়। وَهُوَ مُؤْمِنٌ এটা حَالٌ হয়েছে।

٢٠. كُلًّا مِّنَ الْفَرِيْقَيْنِ نُّمِدُّ نُعْطِىْ هٰٓؤُلَاءِ وَهٰٓؤُلَاءِ بَدَلٌ مِنْ مُتَعَلِّقٍ بِنُمِدُّ عَطَاءِ رَبِّكَ ط فِى الدُّنْيَا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ فِيْهَا مَحْظُوْرًا مَمْنُوْعًا عَنْ اَحَدٍ

২০. এরা তারা অর্থাৎ এ উভয় দলের প্রত্যেককেই আমি দুনিয়াতে দান করি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে এবং এতে তোমার প্রতিপালকের দান কারো থেকে নিষিদ্ধ রাখা হয় না। অর্থাৎ ফিরিয়ে রাখা হয় না। لِمَنْ আমি দান করি। هٰٓؤُلَاءِ এটা بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مِنْ عَطَاءِ এটা لِمَنْ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٢١. اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ وَالْجَاهِ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ اَعْظَمُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِى الْاِعْتِنَاءُ بِهَا دُوْنَهَا

২১. লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একজনকে অপর দলের উপর উপজিবীকা এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি দানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। আর পরকাল তো অবশ্যই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ মহান এবং দুনিয়া থেকে প্রাধান্য লাভে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্য কিছুর প্রতি নয় এর প্রতিই সকলের একনিষ্ঠ হওয়া কর্তব্য।

٢٢. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَخْذُوْلًا لَا نَاصِرَ لَكَ

২২. আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে তোমার কেউ সাহায্যকারী হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْجِنْس : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْاِنْسَانُ-এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টি جِنْس-এর জন্য হয়েছে - اِسْتِغْرَاقْ - এর জন্য নয়। কাজেই এখন এ আপত্তি উত্থাপিত হবে না যে, সকল মানুষ বদদোয়ার ক্ষেত্রে عَجُوْل হয় না।

قَوْلُهُ الْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ : অর্থাৎ اٰيَةَ اللَّيْلِ-এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّهْ হয়েছে। এটা সেই সংশয়ের নিরসন যে, مُضَافْ اِلَيْهِ টা مُضَافْ-এর ভিন্ন হয়ে থাকে। অথচ اٰيَةَ اللَّيْلِ-এর মধ্যে مُضَافْ اِلَيْهِ এবং مُضَافْ একই হয়েছে। উত্তরের সারকথা হলো এই যে, এটা হলো اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ আর এটা اِضَافَتْ عَدَدْ اِلَى الْمَعْدُوْدِ-এর অন্তর্গত যেমন عَشَرَ سِنِيْنَ-এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ হয়েছে- اٰيَةَ النَّهْرِ -এর মধ্যেও এ সুরতই রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ مُبْصَرًا فِيْهِ : এতে مَجَازْ عَقْلِىْ হয়েছে। কেননা দিন দেখে না; বরং দিনে দেখা যায়, عَلَاقَةْ ظَرْفِيَّتْ-এর কারণে দেখার ইযাফত দিনের দিকে করে দিয়েছে, অর্থাৎ اِسْمْ فَاعِلْ বলে ظَرْف উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِالضَّوْءِ : অর্থাৎ بِسَبَبِ الضَّوْءِ

قَوْلُهُ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهٖ : شِدَّتْ لُزُوْمْ-কে বর্ণনা করার জন্য এটা একটি আরবীয় تَعْبِيْر বা ব্যক্তকরণ। আরবদের এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হতো তখন তারা পাখির মাধ্যমে শুভাশুভের নিদর্শন নিত। এর সুরত এরূপ হতো যে, পাখি নিজে উড়ে বা কারো উড়ানোর মাধ্যমে যদি ডানদিকে যেত তবে তারা এটাকে নেকফালি মনে করত এবং সেই কাজটি করে ফেলত। যখন আরবে এই প্রথা ব্যাপক হয়ে গেল তখন মূল কল্যাণ ও অকল্যাণকেই طَائِرٌ দ্বারা ব্যক্ত করতে লাগল। আর এটা تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ لَازِمِهٖ-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ خَصَّ بِالذِّكْرِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, আমল পূর্ণ মানুষের জন্যই আবশ্যক হতো শুধুমাত্র গর্দানের জন্য নয়। অথচ এখানে أَعْمَالُ -কে গর্দানের জন্য আবশ্যক বলা হয়েছে।

উত্তরের সারকথা হলো এই যে, যেমনিভাবে قِلَادَةٌ [গলার হার] গলার জন্য সাধারণভাবে لَازِمٌ غَيْرُ مُنْفَكٍّ হয়ে এমনিভাবে মানুষের আমল মানুষের জন্য لَازِمٌ হয়। এ ব্যক্তকরণের মধ্যে شِدَّتُ لُزُوْمٍ এবং لُزُوْمٌ دَوَامٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الخ : মুজাহিদ (র)-এর উক্তি মতে এতে مَجَازٌ عَقْلِيٌّ হবে না।

قَوْلُهُ صِفَتَانِ لِكِتَابًا : يَلْقَهُ টা জুমলা হয়ে كِتَابًا - এর প্রথম সিফত, আর مَنْشُوْرًا হলো দ্বিতীয় সিফত। আবার مَنْشُوْرًا টা بَاتِبَه -এর- ضَمِيْر مَفْعُوْلِيْ হতে حَالٌ হওয়াও বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَهُ : পূর্বের সাথে نَظْم এবং رَبْط প্রতিষ্ঠা করার জন্য يُقَالُ -কে উহ্য মানা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَحْمِلُ : এটা لَا تَزِرُ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ وَبِهِ : এর যমীর خَبِيْرًا عَلَى سَبِيْلِ الْاِنْفِرَادِ এবং بَصِيْرًا - এর দিকে ফিরেছে। ইবারত এভাবে হলে উত্তম হতো যে, وَبِذُنُوْبِ يَتَعَلَّقُ بِخَبِيْرًا وَبَصِيْرًا

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ لَهُ : অর্থাৎ لِمَنْ نُرِيْدُ টা لَهُ থেকে إِعَادَةُ جَارٍ -এর সাথে بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। যে কাজে মানুষ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পুরস্কার লাভ করবে সে কাজের প্রতি পবিত্র কুরআন মানুষকে আকৃষ্ট করে। আর যে কাজের পরিণাম মানুষের জন্যে ভয়াবহ হবে সে কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, পবিত্র কুরআনের এ আহ্বান সত্ত্বেও মানুষ তার ভালোমন্দ বুঝতে চায় না, তার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না। সে যেমন তার মঙ্গল কামনা করে ঠিক তেমনিভাবে তার অমঙ্গল এবং অকল্যাণের দিকেও ছুটে যায়। তার আচার আচরণের মাধমে সে নিজের অকল্যাণ ডেকে আনে এমনকি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে। মক্কার কাফের নযর ইবনে হারেস প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস করতো না, পবিত্র কোরআনকে সত্য মনে করত না। তাই সে বিদ্রূপ করে এভাবে দোয়া করত, "হে আল্লাহ যদি ইসলাম এবং কুরআন সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর।" [নাউযুবিল্লাহ!] বদরের যুদ্ধের দিন নযর এবনে হারেস নিহত হয়। এভাবে মানুষ নিজের অকল্যাণ কামনা করে। তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৪১; তাফসীরে কাবীর, পারা ২০, পৃ. ১৬২]

এ পর্যায়ে আরও বিবরণ রয়েছে। ওয়াকেদী হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোনো আজাদ করা গোলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর ﷺ একজন বন্দীকে এনে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, "এর প্রতি লক্ষ্য রেখ [যেন পালিয়ে না যায়]।" হযরত আয়েশা (রা.) অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথায় মশগুল হওয়ার কারণে বন্দীর প্রতি নজর রাখতে পারেননি। এই সুযোগে সে পলায়ন করে। পরে হুজুর ﷺ আগমন করলেন এবং বন্দী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, "আমি জানি না, আমি তার ব্যাপারে সামান্য গাফেল হয়েছিলাম, এই ফাঁকে সে পালিয়ে গেছে তখন হুজুর ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। [রাগান্বিত হয়ে] বললেন, "আল্লাহ তোমার হাত কেটে দিন।" একথা বলে তিনি বাহিরে তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং অপরাধীকে ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক প্রেরণ করলেন। লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে আসল। হুজুর ﷺ ঘরে তশরিফ আনলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তখন বিছানায় বসে তাঁর হাতকে ওলটপালট করে দেখছিলেন। হুজুর ﷺ বললেন, "কি হয়েছে?" হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, "আপনার বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করছি।" তখন হুজুর ﷺ আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলে এভাবে মুনাজাত করলেন : "হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ, অন্য মানুষের ন্যায় আমারও কষ্ট হয় এবং রাগ আসে। আমি যদি কোনো মোমেন পুরুষ বা মোমেন নারীর জন্যে বদদোয়া করি তবে আমার বদদোয়াকে তাঁর জন্যে গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানিয়ে দাও।" –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. ২৪; তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৪০ - ৪১]

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগৎ একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ১. দিনের আলোতে মানুষ রুজি অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরি, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্য আলো অত্যাবশ্যক। ২. দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরি, চাকরের চাকরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আজাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কোনো কোনো লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরজ করবে, পরওয়ারদিগার! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে। আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ তোমরা অন্যদের গিবত করতে। –[তাফসীরে মাযহারী]

পয়গাম্বর প্রেরণ ব্যতীত আজাব না হওয়ার ব্যাখ্যা : এ আয়াতদৃষ্টে কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে যাদের কাছে কোনো নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো আজাব হবে না। কোনো কোনো ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকিদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায়। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ প্রভৃতি– সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আজাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রাসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গাম্বরগণের দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যতীত সাধারণ গুনাহের কারণে আজাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রাসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন: রসূল ও নবী অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহর রাসূল বটে।

মুশরিকদের সন্তানসন্ততির আজাব হবে না : لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আজাব হবে না। কেননা পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রশ্নে ফিকহবিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً الخ : একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : اِذَا اَرَدْنَا এবং অতঃপর اَمَرْنَا বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আজাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন এবং আজাব ও ছওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আজাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আজাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আজাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরি ও গুনাহের সংকল্প– আল্লাহর ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

আয়াতের জন্য একটি তাফসীর : أَمَرْنَا শব্দের প্রচলিত অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি আদেশ দেই, কিন্তু এ আয়াতে এ শব্দের বিভিন্ন কেরাত হয়েছে। আবূ উছমান নাহদী, আবূ রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অবলম্বিত এক কেরাতে এ শব্দটি মীমের তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ আমি অবস্থাপন্ন বিত্তশালী লোকদেরকে প্রভাবশালী ও শাসক করে দেই। তারা পাপাচারে মেতে উঠে এবং গোটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক কেরাতে শব্দটিকে أَمَّرْنَا পাঠ করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এর তাফসীর أَكْثَرْنَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির উপর আজাব প্রেরণ করেন, তখন তার প্রাথমিক লক্ষণ এই প্রকাশ পায় যে, সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়। তারা পাপাচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আজাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়।

প্রথম কেরাতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ভোগবিলাসী লোকদের শাসনকার্য অথবা এ ধরনের লোকের প্রাচুর্য মোটেই আনন্দের বিষয় নয়; বরং আল্লাহর আজাবের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে আজাবে পতিত করতে চান, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জাতির শাসনকর্তা ও নেতৃপদে এমন লোকদেরকে অধিষ্ঠিত করে দেন, যারা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সেবী। অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। উভয় অবস্থায় পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে আল্লাহর নাফরমানি নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অবশেষে তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার : আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণির চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ الخ : যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, আলোচ্য আয়াতে তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা اِسْتِمْرَارٌ وَدَوَامٌ ক্রমাগত বলতে থাকা ও স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই আচ্ছন্ন করে রাখে– পরকালের প্রতি কোনো লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় أَرَادَ الْأٰخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মু'মিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোনো কোনো কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোনো কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হলো মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিদ'আত ও মনগড়া আমল যতই ভালো দেখা যাক–গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيَهَا শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা [পরকালের] লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎ কর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়– সাধারণ বিদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন– পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী سَعْيَهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে এ কথা ও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোনো সময় করল কোনো সময় করল না– এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا : "আল্লাহ পকের সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ স্থির করো না নতুবা তোমাকে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসে থাকতে হবে।"

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একদল দুনিয়া প্রিয়, যাদের পরিণাম হলো আখেরাতের আজাব। আরেক দল যারা আখেরাতের কল্যাণকামী, আল্লাহ পাকের অনুগত, তাদের শুভপরিণতি হলো আখেরাতের ছওয়াব, তবে এর জন্য তিনটি পূর্ব শর্ত রয়েছে। ১. আখেরাতের সাফল্যের জন্যে প্রয়াসী হতে হবে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। ২. এই আকাঙ্খা পূরণের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা এবং সাধনা অব্যাহত থাকতে হবে। ৩. ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে হবে।

আর আলোচ্য আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঈমান হলো তৌহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো প্রকার শিরক না করা। তাই ইরশাদ হয়েছে- لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ "আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ স্থির করো না।"

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে অথচ এই আয়াতে শিরক না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, যদিও প্রকাশ্যে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে, কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাঁর সমগ্র উম্মতকে। এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় অন্য আয়াতে-

يَاۤ اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ এ আয়াতেও সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে আর উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র উম্মতকে। অথবা কথাটি এভাবে ইরশাদ হয়েছে- اَيُّهَا الْاِنْسَانُ অর্থাৎ হে মানব জাতি! আল্লাহ পাকের সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না।

যদি তা কর তবে তোমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অসহায় ও নিরুপায় হয়ে বসে থাকবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কাছে দানের আশা করে আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কিছুকে মাবুদ স্থির করো না। আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিস যখন তোমার তাকদীরে না রাখেন এমন অবস্থায় সেই জিনিস অন্যের কাছে যদি আশা করা হয় তবে তাও হবে শিরক। এমন অবস্থায় তাকে অসহায় এবং অপমানিত হয়ে দোজখে প্রবেশ করতে হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ "আর যদি তিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেন তবে তাঁর পরে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?" আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয় তোমার উপকার করার জন্যে, আল্লাহ পাক যা তোমার জন্যে লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো উপকার তারা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয় তোমার ক্ষতি সাধনের জন্যে, আল্লাহ পাক যা তোমার ব্যাপারে লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতি সাধন করতে তারা সক্ষম হবে না। তকদীর লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, কলম তুলে ফেলা হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে।

-[তাফসীরে শায়খে আকবর ইবনে আরাবী (র.) খ. ১, পৃ. ৭১৬]

অনুবাদ :

٢٣. وَقَضٰى اَمَرَ رَبُّكَ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّاتَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ اَنْ تُحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط بِاَنْ تَبَرُّوْهُمَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا فَاعِلٌ اَوْكِلَاهُمَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ يَبْلُغَانِ فَاَحَدُهُمَا بَدَلٌ مِنْ اَلِفِهِ فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا مُنَوَّنًا وَغَيْرَ مُنَوَّنٍ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى تَبًّا وَقُبْحًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا تَزْجُرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا جَمِيْلًا لَيِّنًا ـ

২৩. তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত তোমরা অপর কারো ইবাদত করবে না, আর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে তাদের বাধ্য থাকবে তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমকও দিও না। তাদের সাথে সম্মানজনক অর্থাৎ ভালো ও নম্র কথা বলো। وَقَضٰى এ স্থানে অর্থ স্থির নির্দেশ দিয়েছেন। اَنْ এটা এ স্থানে بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত। اِحْسَانًا এটা এ স্থানে উহ্য اَنْ تُحْسِنُوْا ক্রিয়ার مَصْدَرْ বা সমধাতুজ কর্ম। اَحَدُهُمَا এটা يَبْلُغَنَّ ক্রিয়ার فَاعِلْ বা কর্তা. يَبْلُغَنَّ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে تَثْنِيَةْ বা দ্বিবচন হিসেবে يَبْلُغَانِ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় اَحَدُهُمَا উক্ত ক্রিয়ার اَلِفْ বা দ্বিবচন থেকে بَدَلْ বা স্থলাভিষিক্ত পদ বলে গণ্য হবে। اُفٍّ-এর ف অক্ষরটি ফাতাহ ও কাসরা, তানবীন ও তানবীন ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে, এটা مَصْدَرْ বা ক্রিয়ার উৎস। অর্থাৎ মন্দ বা ধ্বংসের কথা বলো না। وَلَا تَنْهَرْهُمَا তাদের উভয়কে ধমক দিও না

٢٤. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اَلِنْ لَهُمَا جَانِبَكَ الذَّلِيْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ اَىْ لِرِقَّتِكَ عَلَيْهِمَا وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمَانِىْ حِيْنَ رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ـ

২৪. অনুকম্পা অর্থাৎ তাদের প্রতি তোমরা দয়ার্দ্রতায় তাদের প্রতি বিনয়ের পাখনা অবনত রেখ অর্থাৎ তুমি তোমাকে বিনম্র রেখ এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিল যখন তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালক করেছিল।

٢٥. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط مِنْ اِضْمَارِ الْبِرِّ وَالْعُقُوْقِ اَنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ طَائِعِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ الرَّجَّاعِيْنَ اِلٰى طَاعَتِهٖ غَفُوْرًا لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ فِىْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ بَادِرَةٍ وَهُمْ لَا يُضْمِرُوْنَ عُقُوْقًا

২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ তাদের প্রতি বাধ্যতা বা অবাধ্যতা যা গোপন আছে তা ভালো জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে আল্লাহর প্রতি বাধ্যগত হলে যারা আল্লাহ অভিমুখী অর্থাৎ যারা সতত তাঁর আনুগত্য অভিমুখী আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে নয়; বরং হঠাৎ করে যদি তাদের হকের বিষয়ে কোনো কিছুর প্রকাশ হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন।

٢٦. وَاٰتِ اَعْطِ ذَا الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ حَقَّهٗ مِنَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا بِالْاِنْفَاقِ فِىْ غَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

২৬. এবং দিয়ে দাও আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অর্থাৎ সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষার যা কিছু আছে তা এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও, আর আল্লাহর অনুগত্যের বাইরে ব্যয় করে কিছুতেই অপব্যয় করো না। اٰتِ দিয়ে দাও। ذَا الْقُرْبٰى আত্মীয়তার সম্পর্কের অধিকারীগণ।

٢٧. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ اَىْ عَلٰى طَرِيْقَتِهِمْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا شَدِيْدَ الْكُفْرِ لِنِعَمِهٖ فَكَذٰلِكَ اَخُوْهُ الْمُبَذِّرُ .

২৭. নিঃসন্দেহে অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই অর্থাৎ তারা শয়তানের পথে অধিষ্ঠিত। এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ তাঁর অনুগ্রহের প্রতি সে খুবই কৃতঘ্ন। সুতরাং এর ভ্রাতাও তদ্রূপ হবে'।

٢٨. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اَىْ اَلْمَذْكُوْرِيْنَ مِنْ ذِى الْقُرْبٰى وَمَا بَعْدَهُمْ فَلَمْ تُعْطِهِمْ اِبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا اَىْ لِطَلَبِ رِزْقٍ تَنْتَظِرُهٗ يَأْتِيْكَ فَتُعْطِيْهِمْ مِنْهُ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا لَيِّنًا سَهْلاً بِاَنْ تَعِدَهُمْ بِالْاِعْطَاءِ عِنْدَ مَجِيْءِ الرِّزْقِ

২৮. আর যদি তাদের অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও তৎপর যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিমুখ করতে হয় এবং কিছু দিতে না পার আর তুমি তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে অনুগ্রহ প্রত্যাশায় তার সন্ধানে রত অবস্থায় থাক অর্থাৎ তোমার নিকট কিছু না থাকায় তুমি জীবনোপকরণ তালাশে রত ও তা পাওয়ার অপেক্ষায় আছ। তা তোমার হস্তগত হলে তাদেরে দেবে বলে আশা কর তবে এই অবস্থায় তাদেরকে নম্র কথা বল যেমন, সম্পদ হস্তগত হলে দেবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাও। مَيْسُوْرًا নম্র, সহজ।

٢٩. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ اَىْ لَا تُمْسِكْهَا عَنِ الْاِنْفَاقِ كُلَّ الْمَسْكِ وَلَا تَبْسُطْهَا فِى الْاِنْفَاقِ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا رَاجِعٌ لِلْاَوَّلِ مَحْسُوْرًا مُنْقَطِعًا لَا شَىْءَ عِنْدَكَ رَاجِعٌ لِلثَّانِىْ

২৯. তোমার হস্ত গলায় বেড়িযুক্ত করে রেখ না অর্থাৎ ব্যয় করা বন্ধ করে রেখো না আর ব্যয়ের বেলায় হস্ত একেবারে সম্প্রসারিত করে দিও না, তাহলে প্রথমোক্ত অবস্থায় তুমি নিন্দিত এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে ফলে কিছুই তোমার থাকবে না। مَحْسُوْرًا - নিঃস্ব।

٣٠. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهٗ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهٗ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا عَالِمًا بِبَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ فَيَرْزُقُهُمْ عَلٰى حَسَبِ مَصَالِحِهِمْ .

৩০. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ সম্প্রসারিত করেন তাকে স্বচ্ছল করে দেন, এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করে দেন। সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে অবহিত ও চক্ষুষ্মান। তাদের ভিতর ও বাহির সকল কিছু জানেন। সুতরাং তাদের কল্যাণানুসারে তাদেরকে জীবনোপকরণ দান করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِأَنْ : এটা উহ্য মানার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ হলো مَصْدَرِيَّةٌ এ সুরতে لَا টা نَافِيَةٌ হবে। আর تَعْبُدُوْنَ টা عِبَادَةٌ -এর অর্থে হবে। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বলেছেন যে, তিনি ব্যতীত কারো জন্যই উপাসনা নয়। আবার এটাও বৈধ যে, اَنْ টা مُفَسِّرَةٌ হবে। কেননা قَضٰى টা قَالَ অর্থে হয়েছে। এ সুরতে لَا টা نَافِيَةٌ হবে।

قَوْلُهُ يَبْلُغَنَّ : এটা مُضَارِعْ بَانُوْن ثَقِيْلَةٌ - এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ - এর সীগাহ।

قَوْلُهُ وَاَنْ تُحْسِنُوْا : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. اَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. بِالْوَالِدَيْنِ টা جَارْ مَجْرُوْر মিলে اِحْسَانًا مُؤَخَّرْ -এর مُتَعَلِّقْ হতে পারে না, তাই বাধ্য হয়েই اَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানতে হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি اَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানা না হয় তবে بِالْوَالِدَيْنِ -এর আতফ হবে لَا تَعْبُدُوْا -এর উপর এবং এটা جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ -এর আতফ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -এর উপর হবে, যা বৈধ নয়। আর যখন اَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানা হয় তখন جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ -এর আতফ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ই হবে।

قَوْلُهُ عِنْدَكَ : অর্থাৎ فِيْ كَفَالَتِكَ وَحِرْزِكَ

قَوْلُهُ فَاعِلٌ : অর্থাৎ اَحَدُهُمَا হলো فَاعِلٌ এটা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো এটা যে, يَبْلُغَنَّ -এর মধ্যে فَاعِلٌ -এর যমীর উহ্য নয় যে, تَكْرَارْ فَاعِلٌ - এর আপত্তি উত্থাপিত হবে, বরং اَحَدُهُمَا হলো ফায়েল।

قَوْلُهُ فَاحَدُهُمَا بَدَلٌ مِنْ اَلِفِهِ : এটা দ্বিতীয় কেরাতের তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর সারমর্ম হলো এই যে, এক কেরাতে يَبْلُغَنَّ -এর স্থলে يَبْلُغَانِ রয়েছে। সেই সুরতে অবশ্যই تَكْرَارْ فَاعِلْ - এর আপত্তি উত্থাপিত হবে। এর উত্তর হলো এই যে, يَبْلُغَانِ - এর فَاعِلْ এর اَلِفْ -এর يَبْلُغَانِ, হলো ফায়েলের আর اَحَدُهُمَا হলো তার থেকে بَدَلْ এটা নয়। কাজেই এ কেরাতের সুরতেও تَكْرَارْ فَاعِلْ -এর আপত্তি উত্থাপিত হবে না।

قَوْلُهُ اَلِنْ لَهُمَا جَانِبَكَ الخ : অর্থাৎ جَنَاحٌ দ্বারা রূপকভাবে جَانِبْ - এর ইচ্ছা করেছেন। আর এটা خَاصْ উল্লেখ করে عَامْ উদ্দেশ্য নেওয়ার অন্তর্গত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ الذَّلِيْلُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلَّذِىْ -এর দিকে جَنَاحٌ -এর ইযাফতটা হলো بَيَانِيَةٌ

قَوْلُهُ اَىْ لِرِقَّتِكَ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مِنَ الرَّحْمَةِ -এর مِنْ টি اَجَلْ - এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ رَحِمَانِىْ : এ বৃদ্ধি করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাশবীহকে বৈধ করা।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يَضِيْمُرُوْنَ الخ : এটা হলো جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ

قَوْلُهُ فِىْ غَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভালো কাজে যদি অতিরঞ্জনের সাথেও ব্যয় করা হয় তবুও তা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ الخ : পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরজ করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্র করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছে- اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করল। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন, [মোস্তাহাব] সময় হলে নামাজ পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল, এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন : পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফজিলত : মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাকে হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -[মাযহারী]

১. তিরমিযী ও মুস্তাদারাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -[মাযহারী]

২. তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

৩. হযরত আবূ উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন, তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বেআদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

৪. বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এ শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিনবার বলেন- وَاِنْ ظَلَمَا وَاِنْ ظَلَمَا وَاِنْ ظَلَمَا অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি জুলুম করে তবুও পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

৫. বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজের ছওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই ছওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্! তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই।

পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

৬. বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত আবূ বকরা (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সমস্ত গুনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতামাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়।

কোনো কোনো বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গুনাহের কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েজও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েজ নয়।

পিতামাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরি নয় : ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েজ হবে কি? তিনি বললেন– صِلِيْ أُمَّكِ অর্থাৎ "তোমার জননীকে আদার-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতমাতা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাক বলে– وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েজ নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মা'রূফ বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

পিতামাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে : পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোনো সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরজ কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবত সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ্যে কুরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালনপালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কুরআন পাকের সাধারণ নীতি!

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবিদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কুরআন পাক এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশি তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতামাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক. তাঁদেরকে 'উফ'-ও বলবে না। এখানে **'উফ'** শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উফ' বলার চাইতেও কম কোনো স্তর থাকলেও তাও অবশ্য উল্লেখ করা হতো। [মোটকথা, যে কথায় পিতামাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।]

দ্বিতীয়. وَلَا تَنْهَرْهُمَا - نَهْر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ. وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا প্রথমোক্ত দুটি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, যেমন কোনো গোলাম তার রূঢ়স্বভাব সম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ - এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحٌ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়; বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইজ্জতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়; বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ. وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا - এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার ষোল আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা : পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েজ হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েজ নয়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : কুরতুবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তোমার পিতাকে ডেকে আন। এমন সময়ই হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো সে মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনতে পায়নি। যখন লোকটি তার পিতাকে নিয়ে হাজির হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাপার কি, আপনার পুত্র আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিতে চান? পিতা বলল, আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার ফুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, إِيْهٍ [অর্থাৎ ব্যস! আসল ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো বলার শোনার দরকার নেই।] এরপর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার কানও শোনেনি? লোকটি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করে দেন। [যে কথা কেউ শোনেনি; তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মোজেজা] অতঃপর সে বলল, এটা ঠিক যে, আমি মনে মনে কয়েক লাইন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করল–

غَذَوْتُكَ مَوْلُوْدًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا * تُعَلُّ بِمَا اَجْنِىْ عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি। তোমার যাবতীয় খাওয়া-পড়া আমারই উপার্জন থেকে ছিল।

اِذَا لَيْلَةٌ ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ اَبِتْ * لِسُقْمِكَ اِلَّا سَاهِرًا اَتَمَلْمَلُ

কোনো রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তখন আমি সারা রাত তোমার অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি।

كَاَنِّىْ اَنَا الْمَطْرُوْقُ دُوْنَكَ بِالَّذِىْ * طُرِقْتَ بِهِ دُوْنِىْ فَعَيْنِىْ تَهْمَلُ

যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে– তোমাকে নয়। ফলে আমি সারা রাত ক্রন্দন করেছি।

تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِىْ عَلَيْكَ وَاِنَّهَا * لَتَعْلَمُ اَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ

আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হতো; অথচ আমি জানতাম যে, মৃত্যুর জন্য দিন নির্দিষ্ট রয়েছে– আগে পিছে হতে পারবে না।

فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِىْ * اِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيْكَ اُؤَمِّلُ

অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছ।

جَعَلْتَ جَزَائِىْ غِلْظَةً وَفَظَاظَةً * كَاَنَّكَ اَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ

তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ; যেন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা না করতে।

فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِيْ * فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُلَاصِقُ يَفْعَلُ

আফসোস যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃত্বের হক আদায় না হয়, তবে কমপক্ষে ততটুকুই করতে হবে যতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে।

فَأَوْلَيْتَنِيْ حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ * عَلَيَّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالِكَ تَبْخَلُ

তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং স্বয়ং আমারই অর্থসম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের জামার কলার চেপে ধরলেন এবং বললেন, أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার। −[তাফসীরে কুরতুবী খ. ষষ্ঠ, পৃ. ২৪]

কবিতাগুলো আরবি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'হামাসা'তেও উদ্ধৃত রয়েছে; কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উমায়া ইবনে আবুস্‌সলত। কেউ কেউ বলেন, এগুলো আব্দুল আ'লার কবিতা এবং কারো কারো মতে কবিতাগুলো আলী আব্বাস অন্ধের।

−[হামিয়া-কুরতুবী]

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোনো সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরিউক্ত আদবের পরিপন্থি। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবির ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো সময় কোনো পেরেশানি অথবা অসাবধানতার কারণে কোনো কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবি অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। أَوَّابِيْنَ শব্দের অর্থ تَوَّابِيْنَ অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিবের ছয় রাকাত এবং ইশরাকের নফল নামাজকে صَلٰوةُ الْأَوَّابِيْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ নামাজগুলো পড়ার তাওফীক তাদেরই হয়, যারা أَوَّابِيْنَ অর্থাৎ تَوَّابِيْنَ [তওবাকারী]।

قَوْلُهُ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ الخ : সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতামাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ− এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতে সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারণের মতো ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণপোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরজ। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণপোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। − [তাফসীরে মাযহারী]

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। কেননা তাদের হক তার জিম্মায় ফরজ। দাতা সে ফরজই পালন করছে মাত্র; কারো প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تَبْذِيْر অর্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা : কুরআন পাক অপব্যয়কে দুটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تَبْذِيْر এবং অপরটি إِسْرَافٌ - আলোচ্য আয়াতে تَبْذِيْر নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوْا আয়াতে إِسْرَافٌ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গুনাহের কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে إِسْرَافٌ ও تَبْذِيْر বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, গুনাহের কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে إِسْرَافٌ বলা হয়। তাই إِسْرَافٌ-এর চাইতে গুরুতর। تَبْذِيْر - কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন, কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদও [অর্ধসের] ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হক নয় এমন অবস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয় [মাযহারী]। ইমাম মালিক (র.) বলেন, হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয়। একে اِسْرَافٌ-ও বলে। এটা হারাম। –[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবী বলেন, হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تَبْذِيْر এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়– এটাও تَبْذِيْر-এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে তবে তা تَبْذِيْر-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ الخ : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মতো কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً الخ : খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে মারদওয়াইহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অন্য কোনো কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন, অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, আম্মা বলেছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের সময় হলো। হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মতো বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানি ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআন পাকের مَحْسُوْرًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হতো এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোনো কিছুই করেননি। এ থেকে বুঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভালো হতো' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃঙ্খলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃঙ্খলা। -[কুরতুবী] কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও বিশৃঙ্খলা। -[মাযহারী] مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, مَلُوْمٌ শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَحْسُوْرًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশি ব্যয় করে নিজে ফকির হয়ে গেলে সে مَحْسُوْرٌ অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

فَائِدَه جَلِيْلَه

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا হতে لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

২৫টি আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে লিকে দেওয়া হলো–

১. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

২. ৩. وَقَضٰى رَبُّكَ الخ আয়াতে দু'টি হুকুম বর্ণিত হয়েছে

ক. عِبَادَةُ اللّٰهِ খ. نَهْىٌ عَنْ عِبَادَةِ الْغَيْرِ

৪. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

৫. فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ

৬. وَلَا تَنْهَرْهُمَا

৭. وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

৮. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

৯. وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا

১০. وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

১১. وَالْمِسْكِيْنَ

১২. وَابْنَ السَّبِيْلِ

১৩. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

১৪. فَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

১৫. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً

১৬. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

১৭. وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ

১৮. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى

১৯. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

২০. فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ

২১. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

২২. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ

২৩. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ

২৪. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

২৫. وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا

অনুবাদ :

٣١. وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ بِالْوَادِ خَشْيَةَ مَخَافَةَ اِمْلَاقٍ ط فَقْرٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً اِثْمًا كَبِيْرًا عَظِيْمًا .

৩১. তোমাদের সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা অবশ্যই মহাপাপ। خَشْيَةَ আশঙ্কা। اِمْلَاقٍ দারিদ্র্য। خِطْاً পাপ। كَبِيْرًا মহা।

٣٢. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اَبْلَغُ مِنْ لَا تَاْتُوْهُ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط قَبِيْحًا وَسَاۤءَ بِئْسَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا هُوَ .

৩২. ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়োনা, এটা অশ্লীল মন্দ ও নিকৃষ্ট আচরণ কত নিকৃষ্ট পথ তা। لَا تَقْرَبُوا - নিকটবর্তী হয়ো না। এটা لَاتَاْتُوْهُ [তা করো না] থেকে অধিক তাকীদ সম্পন্ন।

٣٣. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ لِوَارِثِهٖ سُلْطٰنًا تَسَلُّطًا عَلَى الْقَاتِلِ فَلَا يُسْرِفْ يَتَجَاوَزِ الْحَدَّ فِى الْقَتْلِ ط بِاَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهٖ اَوْ بِغَيْرِ مَا قَتَلَ بِهٖ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا .

৩৩. আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়ভাবে ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবককে উত্তরাধিকারীকে তো হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে সীমালঙ্ঘন না করে। যেমন, হত্যাকারীকে ছেড়ে অন্যকে হত্যা করা বা যে ধরনের বস্তু দ্বারা হত্যা করেছিল তা ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারা হত্যা করা সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই। سُلْطٰنًا ক্ষমতা।

٣٤. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ص وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِذَا عَاهَدْتُّمُ اللّٰهَ اَوِ النَّاسَ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا عَنْهُ .

৩৪. সদুদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। এবং আল্লাহ কিংবা মানুষের সাথে অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার তোমরা পালন করো। অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই তার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।

٣٥. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اَتِمُّوْهُ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمِيْزَانِ السَّوِيِّ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا مَاٰلًا .

৩৫. মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণমাপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। اَوْفُوْا পূর্ণভাবে দাও। اَلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। تَاْوِيْلًا এ স্থানে অর্থ পরিণাম।

٣٦. وَلَا تَقْفُ تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ الْقَلْبَ كُلُّ اُولٰۤئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا صَاحِبُهٗ مَاذَا فَعَلَ بِهٖ .

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ের অনুসরণ করো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়– তাদের প্রত্যেকের নিকট তাদের অধিকারী প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। যে সে এগুলোকে কি কাজে ব্যবহার করেছে। لَا تَقْفُ অনুসরণ করো না। اَلْفُؤَادَ হৃদয়।

৩৭. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اَيْ ذَا مَرَحٍ بِالْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَشُقَّهَا حَتّٰى تَبْلُغَ اٰخِرَهَا بِكِبْرِكَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا الْمَعْنٰى اِنَّكَ لَا تَبْلُغُ هٰذَا الْمَبْلَغَ فَكَيْفَ تَخْتَالُ

৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে অহংকার ও গর্বে স্ফীত হয়ে ঔদ্ধত্য সহকারে বিচরণ করো না। তুমি কখনই ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমার অহংকারে তুমি ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করত তার পাতালে পৌঁছতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ থেকে পারবে না। অর্থাৎ তুমি তো কখনও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এর পরও তুমি কেমন করে অহংকার প্রদর্শন কর।

৩৮. كُلُّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ـ

৩৮. উল্লিখিত এ সবগুলোর যা মন্দ তা তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

৩৯. ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ط الْمَوْعِظَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

৩৯. হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক যে হিকমত উপদেশ তোমাকে ওহীর মাধ্যমে দিয়েছেন তা তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ স্থির করো না। করলে, তুমি নিন্দিত ও দূরীকৃত অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪০. اَفَاَصْفٰكُمْ اَخْلَصَكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ط بَنَاتٍ لِنَفْسِهِ بِزَعْمِكُمْ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ بِذٰلِكَ قَوْلًا عَظِيْمًا ـ

৪০. হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য বিশেষ করে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন আর তোমাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণানুসারে নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে মহিলা অর্থাৎ কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমার এ বিষয়ে অবশ্যই এক সাংঘাতিক কথা বলে থাক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِمْلَاقٍ : এটা বাবে اِفْعَالٌ হতে অর্থ-দারিদ্র্য, বিরক্ততা, নিঃস্বতা।

قَوْلُهُ اَلْوَادِ : এটা বাবে ضَرَبَ - এর মাসদার অর্থ– জীবিত দাফন করা, প্রোথিত করা।

قَوْلُهُ خِطْأً : এটা বাবে سَمِعَ -এর মাসদার অর্থ– ভুলত্রুটি, গুনাহ, অপরাধ।

قَوْلُهُ اَبْلَغُ مِنْ لَا تَاْتُوْهُ : অর্থাৎ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى টা مَعْنَوِيَّتْ এবং تَعْبِيْر -এর মধ্যে لَا تَاْتُوْهُ থেকে اَبْلَغُ কেননা لَاتَقْرَبُوْا -এর মধ্যে ব্যভিচারের নিকটে যাওয়া থেকেও বারণ করা হয়েছে, যাতে دَوَاعِي زِنَا এবং مُقَدِّمَات زِنَا থেকে বিরত থাকাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। لَا تَاْتُوْهُ -এর বিপরীত।

قَوْلُهُ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا : এখানে যমীরটি নিহতের অভিভাবকের দিকে ফিরেছে। নিহতের অভিভাবক এজন্য مَنْصُوْر যে, শরিয়ত তাকে قِصَاصْ নেওয়ার অধিকার দিয়েছে।

قَوْلُهُ مَسْئُوْلًا عَنْهُ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

قَوْلُهُ لَا تَقْفُ : তুমি পিছনে চলো না, তুমি অনুসরণ করো না। এটা বাবে نَصَرَ -এর قَفْوًا মাসদার হতে نَهِيْ حَاضِرْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগহ। অর্থ– পিছে চলা, অনুসরণ করা।

قَوْلُهُ ذَامَرَحٍ : মুযাফ উহ্য মেনে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, مَرَحًا টা لَا تَمْشِ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে অথচ مَرَحًا -এর حَمْلْ মাসদার হওয়ার কারণে বৈধ নয়। জবাবের সার কথা হলো মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ذَا مَرَحٍ অর্থাৎ مَارِحًا -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوْآ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন।"

আর এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَلَا تَقْتُلُوْآ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ "আর তোমরা সন্তানসন্ততিকে অভাবের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তাদেরকে রিজিক দান করি এবং তোমাদেরকেও।"

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী আয়াতে পিতামাতার সঙ্গে এহসান করার পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর এ আয়াতে সন্তানের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২০, পৃ. ১৯৬]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিজিক দানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিজিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– إِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসিলাতেই পায়।

মাসআলা : কুরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিজিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়াত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গুনাহ না হলেও এটা যে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করতো, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিজিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিজিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকে দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে

অপরাধী হচ্ছ; বরং এক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়। তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসিলাতেই পায়।

মাসআলা : কুরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিজিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়াত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গুনাহ না হলেও এটা যে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ الخ : অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এতৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোনো মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

-[ইবনে মাজাহ, বায়হাকী : মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে- آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ এই লোকটিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী, ইবনে মাজাহ থেকে]

বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। ১. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি জেনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরিয়তসম্মত শাস্তি। ২. সে যদি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারে। ৩. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কিসাস নেওয়ার অধিকার কার : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী। তাই তাফসীরের সারসংক্ষেপে 'সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ওলী' লেখা হয়েছে।

অন্যায়ের জওয়াব অন্যায় নয়- ইনসাফ। অপরাধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে : فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ এটা ইসলামি আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েজ নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরিয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কিসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মজলুমের পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মজলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

মূর্খতা যুগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হতো। কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হতো না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হতো। ইসলামি কিসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুজুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তি প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোনো জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোনো অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ الخ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আর্থিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ যথা- নবম, দশম ও একাদশতম নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বর্ণিত হয়েছে।

এতিমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতিমদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এতে যেন শরিয়তবিরোধী অথবা এতিমদের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতিমদের মালের হেফাজত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতিমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। নিজেদের খেয়াল-খুশিতে অথবা কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে ব্যয় করবে না। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতিম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাজত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনেরো বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠারো বছর।

অবৈধ পন্থায় যে কোনো ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েজ নয়। এখানে বিশেষ করে এতিমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোনো হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবি করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবি কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গুনাহ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকর করার নির্দেশ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দু প্রকার। ১. যা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলি মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে- দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মু'মিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরিয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরিয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোনো এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোনো কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোনো লোক একতরফাভাবে কারো সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গুনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - অর্থাৎ কিয়ামতে অন্যান্য ফরজ, ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহর বিধানাবলি পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেনদেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাসআলা : ফিকহবিদগণ বলেছেন, আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা : মাসআলা- أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ তাফসীর বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষ মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে- ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। ১. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরিয়তের আইন ছাড়া ও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভালো মনে করতে পারে না। ২. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা ছওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোনো ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরিউক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বাদশতম ও ত্রয়োদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোনো বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরি যে, জানার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। একপ্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের কোনো সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌঁছা। এতে বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনিভাবে বিধানাবলিও দু'প্রকার। ১. অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানাবলি; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম স্তরের জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আমল করা জায়েজ নয়। ২. ظَنِّيَّاتٌ অর্থাৎ ধারণা প্রসূত বিধানাবলি; যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এ বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিধানাবলিতে প্রথম স্তরের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামি মূলনীতিসমূহে এরূপ জ্ঞান না হলে তার কোনো মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। -[বয়ানুল কুরআন]

কান, চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ : - إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে। কানকে প্রশ্ন করা হবে– তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে– তুমি সারা জীবনে কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে– সারা জীবনে মনে কি কি কামনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরিয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারো গিবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরিয়ত বিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন ভিন্ন স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আজাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোনো কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে– اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ আজ [কিয়ামতের দিন] আমি এদের [অপরাধীদের] মুখ মোহর করে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে– কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যাদ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দুটি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দুটি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

দ্বিতীয় আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই– ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যাদ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গুনাহ। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে উঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। –[মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রার এক রেওয়ায়েতে হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব [চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহর মহত্ত্বগুণ বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহর শরিক হতে চায় সে জাহান্নামি।]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা অহংকার করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমান মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুলস। তাদের উপর প্রখরতর অগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামিদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হবে। -[তিরমিযী]

খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার এক ভাষণে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট, কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

উল্লিখিত নির্দেশাবলি বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দকাজ আল্লাহ তা'আলার কাছে মাকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলির মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি; যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হুঁশিয়ারি : পূর্বোল্লিখিত পনেরোটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলি একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল- وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়; বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এ পনেরোটি আয়াত সমগ্র তাওরাতের সার-সংক্ষেপ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলি সূরা বনী ইসরাঈলের পনেরো আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

অনুবাদ :

٤١. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنَ الْاَمْثَالِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ لِيَذَّكَّرُوْا ط يَتَّعِظُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ ذٰلِكَ اِلَّا نُفُوْرًا عَنِ الْحَقِّ .

৪১. আমি অবশ্যই এ কুরআনে বহু উদাহরণ, প্রতিশ্রুতি ও হুমকির কথা বারবার বিবৃত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু তা সত্য থেকে এদের বিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। صَرَّفْنَا বারবার বিবৃত করেছি। لِيَذَّكَّرُوْا যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

٤٢. قُلْ لَهُمْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اَيِ اللّٰهِ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَابْتَغَوْا طَلَبُوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ اَيِ اللّٰهِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا لِيُقَاتِلُوْهُ .

৪২. তাদেরকে বল, তাদের মতো যদি তাঁর সাথে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আরও ইলাহ থাকত তবে তারা অবশ্যই আরশ অধিপতির অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার পথ উপায় অন্বেষণ করত।

٤٣. سُبْحٰنَهُ تَنْزِيْهًا لَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ مِنَ الشُّرَكَاءِ عُلُوًّا كَبِيْرًا .

৪৩. তিনি পবিত্র দোষমুক্ততা কেবল তাঁরই এবং তারা যা বলে অর্থাৎ যে সমস্ত অংশী আরোপ করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

٤٤. تُسَبِّحُ لَهُ تُنَزِّهُهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ اِلَّا يُسَبِّحُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهٖ اَيْ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَفْهَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط لِاَنَّهُ لَيْسَ بِلُغَتِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوْبَةِ .

৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা দোষ-ত্রুটি মুক্ততার কথা ঘোষণা করে এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করে না অর্থাৎ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে না। কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝতে পার না। কেননা তা তোমাদের ভাষায় নয় নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। তাই তিনি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না। لَا تَفْقَهُوْنَ তোমরা বুঝ না।

٤٥. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا اَيْ سَاتِرًا لَكَ عَنْهُمْ فَلَا يَرَوْنَكَ وَنَزَلَ فِيْمَنْ اَرَادَ الْفَتْكَ بِهٖ ﷺ .

৪৫. যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা ও তোমার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই। যা তোমাকে তাদের থেকে লুকিয়ে রাখে। ফলে তারা আর তোমাকে দেখতে পায় না। কিছু সংখ্যক লোক অতর্কিতে গুপ্ত হামলা করে রাসূল ﷺ -কে হত্যা করে ফেলতে চেয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

٤٦. وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَغْطِيَةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ مِنْ اَنْ يَفْهَمُوا الْقُرْاٰنَ اَيْ فَلَا يَفْهَمُوْنَهٗ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط ثِقْلًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهٗ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا عَنْهُ .

৪৬. আমি তাদের অন্তরের উপর তা উপলব্ধি করার বিষয় অর্থাৎ আল কুরআনকে বুঝার ক্ষেত্রে আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি ফলে তারা তা বুঝতে পারে না এবং তাদের কর্ণে ছিপি সৃষ্টি করে দিয়েছি ফলে তারা তা শুনে না যখন কুরআনে তুমি এক আল্লাহর কথা উল্লেখ কর তখন তারা তা থেকে বিমুখ হয়ে সরে পড়ে। اَكِنَّةً আবরণ। وَقْرًا ছিপি [illegible]

٤٧. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ بِسَبَبِهٖ مِنَ الْهَزْءِ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ قِرَاءَتَكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى يَتَنَاجَوْنَ بَيْنَهُمْ اَيْ يَتَحَدَّثُوْنَ اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهٗ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ تَنَاجِيْهِمْ اِنْ مَا تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا مَخْدُوْعًا مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهٖ .

৪৭. যখন তারা তোমার প্রতি অর্থাৎ তোমার আবৃত্তির প্রতি কান পাতে তখন তারা কি কারণে অর্থাৎ বিদ্রূপ করার জন্য যে কান পাতে তা আমি ভালো জানি এবং জানি যখন তারা গোপন সলাপরামর্শ করে পরস্পরে গোপন কানাকানি করে অর্থাৎ আলোচনা করে এবং সীমালঙ্ঘনকারীরা তাদের কানাকানিতে বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির ধোঁকায় নিপতিত ও বুদ্ধি বিভ্রান্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। اِذْ يَقُوْلُ এটা পূর্ববর্তী اِذْ هُمْ نَجْوٰى-এর بَدَل বা স্থলবর্তী বাক্যাংশ। اِنْ এটা এ স্থানে না অর্থবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٨. قَالَ تَعَالٰى اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ بِالْمَسْحُوْرِ وَالْكَاهِنِ وَالشَّاعِرِ فَضَلُّوْا بِذٰلِكَ عَنِ الْهُدٰى فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَيْهِ .

৪৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয় জাদুগ্রস্ত, গণক, কবি ইত্যাদি কত কিছু বলে। ফলে তারা সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তারা তাঁর পথ পেতে সক্ষম হবে না। سَبِيْلًا পথ।

٤٩. وَقَالُوْا مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا .

৪৯. তারা অর্থাৎ যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হবো?

٥٠. قُلْ لَّهُمْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا .

৫০. তাদেরকে বল, তোমরা হয়ে যাও পাথর বা লৌহ–

٥١. اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ج يَعْظُمُ عَنْ قَبُوْلِ الْحَيٰوةِ فَضْلًا عَنِ الْعِظَامِ وَالرُّفَاتِ فَلَا بُدَّ مِنْ اِيْجَادِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ .

৫১. অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; অস্থিতে পরিণত বা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার কথা তো সহজ বরং এমন বস্তুও যদি হও যাতে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব তবুও তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার অবশ্যই করা হবে।

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُّعِيدُنَا ط إِلَى الْحَيٰوةِ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ج وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْبَدْءِ قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَةِ بَلْ هِيَ أَهْوَنُ فَسَيُنْغِضُونَ يُحَرِّكُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ تَعَجُّبًا وَيَقُولُونَ إِسْتِهْزَاءً مَتٰى هُوَ ط أَيِ الْبَعْثُ قُلْ عَسٰى أَنْ يَّكُونَ قَرِيْبًا ـ

তারা অচিরেই বলবে কে আমাদেরকে জীবন ফিরিয়ে দেবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না। যিনি শুরুতে অস্তিত্ব প্রদানের ক্ষমতা রাখেন তিনি তা পুনর্বার করতেও সক্ষম; বরং তা তো আরও সহজ। অতঃপর তারা বিস্মিত হয়ে তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে এবং বিদ্রূপ করে বলবে, তা পুনরুত্থান কবে? বল, সম্ভবত খুব শীঘ্রই হবে। اَلَّذِيْ فَطَرَكُمْ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। يُنْغِضُوْنَ নাড়বে।

৫২. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ يُنَادِيكُمْ مِنَ الْقُبُوْرِ عَلٰى لِسَانِ إِسْرَافِيْلَ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ فَتُجِيْبُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ بِحَمْدِهِ بِأَمْرِهِ وَقِيْلَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَتَظُنُّوْنَ إِنْ مَا لَبِثْتُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيْلًا لِهَوْلِ مَا تَرَوْنَ ـ

৫২. যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন অর্থাৎ ইসরাফীলের জবানি কবর থেকে তোমাদেরকে ডাক দেবেন এবং তোমরা তাঁর হামদসহ অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, "তাঁরই সকল প্রশংসা"– এ কথা বলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা এ দিনের বিভীষিকা দর্শনে মনে করবে যে দুনিয়ায় খুব অল্প কালই অবস্থান করেছিলে। إِنْ لَبِثْتُمْ এটা এ স্থানে না অর্থবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ : এখানে وَاوْ টি عَاطِفَه আর لَامْ হলো قَسَمِيَّه আর صَرَّفَ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে بَيَّنَّا এবং أَوْضَحْنَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ– وَلَقَدْ صَرَّفْنَا أَمْثَالًا

قَوْلُهُ سَاتِرًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَفْعُوْل টা فَاعِلْ অর্থে হয়েছে। কেননা পর্দা سَاتِرْ হয়ে থাকে مَسْتُوْر নয়।

قَوْلُهُ اَلْفَتْكَ : بِتَثْلِيْثِ الْفَاءِ اَلْقَتْلُ عَلَى الْغَفْلَةِ আচমকা বেখেয়ালীর অবস্থায় হত্যা করে দেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ اَنْ يَفْهَمُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ টা হলো মাসদারিয়া ; تَفْسِيْرِيَّه নয়। مِنْ اَنْ يَفْهَمُوْا -এর মধ্যে مِنْ বৃদ্ধি করেছেন যে, اَنْ يَفْقَهُوْهُ টা উহ্য مِنْ -এর সাথে اَكِنَّةً -এর সেলাহ হয়েছে। আর اَكِنَّةً টা مَنْع -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটা নয় যে, اَنْ يَفْقَهُوْهُ টা مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে যে, উহ্য মুযাফের প্রয়োজন হবে এবং উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, كَرَاهَةَ اَنْ يَفْقَهُوْهُ

قَوْلُهُ وَحْدَهٗ : এটা মাসদার حَالْ -এর স্থানে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ نُفُوْرًا : এটা মাসদার وَلَّوْا -এর مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

قَوْلُهُ إِذْ يَسْتَمِعُونَ الخ : إِذْ يَسْتَمِعُونَ এবং إِذْ هُمْ نَجْوٰى এ উভয়টি أَعْلَمُ এর- ظَرْف হয়েছে

قَوْلُهُ قِرَاءَتَكَ : এখানে মুযাফ উহ্য মেনে বলে দিয়েছেন যে, إِسْتِمَاعٌ-এর মাফউল কেরাত উহ্য রয়েছে। কেননা ذَاتٌ-এর শ্রবণ করা অসম্ভব এবং ذَاتٌ শ্রবণের বস্তুও নয়।

قَوْلُهُ مَخْدُوعًا : অর্থাৎ مَسْحُورًا অর্থাৎ এমন জাদুগ্রস্ত যে, জাদুর কারণে তার জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে

قَوْلُهُ رُفَاتًا : رُفَاتٌ সেই বস্তুকে বলা হয় যা শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يُنْغِضُونَ : এটা বাবে إِنْفَعَالٌ-এর إِنْغَاضٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ-এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ-এর সীগাহ, অর্থ- তারা মাথা নাড়ায়, আন্দোলিত করে। আর বাবে نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে نَغْضٌ মাসদার অর্থ- উপর থেকে নিচের দিকে মাথা নাড়ানো

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাওহীদের প্রতি ঈমান। আর আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতি তাগিদ এবং শিরকের বাতুলতার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا অর্থাৎ কাফের মুশরিকরা যেন তাওহীদের সত্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তারা বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী হয় এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে এজন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বারবার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কিছুতেই তাদের কিছু হয় না, তারা সঠিক পথে আসে না, তাদের বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, দৌরাত্ম্য এবং ধৃষ্টতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, এই কুরআনে আমি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ নসিহত এবং সারগর্ভ উপদেশ, বিধি-নিষেধ, দৃষ্টান্ত, যুক্তি-প্রমাণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে করে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং সরল সঠিক পথ অবলম্বন করে। অথবা এর অর্থ হলো, এ আয়াতসমূহে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমি পবিত্র কুরআনে বারবার বিভিন্নভাবে এজন্যে বর্ণনা করেছি যেন লোকেরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং জীবন-সাধনায় সঠিক পথ অবলম্বন করে। অথবা এর অর্থ হলো, ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের কন্যা না হওয়ার কথা আমি পবিত্র কুরআনে বারবার ঘোষণা করেছি, যেন তারা আল্লাহ পাকের শানে এমন আপত্তিকর বেআদবিপূর্ণ কথা না বলে এবং পবিত্র কুআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে। কিন্তু তারা সঠিক পথে আসে না, তাদের গোমরাহি এবং ধৃষ্টতা বেড়েই চলেছে।

قَوْلُهُ إِذًا لَّا بْتَغَوْا : আয়াতে তাওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমস্ত সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ না হন; বরং তাঁর আল্লাহতে অন্যরাও শরিক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালামশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ : ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তাসবীহ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান- সবারই জানা। কাফের মানব ও জিন বাহ্যত তাসবীহ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তাসবীহ পাঠ করার অর্থ কি? কোনো কোনো আলিম বলেন, তাদের তাসবীহ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তাসবীহ। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোনো বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তাসবীহ।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তাসবীহ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তা'আলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তাসবীহ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যত আল্লাহর অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে; যেমন- বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তাসবীহ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কুরআন পাকের وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তাসবীহ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তাসবীহ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তাসবীহ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়- সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে। -[কুরতুবী]

হাদীসে একটি মোজেজা উল্লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের তালুতে কঙ্করের তাসবীহ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মোজেজা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে-কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, কঙ্করসমূহের তাসবীহ পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা নয়। তারা তো যেখানে থাকে, সেখানেই তাসবীহ পাঠ করে; বরং মোজেজা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তাসবীহ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণত সূরা সাদে হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে- إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তাসবীহ পাঠ করে। সূরা বাকারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে- وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا অর্থাৎ এরা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এ কুফরি বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তাসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এক পাহাড় অন্য পাহাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে- এমন কোনো বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতটি পাঠ করেন- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا অতঃপর বলেন, এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় কুফরি বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর জিকির শোনে না এবং তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? -[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো জিন, মানব, পাথর ও ঢিলা এমন নেই যে মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়। -[মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ]

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহের শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে খানা খেলে খাদ্যের তাসবীহের শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি মক্কার ঐ পাথরটিকে চিনি, যে নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ বলেন, এই পাথরটি হচ্ছে "হাজরে-আসওয়াদ।"

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ বিষয়াবলি সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। হান্নানা স্তম্ভের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিম্বর তৈরি হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একে ছেড়ে মিম্বরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কান্নার শব্দ সাহাবায়ে কেরামও শুনেছিলেন।

এসব রেওয়ায়েত দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু সত্যিকারভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই তাসবীহ বিদ্যমান আছে; এমনকি দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তাসবীহ আছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, তাসবীহের অর্থ অবস্থাগত তাসবীহ হলে উপরিউক্ত আয়াতে হযরত দাউদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাগত তাসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ প্রত্যেক বস্তু থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তাসবীহ। খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কঙ্করদের তাসবীহ পাঠে মোজেজা ছিল না। ওরা তো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তাসবীহ পাঠ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তাসবীহ এমন শব্দময় হয়ে উঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়। এমনিভাবে পাহাড়সমূহের তাসবীহ পাঠও হযরত দাউদ (আ.)-এর মোজেজা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মোজেজায় ঐ তাসবীহ কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا الخ : পয়গাম্বরের উপর জাদুর ক্রিয়া হতে পারে : পয়গাম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ও ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর জাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা জাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরও জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে জাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কুরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে– জাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কুরআন তা'ই খণ্ড করেছে। অতএব জাদুর হাদীসটি এ আয়াতের পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে যখন সূরা লাহাব নাজিল হয়, যাতে আবূ লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভালো হয়। কারণ সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন, না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল– আপনার সঙ্গী আমার 'হিজু' [কবিতার মাধ্যমে নিন্দা] করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, সে কি আপনাকে দেখেনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

قَوْلُهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ : يَدْعُوْ শব্দটি دُعَاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর। –[কুরতুবী]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভালো নাম রাখবে। [অর্থহীন নাম রাখবে না।]

হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে : فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ . اِسْتِجَابَتٌ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে।

بِحَمْدِهِ অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মু'মিন ও কাফের সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহলে কাফেরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তাফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (র.) বলেন, কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। –[কুরতুবী]

কেননা তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোনো কোনো তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মু'মিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে- يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا হায় আফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে! অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে- يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ হায় আফসোস, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তাফসীরের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মু'মিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াত রয়েছে- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ। অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলি উচ্চারিত হবে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে- وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

قَوْلُهُ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং নবুয়তের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত সম্পর্কে কাফেরদের যে সন্দেহ ছিল তা খণ্ডন করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২০, পৃ. ২২৪]

কাফেরদের কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যে আমরা যখন মৃত্যুর পরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব তখন কিভাবে আমাদের পুনরুত্থান হবে? আল্লাহ পাক তাদের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর যখন তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করবেন যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর এ কাজ তাঁর জন্যে অত্যন্ত সহজ। আল্লামা ওসমানী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার করত তন্মধ্যে একটি কথা হলো এই যে, মানুষের মৃত্যুর পর সে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং ধীরে ধীরে সবই শেষ হয়ে যায়। এমনকি অস্থি পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। অথচ ইনি দাবি করেন যে, তোমরা নতুন জীবন লাভ করবে এবং তোমাদের পুনরুত্থান হবে। এমন আজগুবি কথা যে বলে তাকে পয়গাম্বর কি করে মেনে নেওয়া যায়? কাফেরদের এসব কথার উত্তরই দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৩১৭]

ইরশাদ হয়েছে- قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا। অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও অথবা তোমরা যা তার চেয়েও কঠিন মনে কর তা হয়ে যাও অর্থাৎ তোমরা যদি জীবনী শক্তি বঞ্চিত লৌহ বা পাথরে পরিণত হও তবুও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাঁর মহান দরবারে হাজির করবেন। সূরা জুমু'আয় কিভাবে এ সত্যকে ঘোষণা করা হয়েছে তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে-.....قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ অর্থাৎ [হে রসূল!] আপনি বলুন নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ সে মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করবে। এরপর তোমাদেরকে হাজির করা হবে সেই মহান সত্তার দরবারে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

অনুবাদ :

٥٣. وَقُلْ لِعِبَادِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ يَقُوْلُوا لِلْكُفَّارِ الْكَلِمَةَ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ يُفْسِدُ بَيْنَهُمْ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيْنًا بَيِّنَ الْعَدَاوَةِ .

৫৩. আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন কাফেরদেরকে এমন কথা বলে যা উত্তম. শয়তান অবশ্য তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উসকানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তার শত্রুতা সুস্পষ্ট। يَنْزَغُ বিশৃঙ্খলার উসকানি দেয়।

٥٤. وَالْكَلِمَةُ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ هِيَ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْاِيْمَانِ اَوْ اِنْ يَّشَاْ تَعْذِيْبَكُمْ يُعَذِّبْكُمْ ط بِالْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا فَتَجْبُرُهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

৫৪. সেই উত্তম কথাটি হলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে তওবা ও ঈমান গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। আর তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করলে কুফরি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে শাস্তি প্রদান করবেন। আর আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি যে, ঈমান গ্রহণের জন্য তুমি তাদেরকে বাধ্য করবে। এটা জেহাদ সংক্রান্ত বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল।

٥٥. وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط فَيَخُصُّهُمْ بِمَا شَاءَ عَلٰى قَدْرِ اَحْوَالِهِمْ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ بِتَخْصِيْصِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِفَضِيْلَةٍ كَمُوْسٰى بِالْكَلَامِ وَاِبْرَاهِيْمَ بِالْخُلَّةِ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالْاِسْرَاءِ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا .

৫৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কারা আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন। সুতরাং তাদের অবস্থানুসারে তিনি যা দ্বারা ইচ্ছা তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। আমি তো নবীগণের কতককে বিশেষ কোনো মর্যাদায় বিভূষিত করে যেমন হযরত মূসাকে কালাম বা আল্লাহর সাথে কথোপকথন দ্বারা; হযরত ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করত, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ইসরা ও মি'রাজের মর্যাদা দিয়ে অপর কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি। আর দাউদকে দিয়েছি যাবূর।

٥٦. قُلْ لَهُمْ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ اٰلِهَةٌ مِّنْ دُوْنِهٖ كَالْمَلَائِكَةِ وَعِيْسٰى وَعُزَيْرٍ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا لَهٗ اِلٰى غَيْرِكُمْ .

৫৬. এদেরকে বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইলাহ বলে ধারণা কর তাদেরকে যেমন ফেরেশতা, ঈসা, উযায়র প্রভৃতিকে আহ্বান কর। অনন্তর তোমাদের দুঃখ দূর করার বা অন্য কারো দিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই।

৫৭. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ هُمْ آلِهَةً يَبْتَغُونَ يَطْلُبُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ الْقُرْبَةَ بِالطَّاعَةِ أَيُّهُمْ بَدَلٌ مِنْ وَاوِ يَبْتَغُونَ أَيْ يَبْتَغِيهَا الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط كَغَيْرِهِمْ فَكَيْفَ يَدْعُونَهُمْ آلِهَةً إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا .

৫৭. তারা যাদেরকে ইলাহ বলে আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা তাঁর নিকটতর তারাই তো আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। সুতরাং অন্যদের অবস্থা আর কি হতে পারে? আর তারা অন্যান্যদের মতোই তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে সুতরাং এদেরকে তারা কেমন করে ইলাহ হিসেবে আহ্বান করে? নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। أَيُّهُمْ এটা يَبْتَغُونَ -এর وَاوْ [বহুবচন বাচক সর্বনাম]-এর بَدَل বা স্থলবর্তী বাক্য। অর্থাৎ তারাই তা অন্বেষণ করে যারা নিকটতর।

৫৮. وَإِنْ مَا مِنْ قَرْيَةٍ أُرِيدَ أَهْلُهَا إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ بِالْمَوْتِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ط بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَسْطُورًا مَكْتُوبًا .

৫৮. এমন কোনো জনপদ নেই অর্থাৎ জনপদবাসী নেই যা আমি কিয়ামত দিনের পূর্বে মৃত্যু দিয়ে ধ্বংস করব না বা যাকে হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা অবশ্যই কিতাবে লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। إِنْ مَا এই إِنْ টি এ স্থানে না-অর্থবোধক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَسْطُورًا -লিপিবদ্ধ।

৫৯. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْأٰيٰتِ الَّتِي اقْتَرَحَهَا أَهْلُ مَكَّةَ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ط لِمَا أَرْسَلْنَاهَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَلَوْ أَرْسَلْنَاهَا إِلَىٰ هٰؤُلَاءِ لَكَذَّبُوا بِهَا وَاسْتَحَقُّوا الْإِهْلَاكَ وَقَدْ حَكَمْنَا بِإِمْهَالِهِمْ لِإِتْمَامِ أَمْرِ مُحَمَّدٍ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ آيَةً مُبْصِرَةً بَيِّنَةً وَاضِحَةً فَظَلَمُوا كَفَرُوا بِهَا فَأُهْلِكُوا وَمَا نُرْسِلُ بِالْأٰيٰتِ الْمُعْجِزَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا لِلْعِبَادِ لِيُؤْمِنُوا .

৫৯. মক্কাবাসীরা যে নিদর্শনের তলব করে তা প্রেরণ করতে আমাকে এটা ব্যতীত অন্য কিছুই ফিরায় না যে পূর্ববর্তীগণ যখন আমি তা তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তখন তারা তা অস্বীকার করেছিল। অনন্তর তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এদের নিকটও যদি আমি তা প্রেরণ করি তবে তারাও তা অস্বীকার করে বসবে এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তবে মুহাম্মদ ﷺ-এর বিষয় পূর্ণ করার জন্য এদেরকে অবকাশ প্রদানের ফয়সালা দিয়েছি। স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ আমি ছামূদের নিকট উষ্ট্রী প্রেরণ করেছিলাম; অনন্তর তারা তার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাকে অস্বীকার করেছিল; অনন্তর তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন মোজেজা প্রেরণ করি। যাতে তারা ঈমান আনয়ন করে। مُبْصِرَةً - সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

٦٠. وَ اذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ط عِلْمًا وَقُدْرَةً فَهُمْ فِيْ قَبْضَتِهِ فَبَلِّغْهُمْ وَلَا تَخَفْ اَحَدًا فَهُوَ يَعْصِمُكَ مِنْهُمْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ عِيَانًا لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ اَهْلِ مَكَّةَ اِذْ كَذَّبُوْا بِهَا وَارْتَدَّ بَعْضُهُمْ لِمَا اَخْبَرَهُمْ بِهَا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ط وَهِيَ الزَّقُّوْمُ الَّتِيْ تَنْبُتُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لَّهُمْ اِذْ قَالُوْا النَّارُ تُحْرِقُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تُنْبِتُهُ وَنُخَوِّفُهُمْ بِهَا فَمَا يَزِيْدُهُمْ تَخْوِيْفُنَا اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا .

৬০. এবং স্মরণ কর আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায় মানুষকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন সকল কিছুই তাঁর মুষ্টির ভিতর, এদেরকে আমার কথা পৌঁছাতে থাকুন। কাউকেও আপনি ভয় করবেন না। তিনি আপনাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন। ইসরা ও মি'রাজ রজনীতে প্রত্যক্ষভাবে তোমাকে যে দৃশ্য আমি দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের অর্থাৎ মক্কাবাসীদের পরীক্ষার জন্য। রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন তখন অনেকেই তা অস্বীকার করেছিল এবং ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আর কুরআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের উল্লেখ রয়েছে তাও তা হলো যাক্কুম নামক একপ্রকার বৃক্ষ। এটা জাহান্নামের তলদেশে উদ্‌গমিত হয়। এটাও তাদের পরীক্ষার জন্য ছিল। তারা বলেছিল, আগুন তো বৃক্ষ জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং তাতে বৃক্ষ উদ্‌গম হবে কেমন করে? আমি এটা দ্বারা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু তা অর্থাৎ আমার ভীতি প্রদর্শন কেবল তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْكَلِمَةُ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ : اَلَّتِيْ হলো اِسْمِ مَوْصُوْل আর هِيَ হলো মুবতাদা, আর اَحْسَنُ হলো তার খবর। مُبْتَدَأ এবং خَبَرْ মিলে জুমলা হয়ে সেলাহ হয়েছে। صِلَةٌ এবং مَوْصُوْل মিলে صِفَتْ হয়েছে উহ্য اَلْكَلِمَةُ মাওসূফের। مَوْصُوْف এবং صِفَتْ মিলে مَقُوْلَهْ হয়েছে يَقُوْلُ-এর। মুফাসসির (র.) اَلْكَلِمَةُ উহ্য মেনে اَلَّتِيْ-কে تَانِيْث নেওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ هِيَ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ الخ : اَلْكَلِمَةُ اَلَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ হলো-এর তাফসীর। আর মধ্যবর্তী বাক্য হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ কাজেই مُفَسَّرْ এবং مُفَسِّرْ-এর মাঝে পার্থক্যের আপত্তির নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِمَا شَاءَ : অর্থাৎ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا : এতে এ কথার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফজিলত এ কারণে যে, তাঁর উপর ওহির মাধ্যমে যাবূর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাঁর রাজত্ব ও সম্পদের কারণে নয়।

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الخ : এখানে اُولٰٓئِكَ হলো اِسْمِ اِشَارَهْ مَوْصُوْف আর اَلَّذِيْنَ হলো اِسْمِ مَوْصُوْل আর يَدْعُوْنَ হলো ফে'ল ও ফায়েল هُمْ যমীর হলো সেলাহ উহ্য মাফঊল। আর اٰلِهَةً টা هُمْ থেকে تَمْيِيْز এখন يَدْعُوْنَ ফে'ল তার ফায়েল এবং মাফঊলের সাথে মিলে সেলাহ। مَوْصُوْل এবং صِلَةٌ মিলে জুমলা হয়ে اُولٰٓئِكَ মাওসূফের সিফত। مَوْصُوْف এবং صِفَتْ মিলে مُبْتَدَأْ আর يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ জুমলা হয়ে مُبْتَدَأْ-এর خَبَرْ হয়েছে।

দ্বিতীয় তারকীব : أُولَٰئِكَ হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ ও بَدَلٌ হলো الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ আর مُبْدَلٌ مِنْهُ এখন بَدَلٌ মিলে মুবতাদা আর يَبْتَغُوْنَ জুমলা হয়ে তার খবর।

قَوْلُهُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ : এটা মুবতাদা ও খবর। আবার এটাও বৈধ রয়েছে যে, أَيُّهُمْ টা يَبْتَغُوْنَ -এর যমীর থেকে بَدَلٌ হবে অর্থাৎ يَبْتَغِىْ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ تَعَالَى الْوَسِيْلَةَ فَكَيْفَ مَنْ دُوْنَهُ আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ তারকীবই পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهُ مُبْصِرَةً : مُبْصِرَةً টা উহ্য أَيَةً মাওসূফের সিফত اَلنَّاقَةَ -এর নয়। কাজেই মওসূফ ও সিফতের মধ্যে عَدَمُ مُطَابَقَتْ-এর আপত্তির নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ عِيَانًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رُؤْيَا অর্থ رُؤْيَتْ بَصَرِىْ

قَوْلُهُ الشَّجَرَةُ : এর আতফ হয়েছে اَلرُّؤْيَا -এর উপর– আমি উভয়কে পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি।

قَوْلُهُ اَلشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ : এতে مَجَازٌ হয়েছে। অর্থাৎ ভর্ৎসনা গাছের উপর হয়নি; বরং গাছ থেকে ভক্ষণকারীর উপর হয়েছে। কেননা গাছের উপর ভর্ৎসনার কোনো অর্থই হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقُلْ لِعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ এবং কিয়ামতের সত্যতার দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যদি কাফের মুশরিকদের সাথে বিতর্কের প্রয়োজন হয় তবে বিনম্র ভাষায় যেন তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩২৫]

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عِبَادٌ শব্দ দ্বারা মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে মুমিনদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ.... [অতএব, সুসংবাদ দিন আমার সেই বান্দাদেরকে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করতে চায়।]

আরও ইরশাদ হয়েছে– فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ [অতএব, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও।] যেহেতু ইতঃপূর্বে শিরকের বাতুলতা এবং তাওহীদের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনের বাস্তবতার কথাও দলিল-প্রমাণ সহ ইরশাদ হয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সঙ্গে যেন বিনম্র ভাষায় কথা বলা হয়, তাদেরকে যেন গালি না দেওয়া হয় এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে যেন তাদের সাথে কথা বলা হয়। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২০, পৃ. ২২৮]

শানে নুযূল : কালবী (র.) বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা যখন মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করে তখন মুসলমানগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাজিল হয় হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে। জনৈক কাফের তাকে গালি দিয়েছিল তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন এ আয়াতের মাধ্যমে। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৮৪ - ৮৫]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলে দিন যেন তারা পরস্পর কথা বলার সময় বিনম্র ভাষা ব্যবহার করে, তা না হলে শয়তান পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে দেবে এবং কলহ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে, শয়তান সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এজন্যে হাদীস শরীফে কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উঠিয়ে ইশারা করাকেও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শয়তান তাতে আঘাত করিয়ে দিতে পারে। পরিণামে সে জাহান্নামি হয়ে যেতে পারে। –[মুসনাদে আহমদ]

হুজুর পাক ﷺ একটি সমাবেশে ইরশাদ করেন, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে এবং একে অন্যকে বিরক্ত না করে। আর কেউ যেন কাউকে অপমান না করে। এরপর তিনি তাঁর বক্ষ মোবারকের প্রতি ইশারা করেন, "তাকওয়া এখানে।" যে দু ব্যক্তির মধ্যে দীনি মহব্বত গড়ে উঠে এবং পরে তা ছিন্ন হয়ে যায়, সেই বিচ্ছিন্নতার কথা যে ব্যক্তি আলোচনা করে সে অত্যন্ত মন্দ এবং নেহায়েত বদ ও দুষ্ট। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] : পারা ১৫, পৃ. ৫১]

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয় : প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

که بے حکم شرع آب خوردن خطاست
وگر خون بفتوی بریزی رواست

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শানশওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়, তাই এর অনুমতি রয়েছে গালিগালাজ ও কটুকথা দ্বারা কোনো দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা ছিল এই- জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন। ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এ আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا : এখানে বিশেষভাবে যাবূরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, যাবূর গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কুরআনে বলা হয়েছে- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ বর্তমান প্রচলিত যাবূরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। -[তাফসীরে হক্কানী]

ইমাম বগভী (র.) স্বীয় তাফসীরে এ স্থানে লিখেন, যাবূর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশো পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরজ কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

قَوْلُهُ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ : وَسِيْلَة শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পৌঁছার উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর জন্য অসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরিয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

قَوْلُهُ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ : হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা- মানুষের এ দুটি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোনো একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ : অর্থাৎ শবে মি'রাজে যে দৃশ্যাবলি আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফিতনা ছিল। আরবি ভাষায় 'ফিতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ তাফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ গোমরাহি। এর এক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়শা, সুফিয়া হাসান, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফিতনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শবে মি'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যূষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোনো কোনো অপক্ব নওমুসলিম এ কথাকে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল। -[তাফসীরে কুরতুবী]

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رُؤْيَا শব্দটি আরবি ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্সা বুঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বুঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। এ কারণেই অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাকেই আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

অনুবাদ :

٦١. وَ اذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا نَصَبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَىْ مِنْ طِيْنٍ .

৬১. এবং স্মরণ কর যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি সিজদা কর অর্থাৎ নত হয়ে অভিবাদনমূলক সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে বলল, যাকে আপনি কর্দম হতে সৃষ্টি করেছেন আমি কি তাকে সিজদা করব? طِيْنًا এটা بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ এর কাসরা দানকারী অক্ষর [এ স্থানে [مِنْ] প্রত্যাহারের ফলে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল مِنْ طِيْنٍ

٦٢. قَالَ اَرَءَيْتَكَ اَىْ اَخْبِرْنِىْ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ فَضَّلْتَ عَلَىَّ بِالْاَمْرِ بِالسُّجُوْدِ لَهٗ وَاِنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَارٍ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ لَاَسْتَاْصِلَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ بِالْاَغْوَاءِ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ مِمَّنْ عَصَمْتَهٗ .

৬২. সে বলেছিল, লক্ষ্য করুন আমাকে অবহিত করুন এটা সেই জন যাকে আপনি সেজদা করার নির্দেশ দান করত আমার উপর সম্মানিত করলেন মর্যাদা দিলেন। অথচ আমি এটা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা আমাকে আপনি অগ্নি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তবে আমি তাদের অল্প কতক জন ব্যতীত যাদেরকে আপনি রক্ষা করবেন তারা ব্যতীত তার বংশধরকে অসৎ কার্যে প্ররোচিত করে সমূলে শেষ করে দেব। لَئِنْ-এর لَامْ টি قَسْمِيَّةٌ বা শপথব্যঞ্জক। لَاَحْتَنِكَنَّ নিশ্চয় সমূলে উৎপাটিত করে দেব।

٦٣. قَالَ تَعَالٰى لَهٗ اِذْهَبْ مَنْظَرًا اِلٰى وَقْتِ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ اَنْتَ وَهُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا وَافِرًا كَامِلًا .

৬৩. তাকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, যাও প্রথম শিঙ্গা ফুৎকার পর্যন্ত অবকাশ প্রদত্ত হলো যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামই হবে তোমাদের অর্থাৎ তোমার ও তাদের পরিপূর্ণ শাস্তি। مَوْفُوْرًا পরিপূর্ণ, যথাযথ।

٦٤. وَاسْتَفْزِزْ اسْتَخِفَّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ بِدُعَائِكَ بِالْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيْرِ وَكُلِّ دَاعٍ اِلَى الْمَعْصِيَةِ وَاجْلِبْ صِحْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَهُمُ الرُّكَّابُ وَالْمُشَاةُ فِى الْمَعَاصِىْ .

৬৪. তোমার আওয়াজে অর্থাৎ গানবাদ্য ও পাপকার্যের দিকে আহ্বানকারী বিষয়সমূহের মাধ্যমে আহ্বান করার দ্বারা তাদের মধ্য যাকে পার প্রতারণা কর, তোমার পাপকার্যের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে ডাক দাও।

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ كَالرِّبٰوا وَالْغَصْبِ وَالْأَوْلَادِ مِنَ الزِّنَا وَعِدْهُمْ بِأَنْ لَّا بَعْثَ وَلَا جَزَاءَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ بِذٰلِكَ اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا ـ

এবং তাদের ধনে অর্থাৎ হারাম সম্পদে যেমন– সুদ, অপহরণ ইত্যাদিতে এবং ব্যভিচারজাত সন্তানসন্ততিতে শরিক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও যে পুনরুত্থানও হবে না, কোনোরূপ প্রতিফলেরও সম্মুখীন হতে হবে না। শয়তান তাদেরকে এভাবে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো মাত্র ছলনা। নিস্ফল। اِسْتَفْزِزْ এ স্থানে অর্থ প্রতারণা কর। اَجْلِبْ এ স্থানে মর্ম চিৎকার করে ডাক। خَيْل অশ্বারোহী। رَجِلٌ পদাতিক।

٦٥. اِنَّ عِبَادِي الْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط تَسَلُّطٌ وَقُوَّةٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا حَافِظًا لَهُمْ مِنْكَ ـ

৬৫. আমার মু'মিন বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা শক্তি ও দাপট চলবে না। কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোমার চক্রান্ত থেকে রক্ষাকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

٦٦. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي يُجْرِي لَكُمُ الْفُلْكَ السُّفُنَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ط تَعَالٰى بِالتِّجَارَةِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا فِيْ تَسْخِيْرِهَا لَكُمْ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ الشِّدَّةُ فِي الْبَحْرِ خَوْفَ الْغَرَقِ ضَلَّ غَابَ عَنْكُمْ مَنْ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاٰلِهَةِ فَلَا تَدْعُوْنَهُ اِلَّا اِيَّاهُ ج تَعَالٰى فَاِنَّكُمْ تَدْعُوْنَهُ وَحْدَهُ لِاَنَّكُمْ فِيْ شِدَّةٍ لَا يَكْشِفُهَا اِلَّا هُوَ ـ

৬৬. তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান নৌকাসমূহ পরিচালিত করেন। যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাঁর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার তা তোমাদের বাধ্যগত করে দেওয়ায় নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। يُزْجِيْ - প্রবাহিত করেন, পরিচালিত করেন। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ অর্থাৎ নিমজ্জনের ভয় স্পর্শ করে তখন হারিয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের [মন] থেকে সরিয়ে যায় তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর অর্থাৎ ইলাহ্ হিসেবে উপাসনা কর তারা। এ সময় আর এদের তোমরা আহ্বান কর না। এ বিপদে নিপতিত হয়ে কেবল আল্লাহকেই তখন তোমরা ডাক। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরিত করার নেই।

٦٧. فَلَمَّا نَجّٰكُمْ مِنَ الْغَرَقِ وَاَوْصَلَكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ عَنِ التَّوْحِيْدِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا جُحُوْدًا لِلنِّعَمِ ـ

৬৭. অনন্তর তিনি যখন তোমাদেরকে নিমজ্জন থেকে উদ্ধার করেন এবং পৌছিয়ে দেন স্থলে তখন তোমরা তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। اَلضُّرُّ কষ্ট, বিপদ। كَفُوْرًا - অতিশয় নিয়ামত অস্বীকারকারী।

٦٨. اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَيِ الْاَرْضِ كَقَارُوْنَ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اَيْ يَرْمِيْكُمْ بِالْحَصْبَاءِ كَقَوْمِ لُوْطٍ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا حَافِظًا مِنْهُ ـ

৬৮. তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেলে যে, কারূনের মতো তোমাদেরকেও তিনি মাটিতে ভূগর্ভে দাবিয়ে দেবেন না ব লূত সম্প্রদায়ের মতো তোমাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন না? তোমাদেরকে কঙ্কর ছুড়ে মারবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোনো কর্মবিধায়ক অর্থাৎ তা থেকে রক্ষাকারী পাবে না।

٦٩. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيْهِ أَيْ الْبَحْرِ تَارَةً مَرَّةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيْحِ أَيْ رِيْحًا شَدِيْدَةً لَا تَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا قَصَفَتْهُ فَتَكْسِرُ فُلْكَكُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ بِكُفْرِكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا نَصِيْرًا أَوْ تَابِعًا يُطَالِبُنَا بِمَا فَعَلْنَا بِكُمْ.

৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে তিনি তোমাদেরকে তাতে অর্থাৎ সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না অনন্তর তা তোমাদের নৌযানসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। অনন্তর তোমাদের কুফরি করার দরুন তোমাদেরকে তিনি নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না। বা এর অর্থ হলো তোমাদের পরবর্তী এমন কেউ থাকবে না যে তোমাদের সাথে আমার আচরণ সম্পর্কে আমাকে কৈফিত চাইতে পারে। تَارَةً أُخْرَى আরেকবার। قَاصِفًا مِنَ الرِّيْحِ কুজঝটিকা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাই ভেঙ্গেচুরে একাকার করে ফেলে। بِمَا كَفَرْتُمْ-এ স্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎস অর্থব্যঞ্জক। تَبِيْعًا অর্থ সাহায্যকারী, অনুসরণকারী।

٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا فَضَّلْنَا بَنِيْ آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالنُّطْقِ وَاعْتِدَالِ الْخَلْقِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمِنْهُ طَهَارَتُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَحْرِ عَلَى السُّفُنِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا كَالْبَهَائِمِ وَالْوُحُوْشِ تَفْضِيْلًا فَمَنْ بِمَعْنٰى مَا أَوْ عَلٰى بَابِهَا وَتَشْمُلُ الْمَلٰئِكَةَ وَالْمُرَادُ تَفْضِيْلُ الْجِنْسِ وَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيْلُ أَفْرَادِهِ إِذْهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْبَشَرِ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ.

৭০. নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি অর্থাৎ জ্ঞান, ভাষা, সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি। মৃত্যুর পর তাদের [মু'মিনদের লাশ] পবিত্র হওয়ার বিধানও এর অন্যতম, স্থলে বহনকারীপ্রাণীর মাধ্যমে ও সমুদ্রে জলযানসমূহের মাধ্যমে আমি তাদের চলাচলের বাহনের ব্যবস্থা করেছি; তাদেরকে পবিত্র জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি সে সমস্তের অনেক কিছুর উপর যেমন– পশু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির উপর নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। ফেরেশতাগণের উপরও এ শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। এ স্থানে শ্রেষ্ঠত্ব বলতে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এতে প্রত্যেক সদস্যের শ্রেষ্ঠ হওয়া বুঝায় না। ফেরেশতাগণ নবীগণ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। مِمَّنْ خَلَقْنَا - এ স্থানে مَنْ শব্দটি مَا অর্থে বা এর নিজস্ব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَخْبِرْنِيْ : اَرَأَيْتَكَ-এর كَافٌ টি خِطَابٌ-এর জন্য হয়েছে, এটা اِسْمٌ নয়। বরং فَاعِلٌ مُخَاطَبٌ-এর اِسْنَادٌ-এর تَاكِيْد-এর হয়েছে। কাজেই এর কোনো مَحَلِّ اِعْرَابٌ নেই। আর هٰذَا টা اَرَأَيْتَكَ-এর প্রথম মাফউল আর اَلَّذِيْ كَرَّمْتَ হলো هٰذَا - এর সিফত, আর اَرَأَيْتَكَ-এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা হলো لِمَ كَرَّمْتَ عَلَيَّ এই উহ্যের উপর সিফত দালালত করতেছে।

قَوْلُهُ فَضَّلْتَ : প্রশ্ন. كَرَّمْتَ -এর তাফসীর فَضَّلْتَ দ্বারা কেন করা হলো?

উত্তর. কেননা تَكْرِيْم -এর সেলাহ عَلٰى হয় না।

قَوْلُهُ مُنْظَرًا : অর্থাৎ مُهْمَلًا এখানে اِذْهَبْ টা ذِهَابٌ থেকে নয় যা اَلْمَجِيْئُ -এর বিপরীত; বরং এর অর্থ হলো- اِمْضِ لِشَانِكَ الَّذِى اخْتَرْتَهٗ অর্থাৎ তুমি যা করার ইচ্ছা করেছ তা করে ফেল।

قَوْلُهُ اَنْتَ وَهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, مِنْهُمْ -এর মধ্যে هُمْ হলো غَائِبٌ -এর বহুবচনের যমীর আর جَزَائُكُمْ -এর মধ্যে كُمْ হলো حَاضِرٌ -এর বহুবচনের যমীর। কাজেই উভয়টির মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, মূলে ছিল– اِنَّ جَهَنَّمَ جَزَائُكَ وَجَزَائُهُمْ এরপর مُخَاطَبٌ কে- غَائِبٌ -এর উপর প্রাধান্য দিয়ে দিয়েছে। কাজেই উভয় যমীরের مُخَالَفَتْ -এর আপত্তির নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اِسْتَفْزِزْ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ হতে اَمْر এর- وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ– তুমি ঘাবড়ে যাও, হতবুদ্ধি হয়ে যাও।

قَوْلُهُ لَاَحْتَنِكَنَّ : এ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِحْتِنَاكٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ بَانُوْنِ تَاكِيْدِ ثَقِيْلَةٌ এর- وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ– অবশ্যই আমি তোমাকে আমার আয়ত্তে নিয়ে নেব। অবশ্যই আমি তোমাকে লাগাম লাগিয়ে দেব।

قَوْلُهُ لَاَسْتَاْصِلَنَّ : অর্থ– আমি পরিপূর্ণভাবে মূলোৎপাটন করব, মূল থেকে উপড়ে ফেলব।

قَوْلُهُ اَوْصَلَكُمْ : প্রশ্ন. نَجَّاكُمْ -এর তাফসীর اَوْصَلَكُمْ দ্বারা কেন করা হলো?

উত্তর. যেহেতু تُنْجِيْكُمْ -এর সেলাহ اِلٰى আসে না আর এখানে সেলাহ اِلٰى হয়েছে যা বৈধ নয়, যার কারণ বলে দিয়েছেন যে, تُنْجِيْكُمْ টা اَوْصَلَكُمْ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার সেলাহ اِلٰى আসে।

قَوْلُهُ بِكُفْرِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِمَا كَفَرْتُمْ -এর মধ্যে مَا টা مَصْدَرِيَّةٌ হয়েছে, কাজেই عَدَمْ عَائِدْ -এর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

قَوْلُهُ اِعْتِدَالُ الْخَلْقِ : এবং اِعْتِدَالٌ -এরই কথা সেটা যেটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি মাথা নিচু করে আহার গ্রহণ করে কিন্তু মানুষ মাথা নিচু করার পরিবর্তে আহারকে মুখের দিকে উত্তোলন করে থাকে।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ تَفْضِيْلُ الْجِنْسِ : এই বৃদ্ধিকরণ একটি প্রশ্নের জবাবে হয়েছে।

প্রশ্ন. আমরা এটা মানি না যে, সকল আদম সন্তান সকল ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম?

উত্তর. এখানে جِنْس بَنِىْ اٰدَمْ -এর উপর جِنْس مَلَائِكَةٌ - এর শ্রেষ্ঠ বুঝানো উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বিশেষ ফেরেশতাগণ সাধারণ মানুষ থেকে উত্তম। বিশেষ মানুষ যেমন নবীগণ তাদের থেকে উত্তম নয়।

বি. দ্র. যদি عَلٰى كَثِيْرٍ শব্দটির প্রতি বিশেষভাবে গবেষণা করা হয় তবে উল্লিখিত প্রশ্নটিই উত্থাপিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের দৌরাত্ম্য, নাফরমানি, প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরোধিতা ও শত্রুতার উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত আদম (আ.) এবং ইবলিস শয়তানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পুরাতন দুশমন তাই তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না এবং তোমাদের নিকট আমার প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করো না। শয়তানের কাজই হলো মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক করা, মানুষকে পথভ্রষ্ট করা।

–[মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্ধলবী (র.) খ. ৪, পৃ. ৩৩৬]

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য ঘটনা দ্বারা এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া হলো ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করা হলো শয়তানের কাজ। এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করার লক্ষ্যেই হযরত আদম (আ.) ও ইবলিস শয়তানের ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

আর সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সেজদা কর তখন সঙ্গে সঙ্গে ইবলিস ব্যতীত সকলে সেজদা করেছে। ইবলিস বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। ইবলিস সেজদা করতে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে।

মানব সৃষ্টির ইতিকথা : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, সাইদ ইবনে যুবায়ের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, জমিন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়েছেন মিষ্টি এবং লবণাক্ত উভয় প্রকার, তা দ্বারা আদমের দেহ তৈরি করেছেন। যাকে মিষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সে ভাগ্যবান হয়েছে, এমনকি তার পিতামাতা কাফের হলেও। পক্ষান্তরে যাকে লবণাক্ত মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে সে হয়েছে ভাগ্যহত, এমনকি নবীর সন্তান হলেও।

আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী এবং হাকেম হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ পাক সমগ্র পৃথিবী থেকে এক মুঠো মাটি নিয়েছেন, তা থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদমের সন্তানগণ ঐ মাটি মোতাবেকই হয়েছে। বর্ণের দিক থেকে লাল, সাদা, কাল অথবা মাঝারী ধরনের। এমনিভাবে মেজাজের দিক থেকে বিনম্র, কঠোর, মন্দ এবং উত্তম। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৯৪ ; তাফসীরে তাবারী, খ. ১৫, পৃ. ৮০]

قَوْلُهُ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ : "সে বলেছে, এই তো সেই, যাকে আপনি আমার চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন।" অভিশপ্ত শয়তান দরবারে এলাহীতে মানুষের সাথে তার শত্রুতার কথা প্রকাশ করেছে। আদম সন্তানের প্রতি তার যে বিদ্বেষ রয়েছে তা প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। শুধু তাই নয়, বরং মানব জাতির সর্বনাশ সাধনের সংকল্পের কথাও সে বলেছে। আর এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদানের আবেদন পেশ করেছে।

لَاَحْتَنِكَنَّ . اِحْتِنَاكٌ শব্দের অর্থ– কোনো বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা।

قَوْلُهُ وَاسْتَفْزِزْ : اِسْتَفْزِزْ শব্দের আসল অর্থ– বিচ্ছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ بِصَوْتِكَ : صَوْتٌ শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং-তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনা হারাম। –[কুরতুবী]

ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা না করার সময় দুটি কথা বলেছিল। **প্রথম কথা**, আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোনো আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোনো কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন– আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট সকল বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের অঙ্গারে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরি বিবেচিত হয় না; বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবিই ছিল, তাও অবাস্তব নয়।

قَوْلُهُ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ : মানুষের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই যে, ধনসম্পদকে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধনসম্পদে শয়তানের শরিকানা। সন্তানসন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানা কয়েকভাবে হতে পারে। সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে তাদের লালনপালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? সর্বশেষ আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক. এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলি ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? দুই. অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বুঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণত সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে– যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্বজগৎ ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো– এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোনো কোনো আলিম বলেন, হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা মাংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীবজন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যেই বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্বে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তুর চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতা; যেমন জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মু'মিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণির মু'মিন, যেমন পয়গাম্বর শ্রেণি, তাঁরা বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলা বাহুল্য এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য সাফল্য ও যুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা এই– أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত। –[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ : এ আয়াতে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা মানব জাতির সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। মানুষকে আল্লাহ পাক অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। যেমন মানুষের আকার-আকৃতি, মানুষের বাক-শক্তি, বিচার-বুদ্ধি, বোধ-শক্তি, লেখার শক্তি, ইঙ্গিতে বুঝাবার শক্তি, সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর কর্তৃত্ব, বিভিন্ন রকম শিল্প এবং পেশা কৌশল প্রদান করেছেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর সঙ্গে মহাকাশের কিছুর যোগসূত্র স্থাপনের তৌফিক দান করেছেন যেন মানুষ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হতে পারে এবং রিজিকের উপকরণ সমূহ অর্জিত হতে পারে। তিনি মানুষকে জীবজন্তুদের থেকে পৃথক এক বিশেষ ব্যবস্থা দিয়েছেন যে মানুষ হাত দ্বারা ধরে স্বচ্ছন্দে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে এবং মানুষকে তিনি মহব্বত, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেছেন যেন সে আল্লাহ পাকের মারেফাত লাভ করে, তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। হাকেম এবং দায়লামী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– আঙ্গুল দ্বারা খাবার গ্রহণ করার ব্যবস্থার মাধ্যমেও আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন।

মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা : এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ পাক মানব জাতিকে যে সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছেন তা দু'প্রকার একটি দৈহিক আরেকটি আধ্যাত্মিক বা রূহানী। দৈহিক সম্মান এবং বৈশিষ্ট্য সকল মানুষই পেয়ে থাকে মুমিন হোক বা কাফের। দৈহিক মর্যাদা এই যে–

১. আল্লাহ পাক স্বয়ং তার মালমসলা তৈরি করেছেন এবং স্বীয় কুদরতি হাতে তাকে বানিয়েছেন।

২. আল্লাহ পাক মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

৩. মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঠিক ওজন মোতাবেক বানিয়েছেন।

৪. ধরা এবং খাওয়ার জন্য আঙ্গুল দিয়েছেন।

৫. চলার জন্য পা দান করেছেন।

৬. পুরুষদেরকে দাড়ি এবং মেয়েদেরকে চুল দিয়ে তাদের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন।

৭. বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন।

৮. বাকশক্তি দান করেছেন।

৯. কলম দ্বারা লিখতে শিখিয়েছেন।

১০. জীবিকা উপার্জনের পথ নির্দেশ করেছেন।

১১. নব-নব আবিষ্কারের পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন।

আধ্যাত্মিক বা রূহানী মর্যাদা : মানুষের দ্বিতীয় প্রকার মর্যাদা হলো রূহানী। আর এ মর্যাদাও দু-ভাগে বিভক্ত। একটি হলো সাধারণ। আরেকটি হলো বিশেষ। সাধারণ মর্যাদা মুমিন এবং কাফের উভয়েই লাভ করে।

১. রূহানী মর্যাদা হলো এই যে, আল্লাহ পাক মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি মানবদেহে একটি রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফলে সে জীবন্ত হয়েছে।

২. এরপর আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন এবং সমগ্র মানব জাতিকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?] বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ পাকের সম্বোধন লাভ করা নিঃসন্দেহের বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ পাকের এই কথার জবাবে মুমিন ও কাফের সকলে بَلٰى [হ্যাঁ] বলে জবাব দেয় অর্থাৎ আল্লাহ পাক সকলের নিকট থেকে তাঁকে পালনকর্তা হিসাবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

৩. সমগ্র মানব জাতিকে স্বভাব ধর্মের উপর সৃষ্টি করা হয়।

৪. এরপর কৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণ করেন যুগে যুগে এবং আসমানি গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন। এর দ্বারা একথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি তোমরা স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা কর, তবে কেয়ামতের পর তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে জান্নাতে চিরদিন বাস করবে। পক্ষান্তরে যদি কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ কর এবং তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শত্রু ইবলিসের অনুসারী হও, তবে ইবলিসের সঙ্গে তোমাদেরকে দোজখে থাকতে হবে।

অনুবাদ :

٧١. اُذْكُرْ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ج بِنَبِيِّهِمْ فَيُقَالُ يَا اُمَّةَ فُلَانٍ اَوْ بِكِتَابِ اَعْمَالِهِمْ فَيُقَالُ يَاصَاحِبَ الْخَيْرِ وَيَا صَاحِبَ الشَّرِّ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَمَنْ اُوْتِيَ مِنْهُمْ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَهُمُ السُّعَدَاءُ اُولُوا الْبَصَائِرِ فِى الدُّنْيَا فَاُولٰئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ يُنْقَصُوْنَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ فَتِيْلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ

৭১. স্মরণ কর সেই দিনকে যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব নবীগণের নাম উল্লেখ করে আহ্বান করব, যেমন বলা হবে, হে অমুক নবীর উম্মত; বা এর অর্থ হলো, তাদের আমলনামা উল্লেখ করে ডাকব, যেমন, বলা হবে, হে সৎ আমলের অধিকারী বা হে অসৎ আমলের অধিকারী! আর এই ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের দিন। এদের মধ্যে যাদের দক্ষিণ হস্তে তাদের আমল নামা দেওয়া হবে অর্থাৎ যারা সৌভাগ্যবান এবং দুনিয়াতে ছিল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না অর্থাৎ তাদের আমলনামা থেকে কিছু হ্রাস করা হবে না। فَتِيْلًا অর্থাৎ খর্জুর বীচির উপরস্থ হালকা বাকল পরিমাণও।

٧٢. وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَىِ الدُّنْيَا اَعْمٰى عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى عَنْ طَرِيْقِ النَّجَاةِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَاَضَلُّ سَبِيْلًا اَبْعَدُ طَرِيْقًا عَنْهُ ـ

৭২. যে এই স্থানে অর্থাৎ ইহলোকে সত্য থেকে অন্ধ পরলোকেও সে মুক্তির পথ ও আমলনামা পাঠ হতে হবে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট তা হতে অধিকতর দূরবর্তী পথে সে বিদ্যমান।

٧٣. وَنَزَلَ فِىْ ثَقِيْفٍ وَقَدْ سَاَلُوْهُ اَنْ يُحَرِّمَ وَادِيْهِمْ وَاَلَحُّوْا عَلَيْهِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ كَادُوْا قَارَبُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ يَسْتَنْزِلُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ق وَاِذًا لَوْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ـ

৭৩. সাকীফ গোত্রের লোকগণ রাসূল ﷺ -এর নিকট তাদের এলাকাটি হেরেমরূপে নির্ধারণ করতে আবেদন করেছিল এবং এই বিষয়ে তারা খুবই পীড়াপীড়ি করেছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা থেকে তারা প্রায় তোমার পদস্খলন ঘটিয়ে ফেলেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর। তখন অর্থাৎ তুমি তা করলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। اِنْ এটা مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত। كَادُوْا - নিকট ছিল। يَفْتِنُوْنَكَ - যে তারা তোমার পদস্খলন ঘটিয়ে ফেলবে।

٧٤. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ عَلَى الْحَقِّ بِالْعِصْمَةِ لَقَدْ كِدْتَّ قَارَبْتَ تَرْكَنُ تَمِيْلُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا رُكُوْنًا قَلِيْلًا لِشِدَّةِ اِحْتِيَالِهِمْ وَاِلْحَاحِهِمْ وَهُوَ صَرِيْحٌ فِىْ اَنَّهٗ لَمْ يَرْكَنْ وَلَا قَارَبَ ـ

৭৪. আমি তোমাকে ইচ্ছামতো বা নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করার মাধ্যমে সত্যের উপর অবিচলিত না রাখলে তাদের পীড়াপীড়ি এবং প্রতারণায় তুমি তাদের প্রতি প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তে। বক্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে এই কথা ব্যক্ত করছে যে, রাসূল ﷺ তাদের প্রতি ঝুঁকেও যান নি বা তার নিকটবর্তীও হননি। كِدْتَ - তুমি সন্নিকটে ছিলে. تَرْكَنُ - ঝুকতে।

٧٥. إِذًا لَّوْ رَكَنْتَ لَأَذَقْنٰكَ ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ اَىْ مِثْلَىْ مَا يُعَذِّبُ غَيْرَكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا مَانِعًا مِنْهُ.

৭৫. তখন অর্থাৎ তুমি যদি ঝুঁকে পড়তে তবে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে অন্যরা যে শাস্তি পেত বা পাবে তার দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোনো সাহায্যকারী তা হতে তোমাকে রক্ষাকারী পেতে না।

٧٦. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ لَهُ الْيَهُوْدُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَالْحَقْ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا اَرْضُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ اَرْضِ الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّوْ اَخْرَجُوْكَ لَا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا ثُمَّ يُهْلَكُوْنَ.

৭৬. ইহুদিরা রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, আপনি সত্যই নবী হয়ে থাকলে শামে চলে যান। কেননা তাই মূলত নবীগণের ভূমি। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তারা তোমাকে ভূমি হতে অর্থাৎ মদীনা ভূমি হতে উৎখাত করতে চেয়েছিল, তোমাকে সেথা হতে বের করার জন্য। তা হলে অর্থাৎ যদি তোমাকে বের করে দিত তবে তোমার পর তারাও সেথায় অল্প কালই টিকে থাকত পরে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। إِنْ - এটা مُخَفَّفَه বা লঘুকৃত।

٧٧. سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَىْ كَسُنَّتِنَا فِيْهِمْ مِنْ إِهْلَاكِ مَنْ اَخْرَجَهُمْ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا تَبْدِيْلًا.

৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের ক্ষেত্রের বিধানের মতো; অর্থাৎ যারা নবীগণকে বহিষ্কার করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া ছিল যেমন আমার বিধান তদ্রূপ তাদের ক্ষেত্রেও আমার তদ্রূপ বিধান। আর তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না। تَحْوِيْلًا - পরিবর্তন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُنَاسٍ : লোকজন, এটা نَوْسٌ হতে নির্গত, যার অর্থ নড়াচড়া করা, এটা إِنْسَانٌ - এর جَمْعٌ بِغَيْرِ لَفْظِه হয়েছে। مِصْبَاحٌ তে রয়েছে যে, إِنْسَانٌ টা نَاسٌ হতে নির্গত এবং এটা إِسْمِ جِنْس, এটা مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ, একবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ يَاصَاحِبَ الشَّرِّ : এতে মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ يَا صَاحِبَ كِتَابِ الشَّرِّ.

قَوْلُهُ يَقْرَرُوْنَ : অর্থাৎ يَقْرَءُوْنَ سُرُوْرًا অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়বে।

قَوْلُهُ قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ : মুফাসসির (র) فَتِيْلًا - এর তাফসীর قِشْرَةُ النَّوَاةِ দ্বারা করেছেন। যদি اَلْخَيْطُ الَّذِىْ فِىْ نُقْرَةِ النَّوَاةِ طُوْلًا দ্বারা فَتِيْلًا -এর তাফসীর করতেন তবে উত্তম হতো। কেননা খেজুর দানার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকে ১. فَتِيْل ২. قِطْمِيْر ৩. نَقِيْر

فَتِيْل ঐ রগ-রেশাকে বলা হয় যা দানার পিঠে লম্বা আকারে হয়ে থাকে, এবং বিচির উপর ঝিল্লির ন্যায় আবরণকে قِطْمِيْر বলা হয়। এবং বিচির পিঠে একটি ছিদ্র থাকে তাকে نَقِيْر বলা হয়। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِىْ)

قَوْلُهُ اَبْعَدُ طَرِيْقًا عَنْهُ : অর্থাৎ اَبْعَدُ طَرِيْقًا عَنِ الْاَعْمٰى فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ অন্ধ যেভাবে রাস্তা অবলোকন করা থেকে দূরে থাকে, কাফেররা মুক্তির পথ অবলোকন করা থেকে তার চেয়ে দূরে অবস্থান করবে।

قَوْلُهُ رُكُوْنًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَفْعُوْل مُطْلَقْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে নয়। কেননা تَرْكَنُ হলো لَازِمْ ; مُتَعَدِّىْ নয়। شَيْئًا - এর মওসূফ رُكُوْنًا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَسْتَفِزُّوْنَكَ : অর্থাৎ لِيُزْعِجُوْنَكَ এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ - এর اِسْتِفْزَازٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ্ ك হলো মাফঊলের যমীর, অর্থ– তোমাদের পা উপড়ে ফেলবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ : এখানে اِمَامْ শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ এখানে اِمَام مُبِيْن অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থেরই আশ্রয় নেওয়া হয়; যেমন কোনো অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ قَالَ يُدْعٰى اَحَدُهُمْ فَيُعْطٰى كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهٖ অর্থাৎ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ আয়াতের তফসীরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ আমলনামা করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েব মাশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী নেতা হোক।

–[তাফসীরে কুরতুবী]

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী দল, হযরত মূসা (আ)-এর অনুসারী দল, হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেওয়াও সম্ভবপর।

আমলনামা : কুরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ অন্য এক আয়াতে রয়েছে, اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ - প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে; পরহেজগার হোক কিংবা গোনাহগার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে এবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে মুক্তির হবে; যদিও কোনো কোনো কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কুরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে تَطَايُرُ الْكُتُبِ শব্দটি উল্লিখিত আছে; অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোনো কোনো হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে– কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। –(বয়ানুল কোরআন)

قَوْلُهُ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তফসীরে মাযহারীতে ঘটনাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যুবায়ের ইবনে নুফায়র (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমর্থিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ সরদার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল ঃ আপনি যদি বাস্তবিকই আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্য অপমানকর। এরূপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাবো। তাদের এই আবদার শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনেও কিছুটা কল্পনা জাগে যে, এদের দাবি পূরণ করা হলে সম্ভবত এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্বও ফিতনা। আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর বলা হয়েছে ঃ যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃঢ়পদ রাখার ব্যবস্থা না হতো, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার কাছে অসম্ভব ছিল না।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কাফেরদের অনর্থক আবদারের দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঝুঁকে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি পয়গাম্বরদের সুউচ্চ ও পবিত্রতম চরিত্র ও স্বভাবের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। পয়গাম্বরসুলভ পাপমুক্ততা না থাকলেও কাফেরদের অনর্থক আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়া পয়গাম্বরের স্বভাবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। পয়গাম্বরসুলভ নিষ্পাপ চরিত্রের কারণে তাও দূর করে দেওয়া হয়েছে।

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ : অর্থাৎ যদি অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হতো এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হতো। কেননা নৈকট্যশীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্নীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ : অর্থাৎ হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ : اِسْتِفْزَازٌ-এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দুরকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আবুল কাসেম ﷺ! যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গাম্বরদের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَإِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ আয়াতটি নাজিল করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়েশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশি দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাছীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কুরআন পাকের এই হুঁশিয়ারিও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরি অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

قَوْلُهُ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا : এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপ চালু রয়েছে যে, যখন কোনো জাতি তাদের পয়গাম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়।

অনুবাদ :

٧٨. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اَىْ مِنْ وَقْتِ زَوَالِهَا اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ اِقْبَالِ ظُلْمَتِهٖ اَىِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا تَشْهَدُهٗ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ۔

৭৮. সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত অর্থাৎ যুহর, আসর, মাগরিব, ঈশা-এর সালাত কায়েম করবে আর ফজরের কুরআনও ভোরের সালাতও। ফজরের সালাত অবশ্যই তখন সমুপস্থিত হয় অর্থাৎ রাত্রি ও দিনের ফেরেশ্‌তাগণ সেই সময় সমুপস্থিত হয়। دُلُوْكِ الشَّمْسِ সূর্য হেলে পড়ার সময়। غَسَقِ اللَّيْلِ অর্থাৎ নিশার ঘন অন্ধকার সমাগম।

٧٩. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ فَصَلِّ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ نَافِلَةً لَّكَ فَرِيْضَةً زَائِدَةً لَكَ دُوْنَ اُمَّتِكَ اَوْ فَضِيْلَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَةِ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ يُقِيْمَكَ رَبُّكَ فِى الْاٰخِرَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَحْمَدُكَ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ فِىْ فَصْلِ الْقَضَاءِ۔

৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশ তা সহ অর্থাৎ কুরআন সহ তাহাজ্জুদ সালাত কায়েম করবে; এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত অর্থাৎ কেবল তোমার জন্য একটি অতিরিক্ত ফরজ হিসাবে নির্ধারিত। তোমার উম্মতের জন্য নয়; বা এর অর্থ, ফরজ সালাতসমূহের বাইরে এটা একটি বিশেষ মর্যাদা লাভের সালাত। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরকালে পৌছাবেন প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে- প্রশংসিত স্থানে। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সকলেই যে স্থানে তোমার প্রশংসা করবে। এটা হলো কিয়ামতের দিন বিচার কার্যের ফয়সালা দানের জন্য শাফায়াত স্থান।

٨٠. وَنَزَلَ لَمَّا اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ الْمَدِيْنَةَ مُدْخَلَ صِدْقٍ اَىْ اِدْخَالًا مَّرْضِيًّا لَا اَرٰى فِيْهِ مَا اَكْرَهُ وَّاَخْرِجْنِىْ مِنْ مَكَّةَ مُخْرَجَ صِدْقٍ اِخْرَاجًا لَا اَلْتَفِتُ بِقَلْبِىْ اِلَيْهَا وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا قُوَّةً تَنْصُرُنِىْ بِهَا عَلٰى اَعْدَائِكَ۔

৮০. হিজরত করার জন্য নির্দেশিত হওয়ার সময় নাজিল হয়। বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি মদীনায় আমার প্রবেশ শুভ রূপে কর সন্তোষ জনক কর। সেখানে যেন অপ্রীতিকর কিছু প্রত্যক্ষ না করি এবং মক্কা থেকে নির্গমন শুভ রূপে কর অর্থাৎ এমনভাবে নির্গমন কর যে এর প্রতি আমার মন যেন না ফিরে এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি। অর্থাৎ এমন শক্তি যা তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে।

٨١. وَقُلْ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ جَاءَ الْحَقُّ الْاِسْلَامُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ء بَطَلَ الْكُفْرُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا مُضْمَحِلًّا زَائِلًا وَقَدْ دَخَلَهَا وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ صَنَمًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهٖ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ الخ حَتّٰى سَقَطَتْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

৮১. এবং পুনরায় মক্কায় প্রবেশের সময় বলো, সত্য অর্থাৎ ইসলাম এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কুফরির বিনাশ হয়েছে. মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার তাতে প্রবেশ করেছিলেন ঐ সময় বায়তুল্লাহ কাবা শরীফের চতুষ্পার্শে তিন শত ষাটটি মূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল. তিনি তখন তাঁর হস্তের একটি লাঠি দ্বারা তাদেরকে গুঁতো দিতেছিলেন আর তেলাওয়াত করছিলেন ঃ جَاءَ الْحَقُّ - .... সত্য এসেছে ... ...। শেষ পর্যন্ত প্রতিমাগুলো ভূলুণ্ঠিত হলো। শায়খান অর্থাৎ বুখারী-মুসলিম এর বিবরণ দিয়েছেন। زَهُوْقًا - অর্থাৎ বিবর্ণ ও বিনাশ প্রাপ্ত হবে

٨٢. وَنُنَزِّلُ مِنَ لِلْبَيَانِ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مِنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا خَسَارًا لِكُفْرِهِمْ بِهٖ.

৮২. আমি অবতীর্ণ করি কুরআন যা মুমিনদের জন্য বিভ্রান্তি থেকে উপশমদাতা ও রহমত স্বরূপ আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কাফেরদের জন্য এতদ্বিষয়ে তাদের কুফরির কারণে ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। مِنَ الْقُرْاٰنِ এ স্থানে مِنْ শব্দটি بَيَانِيَّة বা বিবরণমূলক

٨٣. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ الْكَافِرِ اَعْرَضَ عَنِ الشُّكْرِ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ج ثَنٰى عِطْفَهٗ مُتَبَخْتِرًا وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ الْفَقْرُ وَالشِّدَّةُ كَانَ يَئُوْسًا قَنُوْطًا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ.

৮৩. আর মানুষের প্রতি কাফেরের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও এক পার্শ্বে সরে যায় অহংকার দেখিয়ে এক পার্শ্বে ঘুরে যায়। আর তাকে অনিষ্ট অর্থাৎ অভাব ও বিপদ স্পর্শ করলে সে হতাশ হয়ে পড়ে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে।

٨٤. قُلْ كُلٌّ مِّنَّا وَمِنْكُمْ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ طَرِيْقَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا طَرِيْقًا فَيُثِيْبُهٗ.

৮৪. বল, আমরা ও তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা সঠিক ও নির্ভুল। অনন্তর তাকে তিনি পুণ্য ফল প্রদান করবেন। سَبِيْلًا - পথ, পদ্ধতি

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مِنْ وَقْتِ زَوَالِهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ-এর মধ্যে لَامْ টা مِنْ অর্থে হয়েছে। কেননা ওয়াক্তের জন্য নামাজ পড়ার কোনো অর্থ হয় না। সালাতুল ফজর কে কুরআন বলা হয়েছে। কেননা কুরআন পাঠ করা সালাতের রোকন। যেমনি ভাবে সেজদা বলে সালাত উদ্দেশ্য হয়, রুকু বলে নামাজ উদ্দেশ্য হয়। এমনিভাবে কুরআন বলেও সালাত উদ্দেশ্য হয়। এবং قُرْاٰنَ - এর আতফ - اَلصَّلٰوةَ - এর উপর হয়েছে অর্থাৎ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاَقِمِ الْقُرْاٰنَ

قَوْلُهُ مِنَ اللَّيْلِ : অর্থাৎ بَعْضِ اللَّيْلِ

قَوْلُهُ دُلُوكِ : সূর্য ঢলে পড়া, অস্ত যাওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, دُلُوْك অর্থ হলো- অস্ত যাওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর এবং জাবের (রা.)-এর মতে সূর্য ঢলে পড়া। আর زَوَال شَمْس - এর অর্থই অধিকাংশের থেকে বর্ণিত রয়েছে। আর এই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া অধিক উত্তম। তদুপরি دُلُوْك - এর অর্থ زَوَال নেওয়া হলে আয়াত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে অন্তর্ভুক্ত করবে। دُلُوْكُ الشَّمْسِ দ্বারা জোহর আসর এবং إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ দ্বারা মাগরিব ও এ'শা এবং قُرْآنَ الْفَجْرِ দ্বারা ফজরের নামাজকে বুঝাবে।

قَوْلُهُ غَسَقِ اللَّيْلِ : غَسَقٌ হলো অন্ধকার, আধার এবং বলা হয়েছে রাতের প্রথম অংশ প্রবেশ করা।

قَوْلُهُ فَتَهَجَّدْ : এটা اَلْهُجُوْدُ থেকে নির্গত অর্থ تَرْكُ النَّوْمِ لِلصَّلٰوةِ তথা নামাজের জন্য নিদ্রা পরিত্যাগ করা।

قَوْلُهُ نَافِلَةً : এর অর্থ অতিরিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শত্রুদের দূরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাজ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ কয়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ অর্থাৎ আমি জানি যে, কাফেরদের কথা-বার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। -[তাফসীরে কুরতুবী]

এ আয়াতে আল্লাহর জিকির, প্রশংসা, তাসবীহ ও নামাজে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর জিকির ও নামাজ বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামাজ, যেমন কুরআন পাকে বলে وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ সবর ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ : সাধারণ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা دُلُوْك শব্দের অর্থ, আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دُلُوْك বলা যায়। কিন্তু সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন।

-[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ : غَسَقٌ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে دُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ -এর মধ্যে চারটি নামাজ এসে গেছে, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের দু'নামাজের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غَسَقِ لَيْل অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। এ কারণেই ইমাম আজম আবূ হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই غَسَقِ اللَّيْلِ -এর তাফসীর স্থির করেছেন।

قَوْلُهُ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ : এখানে قُرْاٰنَ শব্দ বলে নামাজ বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাছীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, دُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ বাক্যে চার নামাজের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُوْدًا : شهادة ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, অর্থ– উপস্থিত হওয়া। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাজে উপস্থিত হয়। তাই একে مَشْهُوْد বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায় করতে পারে না। জানিনা, যারা কুরআনকে হাদীস ও রাসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবি করে তারা নামাজ কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাজে কুরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, অর্থাৎ ফজরের নামাজে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত এবং ফজরের সংক্ষিপ্ত কেরাতের কথা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা কার্যত পরিত্যক্ত। সহীহ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাজে সূরা আ'রাফ, মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাজে শুধু 'قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ' ও 'قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী (র.) সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন– অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

তাহাজ্জুদ নামাজের সময় ও বিধানাবলি : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ - تَهَجَّدْ শব্দটি هُجُوْدٌ থেকে উদ্ভূত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা بِهٖ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। [মাযহারী] কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামাজ পড়া। এ কারণেই শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাজকে 'নামাজে তাহাজ্জুদ' বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ এরূপ নেওয়া হয় যে, কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামাজ। কিন্তু তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামাজ পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাজের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কুরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোনো কোনো হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাছীর লেখেন قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيُحْمَلُ عَلٰى مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাজকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কুরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই কিন্তু সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন, তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরজ না নফল? نَافِلَة نَفْل- نَافِلَةً لَّكَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামাজ ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরি নয় করলে ছওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গুনাহ, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাজে তাহাজ্জুদের সাথে نَافِلَةً لَكَ শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এজন্যই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে نَافِلَة শব্দটিকে فَرِيْضَة -এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ উম্মতের উপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাজই ফরজ কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরজ। অতএব এখানে نَافِلَةً শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত ফরজ; নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযয়াম্মিল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামাজ সবার উপর ফরজ ছিল। সূরা মুযযাম্মিলে এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে মি'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ নামাজ সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষেও রহিত হয় কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نَافِلَةً لَّكَ বাক্যের অর্থ এই যে, তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরজ। কিন্তু তাফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। এক. ফরজকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোনো কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। দুই. সহীহ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে কিন্তু ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ অর্থাৎ আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম তখন ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই ছওয়াব দেওয়া হবে, যদিও কাজ হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর পাঞ্জেগানা নামাজ ছাড়া কোনো নামাজ ফরজ ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, نَافِلَةً শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরজের অর্থে হতো, তবে এর পরে لَّكَ শব্দের পরিবর্তে عَلَيْكَ হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لَّكَ তো শুধু জায়েজ হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তাফসীর মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফরজ নামাজ যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نَافِلَةً لَّكَ বলার কি অর্থ হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই নফল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গুনাহের কাফফারা এবং ফরজ নামাজ সমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ গুনাহ থেকে এবং ফরজ নামাজের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোনো ত্রুটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। –[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

তাহাজ্জুদ নফল, না সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ : ফিকহবিদদের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদার সাধারণ সংজ্ঞা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা ওজরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। তবে যদি কোনো শরিয়ত সম্মত প্রমাণ দ্বারা বোঝা যায় যে, কাজটি একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ উম্মতের জন্য নয়; তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নয়। এই সংজ্ঞার বাহ্যিক তাগিদ এই যে, তাহাজ্জুদও সবার জন্য সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়।

কেননা তাহাজ্জুদের নামাজ স্থায়ীভাবে পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই। তাফসীরে মাযহারীতে একেই পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। তিনি উত্তরে বললেন, তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। এ ধরনের বিরূপ মন্তব্য ও হুঁশিয়ারি শুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

যারা তাহাজ্জুদকে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। উপরিউক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে নিছক তরক করার কারণে নয়, বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে। কেননা একবার কোনো নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়মিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার মতেই বাঞ্ছনীয়। অভ্যাস গড়ে তোলার অপর ত্যাগ করা নিন্দনীয়। কেননা অভ্যাসের পর বিনা ওজরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়।

তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা : সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানে অথবা রমজানের বাইরে কোনো সময় এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তন্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকাত ছিল বিতিরের নামাজ এবং অবশিষ্ট আট রাকাত তাহাজ্জুদের।

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তেরো রাকাত পড়তেন। বিতিরের তিন রাকাত এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নতও এর অন্তর্ভুক্ত [মাযহারী] রমজানের কারণে ফজরের সুন্নতকে রাত্রিকালীন নামাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামাজ আট রাকাত পড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এরই অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে উপরিউক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয় রাকাত ও পড়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে মাসরূক (র.) হযরত আয়েশা (রা.) কে তাহাজ্জুদের নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সাত, নয় ও এগারো রাকাত হতো ফজরের সুন্নত ছাড়া। [মাযহারী] হানাফী নিয়ম অনুযায়ী বিতিরের তিন রাকাত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়ের মধ্যে ছয় এবং এগারোর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকাত থেকে যায়।

তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নিয়ম : বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা এই যে, প্রথমে দুরাকাত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কেরাতে অতঃপর অবশিষ্ট রাকাতগুলোতে কেরাতেও দীর্ঘ এবং রুকূ-সিজদাও দীর্ঘ করা হতো। মাঝে মাঝে খুব বেশি দীর্ঘ করা হতো এবং মাঝে মাঝে কম [এ হচ্ছে ঐসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো তাফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

'মাকামে মাহমূদ' আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মকামে মাহমূদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে এই মকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অন্য কোনো পয়গাম্বরের জন্য নয়। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গাম্বরের সমীপে শাফায়াতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গাম্বরই ওজর পেশ করবেন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফায়াত করবেন।

পয়গাম্বর ও সৎলোকদের শাফায়াত গ্রহণীয় হবে : ইসলামি উপদল সমূহের মধ্যে খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় পয়গাম্বরদের শাফায়াত স্বীকার করে না। তারা বলে কবিরা গুনাহ কারও শাফায়াত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গাম্বরগণের এমন কি, সৎলোকদের শাফায়াত গুনাহগারদের পক্ষে কবুল করা হবে। অনেক মানুষের গুনাহ শাফায়াতের ফলে মাফ হয়ে যাবে।

ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকীতে হযরত উসমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পয়গাম্বরগণের গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করবেন, এরপর আলেমগণ, এরপর শহীদগণ শাফায়াত করবেন। দায়লমী হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আলেমকে বলা হবে, আপনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফায়াত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহের সমান।"

আবূ দাউদ ও ইবনে হাইয়ান হযরত আবুদ্দারদার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফায়াত তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য কবুল করা হবে।

হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাইতে বেশি লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী]।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ শাফায়াত করবেন এবং তাঁর শাফায়াতের ফলে কোনো ঈমানদার দোজখে থাকবে না, তখন আলেম ও সৎলোকদের শাফায়াত কেন এবং কিভাবে হবে? তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সম্ভবত আলেম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফায়াত করতে চাইবেন, তারা নিজ নিজ শাফায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবেন।

ফায়দা : এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ আমার শাফায়াত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা কবীরা গুনাহ করেছিল। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে কবীরা গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করবেন। কোনো ফেরেশতা অথবা উম্মতের কোনো ব্যক্তি তাদের জন্য শাফায়াত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের শাফায়াত সগীরা গুনাগারদের জন্য হবে।

শাফায়াতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাজের বিশেষ প্রভাব আছে : হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) বলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মকামে মাহমূদ অর্থাৎ শাফায়াতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফায়াতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাজের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

قَوْلُهٗ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে এ কথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শধু পাঞ্জেগানা নামাজ কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গাম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ 'মকামে মাহমূদ' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে, এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাফেরদের দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁবে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ : এখানে مُخْرَجْ ও مُدْخَلْ-এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থানে ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صِدْق বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেনেনা আরবি ভাষায় صِدْق এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যত ও অন্তর্গত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কুরআন পাকে قَدَمِ صِدْقٍ - لِسَانَ صِدْقٍ ও مَقْعَدِ صِدْقٍ শব্দগুলো এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদিনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, হে আল্লাহ মদিনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ি-ঘরের মহব্বত অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই তাফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীর আখ্যা দিয়েছন। ইবনে জারীরও এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেওয়ার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোনো লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদিনায় প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল। তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া : হিজরতের সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদিনায় পৌঁছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের কবল থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদিনাকে বাহ্যত ও অন্তর্গত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোনো আলেম বলেন, এ দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا এ দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

قَوْلُهُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ : এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন, বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে পৌঁছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। -[বুখারী, মুসলিম]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নিচ দিকে রাঙ্গতা অথবা লোহার রজত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির বলেন- কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রঙবেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ.) যখন শেষ জমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ হাদীস অনুযায়ী খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

قَوْلُهُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ : কুরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কোনো কোনো আলেমের মতে কুরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের আমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কুরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর শরীরে ফুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোনো এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করল লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর পায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'قُلْ أَعُوذُ' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কুরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا : এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কুরআন পাঠ করলে যেমন কুরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে তেমনি অবিশ্বাস এবং কুরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ : এখানে شَاكِلَة শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সমবগুলোর সারমর্ম, পরিবেশ, অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। [কুরতুবী] এতে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরবার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। [জাসসাস] কেননা পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে شَاكِلَة-এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন! এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজির।

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্টা পুরুষদের জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

অনুবাদ :

٨٥. وَيَسْئَلُوْنَكَ اَىِ الْيَهُوْدُ عَنِ الرُّوْحِ ط الَّذِىْ يَحْيٰى بِهِ الْبَدَنُ قُلْ لَهُمْ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ اَىْ عِلْمِهٖ لَا تَعْلَمُوْنَهٗ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى عِلْمِهٖ تَعَالٰى

৮৫. তারা অর্থাৎ ইহুদিগণ তোমাকে প্রশ্ন করে রূহ অর্থাৎ যার মধ্যে শরীর জীবন স্পন্দন পায় সেই বস্তুটি সম্পর্কে। তাদেরকে বল,- রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ থেকে আসে। অর্থাৎ এটা তিনিই অবগত আছেন। এ সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

٨٦. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَىِ الْقُرْاٰنِ بِاَنْ نَمْحُوْهُ مِنَ الصُّدُوْرِ وَالْمَصَاحِفِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا .

৮৬. ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি অর্থাৎ আল-কুরআন অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম যেমন তা হৃদয় ও পুস্তকের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারতাম অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্ম-বিধায়ক পেতে না। لَئِنْ - এর لَامْ টি قَسْمِيَّةٌ অর্থাৎ শপথ ব্যঞ্জক।

٨٧. اِلَّا لٰكِنْ اَبْقَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا عَظِيْمًا حَيْثُ اَنْزَلَهٗ عَلَيْكَ وَاَعْطَاكَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ .

৮৭. কিন্তু এটা প্রত্যাহার না করে বিদ্যমান রাখা তোমার প্রতিপালকের দয়া মাত্র। তোমার উপর তাঁর মহা অনুগ্রহ বিদ্যমান। সেহেতুই তিনি এটা তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন। তোমাকে 'মাকামে মাহমূদ' এবং আরো বহু বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন। اِلَّا - এটা এ স্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٨. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ فِى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا مُعِيْنًا نَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا .

৮৮. বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ অর্থাৎ এর ভাষালঙ্কার ও ভাব ঐশ্বর্যের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সকলেই সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। কাফেরদের কেউ কেউ বলত, ইচ্ছা করলে আমরাও এ ধরনের কথা বলতে পারি। এর জওয়াবে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। ظَهِيْرًا সাহায্যকারী।

٨٩. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز صِفَةٌ لِمَحْذُوْفٍ اَىْ مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ لِيَتَّعِظُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ اِلَّا كُفُوْرًا جُحُوْدًا لِلْحَقِّ .

৮৯. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপমা বার বার বর্ণনা করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কুফরি ব্যতীত সত্য-প্রত্যাখ্যান ব্যতীত আর সকল কিছুই অস্বীকার করে। صَرَّفْنَا বর্ণনা করে দিয়েছি। مِنْ كُلِّ مَثَلٍ এটা এ স্থানে উহ্য একটি শব্দের صِفَتْ বা বিশেষণ। মূলতঃ ছিল مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ - অর্থাৎ প্রত্যেক জাতীয় উদাহরণ।

٩٠. وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا ـ

৯০. এবং তারা বলে, কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। وَقَالُوْا - পূর্বোল্লেখিত اَبٰى -এর সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। يَنْبُوْعًا এমন প্রস্রবণ যা থেকে পানি বেগে বের হয়।

٩١. اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ـ

৯১. অথবা তোমার খর্জুর ও দ্রাক্ষার বাগান হবে। অনন্তর তার মাঝে মাঝে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদ-নালা। جَنَّةٌ বাগান। خِلٰلَهَا তার মাঝে মাঝে।

٩٢. اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ـ

৯২. অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশ খণ্ড বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলে দিবে অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসবে আমরা তাদেরকে দেখব। كِسَفًا খণ্ড-খণ্ড করে। قَبِيْلًا সামনা সামনি, প্রত্যক্ষভাবে।

٩٣. اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ـ

৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ হবে বা কোনো সিঁড়ি দিয়ে আকাশে আরোহণ করবে; কিন্তু তুমি যদি তাতে আরোহণ কর তবুও আমরা তোমার আকাশারোহণ কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি সেথা থেকে এমন এক কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবে যাতে তোমার সত্যতার সমর্থন থাকবে। আমরা তা পাঠ করব। এদেরকে বল, পবিত্র ও মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো অপরাপর রাসূলগণের মতো একজন মানুষ, একজন রাসূল বই তো নই। আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের কেউই তো কোনো নিদর্শন আনতে পারেননি। زُخْرُفٌ এ স্থানে অর্থ স্বর্ণ। تَرْقٰى আরোহণ করবে। سُبْحَانَ رَبِّىْ এ এস্থানে বিস্ময় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। هَلْ كُنْتُ এ স্থানে প্রশ্নবোধক هَلْ শব্দটি مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ عَنِ الرُّوْحِ : অর্থাৎ عَنْ حَقِيْقَةِ الرُّوْحِ

قَوْلُهٗ عِلْمُهٗ : অর্থাৎ اَلرُّوْحُ مِنَ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ خَصَّ اللّٰهُ نَفْسَهٗ بِعِلْمِهٖ فَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الشَّاْنِ اَىِ الرُّوْحُ مِنْ شَاْنِ رَبِّىْ

قَوْلُهٗ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى عِلْمِهٖ تَعَالٰى : এটা সেই সন্দেহের জবাব যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا আর এখানে বলেছেন مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলমের মোকাবিলায় স্বল্প।

قَوْلُهٗ لَامُ قَسَمٍ : এটা উহ্য قَسَمٍ-এর উপর বুঝাচ্ছে, لَنَذْهَبَنَّ হলো جَوَابُ قَسَمٍ যা جَوَابُ شَرْطٍ - এর স্থলাভিষিক্তও বটে। আবার কেউ কেউ ذَهَبْنَا بِهٖ জবাবে শর্তকে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ لٰكِنْ اَبْقَيْنَاهُ : اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হয়েছে مُتَّصِلٌ নয়। কেননা لا - এর পূর্বেরটি رَحْمَتٌ - এর جِنْس থেকে নয়।

قَوْلُهُ اَبْقَيْنَاهُ : اَبْقَيْنَاهُ কে উহ্য মেনেছেন যাতে করে বাক্যটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা এটা ব্যতীত বাক্যটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

قَوْلُهُ صِفَةٌ لِمَحْذُوْفٍ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, بَيَّنَّا টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِه একে مِنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ করার প্রয়োজন নেই।

উত্তর হলো এই যে, তার মাফঊল উহ্য রয়েছে আর তা হলো مَثَلًا আর مِنْ كُلِّ مَثَلٍ টা كَائِنًا - এর مُتَعَلِّقٌ হয়ে উহ্য মাফঊলের সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا كُفُوْرًا : প্রশ্ন. যখন ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا জায়েজ নেই, তবে اِلٰى اَكْثَرِ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا কেন বৈধ হয়? এটাতো مُثْبَتٌ - এর مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغٌ হয়েছে। আর এটা জায়েজ নেই।

উত্তর. اِلٰى টা نَفْىٌ - এর ফায়দা দিতেছে, মনে হয় যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, فَلَمْ يَرْضَوْا اِلَّا كُفُوْرًا ফার্সীতে এর অনুবাদ হলো - پس قبول نه كرد بيشتر مردمان مگر ناسپاسى را

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى قَالُوْا : অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى-এর উপর عَطْف হয়নি যার কারণে অর্থের ক্ষেত্রে فَسَادٌ আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কুরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়; অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কুরআন পাকে এ শব্দটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি, স্বয়ং কুরআন ও ওহীকেও রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا

রূহ বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোনো কোনো তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহী বাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এর পূর্বেও نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কুরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ্ বলে ওহী, কুরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কুরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ্ কি? মানবদেহে রূহ্ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদিনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদির কাছ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল : মুহাম্মদ ﷺ আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজনে নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদি প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাজিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাজিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ বলা বাহুল্য কুরআন অথবা ওহীকে রূহ্ বলা কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল।

এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবাস্তব। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এ প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্যই ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কুরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ, কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর রিসালাত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন : কুরাইশরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদিরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তদনুসারে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদিদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। -[ইবনে কাছীর] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই এক আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে রূহকে কিভাবে আজাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো আয়াত নাজিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদীনায় : শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোনো কোনো তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাছীর এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাজিল হয়েছে; যেমন কুরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তাফসীরে মাযহারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনার এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছে। এক. এ রেওয়ায়েতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। দুই. এতে বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াব : প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছে, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপতির উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরি ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোনো প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জবাব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোনো ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি নয়, প্রশ্নকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য : ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ মাস'আলা বের করেছেন যে, প্রশ্নকারীর প্রত্যেক প্রশ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মুফতি ও আলেমের দায়িত্বে জরুরি নয় বরং তার ধর্মীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশক্তির অতীত অথবা যে জওয়াবে প্রতিপক্ষের ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়া উচিত। এমনিভাবে অনাবশ্যক ও বাজে প্রশ্নাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির যদি কোনো আমল করা জরুরি হয়ে পড়ে এবং সে নিজে আলিম না হয়, তবে মুফতি ও আলিমের পক্ষে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এর জওয়াব দেওয়া জরুরি। [জাসসাস] ইমাম বুখারী 'ইলম' অধ্যায়ে এই মাস'আলার একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম যুক্ত করে বলেছেন যে, যে প্রশ্নের জওয়াব দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া অনুচিত।

রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারে কি না? কুরআন পাক এ প্রশ্নের জওয়াব শ্রোতাদের প্রয়োজন ও বোধশক্তির অনুরূপ দান করেছে – রূহের স্বরূপ বর্ণনা করেনি। কিন্তু এতে জরুরি হয় না যে, রূহের স্বরূপ কোনো মানুষ বুঝতেই পারে না স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ ও এরূপ জানতেন না। সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতটি এর পক্ষেও নয় এবং বিপক্ষেও নয়। যদি কোনো রাসূল ওহীর মাধ্যমে এবং কোনো ওলী কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এর রূপ জেনে নেয়, তবে তা আয়াতের পরিপন্থি নয়। বরং যুক্তি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তাকে অনর্থক ও বাজে বলা গেলেও অবৈধ বলা যায় না। এ জন্যই অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম রূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। শেষ যুগে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) একখানি পুস্তিকায় এ প্রশ্নের উপর চমৎকার আলোকপাত করেছেন এবং রূহের স্বরূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটুকু বোঝা সম্ভব, ততটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। একজন শিক্ষিত লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং সন্দেহ ও জটিলতা থেকে বাঁচতে পারে।

ফায়দা : ইমাম বগভী এস্থলে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি এই। এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়। একবার মক্কায় কোরায়েশ সরদাররা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততায় কেউ কোনোদিন সন্দেহ করেনি। তিনি কোনোদিন মিথ্যা বলেছেন বলেও কেউ অপবাদ আরোপ করেনি। এতদসত্ত্বেও তাঁর নবুয়তের দাবি আমাদের বোধগম্য নয়। তাই একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় ইহুদি আলিমদের কাছে প্রেরণ করে তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা দরকার। তদনুসারে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার ইহুদি আলিমদের কাছে পৌঁছল। ইহুদি আলিমরা তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তোমরা এগুলো সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর না দেন, তবে তিনি নবী নন। এমনিভাবে যদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর না দেন, তবুও নবী নন। পক্ষান্তরে যদি দুটি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে বুঝে নেবে যে, তিনি নবী। প্রশ্ন তিনটি ছিল এই ঃ এক. তাঁকে ঐ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। তাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। দুই. ঐ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন। তার ঘটনা কি? তিন. রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

প্রতনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রশ্নই রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে পেশ করে দিল। রাসূল ﷺ বললেন–

আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি 'ইনশাল্লাহ্' না বলায় এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্রূপ ও দোষারোপের সুযোগ পেয়ে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ ও উদ্বিগ্ন হলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন–

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজের ওয়াদা করা হলে 'ইনশাল্লাহ' বলে করতে হবে। এরপর রূহ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। গর্তে আত্মগোপনকারীদের সম্পর্কে আসহাবে কাহাফের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নাজিল হয়। পরবর্তী সূরা কাহাফে তা বর্ণিত হবে। ঐ সূরায় আসহাবে কাহফ ও যুলকারনাইনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব দেওয়া হয়নি। [ফলে নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদিদের বর্ণিত আলামত সত্যে পরিণত হয়।] তিরমিযীও এ রেওয়ায়েতটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে। –[মাযহারী]

রূহ এবং প্রবৃত্তি : তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, রূহ এবং প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র বস্তু রয়েছে। রূহ মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য উপকারী হবে এমন কাজের দিকে আহ্বান জানায়। আর প্রবৃত্তি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদের দিকে ডাকে। প্রবৃত্তি পানাহারের দিকে আকৃষ্ট, ভোগ বিলাসে মত্ত, আরাম আয়াশে নিরত। ক্রোধের সময় পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত। প্রতারণায় শয়তানের সঙ্গে রয়েছে তার ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু রূহ মানুষকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর নাজাতের পথে আহ্বান জানায়। রূহ এবং প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য হলো যেমন ফেরেশতা এবং শয়তানের মধ্যে। ফেরেশতা নূর দ্বারা তৈরি আর ইবলীস শয়তান অগ্নি দ্বারা। ফেরেশতা বাধ্য, ইবলীস শয়তান অবাধ্য।

হাফেজ ইবনুল বার (র.) শরহে মোয়াত্তার ভূমিকায় একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ جَعَلَ فِيْهِ نَفْسًا وَرُوْحًا فَمِنَ الرُّوْحِ عِفَافُهُ وَفَهْمُهُ .... وَسَفَهُهُ وَغَضَبُهُ وَنَحْوُ هٰذَا .

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নফস বা প্রবৃত্তি এবং রূহ আমানত রেখেছেন। তাই রূহ থেকেই চরিত্র মাধুর্য, বিবেক বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে, নফস বা প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো অনাচার, ব্যভিচার, অহংকার, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতা।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৬৫-৬৬]

রূহের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য : রূহ কি? রূহের তাৎপর্য্য এবং মাহাত্ম কি? এ সম্পর্কে মানব মনে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মানুষের নাজাতের জন্যে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরিও নয় এবং এটি নবী রসূলগণের তাবলীগের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তও নয়। তাহলে মক্কার কাফেররা বা মদীনার ইহুদিরা এ সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করেছে? এর একই জবাব, শুধু পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, সত্যকে উপলব্ধি করে তা গ্রহণের জন্যে নয়।

রূহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত : রূহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেননা মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান যখন মানুষের মধ্যে কার্যকর হয় তখন প্রকাশ্যে রক্ত ব্যতীত মানব দেহ থেকে আর কিছুই বের হয় না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি হলো নিঃশ্বাস'। কেননা নিঃশ্বাস বন্ধ হলে মানুষের মৃত্যু হয়। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা বলেন, 'রূহ হলো একটি সূক্ষ্ম বাষ্প, যার দ্বারা সমস্ত দেহের কল-কব্জা চলমান থাকে। যখন এ বাষ্প বন্ধ হয়ে যায় তখন মানুষের মৃত্যু হয়।

আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আরেফীনের মতে রূহ হলো এমনি একটি সূক্ষ্ম নূরানী বস্তু যা' সমগ্র দেহে প্রবাহিত থাকে। যেমন গোলাপের পাপড়িতে সুগন্ধ এবং বৃক্ষে পানি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম বস্তুটির সম্পর্ক মানব দেহের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ মানুষটি জীবিত থাকে। পক্ষান্তরে, যখন মানব দেহের সঙ্গে এ সূক্ষ্ম নূরানী বস্তুটির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন মানুষটির মৃত্যু হয়। ইমামুল হারামাইন এবং ইমাম রাজী (র.) এ মতই প্রকাশ করেছেন।

–[তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কন্ধলভী (র.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ৫৬-৫৭]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রূহের তাৎপর্য বা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ : [হে রসূল!] আপনি বলুন, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে।" এ থেকে একথা প্রমাণিত হলো, আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে মানব দেহে কোনো কিছু প্রবেশ করে। ফলে মানুষ জীবনী শক্তির অধিকারী হয়। কিন্তু যখন ঐ বস্তুটি বের হয়ে যায় তখন মানুষের মৃত্যু ঘটে। এটিই আল্লাহ পাকের বিধান। একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মর্জি এবং নির্দেশক্রমেই সৃষ্টি এবং লয় হয়ে থাকে।

মানবজাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে এ কথাও ঘোষণা করেছেন, خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ : আল্লাহ পাক তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে বলেছেন, হও। তাই সে হয়ে গেছে। আরও ইরশাদ হয়েছে, اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ আমি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি হও আর তা হয়ে যায়। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রূহের চেতনা, গুণাবলি পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করতে থাকে। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহ এবং অন্য মানুষের রূহের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে রূহ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছে তা হলো রূহে মোহাম্মদী, কেনন প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রূহ মোবারক উন্নতির এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অন্যদের জন্যে কল্পনাতীত। এই চরম ও পরম উন্নতির কিছু ইঙ্গিত আলোচ্য আয়াতের ভাষায়ও রয়েছে ঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ : এখানে রূহ শব্দের সঙ্গে اَمْرٌ শব্দের সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তদুপরি রব শব্দটির সঙ্গে (ইয়া) অক্ষরটির সম্পর্ক [যার অর্থ হলো 'আমার'] আরও তাৎপর্যবহ।

এতদ্ব্যতীত, রূহের যে উন্নতির কথা বলা হলো তা তার নিজস্ব নয়, অর্থাৎ তার নিজের এখতিয়ার নয়, বরং আল্লাহ পাকের মহান দানে ধন্য হয়েই রূহ উন্নতি করে, আল্লাহ পাক যাকে যতখানি উন্নতি প্রদানের মর্জি করেন সে ততখানি উন্নতি করতে পারে।

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মানুষের রূহ বা মানবাত্মা যত উন্নতি করুক না কেন এবং তার পরিধি যত বিস্তৃতই হোক না কেন তা একটি সীমার মধ্যে থাকবে, অসীম হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ পাকের গুণাবলি অনন্ত অসীম, মানবাত্মার উন্নতি তেমন নয়। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে এটিই পার্থক্য।

মানুষ যত কামেল বা পরিপূর্ণই হোক না কেন তার রূহ যত উন্নতিই করুক না কেন, রূহানী বা আধ্যাত্মিক সাধনায় সে যে উন্নত মাকামেই পৌঁছুক না কেন, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকল গুণাবলি মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিতে পারেন। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, قربان رابیش بود حیرانی যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হন তাদের পেরেশানি হয় অধিকতর। এজন্যেই বলা হয়েছে, اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ "ঈমান হলো আশা এবং ভয়ের মাঝখানে"। আল্লাহর রহমতের আশা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর গজবের ভয়ও অপরিহার্য। যেমন কুরআনে কারীমের একখানি আয়াতে আশা ও ভয়কে একত্রিত করে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ [হে রাসূল!] আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর একথাও জানিয়ে দিন যে নিশ্চয় আমার আজাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

মোটকথা : রূহের উন্নতি পুরোপুরি আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। দান করা বা দান ছিনিয়ে নেওয়া সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন। এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিখ্যাত সুফী সাধক হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) প্রায় সারারাত ক্রন্দন করতেন। কোনো কোনো সময় এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে তাঁর প্রতিবেশীরা মনে করতো হয়তো তাঁর বাড়িতে কারো মৃত্যু হয়েছে। একবার তাঁর খাদেম জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনার এ ক্রন্দন কি জান্নাত লাভের জন্য? তিনি বললেন, জান্নাতের জন্য ক্রন্দনের কি প্রয়োজন? কেননা আল্লাহ পাক যদি জান্নাত আমাদেরকে না দেন তবে কি কাফেরদেরকে দেবেন? লোকটি পুনরায় পশ্ন করলো ঃ তা হলে আপনার এই ক্রন্দন কি দোজখের ভয়ে? তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করেন তবে কাফেরদেরকে কোথায় রাখবেন? লোকটি বলল, তাহলে আপনার ক্রন্দন কিসের জন্যে? হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) বললেন, আমার ক্রন্দনের কারণ হলো এই রাতের শেষ প্রহরে যখন সমগ্র বিশ্ববাসী নিদ্রায় বিভোর, তখন আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার এবং সেজদায় রত হয়ে নৈকট্য-ধন্য হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আমার ভয় হয় আমার কোনো আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে নৈকট্যের এই মাকাম থেকে বঞ্চিত না করেন। এ জন্যে আমি ক্রন্দন করি। মূলতঃ কুরআনে কারীমে এ কথাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে- وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ "আর আমি ইচ্ছা করলে যা কিছু নাজিল করেছি এর সব কিছু কেড়ে নিতে পারি কিন্তু আপনার প্রতিপালকের রহমত যে, তিনি তা করেননি।"

হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে দশজন সাহাবায়ে কেরামকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হলো, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নামই ছিল হযরত আবূ বকর (রা.) এর। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারাবাদ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় দেখা গেল হযরত আবূ বকর (রা.) ক্রন্দনরত রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ এত বড় সুসংবাদ পাওয়ার পর ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ পাক জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু যদি আমার কোনো আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করেন তখন আমার গতি কি হবে?

বস্তুত : এটিই হলো রুহানী উন্নতির উচ্চ মাকাম। এ পর্যায়ে স্বয়ং প্রিয়নবী ﷺ -এর অবস্থাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একখানি হাদীসে রয়েছে– হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আরজ করলেন, হুজুর ﷺ -এর কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হুজুর ﷺ -এর কোন কাজটি আশ্চর্যজনক নয়? একদিন তিনি আমার নিকট আগমন করলেন, আমার বিছানায় আমার লেপের নীচেই শায়িত হলেন। একটু পরেই তিনি উঠলেন এবং উঠে বললেন ঃ আমি তো আমার প্রতিপালকের ইবাদত করবো। একথা বলে তিনি অজু করে নামাজের নিয়ত করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাঁর অশ্রুতে বক্ষ মোবারক ভেসে গেল। এভাবে রুকূ' ও সেজদার হালতেও তিনি ক্রন্দন করতে থাকলেন। আর ক্রন্দন করে রাত অতিবাহিত করলেন। অবশেষে ফজরের নামাজের জন্য হযরত বেলাল (রা.) ডাকতে আসলেন। আমি আরজ করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক তো আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন। তবু এত ক্রন্দন করেন কেন? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি কেন ক্রন্দন করবো না? অথচ আর এ রাতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। এরপর ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস অনিবার্য যে এ আয়াতসমূহ পড়ে এবং চিন্তা করে না।

রূহের মাহাত্ম অনুভব করতে হলে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সমগ্র বিশ্ব একটা বিরাট কারখানা। তাতে অনেক প্রকার যন্ত্র রয়েছে। যথা ঃ শ্রবণযন্ত্র, দর্শন-যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র, চিন্তা করার যন্ত্র, পানাহার গ্রহণের যন্ত্র, খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের যন্ত্র, পানি নিষ্কাশনের যন্ত্র, চলাচল করার যন্ত্র প্রভৃতি। আর এজন্যেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক মানুষকে তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

বস্তুতঃ মানব দেহ একটি বিরাট কারখানা, এতে অনেক যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। কারখানার সত্তাধিকারী যখন তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করলেন, তখনই তাতে জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। ঠিক এমনিভাবে মানবদেহের যন্ত্র রূহ বিহীন অসার, জীবনীশক্তি বিহীন হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয় তখন তা জীবন্ত, বলন্ত, চলন্ত হয়ে উঠে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক কথাটি এভাবে ইরশাদ করেছেন– وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ "আর আমি তাতে আমার রূহকে ফুঁকে দিলাম"। ঠিক যেমন অচল কারখানা বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলে তা চলমান হয় এবং যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে মানবদেহে যখন রূহ সঞ্চারিত হয় তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জীবনীশক্তি অনুভূত হয়। বিদ্যুতের কোনো স্বতন্ত্র আকৃতি যেমন লক্ষ্য করা যায় না, ঠিক তেমনি রূহও অদৃশ্য, তাকে কেউ দেখে না, এমনকি রূহের বিস্ময়কর রহস্য আজও মানুষের কাছে উদঘাটিত নয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শুধু এতটুকুই ইরশাদ করেছেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ : "হে রাসূল! আপনি জানিয়ে দিন যে রূহ হলো আমার প্রতিপালকের নির্দেশ"। প্রশ্ন হলো, এই নির্দেশটি কী? কুরআনে করীমে এই প্রশ্নের জবাবে রয়েছে, اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ : আল্লাহ পাক যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও, তখন তা' হয়ে যায়। এই كن শব্দটি اَمْرٌ বা আদেশ। যখনই আল্লাহ পাক কোনো কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেন তখন তো সৃষ্টি হয়ে যায়। এটিই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনে خَلْق اَمْرٌ সৃষ্টি আর আদেশ উভয় শব্দকে একত্র করে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

সতর্ক হও, আল্লাহর জন্যই সৃষ্টি এবং আদেশ অর্থাৎ সৃষ্টি করার শক্তি শুধু তারই। আর আদেশ প্রদানের একচ্ছত্র অধিকারও শুধু তাঁরই, এতে আর কেউ শরিক নয়।

অতএব, মানুষের দেহকে একটি কারখানা মনে করা যেতে পারে। আর রূহকে কারখানায় প্রবাহিত বিদ্যুৎ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যেভাবে বিদ্যুতের সুইচ টিপে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ পাকের আদেশ হলে মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়।

রূহের গন্তব্যস্থল : হযরত আবূ বকর (রা.)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানবদেহ থেকে যখন রূহ বের হয়, তখন কোথায় যায়? তিনি বলেন, মানবদেহের রূহ সাতটি স্থানে যায়।

১. নবী রসূলগণের রূহ, এর অবস্থান জান্নাতে আদন।

২. ওলামায়ে কেরামের রূহ, এর স্থান হলো জান্নাতুল ফেরদাউস।

৩. নেককার মুমিনদের রূহ ইল্লীয়্যিনে স্থান পাবে।

৪. আল্লাহর রাহে শহীদগণের রূহ বেহেশতে উড়তে থাকে এবং যে কোনো স্থানে যেতে পারে।

৫. গুনাহগার মুমিনগণের রূহ আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, জমিনেও নয়; আসমানেও নয়। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

৬. মুমিনদের শিশু সন্তানদের রূহ কস্তুরীর পাহাড়ে থাকে।

৭. কাফেরদের রূহ সিজ্জীনে থাকে, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের দেহ সহ আজাব দেওয়া হয়ে থাকে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

كَلَّآ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা আলোচ্য আয়াতের مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ বাক্যটির অর্থ হলো مِنْ وَحْيِ اللّٰهِ অর্থাৎ রূহ হলো আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ মাত্র।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا : আর তোমাদেরকে সামান্য পরিমাণই জ্ঞান দান করা হয়েছে। এই সামান্য বলতে কতখানি তার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, মহাসমুদ্রে কোনো মানুষ তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দিলে মহাসমুদ্রের অথৈ পানির অনুপাতে ঐ আঙ্গুলের শীর্ষ যতখানি পানি ধারণ করে, ততখানি ইলমই মানুষকে দান করা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান অর্জনের পন্থা সীমিত। মানুষ শ্রবণ এবং দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। কুরআনে কারীমেই রয়েছে এর ঘোষণা।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا : আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃ-উদর থেকে বের করে এনেছেন, যখন তোমরা কিছুই জানতেনা তথা তোমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না।

পরবর্তী আয়াতে জ্ঞান অর্জনের পন্থা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ : আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন শ্রবণ–শক্তি, দর্শন-শক্তি ও অন্তঃকরণ। অতএব, মানুষকে সীমিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের ইলমের অনুপাতে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে অতি সামান্য ইলমই দান করা হয়েছে। তাফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন– পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, রূহ সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা বা রূহের মাহাত্ম উপলব্ধি করা তোমাদের শক্তির উর্ধ্বে। আর তা তোমাদের দীনি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্তও নয় তাই এ সম্পর্কে তোমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়নি। –[তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা– ৫৯৫]

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا : যদি আমি ইচ্ছা করি তবে [হে রাসূল!] আপনাকে যে ওহী দান করেছি তা কেড়ে নিয়ে যেতে পারি। এরপর আপনি আমার বিরুদ্ধে তা এনে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে কাউকে পাবেন না।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, সামান্য জ্ঞানটুকু দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তা-ও ছিনিয়ে নিতে পারেন। মানুষের অন্তর থেকে তা ভুলিয়ে দিতে পারেন। অথবা গ্রন্থে লিখিত অংশ মুছে দিতে পারেন। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ পাক যদি তাঁর মহান বাণী তুলে নেন তবে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যা' ফিরিয়ে দিতে পারে।

–[তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৩]

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সেই ভ্রান্ত ধারণাকারীদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা এই অন্যায় কথা বলেছে যে পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ রচনা করেন। কেননা এতে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সুস্পষ্ট তাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ওহী তাঁর নবীর প্রতি প্রেরণ করা হয় তা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে ছিনিয়ে নিতে পারেন। সেই শক্তি এবং অধিকার তাঁর আছে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ : "কিন্তু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে রহমতের কারণে"। অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন আপনার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেননা। কেননা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত আপনার প্রতি রয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো যদি আল্লাহ পবিত্র কুরআন ছিনিয়ে নেন তবে কেউ তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহম করেন তবে তিনিই ফিরিয়ে দিতে পারেন।

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন তা মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট এহসান। বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ পাকের দু'টি বিশেষ দান রয়েছে। এক. কুরআনের ইলম হাছেল করা আল্লাহ পাক তাদের জন্য সহজ করেছেন। দুই. পবিত্র কুরআনকে হেফজ করে রাখার তৌফিক দান করেছেন।

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ : পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِن شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত; বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ : এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কুরআনকে আল্লাহ্র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোনো মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কুরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্য রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কুরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কুরআনের আল্লাহ্র কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا - আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কুরআনের মোজেজা এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোনো প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর করে না এবং কুরআনরূপী নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতার উল্লেখ ছিল। মুশরিকরা যখন পবিত্র কুরআনের মোকবিলা করতে অক্ষম হয় তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে অনেক আজগুবি ফরমায়েশ করতে লাগলো আর বলল, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আমাদেরকে এ সব নিদর্শন দেখিয়ে দিন [যার আলোচনা পরে আসছে]। কাফেরদের সন্দেহ নিরসনকল্পে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে রয়েছে তাদের ভীত্তিহীন কথাবার্তার জবাব। -[তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত- আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (র.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭০]

শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) ইকরামার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, উতবা, শায়বা, আবূ সুফিয়ান, আবূ জেহেল, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, উমাইয়া ইবনে খালফ সহ মক্কার দূরাত্মা কাফেরদের একটি দল প্রিয়নবী ﷺ এর সঙ্গে দেখা করে বলল, আমরা আপনার রেসালাতে বিশ্বাস করতে পারি না যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের ফরমায়েশ পুরা করেন। আমাদের এই মক্কা শহর চারিপার্শ্বের পাহাড়ের কারণে সংকীর্ণ এবং সংকুচিত হয়ে আছে। এর সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। ইয়েমেন এবং সিরিয়াবাসীর ন্যায় আমাদের সম্পদও নেই। তাই আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করে এই পাহাড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে দিন। যাতে করে মক্কা শহরকে সম্প্রসারণ করা যায়। এমনিভাবে সিরিয়া এবং ইরাকের ন্যায় আমাদের পূর্ব পুরুষকে জীবিত করতে হবে, তাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কেলাব কুরাইশ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে ছিল অত্যন্ত সত্যবাদী। আমরা তাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো যে আপনি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। যদি সে আপনাকে সত্যায়িত করে তবে আমরাও আপনাকে সত্যবাদী মনে করব। রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করলেনঃ আমাকে এজন্যে প্রেরণ করা হয়নি, যে মহান বাণী নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তা তোমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। যদি তোমরা মেনে নাও তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের জন্যে তা' সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি অমান্য কর তবে আমি আল্লাহ্ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় সবর করবো। কাফেররা বলল, আচ্ছা যদি এসব না করেন তবে আপনি এতটুকু করিয়ে দিন যেন আপনাকে সত্যায়িত করার জন্যে আসমান থেকে ফেরেশতা প্রেরিত হয়। আর আপনাকে যেন কিছু বাগান এবং সোনা-রূপার তাণ্ডার প্রদান করা হয় তাতে আমরা আপনাকে যেরূপ দরিদ্র এবং দুঃখ কষ্টে পতিত দেখতে পাচ্ছি তা লাঘব হয় এবং আমাদের ন্যায় বাজারে গিয়ে আপনাকে রুজির অন্বেষণের চিন্তা না করতে হয়। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেননি। আমাকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। তখন কাফেররা বলল, তাহলে আমাদের উপর আসমানকে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হোক। কেননা আপনার দাবি হলো, আপনার প্রতিপালক এমনটি করতে পারেন। এর জবাবে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের উপর আসমান ফেলে দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তা করবেন। তখন জনৈক কাফের বলল, আমরা আপনার কথা ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না যতক্ষণ না আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে এনে আপনার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদের এ সব কথা শ্রবণ করে হুজুর ﷺ দাড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর ফুফু আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালেবের পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াও দাঁড়িয়ে গেল। পথে সে বলল, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কয়েকটি কথা বলল, আপনি তার কোনোটিই গ্রহণ করেননি। এরপর তারা আরও কিছু বিষয় আপনার কাছে চেয়েছে, এর দ্বারা মনে হয় যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আপনার বিশেষ মরতবা রয়েছে। কিন্তু আপনি সেগুলোও মানেননি। এরপর তারা আপনার নিকট আজাব নিয়ে আসার কথা বলেছে যে সম্পর্কে আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। এখন আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি শুধু তখনই বিশ্বাস করবো যখন আপনি আমার সম্মুখে সিড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণ করবেন আর সেখান থেকে আমরা সম্মুখে উন্মুক্ত গ্রন্থ নিয়ে আসবেন এবং আপনার সঙ্গে চারজন ফেরেশতাও আসবে যারা আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে এবং আমার ধারণা এ কাজটি করলেও আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবো না। কাফেরদের এসব কষ্টদায়ক কথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

ইবনে জারীর ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইকরামার বর্ণনার অবলম্বনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর সাঈদ ইবনে মনসূর সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতসমূহ আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৪৯-৫০]

قَوْلُهُ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا : আর তারা বলে আমরা আপনার কথা মানবো না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্যে জমিন থেকে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করেন।

বস্তুত: পবিত্র কুরআনের মোজেজা বা অলৌকিক প্রভাবে কাফেররা পরাজিত হয়ে অত্যন্ত উদ্ভট এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। কখনও বলে মক্কার বুক চিরে আমাদের জন্যে ঝর্ণা বের করে দিন। কখনও বলে মক্কার পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। আর কখনও বলে, যে পর্যন্ত খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান না হয় আর তার ফাঁকে ফাঁকে নহর সমূহ প্রবাহিত না হয় সে পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না।

এ আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যেহেতু কাফেরদের এ সমস্ত কথা শুধু হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কারণেই ছিল তাই তাদেরকে এ জবাব দেওয়া হয়েছে। যদি ঈমান আনয়নের উদ্দেশ্যে তারা এ সব কথা বলতো তবে হয়তো আল্লাহ পাক এ সব মোজেজাও দেখিয়ে দিতেন। এজন্যে প্রিয়নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে তাদের চাহিদা মোতাবেক এসব মোজেজা আমি দেখিয়ে দেব। তবে একথা স্মরণ রাখুন, যদি তারা এসব মোজেজা দেখার পরও ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব যা' ইতিপূর্বে কোনো জাতিকে দেওয়া হয়নি। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি তাদের জন্যে তওবা কবুল হওয়ার এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত রাখবো। হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় কথাটি পছন্দ করেছেন, কেননা তিনি হলেন রহমতের নবী। তাঁর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম।

-[তফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৭৩]

قَوْلُهُ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا : অথবা আপনি যেমন বলেন আমাদের উপর খণ্ড খণ্ড ভাবে আসমান পতিত করবেন অথবা আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قَبِيل শব্দটির অর্থ كَفِيل অর্থাৎ আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্যে সাক্ষী হিসাবে পেশ করুন। তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে আপনার কথা সত্য। আর একথা বিশ্বাস করার কারণে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার দায়িত্ব নিবেন আল্লাহ পাক, তার রসূল এবং ফেরেশতাগণ।

ইমাম কাতাদা (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে قَبِيلًا শব্দটির অর্থ হলো সামনা সামনি। অর্থাৎ আমাদের চোখের সম্মুখে আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে নিয়ে আসুন।

ফররা বলেছেন, আরবরা বলে لَقِيتُ فُلَانًا قِبَلًا وَقُبُلًا আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে সামনা সামনি সাক্ষাৎ করেছি।

قَوْلُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا : কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ এর নিকট যে সব অযথা আবদার করেছে তার জবাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, [হে নবী] আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী রাসূলগণের আগমন হয়েছে তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। আমিও তাঁদের ন্যায় একজন মানুষ। তবে আমি আল্লাহ পাকের মনোনীত রসূল! মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অযথা কোনো ফরমায়েশ বা আবদার করা আমার পক্ষে শুধু যে অশোভনীয় তাই নয়, বরং অসম্ভবও।

আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে বিধি-নিষেধ আসে তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়াই নবী রাসূলগণের কাজ। তাই তোমাদের এসব অনর্থক কথা-বার্তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকে সেই যুগ, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি মোতাবেক অনেক মোজেজাও দিয়েছেন। যেমন প্রিয়নবী ﷺ -কে অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার, তাঁর অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার, সামান্য খাদ্যে তিন হাজার লোকের তৃপ্তি লাভ করার মোজেজা প্রদান করা হয়েছে। এমনি ভাবে শবে মেরাজে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করার তথা আসমানে আরোহণ করার, জান্নাত দোজখ দেখার এবং আল্লাহ্ পাকের আরো অনেক বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন যা তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। এরপরও কাফেররা অনর্থক মোজেজা প্রদর্শনের যে ফরমায়েশ করছে তা শুধু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং কালিমালিপ্ত, ঘৃণ্য ও মন্দ স্বভাবের কারণেই করছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে আরও বিস্তারিতভাবে দূরাত্মা কাফেরদের অযথা আবদারের জবাবে ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ : যদি আপনার প্রতি [হে রসূল!] কাগজে লিখিত কিতাবও অবতরণ করতাম তবুও তারা বলতো এটা স্পষ্ট জাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

আরও এরশাদ হয়েছে- وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ : যদি তাদের জন্যে আসমানের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং, আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ : যদি কোনো কুরআন এমন হতো যার দ্বারা পাহাড়কে গতিশীল করা যেতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতো অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যেতো তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না।

অনুবাদ :

৯৪. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَىْ قَوْلُهُمْ مُنْكِرِيْنَ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا وَلَمْ يَبْعَثْ مَلَكًا ـ

৯৪. আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ফেরেশতা পাঠান নি? তাদের অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের এ উক্তিই লোকদেরকে বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত রাখে। যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ।

৯৫. قُلْ لَّهُمْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ بَدَلَ الْبَشَرِ مَلٰۤئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا اِذْ لَا يُرْسَلُ اِلٰى قَوْمٍ رَسُوْلٌ اِلَّا مِنْ جِنْسِهِمْ لِيُمْكِنَهُمْ مُخَاطَبَتُهُ وَالْفَهْمُ عَنْهُ ـ

৯৫. তাদেরকে বল, পৃথিবীতে মানব জাতির পরিবর্তে ফেরেশতাগণ যদি বিচরণ করত নিশ্চিন্তে তবে আমি আকাশ থেকে তাদের নিকট ফেরেশতাকেই রাসূল করে পাঠাতাম। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাদের জাতীয়ই কাউকেও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়। এতেই আলোচনা, সম্বোধন ও বক্তব্য বুঝা সম্ভবপর হয়।

৯৬. قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ عَلٰى صِدْقِىْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا عَالِمًا بِبَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ ـ

৯৬. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে আমার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ জানেন ও দেখেন। তাদের ভিতর ও বাইর সকল কিছু সম্পর্কে তিনি অবহিত।

৯৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاۤءَ يَهْدُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَاشِيْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ سَكَنَ لَهَبُهَا زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا تَلَهُّبًا وَاشْتِعَالًا ـ

৯৭. আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন সে পথ-প্রাপ্ত এবং আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও তাদের অভিভাবক পাবে না যে তাদেরকে হেদায়েত করবে। কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলাবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধীর রূপে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে অর্থাৎ তার লেলিহান শিখা প্রশমিত হবে তখনই আমি তাদের জন্য তার অগ্নি অর্থাৎ প্রজ্জ্বলন ও দহন বৃদ্ধি করে দেব।

৯৮. ذٰلِكَ جَزَاۤؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْا مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ـ

৯৮. এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নির্দেশসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং পুনরুত্থান অস্বীকার করে বলেছিল, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?

٩٩. أَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مَعَ عِظَمِهَا قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَيِ الْأَنَاسِيَّ فِي الصِّغَرِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لِلْمَوْتِ وَالْبَعْثِ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط فَأَبَى الظّٰلِمُوْنَ إِلَّا كُفُوْرًا جُحُوْدًا لَهُ .

৯৯. তারা কি লক্ষ্য করে না জানেনা আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এত বিশাল অবয়বের হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষও সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালঙ্ঘনকারীগণ কুফরি ব্যতীত তা প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সমস্তই অস্বীকার করে।

١٠٠. قُلْ لَّهُمْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ مِنَ الرِّزْقِ وَالْمَطَرِ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ لَبَخِلْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ خَوْفَ نَفَادِهَا بِالْإِنْفَاقِ فَتَفْتَقِرُوْا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا بَخِيْلًا .

১০০. তাদেরকে বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার যেমন জীবনোপকরণ, বৃষ্টি ইত্যাদির ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও ব্যয় হয়ে যাবে ব্যয় করলে ফুরিয়ে যাবে ও দরিদ্র হয়ে পড়বে এ আশঙ্কায় নিশ্চয় তা ধরে রাখতে এ বিষয়ে নিশ্চয় কৃপণতা প্রদর্শন করতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ। قَتُوْرٌ - কৃপণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, أَنْ টা হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ তাদের জন্য রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ ও কোনোরূপ প্রতিবন্ধক অবশিষ্ট থাকল না রাসূল প্রেরণের অস্বীকারকারীরা মুমিনগণকে এটা বলত যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণের জন্য মানুষকেই নির্বাচন করলেন?

قَوْلُهُ مُطْمَئِنِّيْنَ : এটা اِسْم فَاعِل এর- جَمْع مُذَكَّرْ - এর সীগাহ্ حَالَت نَصْبِيْ তে পতিত হয়েছে অর্থ– বাসস্থান বিনির্মাণকারী, অবস্থানকারী।

قَوْلُهُ لَوْ أَنْتُمْ : প্রশ্ন. لَوْ شَرْطِيَّة টা সর্বদা ফে'লের উপর আসে, কিন্তু এখানে اِسْم - এর উপর এসেছে। এর কারণ কি? উত্তর. أَنْتُمْ - এর পূর্বে فِعْل উহ্য রয়েছে। পরের ফে'লটি তার তাফসীর করতেছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, لَوْ مَا أُضْمِرَ تَمْلِكُوْنَ أَنْتُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ এখানে أَنْتُمْ - تَمْلِكُوْنَ -এর মধ্যকার ফায়েল -এর যমীরের تَاكِيْد হয়েছে এটা عَامِلَة -এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেররা রেসালাত ও নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বিদ্বেষমূলক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরও একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে। কাফেররা একথাও বলে যে যদি আল্লাহ পাকের রাসূল প্রেরণ করার ইচ্ছা হয়েই থাকে, তবে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাই পাঠাতেন। মানুষ আবার রাসূল হবে কি করে? মূলতঃ কাফেরদের এমনি ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন কথারই জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। ইরশাদ হয়েছে– وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إِلَّا أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا . অর্থাৎ মানুষের নিকট যখন হেদায়েত উপস্থিত হয় তখন এই একটি কথাই তাদেরকে ঈমান আনতে বারণ করে তবে কি আল্লাহ পাক মানুষকেই পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেছেন?'

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, অনেক লোক ঈমানের নিয়ামত থেকে এই জন্য বঞ্চিত হয়েছে যে, তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি, যে কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হতে পারেন। তারা প্রথমে আশ্চার্যান্বিত হয়েছে এবং পরে অস্বীকার করেছে, এমনকি তারা সুস্পষ্টভাবে বলে ফেলেছে যে, একজন মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ও একথাই বলেছিল, আমরা আমাদের ন্যায় দু'জন মানুষের প্রতি কিভাবে ঈমান আনবো? বিশেষত: যখন তাদের সমগ্র সম্প্রদায়ই আমাদের অধীনস্থ রয়েছে। এ ধরনের কথা অন্য নবীগণের পথভ্রষ্ট উম্মতরাও বলেছে। আর কোনো কোনো লোকেরা নবী রাসূলগণকে একথাও বলেছে, "তুমি তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, এমন অবস্থায় তুমি আল্লাহর রাসূল কি করে হবে? তুমি তো আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বল। অতএব বড় এবং বিস্ময়কর কোনো নিদর্শন পেশ কর"।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا : হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্ত মনে বাস করতো আর তাদের আসমানে গমনের অধিকার না থাকতো তাহলে আমি আসমান থেকে তাদের জন্য ফেরেশতাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করতাম। কিন্তু পৃথিবীতে তো মানুষ বাস করে যারা আসমান থেকে বিধি নিষেধ নিয়ে আসতে পারে না, তাই মানব জাতির হেদায়েতের জন্য মানুষকে রাসূল মনোনীত করে প্রেরণ করা জরুরি ছিল। মানুষের হেদায়েতের জন্যে ফেরেশতা প্রেরণ করা যায় না। আর ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করার মাধ্যমে উদ্দেশ্যও সফল হবে না। কেননা ফেরেশতারা যদি তাদের প্রকৃতরূপে আসে তাহলে মানুষ তাদেরকে দেখতে সক্ষম হবে না; বরং হেদায়েত লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর যদি ফেরেশতারা মানব রূপ ধারণ করে আসে, তবে ফেরেশতা রাসূল ও মানব রাসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এখন মানুষ রাসূলের ব্যাপারে তোমরা যে অলীক সন্দেহ পোষণ করছ তখনও তাই করবে। অতএব, ফেরেশতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণের দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ : "হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমাদের ও আমার মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট"। কাফেররা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাগণ যদি সামনা সামনি এসে আমাদেরকে আপনার সত্যতার কথা না বলেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না। কাফেরদের এই অন্যায় আবদারের জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে এর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা কার্যত: আমার সত্যতার কথা ঘোষণা করছেন।

আর আল্লাহ পাকের সাহায্যই যথেষ্ট তিনি আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অনেক মোজেজা প্রকাশ করার তৌফিক দান করেন। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট যে, আমি রেসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি, আল্লাহ পাকের মহান বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হওয়ার পরও তোমরা নিতান্ত বিদ্বেষের কারণে এর বিরোধিতা করেছো। আর আল্লাহ পাকই আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন। যে সত্যকে গ্রহণ করবে, তাকে তিনি ছওয়াব দান করবেন, আর যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন।

إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا : "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন" অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। ভয় প্রদর্শক নবী অথবা তাঁর উম্মত সকলের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। তোমাদের নিকট আমার নবুয়তের দাবি সম্পর্কেও তিনি অবগত এবং আমার মাধ্যমে তিনি বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন : এতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্য এক প্রকার সান্ত্বনা এবং কাফেরদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী এ মর্মে যে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরোধিতা করছে, যাদের দ্বারা মুসলমানগণ নির্যাতিত উৎপীড়িত হয়েছে তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ : আর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে-ই পথ পায়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ পাক ব্যতীত আপনি তার কোনো সহায় পাবেন না।

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে যারা অস্বীকার করেছে পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সকল সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ কাফেরদের হেদায়েতের ব্যাপারে অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে তাঁকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তৌফিক হলেই হেদায়েত লাভ সম্ভব হয়, যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের তৌফিক দান করেন, তারাই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। পক্ষান্তরে, যারা নিজেদের জেদ এবং হঠকারিতার কারণে আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়। এমনি অবস্থায় তাদেরকে সাহায্য করার মতো সাধ্য কারো থাকে না। কেননা হেদায়েত লাভের ব্যাপারে সাহায্য শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই আসতে পারে। কিন্তু তাদের অন্যায় অনাচার এবং জেদ ও হঠকারিতা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। পরিণামে তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্নই থেকে যায়। –[তফসীরে কাবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬০]

قَوْلُهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا : আর কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ বোবা ও বধির করে উঠাবো। তারা তাদের মুখের উপর চলবে। অথবা তাদেরকে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টেনে টেনে নেবে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা মুখের উপর কেমন করে চলবে? তখন তিনি ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক যাদেরকে তাদের পায়ের উপর চালাতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাদেরকে মুখেরও উপরে চালাতে পারবেন।

কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পন্থা :

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস আবূ দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি পন্থায় পুনরুত্থান করানো হবে। কিছু লোক আরোহী অবস্থায় থাকবে। আর কিছু লোক পদব্রজে চলবে। আর কিছু লোককে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টেনে নেবে। তখন এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! মুখের উপর কি করে চলবে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, যে আল্লাহ পাক পায়ের উপর চালাতে পারেন, নিঃসন্দেহে তিনি মুখের উপরও চালাতে পারেন। নাসায়ী, হাকেম এবং বায়হাক্বী হযরত আবূ যার (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি দলে বিভক্ত করে উঠানো হবে।

একদল পোশাক পরিহিত অবস্থায় পানাহার করে যানবাহনে আরোহী অবস্থায় থাকবে। আর এক দল পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আর এক দলকে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টানতে থাকবেন।

وَعُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا : অর্থাৎ "তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে উঠানো হবে।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অন্ধ, বোবা ও বধির করে পুনরুত্থানের এ অর্থ নয় যে, তারা কিছুই দেখতে পারবে না, কিছুই বলতে পারবে না বা কিছুই শ্রবণ করতে পারবে না; বরং এর অর্থ হলো– যেভাবে তারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহ দেখতে রাজি হতো না, আর সত্য বাণী গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করতো না এবং তাদের রসনা দ্বারা আল্লাহ পাকের বাণী উচ্চারণ করতো না, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন তারা এমন কোনো দৃশ্য দেখবে না যা তাদের শান্তি ও আনন্দের কারণ হতে পারে এবং তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে এমন কোনো কৈফিয়তও পেশ করতে পারবে না যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আর এমন কোনো কথাও তারা শ্রবণ করবে না, যা তাদের আনন্দের কারণ হতে পারে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে সে সব আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যাতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন : وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ : সেদিন পাপীষ্ঠরা দোজখকে দেখবে।

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا : অর্থাৎ সেখানেই তারা তাদের ধ্বংসকে ডাকবে।

سَمِعُوا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا : অর্থাৎ "পাপীষ্ঠরা সেখানে ক্রোধ এবং বিরক্তির কথা শ্রবণ করবে।" এ আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কাফেররা কেয়ামতের দিন দেখবে শুনবে, এমনকি চিৎকারও করবে।

قَوْلُهُ قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ الخ : এ আয়াতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মতো সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিন। এর জওয়াবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবি করছ। আমি তো একজন রাসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রিসালাত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কুরআনের অলৌকিকতার মোজেজাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনকে এখানে রহমতের অর্থ নবুয়ত ও রিসালাত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না– কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (র) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম দান। তাফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুয়ত। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

অনুবাদ :

١٠١. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ وَهِيَ الْيَدُ وَالْعَصَا وَالطُّوْفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ وَالطَّمْسُ وَالسِّنِيْنُ وَنَقْصٌ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَسْئَلْ يَا مُحَمَّدُ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ عَنْهُ سُؤَالَ تَقْرِيْرٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى صِدْقِكَ اَوْ فَقُلْنَا لَهُ اِسْاَلْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَفْظِ الْمَاضِيْ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا مَخْدُوْعًا مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِكَ.

১০১. হে মুহাম্মদ! বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ অর্থাৎ মুশরিকদের নিকট তোমার সত্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য এই জিজ্ঞাসা কর যে, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম এগুলো ছিল, হস্ত, লাঠি, জলোচ্ছ্বাস, পঙ্গপাল, কীট, ভেক, রক্ত, সম্পদ পাথরে পরিণত হওয়া, দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফলাদির ঘাটতি যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! আমি তো তোমাকে জাদুগ্রস্ত ধোঁকায় নিপতিত ও বুদ্ধিবিনষ্ট বলেই মনে করি। بَيِّنَاتٍ সুস্পষ্ট। فَاسْئَلْ কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যে, আমি মূসাকে বললাম, 'তুমি জিজ্ঞসা কর। অপর এক কেরাতে এটা مَاضِيْ অর্থাৎ অতীত কাল বাচক রূপে পঠিত রয়েছে।

١٠٢. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۤءِ الايات اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۤئِرَ ج عِبَرًا وَ لٰكِنَّكَ تُعَانِدُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا هَالِكًا اَوْ مَصْرُوْفًا عَنِ الْخَيْرِ.

১০২. মূসা বলেছিল, তুমি নিশ্চয় অবগত আছ যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক ব্যতীত এই সমস্ত নিদর্শন শিক্ষাপ্রদরূপে আর কেউ অবতীর্ণ করেনি। কিন্তু তুমি তোমার জেদ ও অবাধ্যতার উপরই বিদ্যমান। হে ফেরাউন! আমি তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে করি। عَلِمْتَ এটা অপর এক কেরাতে ت -এ পেশ সহ অর্থাৎ পুরুষ একবচনরূপে পঠিত রয়েছে। بَصَاۤئِرَ শিক্ষাপ্রদ। مَثْبُوْرًا ধ্বংসপ্রাপ্ত বা কল্যাণ হতে বিমুখ।

١٠٣. فَاَرَادَ فِرْعَوْنُ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ يُخْرِجُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ مِّنَ الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا.

১০৩. অতঃপর সে অর্থাৎ ফেরাউন তাদেরকে অর্থাৎ মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেশ থেকে অর্থাৎ মিসর ভূমি থেকে উচ্ছেদের বহিষ্কারের সংকল্প করল। তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গী সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

١٠٤. وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ اَيِ السَّاعَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا جَمِيْعًا اَنْتُمْ وَهُمْ.

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে অর্থাৎ তোমরা ও তারা সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।

١٠٥. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ وَبِالْحَقِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ نَزَلَ كَمَا اُنْزِلَ لَمْ يَعْتَرِهٖ تَبْدِيْلٌ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ اِلَّا مُبَشِّرًا مَنْ اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ وَّنَذِيْرًا مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ.	১০৫. আমি তা অর্থাৎ আল-কুরআন সত্য-সহই অবতীর্ণ করেছি এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল কিছু সত্য-সহই অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি আছে যেমন তা অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোনোরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি এটাকে স্পর্শ করেনি। হে মুহাম্মদ! আমি তো তোমাকে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দাতা এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।
١٠٦. وَقُرْاٰنًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهٗ فَرَقْنٰهُ نَزَّلْنٰهُ مُفَرَّقًا فِيْ عِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ ثَلَاثٍ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ مَهْلٍ وَتُؤَدَةٍ لِيَفْهَمُوْهُ وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ عَلٰى حَسَبِ الْمَصَالِحِ.	১০৬. কুরআন বিশ বর্ণনান্তরে তেইশ বৎসরে খণ্ড খণ্ডভাবে অবতীর্ণ করেছি। যাতে তুমি তা মানুষের নিকট থেমে থেমে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে পাঠ করতে পার ফলে, তারা যেন তা বুঝে। আর পরিস্থিতির পক্ষে কল্যাণকর চাহিদা অনুসারে কিছু কিছু করে আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। قُرْاٰنًا এটা এ স্থানে এমন একটি ক্রিয়াপদের মাধ্যমে مَنْصُوْب হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়া فَرَقْنَا হলো যার বিবরণবহ। فَرَقْنٰهُ অর্থাৎ এটা খণ্ড খণ্ড করে অবতীর্ণ করেছি।
١٠٧. قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ط تَهْدِيْدٌ لَهُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ قَبْلَ نُزُوْلِهَا وَهُمْ مُؤْمِنُوْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا.	১০৭. মক্কার কাফেরদেরকে বল, তোমরা এতে ঈমান আন অথবা ঈমান স্থাপন না কর, যাদেরকে এর পূর্বে অর্থাৎ এটা নাজিল করার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখনই তারা সেজদার লুটিয়ে পড়ে। ...اٰمِنُوْا তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর....কথাটি তাদের প্রতি হুমকী স্বরূপ।
١٠٨. وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنْ خُلْفِ الْوَعْدِ اِنْ مُخَفَّفَةٌ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا بِنُزُوْلِهٖ وَبَعْثِ النَّبِيِّ لَمَفْعُوْلًا.	১০৮. এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র মহান। ওয়াদা ভঙ্গ করা হতে তিনি পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের এতদ্বিষয়ের নাজিল হওয়ার এবং রাসূল [illegible] -এর প্রেরণের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়ে থাকে। اِنْ এটা এ স্থানে مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত।
١٠٩. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ وَيَزِيْدُهُمُ الْقُرْاٰنُ خُشُوْعًا تَوَاضُعًا لِلّٰهِ.	১০৯. এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে আর তা আল-কুরআন তাদের বিনয় আল্লাহর প্রতি বিনয়ই বৃদ্ধি করে। ...وَيَخِرُّوْنَ আয়াতটিতে অতিরিক্ত একটি গুণ উল্লেখসহ এটাকে পূর্বোল্লিখিত আয়াতটির সাথে عَطْف বা অন্বয় করা হয়েছে। [এটা সেজদা-ই-তেলাওয়াতের আয়াত]

١١٠. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ فَقَالُوْا إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ إِلٰهَيْنِ وَهُوَ يَدْعُوْا إِلٰهًا اٰخَرَ مَعَهُ فَنَزَلَ قُلِ لَهُمْ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط أَيْ سَمُّوْهُ بِأَيِّهِمَا أَوْ نَادُوْهُ بِأَنْ تَقُوْلُوْا يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ أَيًّا شَرْطِيَّةٌ مَّا زَائِدَةٌ أَيْ أَيَّ شَيْءٍ مِنْ هٰذَيْنِ تَدْعُوْا فَهُوَ حَسَنٌ دَلَّ عَلٰى هٰذَا فَلَهُ أَيْ لِمُسَمَّاهُمَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط وَهٰذَانِ مِنْهَا فَإِنَّهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ اَللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ.

১১০. রাসূলে কারীম ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ! হে রাহমান!" এটা শুনে মুশরিকগণ বলত, "আমাদেরকে ইনি দুই মাবূদের ইবাদত করতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই আল্লাহর সাথে অপর এক মাবূদ রাহমান -কে ডাকেন।" এ সম্পর্কে নাজিল হয় : তাদের বল, তোমরা "আল্লাহ" নামে আহ্বান কর বা "রাহমান" নামে আহ্বান কর অর্থাৎ এ দুই-এর যে নামেই তোমরা তাঁর নামকরণ কর, বা এর অর্থ হলো, এ দুই-নামের যে কোনো নামে তোমরা তাঁকে ডাক, যেমন বল, "হে আল্লাহ" বা "হে রাহমান", মোটকথা তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাই সুন্দর। এর প্রমাণ হলো তাঁর অর্থাৎ ঐ নামাঙ্কিত মহান সত্তার জন্য রয়েছে সুন্দরতম বহু নাম। আর উল্লিখিত দুটিও আল্লাহ ও রাহমান এগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিনিই আল্লাহ–যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি আর রাহমান–অতি মেহেরবান, আর রাহীম–পরম দয়ালু, আল মালিক–রাজাধিরাজ, আল-কুদ্দূস–নিষ্কলুষ, আস-সালাম–শান্তি বিধায়ক, আল-মু'মিন–নিরাপত্তা বিধায়ক, আল-মুহায়মিন–নিগাহবান, আল'আযীয–প্রবল, আল-জাব্বার– পরাক্রমশালী, আল-মুতাকাব্বির অহংকারের অধিকারী, আল খালিক-সৃষ্টিকর্তা, আল বারী–উন্মেষকারী, আল মুসাওবীর–রূপদানকারী, আল গাফ্ফার– মহাক্ষমাশীল, আল কাহ্হার–মহাপরাক্রান্ত, আল ওয়াহ্হাব–মহাবদান্য, আর রায্যাক–রিজিকদাতা, আল ফাত্তাহ–মহা বিজয়ী, মহা উদঘাটক, আল আলীম–মহাজ্ঞানী, আল কাবিয–সংকোচনকারী, আল বাসিত–সম্প্রসারণকারী, আল খাফিয–আবনমনকারী, আর রাফী– উন্নয়নকারী, আল মুইযয–সম্মানদাতা, আল মুযিল্ল–হতমানকারী, আস সামী–সর্বশ্রোতা, আল বাসীর–সর্বদ্রষ্টা, আল হাকাম– মীমাংসাকারী, আল 'আদল–ন্যায়নিষ্ঠ, আল লাতীফ–সূক্ষ্ম দক্ষতাসম্পন্ন, আল খাবীর–সর্বজ্ঞ, আল হালীম–অতিসহিষ্ণু, আল আজীম– মহিমাময়, আল গাফূর–ক্ষমাশীল, আশ্ শাকূর– গুণগ্রাহী, আল 'আলী–অত্যুচ্চ, আল কাবীর–বিরাট, মহান, আল হাফীজ–মহারক্ষক, আল মুকীত–আহার্যদাতা, আল হাসীব–মহা পরীক্ষক, আল জালীল–প্রতাপশালী, আল কারীম–মহামান্য, দয়ার্দ্র, আর রাকীব–নিরীক্ষণকারী, আল মুজীব-দোয়া কবুলকারী, আহ্বানের প্রতি উত্তরদানকারী, আল ওয়াসি– সর্বব্যাপী, আল হাকীম–হিকমত ওয়ালা, বিচক্ষণ, আল ওয়াদূদ–প্রেমময়, আল মাজীদ– গৌরবময়, আল বা'ইছ–পুনরুত্থানকারী, আশ্ শাহীদ– প্রত্যক্ষকারী, আল হাকক–মহাসত্য, আল ওয়াকীল– তত্ত্বাবধায়ক, আল কাবিয়্যু–শক্তিশালী, আল মাতীন– দৃঢ়তাসম্পন্ন।

اَلْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ اَلْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اَلْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ اَلْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ اَلْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيْ الْمُتَعَالِيْ اَلْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِيْ اَلْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِيْ اَلْبَدِيْعُ الْبَاقِيْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ تَعَالٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ بِقِرَاءَتِيْ فِيْهَا فَيَسْمَعُكَ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوْكَ وَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهٗ وَلَا تُخَافِتْ تُسِرْ بِهَا ص لِيَنْتَفِعَ اَصْحَابُكَ وَابْتَغِ اِقْصِدْ بَيْنَ ذٰلِكَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا وَسَطًا ۔

আল ওয়ালী– অভিভাবক, বন্ধু, আল হামীদ প্রশংসিত, আল মুহসী– সংখ্যা নিরুপণকারী, আল মুবদি'–আদি স্রষ্টা, আল মুঈদ– পুনঃসৃষ্টিকারী, আল মুহ্‌ই– জীবন দাতা, আল মুমীত–মরণদাতা, আল হায়্যু–চিরঞ্জীব, আল কায়্যূম–স্বয়ং স্থিতিশীল, আল ওয়াজিদ–অবধায়ক, প্রাপক, আল মাজিদ–মহান, আল ওয়াহিদ–একক, আস্ সামাদ–অনপেক্ষ, মুখাপেক্ষিতাহীন, আল কাদির–সামর্থ্যশালী, আল মুকতাদির–ক্ষমতাশালী, আল মুকাদ্দিম–অগ্রবর্তীকারী, আল-মুআখ্‌খির– পশ্চাৎবর্তীকারী, আল আওওয়াল–সকল কিছুর প্রথম, অনাদি, আল আখির–সকল কিছুর শেষ, অনন্ত, আযযাহির– প্রকাশ্য, আল বাতিন-অভ্যন্তর, গুপ্ত, আল ওয়ালী–কার্য নির্বাহক, আল মুতা'আল-সমুন্নত, আল–বারর–ন্যায়বান, আত্ তাউওয়াব–মহা তওবাকবুলকারী, আল মুন্‌তাকিম-প্রতিশোধ গ্রহণকারী, আল 'আফুবু-ক্ষমা প্রদর্শনকারী, আর রাউফ-কোমল, আল মালিকুল মুলক–রাজ্যের অধিকারী, যুল জালালী ওয়াল ইকরাম–মহিমান্বিত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ, আল মুকসিত-ন্যায়পরায়ণ, আল জামি'–একত্রকারী, আলগানী-অভাবমুক্ত, আল মুগনী-অভাবমোচনকারী, আল মানি'–প্রতিরোধকারী, আয্ যারর-অকল্যাণকর্তা, আল নাফি'–উপকারকারী, আন্ নূর-জ্যোতি, আল হাদী–পথ প্রদর্শক, আল বাদী'–অভিনব সৃষ্টিকারী, আল বাকী-চিরস্থায়ী, আল ওয়ারিছ– উত্তরাধিকারী, আর রশিদ–কল্যাণ পথে পরিচালনাকারী, আস সাবূর–ধৈর্যশীল [তিরমিযী শরীফ]। তোমার সালাতে অর্থাৎ সালাতে কেরাত পাঠে স্বর উচ্চ করো না কেননা মুশরিকগণ তোমার নিকট থেকে এটা শুনবে ও তোমাকে গালি দিবে এবং কুরআন ও যিনি এই কুরআন নাজিল করেছেন তাঁকে গালি-গালাজ করবে, আবার তোমার সাহাবীরাও যেন উপকৃত হতে পারে তাই অতিশয় ক্ষীণও করো না। এই দুয়ের মধ্যে অর্থাৎ স্বর উচ্চ করা ও ক্ষীণ করার মধ্যে পথ তা'লাশ কর অর্থাৎ এতদুভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। اَيًّامَا এ স্থানে اَيًّا শব্দটি شَرْطِيَّه বা শর্তবাচক, আর مَا শব্দটি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। অর্থ এতদুভয়ের যে কোনোটিই ডাক না কেন। لَاتُخَافِتْ ক্ষীণ করো না, স্বর একেবারে নীচু করো না। اِبْتَغِ তালাশ কর, গ্রহণ কর।

١١١. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ز الْاُلُوْهِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ يَنْصُرُهٗ مِنْ اَجْلِ الذُّلِّ اَيْ لَمْ يَذِلَّ فَيَحْتَاجُ اِلٰى نَاصِرٍ وَّكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۔

১১১. আর বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, সার্বভৌমত্বে মাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর কোনো অভিভাবক নেই যে তাঁকে সাহায্য করবে অবমাননার বিষয়ে। অর্থাৎ তিনি কখনও লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন না যে, এটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর কোনো সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হতে হবে। সুতরাং তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

عَظِّمْهُ عَظْمَةً تَامَّةً عَنِ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَالشَّرِيْكِ وَالذُّلِّ وَكُلِّ مَالاَ يَلِيْقُ بِهِ وَتَرْتِيْبُ الْحَمْدِ عَلٰى ذٰلِكَ لِلدَّلاَلَةِ عَلٰى اَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ لِكَمَالِ ذَاتِهِ وَتَفَرُّدِهِ فِىْ صِفَاتِهِ رَوَى الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهِ عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْهُ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اٰيَةُ الْعِزِّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ مُؤَلِّفُهُ هٰذَا اٰخِرُ مَا كَمَّلْتُ بِهِ تَفْسِيْرَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ اَلَّفَهُ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ جَلَالُ الدِّيْنِ الْمَحَلِّىْ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ اَفْرَغْتُ فِيْهِ جُهْدِىْ وَبَذَلْتُ فِيْهِ فِكْرِىْ فِىْ نَفَائِسَ اَرَاهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تُجْدِىْ * وَاَلَّفْتُهُ فِىْ مُدَّةِ قَدْرِ مِيْعَادِ الْكَلِيْمِ وَجَعَلْتُهُ وَسِيْلَةً لِلْفَوْزِ بِجَنَّاتِ النَّعِيْمِ وَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُكَمَّلِ * وَعَلَيْهِ فِى الْاٰىِ الْمُتَشَابِهَةِ الْاِعْتِمَادُ وَالْمُعَوَّلُ * فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً نَظَرَ بِعَيْنِ الْاِنْصَافِ اِلَيْهِ * وَوَقَفَ فِيْهِ عَلٰى خَطَإٍ فَاَطْلَعَنِىْ عَلَيْهِ.

* وَقَدْ قُلْتُ شِعْرًا

* حَمِدْتُ اللّٰهَ رَبِّىْ اِذْ هَدَانِىْ

সন্তান গ্রহণ, শরিক গ্রহণ করা, অবমাননা ইত্যাদি যত ধরনের বিষয় তাঁর সত্তার যোগ্য নয় সেই সকল বিষয় থেকে তার সমুচ্চ পবিত্রতা ও মর্যাদার পরিপূর্ণ ঘোষণা দাও। এই আয়াতটিতে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করার বিষয়টিকে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিন্যস্ত করায় প্রমাণ হয় যে, তাঁর সত্তার পরিপূর্ণতা ও সকল গুণে তাঁর এককত্বের দরুনই তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। ইমাম আহমাদ তৎসংকলিত মুসনাদে মুআয আল-জুহানী প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলতেন, আয়াতুল ইয্য বা মর্যাদার আয়াত হলো : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا... হতে শেষ পর্যন্ত। اَللّٰهُ اَعْلَمُ "আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন। এ তাফসীর খানার সংকলয়িতা [জালালুদ্দীন সুয়ূতী] বলছি, বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ আল্লামা আল ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী আশ শাফিঈ (র.) আল কুরআনুল কারীমের যে অসমাপ্ত তাফসীর খানা সংকলন করেছিলেন এটা সম্পূর্ণ ও সমাপ্তকরণ কর্মের এই হলো শেষ। এই কাজে আমি আমার শক্তি নিঃশেষে ব্যয় করেছি। আমার চিন্তা ভাবনা এমন কিছু সুন্দর ও ভালো বিষয়ের মধ্যে লাগিয়েছি ইনশা আল্লাহ এগুলো সকলের উপকারে আসবে বলে আমি ধারণা করি। কলীমুল্লাহ হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে তাওরাত লাভ করতে যে সময়টুকু ব্যয় করেছিলেন সে সময়ের মধ্যে অর্থাৎ চল্লিশ দিনে আমি তাফসীরের এ অংশটুকু সংকলন করতে সক্ষম হয়েছি। নিয়ামত ও সুখ-স্বচ্ছন্দময় জান্নাত লাভে কামিয়াব হওয়ার পথে বইটিকে আমি অন্যতম অসিলা বানালাম। এ তাফসীরখানা মূলত: সমাপ্তকৃত তাফসীরটির অর্থাৎ ইমাম মাহাল্লীর তাফসীরকৃত অংশে অনুসৃত পদ্ধতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মুতাশাবিহ ও যে সমস্ত আয়াত দ্ব্যর্থ বোধক সেই সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও তারই উপর নির্ভর করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহম করুন যারা এই তাফসীরটির প্রতি ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং কোনো ভুল পরিদৃষ্ট হলে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি চরণ রচনা করেছি–

আল্লাহ আমার প্রভু– প্রশংসা যত সকলই তাঁহার।

তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন পথ উহার,

* لَمَّا اَبْدَيْتُ مَعَ عِجْزِىْ وَضُعْفِىْ
* فَمَنْ لِىْ بِالْخَطَا فَارُدُّ عَنْهُ
* وَمَنْ لِىْ بِالْقَبُوْلِ وَلَوْ بِحَرْفٍ هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ
قَطُّ فِىْ خُلْدِىْ اَنْ اَتَعَرَّضَ لِذٰلِكَ لِعِلْمِىْ
بِالْعِجْزِ عَنِ الْخَوْضِ فِىْ هٰذِهِ الْمَسَالِكِ
وَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّنْفَعَ بِهٖ نَفْعًا جَمًّا وَيَفْتَحَ بِهٖ
قُلُوْبًا غُلْفًا وَاَعْيَانًا عُمْيًا وَاٰذَانًا صُمًّا
وَكَاَنِّىْ بِمَنْ اعْتَادَ بِالْمُطَوَّلَاتِ وَقَدْ اُضْرِبَ
عَنْ هٰذِهِ التَّكْمِلَةِ وَاَصْلِهَا حَسْمًا وَعَدَلَ اِلٰى
صَرِيْحِ الْعِنَادِ وَلَمْ يُوَجِّهْ اِلٰى دَقَائِقِهِمَا
فَهْمًا وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى
الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهٖ هِدَايَةً اِلٰى سَبِيْلِ
الْحَقِّ وَتَوْفِيْقًا وَاطِّلَاعًا عَلٰى دَقَائِقِ
كَلِمَاتِهٖ وَتَحْقِيْقًا وَجَعَلْنَا بِهٖ مَعَ الَّذِيْنَ
اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ
وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَ
حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَ مُؤَلِّفُهٗ
عَامَلَهُ اللّٰهُ بِلُطْفِهٖ فَرَغْتُ مِنْ تَالِيْفِهٖ يَوْمَ
الْاَحَدِ عَاشِرِ شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَثَمَانِ
مِائَةٍ وَكَانَ الْاِبْتِدَاءُ فِيْهِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ
مُسْتَهَلَّ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَفَرَغَ
مِنْ تَبْيِيْضِهٖ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ سَادِسَ صَفَرَ سَنَةَ
اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ وَثَمَانِ مِائَةٍ

যাহা আমি করিয়াছি শুরু।
সকল অক্ষমতা লইয়া আমার
কে আছেন এমন সুজন।
যিনি দেখাইয়া দিবেন আমার ভুল
আর আমি আসিব ফিরে।
সেই সব হতে, এমনও বা কে আছেন।
যিনি একটি হরফ হলেও আমার, করিবেন কবুল। আমার অক্ষমতা সম্পর্কে আমার জ্ঞানের কারণে কোনো দিন এই দুরূহ পথে চলার ধারণাও আমার মনে উদিত হয়নি। যা হোক, হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপুল ভাবে উপকৃত করবেন, বহু অবরুদ্ধ মনের দুয়ার খুলে দিবেন, বহু অন্ধ চক্ষু ও আবদ্ধ কর্ণকে উন্মিলীত করে দিবেন। আর যারা বিরাট ও বিপুল পরিসরের গ্রন্থতে অভ্যস্ত তাদের কথা ভিন্ন কিন্তু যারা এ গ্রন্থখানায় ও এর মূল তাফসীর গ্রন্থ খানা হতে নিজদেরকে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে রাখে ও একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং সুস্পষ্ট বিদ্বেষে যারা আবিষ্ট ও এতদুভয়ের তাৎপর্যপূর্ণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহের প্রতি যাদের দৃষ্টি নেই তাদের সম্পর্কে বক্তব্য হলো যে, এ পৃথিবীতে যারা সত্য সম্পর্কে অন্ধ তারা আখেরাতেও অন্ধরূপেই প্রতিভাত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এর মাধ্যমে সত্য-পথের হেদায়েত দান করুন। এর তাওফীক দিন এবং তাঁর কালামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অবহিত লাভ ও এর তাহকীক ও গবেষণার শক্তি দিন। আর নাবিয়্যীন, সিদ্দিকীন, শহীদগণ ও সালেহীন যাদেরকে তিনি তাঁর নিয়ামতে অভিসিক্ত করেছেন তাদের সাথে আমাদের হাশর করুন। সঙ্গী হিসাবে তাঁরা কতই না উত্তম! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তিনি এক অদ্বিতীয়, নাজিল করুন নবীজি এবং তাঁর পরিজন ও সাহাবীদের উপর অগণন ও অসংখ্য সালাত ও সালাম। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। এই সংকলক, আল্লাহ তাঁর সাথে লুত্‌ফ ও মেহেরবানির ব্যবহার করুন, বলছি যে, আটশত সত্তর হিজরি সনের দশই শাওয়াল রবিবার আমার এ খসড়া লেখা সমাপ্ত হয়। উক্ত সনের পহেলা রমজান বুধবার এই কাজ শুরু করেছিলাম আর আটশত একাত্তর সনের ছয়ই সফর বুধবার এর পাণ্ডুলিপি সাফ করার কাজ শেষ হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوَالُ تَقْرِيرٍ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর তো জানা ছিল, এরপরও প্রশ্ন করার মধ্যে ফায়দা কি?

উত্তর. এটা سُوَالُ اِسْتِفْهَامٍ নয় ; বরং এটা হলো سُوَالُ تَقْرِيرٍ

قَوْلُهُ قَبْلَ نُزُوْلِهِ : এখানে نُزُوْلُ মুযাফ উহ্য মেনে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, قَبْلَ الْقُرْاٰنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَبْلَ نُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ আর এটা সম্ভব নয়। কেননা قُرْاٰنْ হলো قَدِيْم কাজেই এর পূর্বে হুকুম দেওয়ার কোনো অর্থই হতে পারে না।

قَوْلُهُ عَطْفٌ بِزِيَادَةٍ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর যে, يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ - এর আতফ পূর্বের يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ -এর উপর হয়েছে। যার কারণে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ টা مَعْطُوْف একই হয়ে গেছে, অথচ مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর বিপরীত হওয়া জরুরি।

উত্তর. مَعْطُوْفٌ -এর মধ্যে يَبْكُوْنَ সিফতের বৃদ্ধি রয়েছে যার কারণে اِتِّحَادٌ অবশিষ্ট থাকেনি।

قَوْلُهُ اَىَّ شَيْئٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَيًّا - এর মধ্যে تَنْوِيْن টা مُضَافٌ اِلَيْهِ - এর পরিবর্তে হয়েছে। - نِدَاءٌ - এর অর্থে নয়।

قَوْلُهُ فَهُوَ حَسَنٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَيًّامَا শর্তের جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। এবং فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى টা উহ্য جَزَاءٌ -এর উপর দালালত করতেছে। جَزَاءٌ কে উহ্য করে - جَزَاءٌ - এর উপর দালালতকারীকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ لِمُسَمَّاهُمَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَلَهُ - এর যমীর উহ্য مُسَمّٰى - এর দিকে ফিরেছে, اِسْم - এর দিকে নয়। অন্যথায় اِسْم -এর জন্য اِسْم হওয়া আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ تَرْتِيْبُ الْحَمْدِ عَلٰى ذٰلِكَ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই যে, حَمْد বলা হয় কোনো ভালো اِخْتِيَارِىْ কর্মের প্রশংসা করাকে (اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ) উল্লিখিত আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ এই আয়াতে তিনটি গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনোটিই سَلْبِىْ হয়েছে اِيْجَابِىْ নয়। অথচ حَمْد হয় اِيْجَابِىْ -এর উপর; سَلْبِىْ এর উপর নয়। কেননা سَلْبِىْ - এর উপর تَنْزِيْهَةٌ হয়ে থাকে।

উত্তর. لِكَمَالِ ذَاتِهِ দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত তিনটি سَلْبِىْ সিফাত এই সম্ভাবনার نَفِىْ করতেছে যা اِحْتِيَاجٌ - এর مُقْتَضٰى হয় এবং وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهِ - এর উপর দালালত করে অর্থাৎ সবাই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, (جُمَلٌ) উত্তরের সারকথা হলো এই যে, যেমনিভাবে صِفَاتٌ - এর কারণে প্রশংসার উপযুক্ত হয়, এমনিভাবে ذَاتٌ - এর কারণেও প্রশংসার উপযুক্ত হয়। আর تَمْثِيْل - এর পদ্ধতিতে উত্তর এই যে, উল্লিখিত তিনটি سَلْبِىْ صِفَاتٌ - এর মধ্যে নিয়ামত এই যে, রাজার যখন স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকে, তখন ভৃত্যদের উপর পরিবার পরিজনের ব্যয় মিটানোর পর উদ্বৃত্ত থেকে ব্যয় করে। আর যখন তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি থাকে না তখন রাজা সকল দান অনুদানকে ভৃত্যগণের জন্যই ব্যয় করে থাকেন। এমনিভাবে সন্তান না হওয়া ভৃত্যগণের উপর অধিক অনুদানের مُقْتَضٰى হয়ে থাকে। আর نَفِىْ شَرِيْك - এর মধ্যে নিয়ামত এই যে, শরিক হওয়ার চেয়ে শরিক না হওয়ার সুরতে রাজা অনুদান দানের ক্ষেত্রে ভীড় না থাকার কারণে অধিক সক্ষম হন। আর نَفِىْ نَصِيْر - এর সুরতে নিয়ামত এটা হয় যে, نَصِيْر - এর نَفِىْ টা শক্তি ও অমুখাপেক্ষীতা বুঝায়। আর এই উভয়টি অধিক অনুদান দানের সক্ষমতাকে বুঝায়। এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত তিনটি سَلْبِىْ صِفَاتٌ গুলো اِيْجَابِىْ হয়ে যায়। কাজেই তার উপর প্রশংসা বর্ণনা করা বৈধ হয়।

قَوْلُهُ اٰيَتُ الْعِزِّ : اٰيَتُ عِزَّتْ অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (আয়াত) অর্থাৎ রাসূল ﷺ এই আয়াতকে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মানুবর্তিতার সাথে প্রত্যহ এই আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। পাঠরীতি হচ্ছে এই যে, প্রথমে تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ পাঠ করবে। এরপর প্রত্যহ ৩৫১ বার قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا নিয়মানুবর্তিতার সাথে পাঠ করবে। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন, সাবী]

قَوْلُهُ وَقَدْ اَفْرَغْتُ فِيْهِ جُهْدِىْ اَىْ فِىْ مَا كَمَّلْتُ بِهِ : অর্থাৎ فِيْهِ - এর যমীরটা مَا كَمَّلْتُ - এর দিকে ফিরেছে। এমনিভাবে رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهِ পর্যন্ত সকল যমীর مَا كَمَّلْتُ - এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ فِىْ نَفَائِسَ : এটা فِيْهِ থেকে بَدَل হয়েছে। অথবা فِىْ نَفَائِسَ - এর মধ্যে فِىْ টা مَعَ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مَعَ نَفَائِسَ আর نَفَائِسَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো دَقَائِقُ حَقَائِقُ এবং পছন্দনীয় نِكَاتٌ نَفِيْسَةٌ বা বালাগাত পূর্ণ বাক্য যা সকলের বুঝে আসে না।

قَوْلُهُ اُرَاهَا : এখানে اُرَاهَا শব্দটি هَمْزَةٌ তে যবর ও পেশ উভয় হরকতই বৈধ রয়েছে। অর্থ হলো اَعْلَمُ وَاَظُنُّ আর تَجْرِىْ টা اُرٰى -এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর هَا হলো প্রথম মাফঊল। অর্থাৎ اُرَاهَا تَجْرِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ جَدْوَاهَا অর্থাৎ হে সম্বোধিত ব্যক্তি! আমি মনে করতেছি যে, এই সূক্ষ্ম ব্যাপার তোমাকে উপকৃত করবে যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন যে, এটা তোমাকে উপকৃত করবে। تَجْرِىْ অর্থ হলো تَنْفَعُ

قَوْلُهُ وَالْفَتْهُ فِىْ مُدَّةِ قَدْرِ مِيْعَادِ الْكَلِيْمِ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যতদিন তূর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন। আর তা হলো চল্লিশ দিন। রচনার সূচনা করা হয়েছে ১লা রমজান থেকে এবং ১০ই শাওয়াল এটা পূর্ণতা লাভ করেছে। মুফাসসির আল্লামা সুয়ূতী (র.) تَحْدِيْثُ نِعْمَتٍ - এর ভিত্তিতে এই সময়ের প্রকাশ করেছেন। কেননা সাধারণত এত অল্প সময়ে এত বড় কাজ সম্পাদন করা অভ্যাস বিরুদ্ধই হয়ে থাকে। সে সময় আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ (বাইশ) বছরের চেয়ে কম। যেমনটি আল্লামা কারখী উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ যে অংশ আল্লামা সুয়ূতী (র.) রচনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَهُمْ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُكَمَّلِ : আল্লামা সুয়ূতী (র) এটা كَسْرِنَفْس তথা নিজেকে ছোট মনে করার ভিত্তিতে বলেছেন।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লামা মহল্লী (র)-এর রচনা কৃত।

قَوْلُهُ اِذْ هَدَانِىْ : এখানে اِذْ টা হলো تَعْلِيْلِيَّةٌ অর্থাৎ لِاَجْلِ هِدَايَتِهِ لِلَّذِىْ اَبْدَيْتُهُ وَ اَظْهَرْتُهُ আর তা হলো উল্লিখিত تَكْمِلَةٌ

قَوْلُهُ فَمَنْ لِىْ بِالْخَطَا : অর্থাৎ مَنْ اَظْهَرَ لِىَ الْخَطَأَ অর্থাৎ যে মহান ব্যক্তি আমার ভুল শুধরে দিবেন আমি সেই ভ্রান্তি ফিরে আসব তথা তার সংশোধন করব।

قَوْلُهُ اَضْرِبْ حَسْمًا : অর্থাৎ اَعْرِضْ اِعْرَاضًا

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهِ : এখানে فِىْ টা عَنْ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مَنْ كَانَ عَنْ هٰذِهِ اَعْمٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি জালালাইনে পূর্বের এবং সংযুক্ত উভয় অংশ থেকে বঞ্চিত ও অজ্ঞাত থাকবে সে অন্যান্য কিতাব থেকেও বঞ্চিত ও অজ্ঞাত থাকবে।

فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى এখানেও فِىْ টা عَنْ অর্থে হয়েছে এবং اٰخِرَةٌ দ্বারা مُطَوَّلَاتٌ উদ্দেশ্য। অর্থ হলো এই যে, যে ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে অজ্ঞাত ও বঞ্চিত থাকবে সে مُطَوَّلَاتٌ তথা তাফসীরের বড় বড় কিতাব থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

قَوْلُهُ رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهِ : بِهِ-এর যমীর কুরআনের দিকে ফিরেছে। এর পরের যমীরগুলোও قُرْاٰنٌ - এর দিকে ফিরেছে। কিন্তু বাক্যের ধারা অনুপাতে অধিক মুনাসিব হলো এই যমীর ও পরবর্তী যমীরগুলো لَمَّا كَمُلَ অর্থাৎ সংযুক্ত অংশের দিকে ফিরবে।

قَوْلُهُ فَرَغْتُ مِنْ تَالِيْفِهِ الخ : আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন যে, আমি প্রথম অর্ধেকের খসড়া কপি ৮৭০ হিজরির ১০ই শাওয়াল রবিবার দিন সমাপ্ত করেছি। আর এর রচনা শুরু করেছিলাম ৮৭০ হিজরির ১লা রমজান। এবং এটাকে পরিচ্ছন্ন করে লেখা শেষ করেছি ৮৭১ হিজরির ৬ই সফর বুধবার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের অনেক প্রশ্নের জবাব ছিল। এ আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউন এবং তার দলবলের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় ঈমান আনেনি। অবশেষে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এভাবে হে মক্কার কাফেররা তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ -এর নিকটও মোজেজার দাবি কর। যদি তোমাদের আবদার অনুযায়ী সে সব মোজেজা প্রকাশ করা হয় তবুও তোমরা সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনবে না। যেভাবে দুরাত্মা ফেরাউন তার সকল শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করতে পারেনি, ঠিক এমনিভাবে তোমরা আমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ -এর মোকাবিলা করতে পারবে না। হযরত মূসা (আ.) কে আল্লাহ পাক লাঠির মোজেজা দিয়েছেন এবং সর্বশেষ নবীকে কুরআনের মোজেজা দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরেশতা ছিলেন না মানুষই ছিলেন, প্রকাশ্যে অসহায়, নিরুপায় ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। অতএব, হযরত মোহাম্মদ ﷺ এর প্রকাশ্য অসহায় অবস্থা দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। তাঁর নিকট রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শক্তি। যেভাবে ফেরাউন ও হামান হযরত মূসা (আ.) এর মোকাবিলা করতে পারেনি; বরং ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ পাক মিসরেই আবাদ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর কোনো শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলাল্লাহ ﷺ -এর মোকাবিলা করতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে মক্কা বিজয় হবে। সারা আরবের নেতৃত্ব আসবে হযরত রাসূলাল্লাহ ﷺ -এর হাতে, বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষদের জন্মস্থান সিরিয়াও হবে তাঁর করতলগত। এই সমস্ত কথা দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

–[তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রা.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৪-৭৫]

তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আর নিশ্চয়ই আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্কের ব্যাপারে ইমাম রাযী (রা.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী একটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ : আর কাফেররা বলে, যে পর্যন্ত আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক এই নিদর্শন সমূহ না দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো না। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ অর্থাৎ তোমরা যে সব মোজেজার দাবি করছো এর চেয়ে শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ মোজেজা আমি ইতিপূর্বে মূসাকে দান করেছি কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল ঐ মোজেজা সমূহ দেখা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, পরিণামে তারা হয়েছে ধ্বংস।

–[তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ : এতে হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰيَة শব্দটি মোজেজা এবং কুরআনি আয়াতের অর্থাৎ আহকামে ইলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। একদল তাফসীরবিদ এখানে اٰيَة -এর অর্থ মোজেজা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশি হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নয়টি মোজেজা এভাবে গণনা করেছেন, ১. হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেতো। ২. শুভ্র হাত, যা জামার নিচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকতো। ৩. মুখের তোৎলামি যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া। ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আজাব প্রেরণ করা। ৬. তুফান প্রেরণ করা। ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। ৮. ব্যাঙের আজাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং ৯. রক্তের আজাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুকে রক্ত দেখা যেতো।

অপর একটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এখানে اٰيَات বলে আল্লাহর বিধি বিধান বোঝানো হয়েছে। এই হাদীসটি আবূ দাঊদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বিশুদ্ধ সনদ সহকারে সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী বলো না। সে যদি জানতে পারে যে, আমরাও তাকে নবী বলি, তবে তার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আ.) যে নয়টি প্রকাশ্য আয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. জেনা করো না, ৪. যে প্রাণকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, ৫. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির জন্য পেশ করো না, ৬. জাদু করো না, ৭. সুদ খেয়ো না, ৮. সতীসাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করো না। যে ইহুদি সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করো না।

এসব কথা শুনে উভয় ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হস্তপদ চুম্বন করে বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কি? তারা হযরত দাউদ (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তার বংশধরের মধ্যে যেন সব সময় নবী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের আশঙ্কা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি তাহলে ইহুদিরা আমাদেরকে বধ করবে।

এই তাফসীরটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অনেক তাফসীরবিদ একেই অগ্রগণ্যতা দান করেছেন।

قَوْلُهُ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– কুরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মোস্তাহাব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করে সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। অর্থাৎ দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে– আল্লাহ তা'আলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। এক. যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। দুই. যে ইসলামি সীমান্তের হেফাজতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে। –[বায়হাকী, হাকিম]

হযরত নজর ইবনে সা'দ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সম্প্রদায়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন। –[রূহুল মা'আনী]

আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদে পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর সংখ্যা খুবই কম। রূহুল মা'আনী গ্রন্থকার এ স্থলে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফজিলত সম্পর্কিত অনেক হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন– وَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ ذَالِكَ حَالَ الْعُلَمَاءِ . অর্থাৎ আলেমদের এরূপ অবস্থাই হওয়া উচিত। কেননা ইবনে জারীর ইবনে মুযির প্রমুখ তাফসীরবিদ আব্দুল আলা তায়মী (র.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু এমন ইলম প্রাপ্ত হয়েছে, যা তাকে ক্রন্দন করায় না; বুঝে নাও যে সে উপকারী ইলম প্রাপ্ত হয়নি।

قَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ الخ : এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তাওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিধৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক. রসূলুল্লাহ ﷺ -একদিন দোয়ায় 'ইয়া আল্লাহ্' ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু' আল্লাহ্কে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু'উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্পদ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র শরিক বলত। সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারিরা বলত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাজিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যা দ্বারা শক্তিলাভ করে সে কোনো সময় নিজের চাইতে ছোট হয়– যেমন সন্তান; কোনো সময় নিজের সমতুল্য হয়; যেমন অংশীদার এবং কোনো সময় নিজের চাইতে বড় হয়; যেমন সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাস'আলা : উল্লিখিত আয়াতে নামাজে কুরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুবই উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলা বাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাজসমূহের জন্য। জোহর ও আসরের নামাজে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামাজ বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজ বুঝায়। তাহাজ্জুদের নামাজও এর অন্তর্ভুক্ত; যেমন এক হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমর (রা.)-কে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন, যাকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন : আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও আদেশ দিলেন যে, অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। –[তিরমিযী]

নামাজে প্রিয়নবী ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের অবস্থা : হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর ﷺ যখন তাঁর স্বগৃহে থাকতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন যেন গৃহের লোকেরা তেলাওয়াত শ্রবণ করতে পারে। –[আবূ দাঊদ শরীফ]

প্রিয়নবী ﷺ কিভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন হযরত উম্মে সালমা (রা.) তা আমাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং এক এক শব্দ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাঠ করেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী]

হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার বাড়িতে থেকে হুজুর ﷺ এর কেরাতের শব্দ শ্রবণ করতাম।

–[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

আর হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর ঘর হুজুর ﷺ -এর বাড়ির সাথেই ছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে হুজুর ﷺ -এর পবিত্র কুরআন পাঠের পন্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, তিনি কখনও উচ্চৈঃস্বরে, কখনও নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৬]

নামাজের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাস'আলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি ইজাজতের আয়াত। [আহমদ, তাবারানী] এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। –[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আনাস (রা.) বলেন : আব্দুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোনো শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন :

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরজ করল! রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই– تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (الاية) -এর কিছু দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরজ করল, যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। –[তাফসীরে মাযহারী]

সমাপ্ত